এইচ. জি. ওয়েলস্

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদক

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য
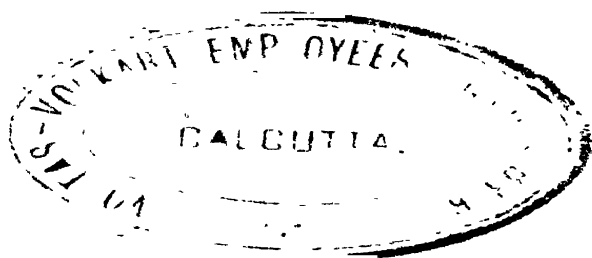
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৪
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২
ছেপেছেন
গৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

ছ-টাকা
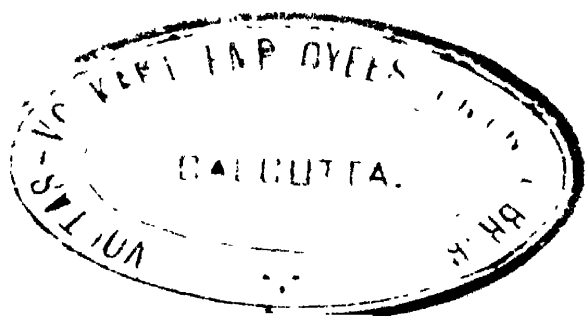
পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মুখবন্ধ

এই 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' অনেকটা একটা উপন্যাসের মত সরাসরি পড়ার জন্যই লেখা। আমাদের বর্তমান জ্ঞানোপযোগী বাহুল্য ও জটিলতা-মুক্ত ইতিহাসের সাধারণ বর্ণনা এই বইয়ে আছে। কোন এক বিশেষ যুগ বা কোন এক বিশেষ দেশের ইতিহাস পড়তে গেলে ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞানের যে কাঠামোটুকু প্রয়োজন, পাঠকেরা এই বইয়ে তা পাবেন। এই লেখকেরই অনেক সম্পূর্ণতর ও বিশদ 'আউটলাইন অব্ হিস্টরি' পড়তে যাওয়ার আগে এই বইটি প্রাথমিক পাঠ হিসাবে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। জীবনের ব্যস্ততার মাঝে যাঁদের খুঁটিয়ে 'আউটলাইন'এর মাত্রচিত্র ও চিত্র দেখে ইতিহাস পড়ার সময় নেই অথচ মনুষ্য জাতির এই দুঃসাহসিক অভিযান সম্বন্ধে যাঁরা তাঁদের বিস্মৃতপ্রায় কিংবা বিক্ষিপ্ত ধারণাকে ঝালিয়ে নিতে বা সুসংহত করতে চান—তাঁদের সেই প্রয়োজন সাধনই এই বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বইটি প্রথম বইটি থেকে সংক্ষিপ্ত করা নয়। তার বিশেষ পরিধির মধ্যে 'আউটলাইন'এর আর কোনরকম সংক্ষেপণ সম্ভব নয়। এই বইটি নতুন পরিকল্পনায়, নতুন ভাবে লেখা মোটামুটি সাধারণ এক ইতিহাস।

এইচ. জি. ওয়েলস্
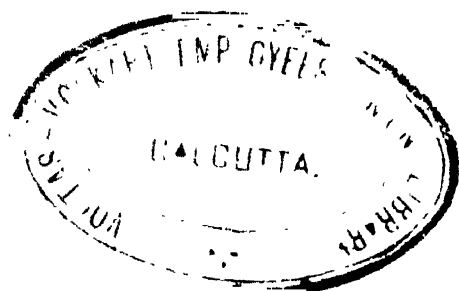
সমাজতন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক ও সত্যকার আদর্শবাদী এইচ. জি. ওয়েলসের মানব-জীবন সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম কৌতূহল। উদগ্র আগ্রহে তিনি সমস্ত জীবন তার উৎপত্তি, তাৎপর্য ও সম্ভাবনার মধ্যে ভবিষ্যতের তমিস্রাঘন রহস্যের চির-উন্মোচনের আশায় সত্যের সন্ধানে অতীতের অন্ধকার ইতিহাস ও রহস্যের মধ্যে আলো নিয়ে ঘুরে ফিরেছেন। সেই আলোক-উদ্ভাসেরই প্রত্যক্ষ ফল এই 'পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

তিনি বলেছেন: 'জ্ঞান ও মানব-শক্তি প্রতিনিয়তই বাড়ছে আমি দেখি। জীবনের সামনে প্রসারিত ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা আমি দেখতে পাই—তার কোন সীমা-রেখা নেই। জীবন আমার কাছে চিরস্থায়ী ঊষালগ্ন। আমাদের জীবন নিত্য নতুন আশায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে।' তাঁর লেখা সম্বন্ধে এইটুকুই পর্যাপ্ত।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কেবল এটুকুই বলবার যে, অনুবাদ যাতে সম্পূর্ণভাবে মূলানুগ হয় সে-বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে—লেখা সহজপাঠ্য বা সাবলীল করতে গিয়ে কোথাও মূলের অমর্যাদা করা হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট জে. এফ. হরাবিন-অঙ্কিত কুড়িটি মানচিত্র এই অনুবাদেও স্থান পেল।

১৮৬৬ এইচ. জি. ওয়েলস ১৯৪৬

মহাকাশে পৃথিবী

আমাদের এ পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটা কাহিনী যার অনেকটাই এখনও অজানা রয়ে গেছে। কয়েকশো বছর আগে পর্যন্ত মানুষ মোটামুটি গত তিন হাজার বছরের ইতিহাস জানত। তার আগে যা ঘটেছিল, তা ছিল নেহাতই কিংবদন্তী আর জল্পনা-কল্পনার ব্যাপার। সভ্যজগতের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করত এবং তাদের শেখানো হত যে, খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হঠাৎ একদিন এ পৃথিবীটা সৃষ্ট হয়েছে—যদিও এ কাণ্ডটা সে বছরের বসন্ত না শরৎকালে ঘটেছিল সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হতে পারেন নি। হিব্রু বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা আর তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো অযৌক্তিক ধর্মসম্বন্ধীয় অনুমানের উপর এই উদ্ভটরকমের সূক্ষ্ম অথচ ভ্রান্ত ধারণাটা গড়ে উঠেছিল। এ ধরনের ধারণাগুলো অবশ্য ধর্মগুরুরা বহুদিন হল বর্জন করেছেন। এখন একথা সকলেই স্বীকার করে যে যতদূর মনে হয় আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী অপরিমেয় বা নিঃসীম কাল থেকে আছে। অবশ্য এ মনে হওয়াতে ভুল থাকতে পারে, যেমন, একটা ঘরের দুদিকে মুখোমুখি দুটো আয়না বসিয়ে দেখানো যায় যে, ঘরটার যেন শেষ নেই। তবে, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি সেটা মাত্র ছয় কি সাত হাজার বছর ধরে আছে, এ ধারণাটা আজ সম্পূর্ণ বাতিল বলে ধরে নেওয়া চলে।

আজকাল একথা সকলেই জানে যে পৃথিবীটা প্রায় বর্তুলাকার—কমলালেবুর মত ওপর-নিচ একটু চাপা, আর এর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে অন্তত অল্প কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক জানতেন যে পৃথিবীটা বর্তুলাকার। কিন্তু তার আগে এটাকে চ্যাপ্টা মনে করা হত। পৃথিবীর সঙ্গে আকাশ, নক্ষত্র এবং গ্রহসমূহের সম্বন্ধ নিয়েও নানারকম ধারণা প্রচলিত ছিল, যেগুলো আজ অত্যন্ত আজগুবি বলে মনে হয়। আমরা এখন জানি যে, পৃথিবী প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের (যেটা নিরক্ষরেখার ব্যাস থেকে চব্বিশ মাইল কম) চারদিকে একবার ঘুরে আসে, সেই জন্যেই দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন হয়। আমরা এও জানি যে, পৃথিবী বছরে একবার করে কতকটা উপবৃত্তাকার আর ক্রমপরিবর্তনশীল এক পথে

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থায় ন-কোটি পনের লক্ষ মাইল। বাড়তে বাড়তে এটা ন-কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মাইল পর্যন্ত হয়।

পৃথিবীকে বেষ্টন করে প্রায় ২৩৯,০০০ মাইল দূরে একটা ছোট গোলক ঘোরে, যার নাম চাঁদ। সূর্যের চারদিকে শুধু যে পৃথিবী আর চাঁদই ঘোরে তা নয়। এ ছাড়াও রয়েছে তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে বুধ আর ছ-কোটি সত্তর লক্ষ মাইল তফাতে শুক্র গ্রহ। তারপর পৃথিবীর বৃত্ত ছাড়িয়ে ছোটখাট অজস্র উপগ্রহ ও গ্রহাণু ছাড়াও রয়েছে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুন। এদের দূরত্ব যথাক্রমে চোদ্দ কোটি দশ লক্ষ, আটচল্লিশ কোটি তিরিশ লক্ষ, অষ্টআশি কোটি ষাট লক্ষ, একশো আটাত্তর কোটি বিশ লক্ষ, এবং দুশো উনআশি কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। এই সব লক্ষ কোটি মাইলের হিসেবগুলো মনের পক্ষে ধারণা করা খুব শক্ত। আমরা যদি সূর্য আর গ্রহগুলোকে আরো ছোট আর সহজবোধ্য মানে নিয়ে আসি তাহলে পাঠকদের বোঝবার সুবিধে হতে পারে।

অতএব ধরা যাক, পৃথিবীটা এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা ছোট বল। এই অনুপাতে সূর্য হবে ন-ফুট ব্যাসের বিরাট একটা গোলা, পৃথিবী থেকে ৩২৩ গজ অর্থাৎ প্রায় একমাইলের পাঁচ ভাগের একভাগ দূরে—মোটামুটি চার-পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পৃথিবী থেকে ২½ ফুট দূরে থাকবে একটা ছোট্ট মটরদানার মত চাঁদ। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে থাকবে দুটো গ্রহ—বুধ আর শুক্র। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব হবে যথাক্রমে ১২৫ আর ২৩৩ গজ। এদের আশেপাশে আর চারদিকে সব ফাঁকা—যতক্ষণ না সূর্য থেকে ৪৯০ গজ দূরে মঙ্গলগ্রহে, বা প্রায় এক মাইল দূরে বৃহস্পতিতে, কিংবা দু-মাইল দূরে আকারে একটু ছোট শনিতে, চার মাইল দূরে ইউরেনাস-এ কিংবা ছ-মাইল দূরে নেপচুন-এ পৌঁছোন যায়। তারপরেই শূন্যতা আর শূন্যতা—তার মাঝে শুধু হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছোট ছোট কণা আর হালকা ধোঁয়ার ভাসমান পুঞ্জ। এ মাপে হিসেব করলে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারাটা হবে ৫০,০০০ মাইল দূরে।

যে বিশাল মহাশূন্যতার বুকে জীবননাট্য অভিনীত হচ্ছে এ সংখ্যাগুলোর থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

কেননা, এই বিপুল শূন্যতার মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই প্রাণী আছে বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমাদের যে চার হাজার মাইল ব্যবধান তার মধ্যে তিন মাইলের থেকে খুব বেশি নিচে

প্রাণের অস্তিত্ব নেই আর ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মাইলের বেশি উপরেও প্রাণের গতায়াত নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই অসীম মহাকাশের আর সবটাই শূন্য এবং নিষ্প্রাণ।

সবচেয়ে গভীর সমুদ্রতলের গভীরতা পাঁচ মাইল আর উঁচু দিকে কুড়ি মাইলের কিছু কম পর্যন্ত মানুষ যেতে পেরেছে। কোন পাখিই পাঁচ মাইল উঁচু অবধি উড়তে পারে না আর যে সব ছোট ছোট পাখি আর পোকামাকড় এরোপ্লেনে করে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দেখা গেছে তারা ঐ উচ্চতার অনেক নিচেই জ্ঞান হারায়।

মহাকালে পৃথিবী

গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি আর বয়স নিয়ে অনেক চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক গবেষণা চলছে। পদার্থবিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিজ্ঞান এখনও এতটা অপরিণত অবস্থায় রয়েছে যে এসব গবেষণার বেশির ভাগই অনুমানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের পৃথিবীর অনুমিত বয়সটা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার দিকেই ঝোঁকটা সাধারণত বেশি। একথা আজ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় যে, সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণমান একটা স্বাধীন গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর বয়স ২,০০০,০০০,০০০ বছরেরও বেশি। আসলে হয়ত তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। এই সময়ের দীর্ঘতাটা এত বেশি যে আমাদের কল্পনাশক্তিকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

এই দীর্ঘকালব্যাপী পৃথক অস্তিত্বের আগে সূর্য, পৃথিবী আর সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান অন্য গ্রহগুলো হয়ত একদিন ছিল মহাকাশে বিক্ষিপ্ত জড়বস্তুর একটা প্রকাণ্ড আবর্ত। দূরবীন দিয়ে নভোমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে সদাঘূর্ণমান নীহারিকামণ্ডলী দেখা যায়। দীপ্যমান মেঘসদৃশ এই বস্তুপুঞ্জ যেন একটা কেন্দ্রের চারদিকে পাক খাচ্ছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন যে, একসময় সূর্য আর তার গ্রহগুলোও এরকম একটা ঘূর্ণমান বস্তুপুঞ্জ ছিল ; ক্রমশ জমাট বাঁধতে বাঁধতে তারা আজকের এই অবস্থায় এসেছে। মহা যুগযুগান্তর ধরে এ জমাট বাঁধার কাজ চলেছে ; শেষে, যে সুদূর অতীতকালের হিসেব আমরা আগে দিয়েছি সেই সময় পৃথিবী আর চাঁদকে আলাদা বলে চেনা গেছে। এখনকার চেয়ে তখন তারা আরো অনেক জোরে ঘুরত, সূর্যের আরো কাছে ছিল, অনেক তাড়াতাড়ি তার চারদিকে ঘুরত আর বোধহয় তাদের উপরিভাগ জ্বলন্ত কিংবা গলিত ছিল। সূর্যের প্রখরতা আর ঔজ্জ্বল্যও ছিল অনেক বেশি।

সীমাহীন সময়ের গণ্ডী পেরিয়ে আমরা যদি পৃথিবীর সেই আদিম ইতিহাসের পর্যায়ে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ত, আজকের পৃথিবীর অন্য কোন দৃশ্যের চেয়ে তার বেশি সাদৃশ্য ব্লাস্ট-ফারনেসের অভ্যন্তরভাগ কিংবা জুড়িয়ে শক্ত হয়ে যাবার আগে গলিত লাভা-প্রবাহের উপরিভাগের সঙ্গে। কোথাও জল দেখা যেত না, কেননা জল যা থাকত তা খুব গরম বাষ্প হয়ে গন্ধক আর ধাতুবাষ্পের এক ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে মিশে থাকত। তার তলায় ঘুরত আর টগবগ করে ফুটত গলিত পাথরের এক সমুদ্র। আগুনে মেঘে ভরা আকাশের এপার থেকে ওপারে গরম আগুনের হল্‌কার মত ছুটে যেত সূর্য আর চাঁদ।

ক্রমশ আস্তে আস্তে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই জ্বলন্ত অগ্নিময় দৃশ্য তার প্রচণ্ড উত্তাপ হারিয়ে ফেলল। আকাশের বাষ্পগুলো বৃষ্টি হয়ে নিচে ঝরে পড়ল, তাদের ঘনত্ব গেল কমে। জমাট বাঁধতে শুরু করেছে এমন সব বড়-বড় পাথরের চাঙড় গলিত সমুদ্রের উপরিভাগে দেখা দিয়ে আবার তলিয়ে গেল, তাদের জায়গায় এল অন্য সব ভাসমান চাঙড়। সূর্য আর চাঁদ ক্রমশ দূরে সরতে আর ছোট হতে লাগল, তাদের চলার বেগ গেল কমে। আকারে ছোট হয়ে আসায় এর মধ্যেই চাঁদ জুড়িয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে আর সূর্যের আলো তাতে ক্রমান্বয়ে বাধা পেয়ে আর প্রতিফলিত হয়ে গ্রহণ আর পূর্ণিমার সৃষ্টি করে চলেছে।

এইভাবে বিপুল সময়ের মধ্য দিয়ে, খুব আস্তে আস্তে পৃথিবীটা ক্রমশ আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর মত হতে হতে শেষে এমন একটা যুগ এল, যখন ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে বাষ্প জমে মেঘ হতে শুরু করল আর প্রথম বৃষ্টি ফুঁসতে ফুঁসতে নেমে এল নিচের প্রথম শিলাস্তরের উপর। আরো অগণিত লক্ষ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বেশির ভাগ জলই এভাবে বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে থাকবে, কিন্তু প্রবল উষ্ণ জলের স্রোত নিচে জমাট বাঁধতে শুরু-করা পাথরের উপর দিয়ে বইতে লাগল; দিঘি আর জলাশয়ে এই প্রবাহগুলো বয়ে নিয়ে এল নুড়ি কাঁকর (detritus), আর জমা করল পলিমাটি।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যখন মানুষ পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে শুনে বসবাস করতে পারত। সে সময় যদি আমরা পৃথিবীটা দেখতে আসতাম তাহলে হয়ত আমাদের দাঁড়াতে হত লাভার মত জমাট পাথরের উপর। তাতে মাটি কিংবা জীবন্ত উদ্ভিজ্জের কোন চিহ্ন থাকত না। মাথার উপরে আকাশটা যেন ঝড়ে ছিঁড়ে পড়ত। গরম হাওয়ার ঝড়, আর মুষলধারে বৃষ্টি আমাদের উপর হানা দিত। সে ঝড় আজকের দিনের প্রচণ্ডতম তুফানের চেয়েও প্রবল, সে বৃষ্টি আজকের এই শান্ত, মৃদুগতি পৃথিবীর পক্ষে

কল্পনা করাও কঠিন। সেই বৃষ্টির জলধারাগুলো আমাদের পাশ দিয়ে বেগে ছুটে যেত—পাষাণবক্ষ লুট করে তারা হয়ে উঠত পঙ্কিল। পরস্পর মিশে অজস্র খরস্রোতা তটিনীর সৃষ্টি করে, তার চঞ্চল গতিপথে গভীর গিরিদরী আর গিরিখাত কেটে চলতে চলতে তারা সেই আদিম সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলত তাদের পলি-মাটির ভার। মেঘের ভিতর দিয়ে দেখতে পেতাম বিশাল এক সূর্য, আকাশের এপার থেকে ওপারে তার গতি পরিষ্কার দেখা যেত। আর সূর্য আর তারপরে চাঁদের অনুসরণ করে আসত নিত্যনৈমিত্তিক ভূমিকম্প আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর এখন যে চাঁদের একটা দিকই আমরা দেখতে পাই, তখন তাকে ঘুরতে দেখা যেত—দেখা যেত সেই দিকটাও, এখন যেটা সে জোর করে লুকিয়ে রেখেছে।

পৃথিবীর বয়স বাড়তে লাগল, দিনগুলো হল দীর্ঘতর, সূর্য গেল ক্রমশ দূরে সরে, তার তেজ গেল কমে। আকাশপথে চাঁদের গতিবেগও কমে এল। ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ডতা কমল, আদিম সমুদ্রে বাড়তে লাগল জল। অবশেষে তারা একত্র হয়ে এক সমুদ্রমেখলার সৃষ্টি করল যা আমাদের পৃথিবী আজও পরে রয়েছে।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু পৃথিবীতে কোনও প্রাণের আবির্ভাব হয় নি। সমুদ্র ছিল প্রাণহীন, পর্বতমালা বন্ধ্যা।

প্রাণের আবির্ভাব

মানুষের স্মরণাতীত কালে পৃথিবীতে যে সব জীবন জেগেছিল, তার বেশির ভাগ খবর আমরা পাই, স্তরীভূত শিলার মধ্যে নানারকম দাগ আর ফসিল থেকে। কাদা পাথর, স্লেট পাথর, চুনা পাথর আর বেলে পাথরের মধ্যে আমরা হাড়, ঝিনুক, গাছের আঁশ, বৃন্ত, ফল, পায়ের ছাপ, আঁচড়ের দাগ ইত্যাদি সংরক্ষিত দেখতে পাই। তারই পাশাপাশি রয়েছে আদিম জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ-খেলানো চিহ্ন আর আদিম বৃষ্টিপাতের দরুন বিন্দু বিন্দু অজস্র গর্ত। পাথরের ভিতর সংরক্ষিত এই সব নিদর্শন অনেক কষ্ট করে পরীক্ষা করে তবে পৃথিবীর জীবনের অতীত ইতিহাসের টুকরোগুলোকে এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা আজ সবাই জানে। পাললিক শিলাগুলো ঠিক স্তরে স্তরে সাজানো নেই। বহুবার লুণ্ঠিত এবং দগ্ধ গ্রন্থাগারের বইয়ের পাতার মত তাদের কুঁকড়িয়ে, দুমড়ে, এদিক-ওদিক ঠেলে, তালগোল পাকিয়ে, তছনছ করা হয়েছে। বহু লোকের একনিষ্ঠ আজীবন সাধনার ফলেই পাথরের এই নথিপত্র আবার সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে প্রথমদিকের পাথরগুলোকে ভূতাত্ত্বিকেরা নাম দিয়েছেন অ্যাজোইক পাথর, কেননা তাদের মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। উত্তর আমেরিকাতে এই অ্যাজোইক পাথরের বিশাল অঞ্চল অনাবৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেগুলো এত পুরু যে, ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন তারা ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের আধখানা জুড়ে রয়েছে। এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারটা আমি আবার বলছি। যেদিন পৃথিবীতে জল আর স্থল প্রথম আলাদা করে চেনা গেল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই যে বিরাট সময়ের ব্যবধান, এর অর্ধেকটাতে জীবনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ পাথরগুলোর উপরেও ঢেউয়ের আর বৃষ্টির চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জীবন্ত প্রাণীর চিহ্ন কিংবা নিদর্শন এগুলোতে একেবারেই অনুপস্থিত।

তারপর, উপর দিকের পাথরে ক্রমশ অতীত জীবনের চিহ্ন দেখা দেয় আর বাড়তে থাকে। পৃথিবীব ইতিহাসের যে যুগে আমরা অতীতের এই নিশানাগুলো পাই, ভূতাত্ত্বিকেরা তার নাম দিয়েছেন নিম্ন-প্যালিওজোইক যুগ। প্রাণের সাড়ার প্রথম আভাস পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে আর সুন্দর কয়েকটি জিনিসের নিদর্শনে—যেমন, ছোট ছোট শামুকজাতীয় মাছের খোলা, ফুলের মত মাথাওয়ালা উদ্ভিদাকৃতি নানারকম প্রাণী, সামুদ্রিক আগাছা, কীট আর চিংড়ি-জাতীয় জীবের চলার পথ আর দেহাবশেষ। খুব গোড়ার দিকেই ট্রিলোবাইট বলে অনেকটা বন-জোঁকের মত এক ধরনের প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়, যারা ঠিক বন-জোঁকের মতই নিজেদের শরীর বলের মত গুটিয়ে নিতে পারত। তার প্রায় বহু লক্ষ বছর পরে আসে এক ধরনের সামুদ্রিক বৃশ্চিক। এর আগে পৃথিবীতে এর চেয়ে দ্রুতগতি আর শক্তিশালী জীব আর দেখা যায় নি।

এ সমস্ত প্রাণীর কোনটাই খুব বড আকারের ছিল না। বড়র মধ্যে ছিল কয়েক রকম সামুদ্রিক বৃশ্চিক, যাদের দৈর্ঘ ছিল ন-ফুট। স্থলভাগে কোনও-রকম প্রাণের চিহ্ন ছিল না, না উদ্ভিদ না জীবজন্তু। পাষাণের ইতিহাসের এ অংশে কোন মাছ কিংবা মেরুদণ্ডী প্রাণী পাওয়া যায় না। ইতিহাসের এ যুগে যে-সব প্রাণীর চিহ্ন আমরা পাই, তারা হচ্ছে আসলে অগভীর জলের জীব। আমরা যদি নিম্ন-প্যালিওজোইক যুগের কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে আজকের কিছুর তুলনা করতে চাই, তবে তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হল কোন পাহাড়ে জলা কিংবা নোংরা নালা থেকে এক ফোঁটা জল নিয়ে তাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করা। যেসব ছোট চিংড়ি-জাতীয় জীব, ঝিনুক-জাতীয় খোলস-ধারী প্রাণী, উদ্ভিদাকৃতি জীব আর শেওলা (algæ) আমরা তার মধ্যে দেখতে

পাব, সেগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যাবে এদের সৌষ্ঠবহীন বৃহদাকার পূর্বগামীদের—যারা এক সময় ছিল আমাদের গ্রহে জীবজগতের মুকুটমণি।

এ কথাটা কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, নিম্ন-প্যালিওজোইক শিলা থেকে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সূত্রপাতের খুব অল্প নিদর্শনই আমরা পেতে পারি। কেননা যেসব জীবের দেহে হাড় বা অন্য কোন শক্ত অংশ ছিল না কিংবা যারা কাদায় তাদের গতিপথ বা গায়ের ছাপ রেখে যাবার মত যথেষ্ট বড় কিংবা ভারী ছিল না, তাদের পক্ষে কোনও প্রকার ফসিলীভূত নিদর্শন রেখে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ প্রকারের ক্ষুদ্র কোমলদেহী প্রাণী রয়েছে যারা ভবিষ্যৎ ভূতাত্ত্বিকদের আবিষ্কারের জন্য কখনও কোন চিহ্ন রেখে যাবে, একথা কল্পনাও করা যায় না। তেমনি, পৃথিবীর সেই আদিম কালে হয়ত এ রকম কোটি কোটি প্রকারের প্রাণী বাস করেছে বংশ বৃদ্ধি করেছে উন্নতি করেছে,—তারপর, কোন চিহ্ন না রেখেই চলে গিয়েছে। তথাকথিত অ্যাজোইক (প্রাণহীন) যুগের ঈষদুষ্ণ আর অগভীর হ্রদে আর সাগরে হয়ত জেলিজাতীয়, খোলসহীন, হাড়হীন অসংখ্য প্রাণী বাস করত, সূর্যকরোজ্জ্বল স্রোতসিক্ত প্রস্তরে আর বেলাভূমিতে হয়ত বিস্তৃত ছিল প্রচুর সবুজ ফেনিল উদ্ভিদরাজি। কোন ব্যাঙ্কের খাতায় যেমন সেই অঞ্চলের প্রতিটি অধিবাসীর অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি পাথরের এই ইতিহাসও বিগত যুগের সমস্ত প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয়। শুধু সেই সব প্রাণীই এ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে যারা খোলস, কাঁটা (spicule) বা কঠিন দেহাবরণ (carapace) ইত্যাদি কিছু একটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে পেরেছে। তবে যে যুগ থেকে পাথরে ফসিল পাওয়া যায় তার আগের যুগের পাথরে গ্রাফাইট বলে এক ধরনের নির্ভেজাল অঙ্গার (carbon) পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ মনে করেন যে কোন অজানা জীবিত পদার্থের জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে হয়ত ওগুলো মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়ে এসেছিল।

মৎস্য যুগ

যে সময়ে মনে করা হত যে পৃথিবীটা মাত্র অল্প কয়েক হাজার বছর হল হয়েছে, তখন লোকেরা বিশ্বাস করত যে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ আর প্রাণীর রূপ চূড়ান্ত আর অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয়েছে, ঠিক এখন যে রকম তাদের দেখা যায় সেই রকমই ছিল তাদের চেহারা। কিন্তু মানুষ যখন পাথরের ভিতর ইতিহাস আবিষ্কার করে তার পাঠোদ্ধার করতে শুরু

করল, তখনই সে বিশ্বাস চলে গিয়ে তার জায়গায় এ সন্দেহ দেখা দিল যে, হয়ত অনেক জাতের জীব যুগের পর যুগ ধরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে হতে এসেছে। এই সন্দেহটাও আবার ব্যাপক হতে হতে দাঁড়াল একটা বিশ্বাসে—জৈবিক বিবর্তনে (evolution) বিশ্বাস। এ বিশ্বাসটা হচ্ছে এই যে, প্রাণী উদ্ভিদ নির্বিশেষে এই যেসব জীব পৃথিবীতে দেখা যায়, তারা সবাই কতকগুলো খুব সাদাসিধে ধরনের পূর্বগামী জীব থেকে ধীর এবং একটানা কতকগুলো পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়েছে। সে জীবগুলো ছিল সুদূর অতীতে তথাকথিত অ্যাজোইক (প্রাণহীন) সাগরের কতকগুলো প্রায় নিরবয়ব প্রাণময় বস্তু।

পৃথিবীর বয়সের মত জৈবিক বিবর্তনের এই প্রশ্নটাও আগেকার দিনে অনেক তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু হয়েছিল। এমন এক সময় গেছে যখন কি কতকগুলো কারণে মনে করা হত যে, জৈবিক বিবর্তনে বিশ্বাস করাটা খাঁটি ক্রিশ্চান, ইহুদী আর মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সে সময় আর নেই। সমস্ত জীব একই বস্তু থেকে উদ্ভূত, এই নতুন এবং উদার মতবাদ গ্রহণ করতে খুব গোঁড়া ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইহুদী আর মুসলমান ধর্মের লোকদেরও এখন কোন বাধা নেই। কোন প্রাণীই এ পৃথিবীতে আচমকা সৃষ্ট হয় নি। জীবন পরিণতি লাভের পথে চিরকাল চলেছে, এখনও চলছে। যুগ যুগ ধরে, কল্পনাতীত কালসমুদ্র পার হয়ে, প্রাণের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে,—জোয়ার-ভাঁটার মধ্যেকার পাঁকে সামান্য একটু স্পন্দনের থেকে মুক্তি, শক্তি আর চেতনার দিকে।

কতকগুলো ব্যক্তিসত্তা (individual) নিয়ে প্রাণ তৈরি। এই সব ব্যক্তিসত্তা সুনির্দিষ্ট পদার্থ। পিণ্ড বা স্তূপের মত, কিংবা অগণিত নিশ্চল স্ফটিকাকার পদার্থের মত, প্রাণহীন বস্তু নয়। আর তাদের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে যা কোন প্রাণহীন বস্তুর নেই। তারা অন্য বস্তু নিজেদের মধ্যে হজম করে সেটা নিজেদের দেহের অংশে পরিণত করতে পারে আর তারা নিজেদের অনুরূপ প্রাণীর সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ তারা খায় এবং বংশবৃদ্ধি করে। তারা অন্য ব্যক্তিসত্তার জন্ম দিতে পারে—যারা প্রায় তাদের মত, কিন্তু সব সময় তাদের থেকে একটু আলাদা। প্রতিটি ব্যক্তি এবং তার সন্তানের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত সাদৃশ্য থাকে, আবার প্রতিটি পিতামাতা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ থাকে। একথা প্রত্যেক জাতের পক্ষে এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরে সত্য।

সন্তান-সন্ততি তাদের পিতামাতার মত কেন হবে কিংবা তাদের মত হবে না-ই বা কেন, তার কারণ অবশ্য বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে

পারেন নি। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে সন্তান-সন্ততিরা একই সঙ্গে কিছুটা একরকম আর কিছুটা আলাদা দেখতে হয়, তখন বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে, যে পরিবেশের মধ্যে এক জাতের প্রাণী বাস করে, সেটা যদি বদলে যায় তবে জাতটার মধ্যেও কতকগুলো পরম্পরাগত পরিবর্তন ঘটবে। কেন না, যে কোন জাতের প্রত্যেক পুরুষে (generation) এমন কয়েকজন ব্যক্তি থাকে যাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলো তাদের নতুন পরিবেশে বাঁচার পক্ষে বেশি উপযোগী করে তোলে। আবার কয়েকজন থাকে যাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জন্য টিঁকে থাকা বেশ কিছুটা শক্ত হয়ে পড়ে। মোটের উপর শেষোক্ত দলের চেয়ে প্রথমোক্ত দল বেশি দিন বাঁচে এবং বেশি সংখ্যায় নিজেদের বংশ বিস্তার করে। এভাবে পুরুষানুক্রমে সমস্ত জাতটার মোটামুটি ধারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এই যে প্রক্রিয়া, একে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ ততটা নেই যতটা আছে প্রজনন এবং ব্যক্তিগত প্রভেদ থেকে উদ্ভূত একটা সিদ্ধান্ত। এমন অনেক শক্তি হয়ত প্রাণীজাতির রূপান্তর, ধ্বংস কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে বিজ্ঞান যাদের ঠিক জানে না কিংবা বোঝে না। কিন্তু জীবনের শুরু থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই যে প্রক্রিয়া তার উপর কাজ করে চলেছে, যে মানুষ তাকে অস্বীকার করে হয় সে জীবনের প্রাথমিক তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ কিংবা তার সাধারণ চিন্তাশক্তিও নেই।

প্রাণের প্রথম আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক জল্পনাকল্পনা করেছেন। সেগুলো প্রায়ই খুব কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু কী করে প্রাণের প্রথম শুরু হল সে সম্বন্ধে কারুরই কোন নিশ্চিত জ্ঞান কিংবা বিশ্বাসযোগ্য ধারণা নেই। তবে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ বিষয়ে একমত যে, সম্ভবত প্রাণের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল উষ্ণ সূর্যকরোজ্জ্বল অগভীর লোনাজলের কাদা কিংবা বালির মধ্যে ; আর তা ছড়িয়ে গিয়েছিল একদিকে জোয়ার-ভাঁটার সীমারেখার মাঝখানের তীরভূমিতে আর অন্যদিকে উন্মুক্ত জলরাশিতে।

সেই আদিম পৃথিবী ছিল একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস আর জলস্রোতের জগৎ। তাদের টানে তীরভূমিতে উঠে শুকিয়ে গিয়ে কিংবা সমুদ্রের আলোবাতাস-হীন অতলে তলিয়ে গিয়ে অনেক প্রাণী নিশ্চয় নিয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। শেকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকা, আর বাইরে একটা চামড়া আর খোলস গজানো যাতে চট্ করে শুকিয়ে মরতে না হয়, এ প্রবৃত্তিগুলোর বিকাশের পক্ষে আদিম অবস্থাটা অনুকূল ছিল। একেবারে প্রথম থেকেই স্বাদের অনুভূতি প্রাণীদের খাদ্যের দিকে

আকৃষ্ট করত আর আলোর অনুভূতি তাদের সমুদ্রতলের অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাগহ্বর থেকে আলোর দিকে বেরিয়ে আসার কিংবা বিপজ্জনক অগভীর জলের আলোর প্রখর ঝলক থেকে সরে যাবার প্রেরণা জোগাত।

প্রাণীর দেহের প্রথম শক্ত খোলস বা দেহবর্ম বোধহয় শুকিয়ে মরবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হয়েছিল, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নয়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের গোড়ার দিকেই দাঁত আর নখ দেখা দিয়েছিল।

প্রথম সামুদ্রিক বৃশ্চিকদের আকার সম্বন্ধে আগেই বলেছি। বহুকাল ধরে এরাই ছিল জীবজগতের প্রভু। তারপর প্যালিওজোইক শিলার সিলুরিয়ান (silurian) বিভাগে (যেটা আজকাল অনেক ভূতাত্ত্বিক ৫০০,০০০,০০০ বছরের পুরোনো বলে মনে করেন) পাওয়া গেল এক নতুন ধরনের প্রাণী। এদের চোখ ছিল, দাঁত ছিল, আর ছিল অনেক বেশি সাঁতার কাটার ক্ষমতা। এরাই হল আমাদের জানা প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী, প্রথম মাছ।

এর পরে ডেভোনিয়ান (devonian) পর্যায়ের পাথরে এই মাছগুলোর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কার শিলাস্তরে এদের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে, শিলার ইতিহাসের এ আমলটাকে বলা হয় মৎস্য যুগ। এক ধরনের মাছ ছিল যারা এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর এক ধরনের মাছ ছিল যারা এখনকার হাঙর আর স্টার্জন মাছের সমগোত্রীয়। তারা জলের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যেত, লাফিয়ে হাওয়ার মধ্যে উঠে পড়ত, সামুদ্রিক আগাছার মধ্যে চরত, একে অন্যকে তাড়া করত আর শিকার করত, পৃথিবীর জলরাশিতে এনে দিত এক অভিনব প্রাণচঞ্চলতা। আমাদের এখনকার মাপকাঠি অনুসারে এদের কেউই খুব বড় ছিল না। খুব কম মাছই লম্বায় দু'তিন ফুটের বেশি ছিল। তবে ব্যতিক্রমও ছিল—যারা কুড়ি ফুট পর্যন্ত লম্বা হত। ভূতত্ত্ব থেকে আমরা এসব মাছের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি নি। এদের আগের কোন প্রাণীর সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এদের বংশপরিচয় সম্বন্ধেও প্রাণীবিজ্ঞানীদের অনেক চিত্তাকর্ষক ধারণা আছে। ওদের আজকের দিনের জীবিত জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ডিমের পরিণতি লক্ষ্য করে এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে দেখে তবে তাঁরা এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মনে হয় যে এসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষেরা ছিল কোমলদেহী, বোধহয় খুব ছোট ছোট সন্তরণকারী জীব, যাদের মুখের চারধারে প্রথমে দাঁতের মত শক্ত অংশ গজাতে শুরু করে। স্কেট ও ডগফিশ-জাতীয় মাছদের সমস্ত মুখ জুড়ে উপর নিচে দাঁতের সারি থাকে—সেগুলোই চ্যাপ্টা দাঁতের মত আঁশ হয়ে ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে তাদের শরীরের প্রায় সবটাই

ঘিরে থাকে। এই দাঁতের মত আঁশ গজাবার সঙ্গে সঙ্গে মাছেরা অতীতের গোপন অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসে। এরাই হল প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা ভূতত্ত্বের ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল।

কয়লা জলাভূমির যুগ

মৎস্যযুগে পৃথিবীর স্থলভাগ একেবারে প্রাণহীন ছিল বলেই মনে হয়। বাঁজা পাথুরে ডাঙা জমি আর এবড়ো খেবড়ো টিলার উপর রোদ আর বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ত। সত্যিকারের মাটি বলতে কিছু ছিল না—কেননা, না ছিল তখন মাটি তৈরি করতে সাহায্য করবার জন্য কেঁচোর দল, না ছিল কোন রকম উদ্ভিদ যারা পাথরের কণাগুলোকে ভেঙে ধুলোয় পরিণত করবে। শৈবাল (moss) বা লতাগুল্মেরও (lichen) কোন চিহ্ন ছিল না। তখনও প্রাণ ছিল কেবল সাগরের বুকে।

বন্ধ্যা প্রস্তরেব এই পৃথিবীর উপর চলত আবহাওয়ার প্রবল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের কারণগুলো খুবই জটিল আর সেগুলো সম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হয় নি। পৃথিবীর কক্ষপথের আকারের পরিবর্তন, আবর্তনের ফলে মেরুদ্বয়ের ক্রমশ স্থান পরিবর্তন, মহাদেশগুলোর আকার পরিবর্তন, এমন কি হয়ত সূর্যের তাপের হ্রাসবৃদ্ধি, সব একজোট হয়ে কখনও বা ভূ-পৃষ্ঠের বিশাল সব অংশ বহুকাল ধরে ঠাণ্ডায় আর বরফে ডুবিয়ে রাখত আবার কখনও বা কোটি কোটি বছর ধরে এই গ্রহের উপর একটা উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিছিয়ে রাখত। পৃথিবীর ইতিহাসে কতকগুলো গভীর আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের যুগ আছে বলে মনে হয়। সে সময় কয়েক কোটি বছরের মধ্যে সঞ্চিত উৎক্ষেপগুলো (upthursts) অগ্ন্যুৎপাত আর ভূ-পৃষ্ঠের উত্তোলনের রেখায় বিদীর্ণ হয়ে পৃথিবীর মহাদেশ আর পর্বতমালার পুনর্বিন্যাস করেছে; সমুদ্রের গভীরতা বেড়েছে, পাহাড়ের উচ্চতা বেড়েছে, শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এর পরেই এসেছে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তার বিশাল সব যুগ,—যখন বৃষ্টি, তুহিন (frost) আর নদী মিলে পাহাড়ের উচ্চতা ক্ষইয়ে ফেলে প্রভূত পরিমাণ পলিমাটি বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রতলকে ভরাট আর উঁচু করে তুলেছে। ক্রমশ সমুদ্রগুলো আরও অগভীর হয়ে উঠেছে, আরও বেশি করে স্থলভাগের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে 'উচ্চতা ও গভীরতা' আর 'অনুচ্চতা ও সমতলতা'র যুগ এসেছে আর গেছে। যেদিন পৃথিবীর ওপরের খোসাটা জমাট বেঁধেছে সেদিন থেকেই যে পৃথিবীটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে

আসছে—এ ধারণাটা যেন পাঠকেরা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেন। ভূ-ত্বকটা জমাট বাঁধবার মত ঠাণ্ডা হবার পর থেকেই পৃথিবীর ভিতরকার তাপটা আর উপরকার অবস্থার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কেননা, অ্যাজোইক যুগেও বহুকালব্যাপী এবং প্রচুর পরিমাণ বরফ আর তুষার অর্থাৎ হিম যুগের চিহ্ন আছে।

মৎস্য যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে, সমুদ্র আর উপহ্রদগুলো যখন অত্যন্ত অগভীর, তখনই কতকটা পাকাপাকিভাবে প্রাণীরা জল থেকে স্থলে বিস্তার লাভ করে। এবার যেসব ধরনের প্রাণীর অজস্র আবির্ভাব হতে থাকে তাদের পূর্বপুরুষেরা যে কোটি কোটি বছর ধরে কোন দুর্লভ অজানা উপায়ে ক্রমশ উন্নত হচ্ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সুযোগ এল এখন।

স্থলভাগের এই আক্রমণের ব্যাপারে উদ্ভিদরা যে প্রাণীদের অগ্রবর্তী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রাণীরা বোধহয় উদ্ভিদের খুব অল্পদিন পরেই স্থলে আসা শুরু করে। স্থলভাগে উদ্ভিদের প্রথম যে সমস্যাটার সমাধান করতে হল সেটা হচ্ছে টেকসই আর শক্ত একটা অবলম্বনের ব্যবস্থা যাতে করে জলের ঊর্ধ্বচাপ (buoyancy) থেকে বঞ্চিত হলেও তার অপপত্রগুলোকে সূর্যালোকের দিকে তুলে ধরা যায়। দ্বিতীয়টা হল জল পাওয়ার সমস্যা। কেননা জল এখন আর হাতের কাছে নেই, নিচের জলাভূমি থেকে সেটা উদ্ভিদের শিরায় শিরায় পৌঁছে দিতে হবে। এ দুটো সমস্যার সমাধান হল কাঠের মত শক্ত শিরা তৈরি হওয়ায়। সেগুলো উদ্ভিদটাকে খাড়াও রাখত আবার পাতায় পাতায় জল সরবরাহের কাজও করত। এই সময়কার পাষাণফলকের ইতিহাস বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদের দ্বারা আকীর্ণ। এদের বেশির ভাগই বিরাট আকৃতির। বড় বড় শৈবাল, লতাগুল্ম, আরও কতরকম গাছ। এদেরই সঙ্গে বুকে হেঁটে ডাঙায় উঠে আসতে লাগল নানা ধরনের সব প্রাণী। কত শতপদী সহস্রপদী জীব, আদিম পোকামাকড়, পুরাকালের রাজ-কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী আর জল-বৃশ্চিক, যা পরবর্তীকালে আদিম মাকড়সা আর স্থল-বৃশ্চিকে রূপান্তরিত হয়েছিল—আর এই সময়েই মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব শুরু হয়।

আদিম যুগের এসব পোকামাকড়ের কোন কোনটা ছিল খুব বিরাট আকারের। এই সময় এক ধরনের ড্রাগন মাছি ছিল যাদের পাখার বিস্তার ছিল উনত্রিশ ইঞ্চি।

নবপর্যায়ের এই সব জীবেরা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করার উপযোগী করে তুলেছিল। এ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই জলে দ্রবীভূত বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করত—বস্তুত এখনও সব প্রাণীই তাই করে। কিন্তু

এখন নানা উপায়ে প্রাণীরাজ্য নিজের প্রয়োজনমত আর্দ্রতা নিজেরাই সরবরাহ করতে শিখে নিতে লাগল। আজ যদি কোন মানুষের ফুসফুস একেবারে শুকিয়ে যায়, সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। তার ফুসফুসের গা ভিজে থাকলেই তবে বাতাস তার মধ্যে দিয়ে তার রক্তে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণের উপযোগী হবার জন্য সব ক্ষেত্রেই হয় পুরোনো ধরনের কানকোর উপর একটা ঢাকনি তৈরি করতে হয়েছে যাতে আর্দ্রতাটা না উবে যায়, নয়তো শরীরের একেবারে ভিতরে কোনরকম নল অথবা নতুন কোনরকম শ্বাস-যন্ত্র তৈরি করতে হয়েছে যেগুলো একরকম জলীয় পদার্থ ক্ষরণের ফলে ভিজে থাকে। মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীর মাছদের আদি পুরুষেরা যেসব সেকেলে ধরনের কানকো দিয়ে শ্বাসকার্য চালাত, সেগুলোকে ডাঙার উপর শ্বাস নেবার উপযোগী করে নেওয়া গেল না। অতএব প্রাণী-জগতের এই বিভাগে মাছদের সাঁতারের থলিটাই দেহের গভীরে অবস্থিত একটা নতুন শ্বাসযন্ত্রে পরিণত হল, যাকে বলে ফুসফুস। উভচর বলে পরিচিত যে সমস্ত প্রাণী, যেমন এখনকার ব্যাং এবং গোসাপ (newt) জাতীয় জীবেরা, তারা প্রথমে জলে তাদের জীবন শুরু করে আর কানকো দিয়ে শ্বাস নেয়। তারপর, যেভাবে অনেক মাছের সাঁতারের থলির উৎপত্তি হয় সেই ভাবে তাদের গলা থেকে একটা থলির মত ফুসফুসটা গজিয়ে উঠে শ্বাসকার্য চালাবার ভার নেয়, প্রাণীটি ডাঙায় চলে আসে, কানকোগুলো ছোট হতে থাকে, কানকোর ফুটোগুলো বুজে যায় (শুধু একটা ফুটো থাকে, এটা বেড়ে কানের গর্ত আর কানের পর্দা হয়ে ওঠে)। এখন থেকে প্রাণীটি শুধু বাতাসেই বেঁচে থাকতে পারে, তবে ডিম পেড়ে বংশ বৃদ্ধি করার জন্যে তাকে অন্ততপক্ষে জলের কিনারায় ফিরে আসতেই হয়।

উদ্ভিদ্ আর জলাভূমিতে আকীর্ণ এই যুগের বায়ু থেকে শ্বাসগ্রহণকারী সব মেরুদণ্ডী প্রাণীই ছিল উভচর শ্রেণীর। প্রায় সবাই আজকালকার গোসাপদের সগোত্র আর তাদের কতকগুলো রীতিমত বৃহদাকৃতির হত। তারা স্থলচর প্রাণী ছিল বটে, কিন্তু সেই ধরনের স্থলচর প্রাণী—যাদের স্যাঁতসেতে জলা জায়গার মধ্যে কিংবা আশেপাশে বাস করা দরকার। এ যুগের সমস্ত বড় বড় গাছ ছিল এদেরই মত উভচর স্বভাবের। তাদের মধ্যে কেউ তখনও এমন ফল বা বীজ উৎপাদন করতে পারে নি যা জমিতে পড়লে শিশির আর বৃষ্টি যতটুকু আর্দ্রতা এনে দিতে পারে তারই সাহায্যে অঙ্কুরিত হতে পারত। মনে হয় অঙ্কুরিত হবার জন্য তাদের সকলকেই তাদের অপবীজ (spores) জলে ফেলতে হত।

বাতাসের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীরা যেসব জটিল এবং বিস্ময়কর

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল সেটার অনুসরণ তুলনামূলক শারীর সংস্থান বিদ্যার (anatomy) মত চমৎকার বিজ্ঞানের একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয়। উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক, সমস্ত জীবিত পদার্থই আসলে জলের জিনিস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মাছ থেকে আরম্ভ করে মানুষ অবধি উন্নত ধরনের যত মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে তাদের সবারই ডিম্বাবস্থায় কিংবা জন্মাবার আগে এমন একটা কানকোর ফুটো থাকে যা শিশু জন্মাবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের চোখ আঢাকা, জলে ভেজা। উন্নত ধরনের প্রাণীদের চোখের পাতা আর জল ঝরার গ্রন্থি আর্দ্রতা নিঃসরণ করে, শুকিয়ে যাবার হাত থেকে চোখকে রক্ষা করে। বাতাসের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গের ক্ষীণতার জন্য প্রয়োজন হয় কানের পর্দার। বাতাসের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্য শরীরের প্রায় প্রতিটি যন্ত্রেই এ ধরনের রূপান্তর আর পরিবর্তনের জোড়াতালির দেখা পাওয়া যাবে।

এই কার্বনিফেরাস বা উভচরদের যুগটা ছিল জলা, উপহ্রদ আর সেই সব জলের মধ্যে মধ্যে নিচু জমিতে জীবন ধারণের যুগ। জীবন তখন অতটা দূর এগিয়েছিল। পাহাড় আর উঁচু ডাঙাগুলো তখনও ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ্যা এবং প্রাণহীন। প্রাণীরা যদিও বাতাসে শ্বাস নিতে শিখেছিল, তবু তখনও পর্যন্ত তাদের মূল ছিল তাদের জন্মস্থান যে জল, তাতে। তখনও বংশ-বিস্তার করবার জন্য তাদের জলে ফিরে আসতে হত।

সরীসৃপ যুগ

কার্বনিফেরাস যুগের প্রাণপ্রাচুর্যের পরেই এল শুষ্ক বিষণ্ণ কতকগুলো যুগের একটা বিরাট চক্র। পাষাণের দলিলে তাদের পরিচয় রয়েছে পুরু বেলেপাথরের স্তরে, যার মধ্যে ফসিলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। পৃথিবীর তাপমাত্রা তখন খুব বেশিরকম কমত আর বাড়ত আর দীর্ঘ দিন ধরে পৃথিবী থাকত হিমশীতল। বিশাল জায়গা জুড়ে জলাভূমির উদ্ভিজ্জের আগেকার প্রাচুর্য শেষ হয়ে আর এই সব নতুনতার প্রস্তরস্তরে চাপা পড়ে একটা সংকোচন আর খনিজ পদার্থে রূপান্তরী-করণের প্রক্রিয়ার শুরু হল ; যার ফলে আজকের পৃথিবী তার অধিকাংশ পাথুরে কয়লার সন্ধান পেয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের সময়েই জীবন তার সবচেয়ে দ্রুত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চলে আর কষ্টের মধ্যে থেকেই সে লাভ করে তার সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষাগুলো। প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন উষ্ণতা আর আর্দ্রতার দিকে ফিরে আসে, আমরা নতুন

এক শ্রেণীর প্রাণীর আর উদ্ভিদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেখতে পাই। এ সময়কার পাষাণের দলিলে আমরা এমন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহাবশেষ পাই যারা ডিম পাড়ত। সে ডিম থেকে এমন ব্যাঙাচি বেরুত না যাদের কিছুকাল জলে থাকা দরকার। ডিম থেকে বেরোবার আগেই বাচ্চাগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর এতটা কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছত যে বেরোবার পরমুহূর্ত থেকেই তারা স্বাধীনভাবে বাতাসে বাস করতে পারত। কানকো তখন একেবারেই বাদ হয়ে গেছে এবং কানকোর ফুটোগুলো শুধু ভ্রূণাবস্থাতেই দেখা যেত।

ব্যাঙাচি-দশা-লুপ্ত এই সব প্রাণীই হল সরীসৃপ। এদের সঙ্গে সঙ্গেই বীজবাহী বৃক্ষের উদ্ভব হয়েছে—যারা জলাভূমি কিংবা হ্রদের সাহায্য ছাড়াও বীজ ছড়াতে পারে। এখন দেখা দিল পামগাছের মত সাইক্যাড আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানারকম ঋজুদেহী গাছ, যদিও তখনও কোনরকম ফুলগাছ কিংবা ঘাস ছিল না। অনেক রকমের ফার্ন ছিল আর নানাধরনের পোকামাকড়ের সংখ্যাটাও তখন বেড়ে গিয়েছিল। গুবরে-জাতীয় পোকা দেখা দিয়েছিল, তবে মৌমাছি বা প্রজাপতি তখনও আসে নি। তবে নতুন যে পুরোপুরি ডাঙার জীব আর উদ্ভিদ সৃষ্ট হবে তার সব মূল রূপ এই বিরাট প্রখরতার যুগগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এর পরে উন্নতি আর বাড়বাড়ন্তের জন্য ডাঙার জীবনের অপেক্ষা রইল শুধু অনুকূল অবস্থার সুযোগের।

যুগের পর যুগ ধরে বহু উত্থান-পতনের পর সেই স্থিরতাটুকু এল। ভূপৃষ্ঠের সেই অনিশ্চিত নড়াচড়া, তার কক্ষের পরিবর্তন, কক্ষপথ আর মেরুর মধ্যবর্তী কোনের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি একসঙ্গে মিলে দীর্ঘস্থায়ী আর বহুবিস্তৃত একটা উষ্ণ অবস্থার সৃষ্টি করল। এখন অনুমান করা হয় যে, এ যুগটা ২০০,০০০,০০০ বছরেরও বেশি চলেছিল। এটাকে বলা হয় মেসোজোইক যুগ; কেননা এটা হল এর আগেকার অনেক বড় প্যালিওজোইক আর অ্যাজোইক যুগ (একসঙ্গে ১,৪০০,০০০,০০০ বছর) আর পরেকার কেইনোজোইক বা নতুন জীবনের যুগের মাঝখানে। এই নতুন জীবনের যুগটা হচ্ছে আবার মেসোজোইক যুগ আর বর্তমান কালের মাঝের সময়টুকু। মেসোজোইক যুগটাকে সরীসৃপ যুগও বলা হত কারণ সে সময় ঐ ধরনের প্রাণীদের বিস্ময়কর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। প্রায় ৮০,০০০,০০০ বছর আগে এ যুগের শেষ হয়।

আজকের পৃথিবীতে সরীসৃপের শ্রেণী (genera) সে তুলনায় অনেক কম, তাদের সংস্থানও সীমাবদ্ধ। কার্বনিফেরাস যুগে যেসব উভচর প্রাণী ছিল দুনিয়ার মালিক তাদের যে সামান্য কটি বংশধর টিঁকে আছে, তাদের তুলনায় সরীসৃপরা

যে শ্রেণীবৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠ, একথা সত্য। এখনও সাপ আছে, জলের আর ডাঙার কচ্ছপ আছে, ঘড়িয়াল, কুমির আর গিরগিটি আছে। এদের সকলেরই সারাবছর গরম চাই—শীত এদের মোটেই সয় না। সম্ভবত মেসোজোইক যুগের সব সরীসৃপই এই একই অসুবিধেয় ভুগত। এরা ছিল গরম আবহাওয়ার জীবজন্তু, বাসও করত গরম আবহাওয়ার উদ্ভিদের ভিতর। তুহিন এদের সহ্য করতে হত না। তবু পৃথিবীতে অন্তত তখন সত্যিকারের শুকনো ডাঙার প্রাণী আর উদ্ভিদ-জগৎ গড়ে উঠেছে। গত যুগের প্রাণপ্রাচুর্যের সময় কাদা আর জলাভূমিতে যে-সব প্রাণী আর উদ্ভিদ বেড়ে উঠেছিল এরা তাদের থেকে আলাদা।

এখন যেসব ধরনের সরীসৃপ আমরা চিনি সেসব তখন ছিল আরও প্রচুর—বড় বড় জলের আর ডাঙার কচ্ছপ, বড় বড় কুমির, অনেক গিরগিটি আর সাপ। কিন্তু এ ছাড়াও ছিল কয়েক শ্রেণীর বিস্ময়কর প্রাণী যারা এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডাইনোসর বলে এক ধরনের অজস্র প্রাণী ছিল। পৃথিবীর নিচু জমিগুলোতে তখন গাছপালা গজাতে শুরু করেছিল—নলখাগড়া, ফার্নজাতীয় লতাগুল্মের ঝোপ আর ঐ ধরনের সব গাছপালা। আর এই প্রাচুর্যের মধ্যে চরবার জন্য এল অসংখ্য তৃণভোজী সরীসৃপের দল। মেসোজোইক যুগ যেমন তার চরম উন্নতির দিকে এগোতে লাগল, এরাও আকারে ক্রমশ বড় হতে লাগল। এই জন্তুগুলোর মধ্যে কোন-কোনটা এত বড় হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত অত বড় জন্তু ডাঙায় জন্মায় নি। তারা তিমিমাছের মত বড় হত। যেমন, ডিপ্লোডোকাস কার্নেগিয়াই (Diplodocus Carnegii)। নাকের ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত এদের মাপ ছিল চুরাশি ফুট। জাইগান্টোসরাসগুলো হত আরও বড়। সেগুলো একশো ফুট লম্বা হত। এই সব দৈত্যগুলোকে খেয়ে জীবনধারণ করত এদের সঙ্গে মাপসই চেহারার একদল মাংসাশী ডাইনোসর। এদের মধ্যে টিরানোসরাস বলে এক প্রাণীকে অনেক বইয়ে আঁকা আর বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা নাকি সরীসৃপী বীভৎসতার চরম।

যে সময় এই বিরাট জীবগুলো মেসোজোইক অরণ্যের অপপত্র আর চিরসবুজ গাছগুলোর মধ্যে চরে বেড়াত আর একে অন্যের পেছনে ধাওয়া করত, সে সময় ছিল অধুনালুপ্ত আর-এক জাতের সরীসৃপ যাদের হাত-পায়ের সামনের দিকটা বাদুড়ের মত ছিল আর যারা পোকামাকড়দের আর একে অন্যকে তাড়া করে বেড়াত। এরাই হচ্ছে টেরোড্যাকটিল (Pterodactyl)। এরা প্রথমে লাফাত, প্যারাশুটের মত উপর থেকে পড়ত, তারপর বনের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে উড়ে বেড়াত। এরাই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা উড়তে পারত। মেরুদণ্ডী জীবদের

ক্রমবর্ধমান শক্তির এ একটা নতুন কৃতিত্ব। তাছাড়া কতকগুলো সরীসৃপ আবার সাগরের জলে ফিরে যেতে লাগল। বড় বড় সাঁতারু প্রাণীর তিনটি দল, যে সমুদ্র থেকে তাদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল সেই সমুদ্রে গিয়ে হানা দিল। এরা হল মেসোসর, প্লেসিওসর আর ইকথিওসর (the Mesosaurs, the Plesiosaurs, and Ichthyosaurs)। এদের কতকগুলো আয়তনে আবার একালের তিমিমাছের কাছাকাছি হয়ে উঠল। মনে হয়, ইকথিওসররা ছিল পুরোপুরি সমুদ্রচর জীব। কিন্তু প্লেসিওসররা ছিল এমন এক ধরনের প্রাণী যাদের তুলনা আজকাল পাওয়া যায় না। তাদের মোটা আর প্রকাণ্ড শরীরে লাগানো ছিল পাখনা যাতে তারা জলাভূমি কিংবা অগভীর জলাশয়ের তলা দিয়ে সাঁতার কেটে কিংবা বুকে হেঁটে যেতে পারত। দেহের তুলনায় ছোট মাথাটা বসানো থাকত বিশাল একটা সাপের মত গলার উপর, যেটা রাজহাঁসের গলাকেও হার মানাত। প্লেসিওসররা হয় রাজহাঁসদের মত সাঁতার কাটতে কাটতে জলের তলায় খাবার খুঁজে খেত নয়ত জলের তলায় ওৎ পেতে থেকে চলতি মাছ আর জন্তুদের ছোঁ মেরে ধরত।

সারা মেসোজোইক যুগটা ধরেই প্রধান প্রধান ডাঙার প্রাণীরা ছিল এই ধরনের। আমাদের, অর্থাৎ মানুষদের হিসেবে এ যুগটা ছিল এর আগের যেকোন যুগের চেয়ে উন্নত। যেসব স্থলচর জীব এ যুগে জন্ম নিয়েছিল—আকারে, পাল্লায়, শক্তিতে, সক্রিয়তায় তারা আগে পৃথিবীতে যেসব প্রাণী দেখা দিয়েছে তাদের থেকে অনেক বড়, অনেক বেশি প্রাণবন্ত। সমুদ্রে অবশ্য এরকম কোন অগ্রগতি দেখা দেয় নি, তবে সেখানেও নতুন ধরনের প্রাণীদের বংশবিস্তার খুব বেশি হয়েছিল। অগভীর সমুদ্রগুলোয় অ্যামোনাইট বলে এক শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণী দেখা দিয়েছিল। এদের বেশির ভাগই ছিল কুণ্ডলী পাকানো, খোপকাটা খোলওয়ালা স্কুইডের (Squid) মত জীব। এদের পূর্বপুরুষেরা প্যালিওজোইক যুগেও ছিল বটে, কিন্তু এটাই ছিল এদের গৌরবময় যুগ। আজ এদের কোন বংশধরই নেই; এদের সবচেয়ে নিকটাত্মীয় হচ্ছে উষ্ণমণ্ডলীয় সাগরের বাসিন্দা মুক্তোর মত চকচকে নটিলাস (Nautilus)। এর আগে পর্যন্ত মাছদের গায়ে যে পাতের মত আর দাঁতের মত আঁশ ছিল তার চেয়ে হাল্‌কা আর সূক্ষ্ম আঁশওয়ালা এক নতুন ধরনের মাছ সেই তখন থেকে নদীতে আর সাগরে প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

প্রথম পাখি আর স্তন্যপায়ী জীব

প্রাণের ইতিহাসে সেই প্রথম গরম কাল—মেসোজোইক যুগ। কয়েক প্যারাগ্রাফে আমরা তখনকার প্রচুর সতেজ গাছপালা আর অজস্র সরীসৃপের ছবি

এঁকেছি। কিন্তু যে সময় ডাইনোসররা উষ্ণ চিরসবুজ বনভূমি আর সমতল জলাভূমিগুলোয় রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে, আর টেরোড্যাকটিলরা তাদের পাখার শব্দে এবং হয়ত তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকারে বনভূমিকে পূর্ণ করে সেই সব পুষ্পহীন গুল্ম আর তরুরাজির মধ্যে গুঞ্জরণশীল কীট-পতঙ্গের অনুসরণ করছে, ঠিক সেই সময় প্রাণপ্রাচুর্যের প্রান্তসীমায় অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়বার মত এবং সংখ্যায় অল্প কতকগুলো প্রাণী শক্তি সঞ্চয় করছিল আর সহনশীলতার শিক্ষা নিচ্ছিল। অবশেষে যখন সূর্য আর পৃথিবীর উদার হাসিমুখ মিলিয়ে যেতে শুরু করল তখন এই শক্তি আর শিক্ষা তাদের জাতির পক্ষে যারপরনাই কাজে এসেছিল।

ডাইনোসর ধরনের কতকগুলো ছোট ছোট লম্ফনশীল সরীসৃপ জাতির একটা দল বোধহয় রেষারেষি আর শত্রুদের তাড়নার ফলে এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছিল, যখন তাদের হয় ধ্বংস হওয়া নয় সমুদ্রতীর কিংবা উঁচু পাহাড়ের শীতের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই বিপন্ন জাতগুলোর মধ্যে একটা নতুন ধরনের আঁশ উৎপন্ন হল। সেগুলো লম্বা হয়ে পালকের মত আকৃতি ধারণ করল এবং শিগগিরই আদিম ধরনের পালকে পরিণত হতে শুরু করল। এই পালকের মত আঁশগুলো একটার উপর একটা চাপানো থাকায় এমন একটা তাপধারক আবরণ সৃষ্টি করল যেটা আগের যেকোন সরীসৃপের আবরণের চেয়ে বেশি কার্যকরী। কাজেই তাদের অধিকারীরা এমন সব ঠাণ্ডা জায়গায় যেতে পারত, যেখানে তখনও কেউ বাস করে নি। বোধহয় এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই জীবগুলোর মধ্যে নিজেদের ডিমের প্রতি বেশি যত্নের একটা প্রবৃত্তি দেখা দিল। বেশির ভাগ সরীসৃপকেই নিজেদের ডিম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন বলে মনে হয়, ফোটবার জন্য সেগুলোকে রোদ আর ঋতুর কৃপার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু জীবনবৃক্ষের এই নতুন শাখায় কয়েক ধরনের জীবের মধ্যে নিজেদের ডিম পাহারা দেবার আর নিজেদের শরীরের উত্তাপ দিয়ে সেগুলো গরম রাখবার একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে লাগল।

শীতের সঙ্গে এইভাবে খাপ খাইয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জীবদের ভিতরে ভিতরে অন্য কতকগুলো পরিবর্তন ঘটল যাতে এদের অর্থাৎ এই আদিম পাখিদের রক্ত হয়ে উঠল গরম; আর তাদের রোদ পোয়াবার দরকার রইল না। খুব গোড়ার দিককার পাখিরা বোধহয় ছিল মৎস্যভোজী সমুদ্রের পাখি, তাদের পায়ের আগাটায় পাখা ছিল না, ছিল পাখনা—অনেকটা পেঙ্গুইনদের মত। সেই অদ্ভুত ধরনের আদ্যিকালের পাখি নিউজিল্যাণ্ডের কিউই (Kiwi)।

এদের পালকগুলো খুব সাদাসিধে রকমের। এরা ওড়ে না, আর এদের কোন পুরুষে কেউ উড়তে পারত বলে মনে হয় না। পাখিদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পাখার আগে এসেছে পালক; কিন্তু পালকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এল তাদের হালকা ভাবে মেলে দেবার সম্ভাবনা, যেটার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল পাখা। আমরা অন্ততপক্ষে এমন একটা পাখির ফসিলীভূত দেহাবশেষ পেয়েছি যার চোয়ালের দাঁত আর লম্বা লেজ ছিল সরীসৃপদের মত, কিন্তু আবার খাঁটি পাখিদের মত ডানাও ছিল। এরা নিশ্চয় উড়ে বেড়াত আর মেসোজোইক যুগের টেরোড্যাকটিলদের সঙ্গে লড়াই করে টিঁকে থাকত। এসব সত্ত্বেও মেসোজোইক যুগে পাখিরা কি সংখ্যায় কি বৈচিত্র্যে খুব বেশি ছিল না। যদি কোন লোক মেসোজোইক যুগের কোন দেশে ফিরে যেতে পারত, তাহলে সে হয়ত দিনের পর দিন হেঁটেও পাখির মত কিছু দেখতে পেত না, যদিও শরবন আর ঝোপের মধ্যে টেরোড্যাকটিল আর পোকামাকড়ের প্রাচুর্য তার চোখে পড়ত।

আর একটা জিনিসও সে বোধহয় কখনও দেখতে পেত না। সেটা হচ্ছে কোন স্তন্যপায়ী জীবের চিহ্ন। বোধহয় পাখি বলা যেতে পারে এরকম কোন জিনিসের লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রথম স্তন্যপায়ী জীবেরা আবির্ভূত হয়েছে। তবে নজরে পড়বার পক্ষে তারা ছিল খুবই ছোট, অস্পষ্ট, আর সুদূর।

একেবারে গোড়ার দিকের পাখিদের মত একেবারে গোড়ার দিকের স্তন্যপায়ী জীবেরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর তাড়ার ফলে কষ্টকর জীবন আর শীত সহ্য করতে বাধ্য হয়। তাদেরও আঁশগুলো পালকের মত হয়ে তাপধারক আচ্ছাদন হয়ে ওঠে। তাদেরও খুঁটিনাটিতে আলাদা অথচ মোটামুটি এক ধরনের কতকগুলো পরিবর্তন হওয়ায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে, রোদ পোয়াবার আর প্রয়োজন থাকে না। পালকের বদলে তাদের লোম গজায় এবং ডিমে আর তা না দিয়ে যতদিন না সেগুলো প্রায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করছে ততদিন সেগুলো তারা তাদের শরীরের ভিতর গরমে এবং নিরাপদে রাখে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পুরোপুরি জরায়ুজ (viviparous) হয়ে ওঠে। তাদের বাচ্চারা জ্যান্ত অবস্থাতে পৃথিবীতে আসতে শুরু করে, আর এমনকি বাচ্চা জন্মাবার পরেও রক্ষণাবেক্ষণ আর ভরণপোষণের জন্য তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখার দিকে তাদের ঝোঁক দেখা যায়। সব না হলেও আজকের বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী জীবই স্তনবিশিষ্ট। তারা বাচ্চাকে স্তন্যপান করায়। এখনও দুটি স্তন্যপায়ী জীব আছে যাদের প্রকৃত স্তন নেই, যদিও তারা তাদের চামড়ার তলা থেকে নিঃসৃত এক ধরনের পুষ্টিকর রস দিয়ে তাদের বাচ্চার পুষ্টিসাধন করে। এরা হচ্ছে হাঁস-ঠোঁট প্ল্যাটিপাস (duck-

billed platypus) আর একিড্‌না (echidna)। একিড্‌না চামড়ায় ঢাকা ডিম পেড়ে সেগুলো নিজের পেটের তলায় একটা থলিতে রেখে দেয়, আর না ফোটা পর্যন্ত সেগুলো এভাবে গরমে আর নিরাপদে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মেসোজোইক পৃথিবীতে বেড়াতে এলে দর্শককে একটা পাখি দেখবার জন্য যেমন দিনের পর দিন খোঁজ করতে হত, তেমনি ঠিক কোথায় খোঁজ করতে হবে না জানা থাকলে স্তন্যপায়ী জীবের কোন চিহ্ন খোঁজাও বৃথা হত। পাখি আর স্তন্যপায়ী জীব দুইই মেসোজোইক আমলে নেহাৎই খাপছাড়া, গৌণ আর নগণ্য জীব বলে মনে হত।

আজকাল অনুমান করা হয় যে, সরীসৃপ যুগ ৮০,০০০,০০০ বছর চলেছিল। মানুষের মত বুদ্ধিমান কোন জীব যদি এই ধারণাতীত সময় ধরে পৃথিবীটা লক্ষ্য করত, তাহলে তার কাছে তখনকার রোদ আর প্রাচুর্যের জগৎ কী নিরাপদ আর চিরস্থায়ীই না মনে হত, কী নিশ্চিতই না মনে হত ডাইনোসরদের কর্দমাক্ত সুখের জীবন আর অসংখ্য উড়ন্ত গিরিগিটির ডানার ঝাপটানি। অথচ তারপরেই মহাবিশ্বের রহস্যময় ছন্দ আর ক্রমসঞ্চিত শক্তি সেই আপাত-চিরন্তন অবিচলতার প্রতিকূল হতে শুরু করল। জীবকুলের সৌভাগ্যের সেই মেয়াদটুকু ফুরিয়ে আসছিল। যুগের পর যুগ, অযুতের পর অযুত বছর ধরে, মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে আর পেছিয়ে গিয়েও, ক্লেশকর আর চরম জলবায়ুর একটা অবস্থার দিকে পরিবর্তন হতে লাগল আর তার সঙ্গে হল জমির উচ্চতার বিপুল রূপান্তর, পাহাড়ের আর সমুদ্রের বিরাট পুনর্বিন্যাস। সুদীর্ঘ মেসোজোইক যুগের সমৃদ্ধির ক্রমাবনতির সময় আমরা পাথরের দলিলে একটা জিনিস দেখতে পাই যেটা এই ধীর এবং দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান্তরের দ্যোতক। সেটা হচ্ছে প্রাণীদের রূপের প্রচণ্ড পরিবর্তন আর নতুন নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত সব শাখাজাতির (species) আবির্ভাব। ধ্বংসের ঘনায়মান ভ্রূকুটির সম্মুখীন হয়ে পুরোনো সব শ্রেণী (orders) আর জাতি (genera) তাদের রূপান্তরের আর মানিয়ে নেবার সামর্থ্য শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ করছিল, যেমন মেসোজোইক অধ্যায়ের এই শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় অ্যামোনাইটরা অজস্র উদ্ভট রূপ ধারণ করেছিল। স্থিতাবস্থায় নতুনত্ব সৃষ্টির কোন উৎসাহ থাকে না। নতুন কিছু গড়ে উঠে না, উঠলেও তাদের দাবিয়ে দেয়া হয়; সে অবস্থার পক্ষে যারা সবচেয়ে উপযোগী, তারা তো রয়েইছে। নতুন অবস্থাতে কিন্তু সেই মামুলি ধরন-গুলোই (types) বিপদে পড়ে। নতুনরাই তখন টিকে থাকবার আর কিছুদিনের জন্য নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার বেশি সুযোগ পায়।

এর পর পাষাণের ইতিহাসে একটা ফাঁক দেখা যায় যেটা হয়ত বহু লক্ষ বছরের। এখানে এখনও একটা পর্দা ফেলা রয়েছে, জীবনের ইতিহাসের অতি ক্ষীণতম রেখাটিও তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। এ পর্দা যখন ওঠে, দেখা যায় সরীসৃপ যুগ শেষ হয়ে গেছে। ডাইনোসর, প্লেসিওসর, ইকথিওসর, টেরোড্যাকটিল, অসংখ্য জাতি আর শাখাজাতি-বিশিষ্ট অ্যামোনাইট—সকলেই একেবারে মিলিয়ে গেছে। তাদের বিশাল বৈচিত্র্য নিয়ে তারা মরে গেছে, কোন বংশধরও রেখে যায় নি। ঠাণ্ডা তাদের মেরে ফেলেছে। তাদের চরম রূপান্তরগুলোও যথেষ্ট ছিল না; টিঁকে থাকবার নিয়মগুলো তারা কখনো ধরতে পারে নি। কতকগুলো চরম প্রাকৃতিক অবস্থার একটা দশার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী গিয়েছে যেটা ছিল তাদের সহন-ক্ষমতার অতীত। আস্তে আস্তে এবং নিঃশেষে মেসোজোইক জীবদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এখন আমরা দেখতে পাই এক নতুন দৃশ্য। নতুন এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু এক উদ্ভিদকুল আর নতুন এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু এক প্রাণীকুল এখন পৃথিবীর অধিকারী।

যে দৃশ্য নিয়ে জীবননাট্যের এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, সেটা তখনও রিক্ত এবং হতশ্রী। শীতের তুষারে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যেসব গাছ তাদের পাতা ঝরিয়ে দেয়, সেই সব গাছ আর পুষ্পিত লতাগুল্মকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে সাইক্যাড আর উষ্ণমণ্ডলের সরল বর্গীয় গাছেরা। আর আগে যেখানে ছিল সরীসৃপদের ছড়াছড়ি, সেখানে তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঢুকছে ক্রমশ অধিক-সংখ্যক আর নতুন ধরনের পাখি আর স্তন্যপায়ী জীব।

স্তন্যপায়ী জীবদের যুগ

পৃথিবীর জীবনে এর পরের মহাযুগ, অর্থাৎ কেইনোজোইক যুগের আরম্ভ হয়েছিল আগ্নেয়গিরিগুলোর তীব্র সক্রিয়তা আর ভূস্তরের উত্থানের মধ্যে দিয়ে। এই সময়টাতেই আল্পস্ আর হিমালয়ের সুবিশাল স্তূপ আর রকিজ ও অ্যাণ্ডিজ পর্বতের মেরুদণ্ড চাড়া দিয়ে উঠেছিল আর আমাদের এখনকার সমুদ্র ও মহাদেশ-গুলোর একটা মোটামুটি সীমারেখা দেখা দিয়েছিল। এই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্রটার সঙ্গে এখনকার পৃথিবীর মানচিত্রের একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যেতে লাগল। আজকালকার হিসেবে ধরা হয় যে, কেইনোজোইক যুগের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চার থেকে আট কোটি বছর কেটে গেছে।

কেইনোজোইক যুগের সূচনায় পৃথিবীর জলবায়ু ছিল কঠোর। এটা আস্তে আস্তে গরম হতে হতে আবার একটা খুব প্রাচুর্যের অবস্থায় এসে পৌছল।

তারপর আবার অবস্থাটা কঠিন হয়ে দাঁড়াল ; পৃথিবী কতকগুলো অত্যন্ত তীব্র শীত-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করল। এগুলোকে বলা হয় হিম যুগ (Glacial Age)। মনে হয়, পৃথিবী এখনও আস্তে আস্তে এই যুগ থেকে বেরিয়ে আসছে।

তবে জলবায়ুর অবস্থার পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে বর্তমান জ্ঞান তাতে করে আমরা ভবিষ্যতে জলবায়ুর অবস্থার কী হেরফের হতে পারে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। হয়ত আমরা আরো বেশি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের দিকে এগোচ্ছি কিংবা আর একটা হিম যুগে ফিরে যাচ্ছি ; আগ্নেয়গিরিগুলোর ক্রিয়াকলাপ আর পর্বতস্তূপগুলোর উত্থান হয়ত বাড়ছে, কিংবা হয়ত কমে আসছে। আমরা জানি না। এর জন্যে যে বিশেষ জ্ঞানের দরকার, তা আমাদের নেই।

এই যুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাস দেখা যায়। এই প্রথম পৃথিবীতে চারণ-ভূমির আবির্ভাব হল। আর, অবজ্ঞাত স্তন্যপায়ী জাতের প্রাণীগুলোর পূর্ণ পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হল কতকগুলো কৌতূহলোদ্দীপক জন্তু যারা চরে খায়, আর কতকগুলো মাংসাশী জাতের প্রাণী যারা সেগুলোকে শিকার করে।

আগেকার যুগগুলোয় যে সব তৃণভোজী আর মাংসভোজী সরীসৃপেরা সমৃদ্ধি লাভ করে তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, প্রথম প্রথম মনে হয় এসব আদিম স্তন্যপায়ী জীবগুলোর সঙ্গে তাদের তফাৎ বোধহয় সামান্য কয়েকটা লক্ষণে। কোন অসাবধানী পর্যবেক্ষকের মনে হতে পারে যে, উষ্ণতা আর প্রাচুর্যের এই যে দ্বিতীয় যুগের শুরু হল, তাতে বোধহয় প্রকৃতি প্রথমটারই পুনরাবৃত্তি করেছে —তৃণভোজী আর মাংসভোজী ডাইনোসরদের জায়গায় তৃণভোজী আর মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী এসেছে, টেরোড্যাকটিলের বদলে পাখি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেটা হবে একেবারে ওপর-ওপর তুলনা। বিশ্বের বৈচিত্র্য অনন্ত আর অবিরাম, এর অগ্রগতি চিরন্তন ; ইতিহাস কখনও নিজের পুনরাবৃত্তি করে না এবং কোন তুলনাই একেবারে সঠিক হতে পারে না। মেসোজোইক আর কেইনোজোইক যুগের প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে তাদের মধ্যে যেসব পার্থক্য ছিল, সেগুলো অনেক বেশি গভীর।

এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূলগত যেটা, সেটা হচ্ছে এ দুই যুগের মানসিক গঠনের পার্থক্য। জনিতা (parent) আর সন্তানের মধ্যে একটা সংশ্রব থেকে যাওয়াটা হচ্ছে স্তন্যপায়ীদের (আর কিছুটা কম পরিমাণে পাখিদের) জীবনের সঙ্গে সরীসৃপদের জীবনের প্রভেদ। আর আসলে এর থেকেই এই

মানসিক গঠনের পার্থক্যের সৃষ্টি। অল্প কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সরীসৃপেরা ডিম পেড়ে সেগুলো আপনা থেকে ফুটবে বলে ফেলে রেখে চলে যায়। সরীসৃপ-শিশু তার জনিতার সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তার মানসিক জীবন যেটুকু আছে, সেটুকুর শুরু আর শেষ তার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সমশ্রেণীর জীবদের অস্তিত্ব হয়ত সে সয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই; সে কখনও অনুকরণ করে না, কখনও তাদের কাছ থেকে কিছু শেখে না, তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করতে সে অপারগ। তার জীবন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি-জীবন। কিন্তু নতুন এসব স্তন্যপায়ী আর বিহগ-বংশের যে বৈশিষ্ট্য, সেই স্তন্যদান আর সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে অনুকরণের মধ্যে দিয়ে শেখা, সতর্কতাসূচক চিৎকারের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা এবং আরও সব একজোট হয়ে কাজ করবার আর পরস্পরকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ও তালিম দেবার সম্ভাবনা। শেখালে শিখতে পারে, এ ধরনের জীব দুনিয়ায় এসে গেছে।

কেইনোজোইক যুগের একেবারে গোড়ার দিককার স্তন্যপায়ী জীবদের মস্তিষ্কের আয়তন অপেক্ষাকৃত সক্রিয় মাংসাশী ডাইনোসরদের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল না। কিন্তু পাষাণের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে যত আমরা আধুনিক যুগের দিকে আসি ততই দেখতে পাই স্তন্যপায়ী জীবদের প্রত্যেকটি জাত এবং দলের মধ্যে মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার একটা সুনিশ্চিত এবং সর্বব্যাপী বৃদ্ধি। যেমন, প্রায় গোড়ার দিকেই, আমরা গণ্ডার-শ্রেণীর জীবদের দেখতে পাই। টাইটানো-থেরিয়াম বলে একটা প্রাণী এ যুগের একেবারে প্রথম বিভাগে আবির্ভূত হয়েছিল। স্বভাব আর প্রয়োজনের দিক থেকে এ বোধহয় প্রায় আজকালকার গণ্ডারদের মত ছিল। কিন্তু এর মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা এর জীবিত বংশধরের এক-দশমাংশও ছিল না।

প্রথম দিককার স্তন্যপায়ীরা বোধহয় স্তন্যদানের সময় শেষ হয়ে গেলেই তাদের সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেত। কিন্তু পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা জেগে ওঠবার পর, সম্পর্কটা বজায় রাখবার সুবিধেটা খুব বড় হয়ে দেখা দিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে স্তন্যপায়ীদের কতকগুলো শ্রেণীর মধ্যে সত্যিকারের সামাজিক জীবনের সূচনা দেখা দিয়েছে। তারা দল বেঁধে, জোট পাকিয়ে, একসঙ্গে থাকছে; একে অন্যকে লক্ষ্য করছে, অনুকরণ করছে, একে অপরের গতিবিধি দেখে আর ডাক শুনে সতর্ক হচ্ছে। এ ধরনের জিনিস পৃথিবীতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আগে দেখা যায়নি। মাছ আর সরীসৃপদের

ঝাঁকে ঝাঁকে আর দলে দলে দেখা যায় সত্যি, তারা একসঙ্গে অনেকে ডিম ফুটে বেরোয়; তারপর একই অবস্থায় পড়ে একসঙ্গে থাকে। কিন্তু সামাজিক এবং যূথচারী স্তন্যপায়ীদের বেলায় দল বাঁধবার প্রেরণাটা শুধু বাইরের অবস্থার চাপ থেকেই আসেনি—আন্তরিক একটা আবেগ এটাকে রক্ষা করেছে। শুধু *একে অন্যের মত দেখতে বলেই যে তাদের একই সময়ে একই জায়গায় পাওয়া যায়* তা নয়; তারা একে অন্যকে পছন্দ করে বলেই একসঙ্গে থাকে।

সরীসৃপ জগতের সঙ্গে আমাদের মানুষদের মানসিক জগতের এই পার্থক্যটুকু যেন আমাদের সহানুভূতি দিয়ে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারি না। একটা সরীসৃপের সহজ উদ্দেশ্য, তার ক্ষুধা, ঘৃণা আর ভয়ের মধ্যে যে ক্ষিপ্র, অজটিল একটা তাগিদ আছে তা আমরা আমাদের ভিতর কল্পনা করতে পারি না। তাদের, সরলতার জন্য আমরা তাদের বুঝতে পারি না; কারণ আমাদের সব চিন্তাধারাই জটিল। আমাদের তাগিদগুলো সরল এক-একটা তাগিদ নয়, অনেকগুলো তাগিদের যোগ-বিয়োগের ফল। কিন্তু স্তন্যপায়ী আর পাখিদের মধ্যে আত্মসংযম আছে অপরের জন্য বিবেচনা আছে, আছে একটা সামাজিক আবেদন, একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ, যা একটু নিচু স্তরের হলেও, অনেকটা আমাদের ধরনের। ফলে তাদের প্রায় সবশ্রেণীর সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। কষ্ট পেলে তাদের চিৎকার এবং নড়াচড়া আমাদের সমবেদনার উদ্রেক করে। আমরা তাদের এমনভাবে পোষ মানাতে পারি যাতে তারা আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের বুঝি। তাদের বন্য ভাব দূর করে আমাদের প্রতি ব্যবহারে আত্মনিয়ন্ত্রণ আর গৃহপালিত জন্তুর মত আচরণ-শিক্ষা দেওয়া যায়।

মস্তিষ্কের এই অসাধারণ বৃদ্ধিই হল কেইনোজোইক যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এর দ্বারা সূচিত হল প্রাণীতে প্রাণীতে একটা নতুন যোগাযোগ আর পরস্পর-নির্ভরতা। যেসব মানবসমাজের কথা আমরা শিগগিরই বলব, এর মধ্যেই সেগুলো গড়ে ওঠার পূর্বাভাস রয়েছে।

কেইনোজোইক যুগ যতই এগিয়ে যেতে লাগল ততই এর উদ্ভিদ আর প্রাণী-জগতের সঙ্গে আজকের পৃথিবীর উদ্ভিদ আর প্রাণীদের মিল পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। প্রকাণ্ড কুৎসিতদর্শন উইন্টাথের আর টাইটানোথেররা (যাদের মত প্রকাণ্ড কুৎসিত জানোয়ার আজ একটাও নেই) অন্তর্ধান করল। আবার অন্য-দিকে কয়েক শ্রেণীর প্রাণী কতকগুলো কিম্ভূতকিমাকার পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমশ উন্নতি করতে করতে হয়ে দাঁড়াল আজকের পৃথিবীর জিরাফ, উট, ঘোড়া, হাতী, হরিণ, কুকুর, সিংহ আর বাঘ। বিশেষত ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের কাহিনী ভূতাত্ত্বিক প্রস্তর-

ফলকে পরিষ্কারভাবে পড়া যায়। কেইনোজোইক যুগের টেপির আকৃতি ছোট একটা পূর্বপুরুষ থেকে মোটামুটি তার রূপের ক্রমবিবর্তনের পুরোপুরি ধারাটাই আমরা খুঁজে পেয়েছি। আর-একটা এ রকম ক্রমোন্নতির ধারা এখন কতকটা ঠিকঠিক ভাবে গেঁথে তোলা হয়েছে। এটা হচ্ছে লামা (llama) এবং উটদের।

বানর, লেজহীন বানর ও উপ-মানব

নিসর্গবাদীরা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর জীবদের কতকগুলো বর্গে (order) ভাগ করেছেন। এদের সবার উপরে আছে প্রাইমেট বর্গ (primates), যার মধ্যে আছে লীমার (lemur), বানর, লেজহীন বানর আর মানুষ। এ শ্রেণীবিভাগটা গোড়ায় দৈহিক গঠন-সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল, মানসিক গুণাগুণের কথা মোটেই ধরা হয় নি।

এখন, ভূবিদ্যার জগতে এই প্রাইমেটদের অতীত ইতিহাস নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। এসব জন্তুদের বেশির ভাগই হয় লীমার আর বানরদের মত জঙ্গলে, নয় বেবুনদের মত ফাঁকা পাহাড়ে জায়গায় থাকত। খুব কমই তারা জলে ডুবে পলি-মাটিতে চাপা পড়ত আর তাদের অধিকাংশ শ্রেণীই সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। কাজেই ঘোড়া, উট ইত্যাদির পূর্বপুরুষদের যত ফসিল পাওয়া যায় এদের ফসিল পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম। তবে আমরা জানি যে, কেইনোজোইক যুগের বেশ গোড়ার দিকেই, অর্থাৎ ৪০,০০০, ০০০ বছর আগে বা তার কাছাকাছি সময়ে আদিম বানর ও লীমার-জাতীয় জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের আধুনিক বংশধরদের তুলনায় তারা ছিল মগজে খাটো আর তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোও তখনও ততটা ফুটে ওঠে নি।

মধ্য-কেইনোজোইক যুগের জগৎজোড়া গ্রীষ্মের বিশাল যুগটা অবশেষে শেষ হল; জীবনের ইতিহাসের পথে আরো দুটো বিশাল গ্রীষ্ম আগে চলে গেছে—পাথুরে কয়লার জলাভূমির যুগের গ্রীষ্ম আর সরীসৃপ যুগের বিরাট গ্রীষ্ম। এটা তাদের অনুসরণ করল। আর একবার পৃথিবীটা ঘুরতে ঘুরতে একটা হিম যুগের দিকে এগিয়ে চলল। পৃথিবী কনকনে ঠাণ্ডা হল, কিছুদিনের জন্য শীতটা একটু কমল, আবার কনকনে ঠাণ্ডা হল। উষ্ণ যে যুগটা অতীত হল তাতে প্রচুর প্রায়োষ্ণ-মণ্ডলীয় (sub-tropical) গাছপালার মধ্যে জলহস্তীরা গড়াগড়ি দিত আর যেখানে এখন ফ্লীট স্ট্রীটের সাংবাদিকেরা যাওয়া-আসা করে সেখানে ভয়ঙ্কর খড়্গদন্তী বাঘেরা তাদের খাঁড়ার মত দাঁত দিয়ে শিকার ধরে বেড়াত। এবার এল আরো ঠাণ্ডা আর নিরানন্দ এক যুগ। তারপর আরো বেশি ঠাণ্ডা আর

নিরানন্দ কয়েকটা যুগ। উপজাতিগুলোর মধ্যে বিরাট একটা বাছাই আর ধ্বংসের কাজ চলল। ঠাণ্ডা আবহাওয়া সইতে পারে এমন এক জাতের লোমশ গণ্ডার, হাতীদের এক বিশাল আকারের লোমশ জ্ঞাতি ম্যামথ, উত্তর মেরুর কস্তুরী-বৃষ (musk-ox) আর বল্‌গা-হরিণ একে একে দৃশ্যপটের উপর দিয়ে চলে গেল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তর মেরুর তুষার-মুকুট সেই বিশাল হিম যুগের শীতল মরণ নিয়ে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল। ইংলণ্ডে সেটা প্রায় টেমস্ নদী পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল, আমেরিকায় ওহিও অবধি। কখনও কখনও কয়েক হাজার বছরের জন্য পৃথিবীটা একটু গরম থাকত, তারপর আবার ফিরে যেত দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে।

এই শীতের দশাগুলোকে (phases) ভূতাত্ত্বিকেরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং *চতুর্থ হিম যুগ বলেন আর এদের মাঝের সময়গুলোকে বলেন হিমান্তর কাল (Inter-glacial periods)। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাতে আজও সেই ভয়ঙ্কর* শীতের ক্ষয়, ক্ষতি আর ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। প্রায় ৬০০,০০০ বছর আগে প্রথম হিম যুগের আগমন সূচিত হয়; আর চতুর্থ হিম যুগ তার সবচেয়ে তীব্র অবস্থায় পৌঁছয় প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে। এই সুদীর্ঘ সর্বব্যাপী শীতের তুষারের মধ্যেই এই গ্রহের বুকে প্রথম মানুষের মত জীবেরা আবির্ভূত হয়।

কেইনোজোইক যুগের মাঝামাঝি সময়ে নানারকমের লেজহীন বানর দেখা যায় যাদের চোয়াল আর পায়ের হাড়ে অনেক অর্ধমনুষ্যোচিত লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এইসব হিম যুগের কাছাকাছি এসেই আমরা এমন কতকগুলি প্রাণীর চিহ্ন দেখতে পাই যাদের 'প্রায়-মানুষ' বলা যেতে পারে। এসব চিহ্ন হাড় নয়, যন্ত্রপাতি। ইউরোপে এই সময়কার, অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশলক্ষ বছর আগেকার শিলাস্তরে বহু পাথর আর চকমকি পাওয়া গেছে যেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে কোন নিপুণ প্রাণী এগুলোর ধারালো প্রান্ত দিয়ে পেটবার, চাঁচবার কিংবা লড়াই করবার বাসনায় এগুলোকে ইচ্ছে করে এভাবে টুকরো করে শান দিয়েছে। এ জিনিসগুলোকে 'এওলিথ' (ঊষা প্রস্তর) বলে। যারা এ জিনিসগুলো তৈরি করেছিল ইউরোপে সেই প্রাণীর কোন হাড় বা দেহাবশেষ নেই, শুধু জিনিসগুলো আছে। যতই আমরা নিশ্চিত হই না কেন, এটা একেবারেই মানুষের মত নয়, এরকম কোন বুদ্ধিমান বানরও হতে পারে। কিন্তু যবদ্বীপের ট্রিনিলে, এই যুগের প্রস্তর-সঞ্চয়ের মধ্যে এক ধরনের বানর-মানুষের মাথার খুলির একটা টুকরো আর কতকগুলো দাঁত আর হাড় পাওয়া গেছে। জীবিত যেকোন লেজহীন বানরের চেয়ে তার মগজের খোলটা বড়, আর বোধহয় সে সোজা হয়ে হাঁটত। এই জীবটিকে এখন পিথেকানথ্রোপাস

ইরেক্টাস (Pithecanthroupus erectus) বলা হয়, অর্থাৎ খাড়াচারী বানর-মানুষ। এই প্রাণীটির এই সামান্ত কখানা হাড়ই এওলিথগুলোর সৃষ্টিকর্তাদের বিষয়ে ধারণা করবার পক্ষে আজ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সহায়।

এর পর, প্রায় আড়াই লক্ষ বছরের পুরোনো বালিতে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা মনুষ্যপ্রায় প্রাণীর আর কোন ক্ষুদ্র অংশও পাই না। তবে, যন্ত্রপাতি আছে প্রচুর। পাষাণের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে যতই এগিয়ে যাই, ততই তাদের ঔৎকর্ষ ক্রমশ বেড়ে ওঠে। সেগুলো আর বিশ্রী-গড়নের এওলিথ থাকে না; হয়ে ওঠে যথেষ্ট নিপুণতা দিয়ে গড়া সুঠাম হাতিয়ার। আর পরবর্তী যুগে আসল মানুষেরা এ ধরনের যে সমস্ত হাতিয়ার বানিয়েছে, এগুলো তার চেয়ে আকারে অনেক বড়। তারপর হাইডেলবার্গে এক বালির গর্তে দেখা গেল শুধু একটা অর্ধমানবিক চোয়ালের হাড়—বিশ্রী একটা চোয়ালের হাড়—তাতে একটুও চিবুক নেই—সত্যিকারের মানুষের চোয়ালের হাড়ের চেয়ে সরু আর অনেক ভারী, —যার জন্য এ প্রাণীটার পক্ষে জিভ নেড়ে কথা উচ্চারণ করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। এই চোয়ালের হাড়টার উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে এ প্রাণীটা ছিল ভারী ওজনের, প্রায় মনুষ্যাকৃতি এক দানব। বোধহয় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত-পাগুলো ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, মাথায় ছিল চাপবাঁধা পুরু চুল। তাঁরা একে হাইডেলবার্গ মানুষ (Heidelberg man) বলেন।

আমার মনে হয় এই চোয়ালের হাড়টা আমাদের মানুষদের কৌতূহলের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক জিনিসের একটা। এটার দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা বিকৃত কাচের মধ্যে দিয়ে অতীতের দিকে চেয়ে এই প্রাণীটার একটা অস্পষ্ট মরীচিকাময় ছায়া দেখতে পাচ্ছি—বিজন বনের মধ্যে দিয়ে সে বেঢপভাবে হেঁটে যাচ্ছে, খড়্গদন্তী বাঘকে এড়াবার জন্য গাছে ওঠবার চেষ্টা করছে, বনের মধ্যে লোমশ গণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর, দানবটাকে আমরা ভালো ভাবে খুঁটিয়ে দেখবার আগেই সে মিলিয়ে যায়। অথচ তার ব্যবহারের জন্য পাথর চেঁচে সে যেসব মজবুত হাতিয়ার তৈরি করেছিল মাটির বুকে তা প্রচুর ছড়িয়ে রয়েছে।

এর চেয়েও অদ্ভুত রহস্যময় হচ্ছে ইংলণ্ডের সাসেক্স্ জেলার পিল্‌ট্‌ডাউন গ্রামে পাওয়া এক জীবের দেহাবশেষ। যে প্রস্তরস্তরে এটা পাওয়া গেছে, তাতে এর বয়স একলক্ষ থেকে দেড়লক্ষ বছরের মধ্যে হবে বলে মনে হয়, যদিও কোন-কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এই দেহাবশেষগুলো হাইডেলবার্গের চোয়ালের হাড়েরও আগেকার। এখানে পাওয়া গেছে একটা পুরু উপমানবিক মাথার খুলির খানিকটা, যা এখনকার যেকোন লেজহীন বানরের খুলির চেয়ে বড়, একটা সিম্পাঞ্জির মত

চোয়ালের হাড়, যেটা এর হতেও পারে নাও হতে পারে,* ব্যাটের মত আকারের একটা হাতীর হাড়, যেটা সযত্নে তৈরি করে তার ভিতরে একটা ছেঁদা করা হয়েছে। এ ছাড়া একটা হরিণের উরুর হাড়, যেটার উপর যেন গোনবার জন্য কয়েকটা দাগ কাটা রয়েছে। ব্যস্, এই সব।

এ কী ধরনের জন্তু যে বসে বসে হাড়ে ছেঁদা করত?

বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এওঅ্যানথ্রোপাস (Eoanthropus) অর্থাৎ ঊষা-মানব। এর জ্ঞাতিদের থেকে এ একেবারে আলাদা। হাইডেলবার্গের সেই জীবটা কিংবা অন্য কোন জীবিত লেজহীন বানরের থেকে এ একেবারেই অন্য রকমের। এরকম নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা যায় নি। কিন্তু ১০০,০০০ বছর আগের থেকে যতই আজকের দিকে এগিয়ে আসি ততই নুড়ি আর প্রস্তরস্তরের মধ্যে চকমকি আর এ ধরনের পাথরের হাতিয়ার বাড়তে থাকে। আর এ হাতিয়ারগুলো আর স্থূল এওলিথ নয়। পুরাতত্ত্ববিদরা এর মধ্যে চাঁচনি, তুরপুন, ছুরি, তীরের ফলা, ছুঁড়ে মারবার পাথর, কুড়ুল প্রভৃতি আলাদা করে চিনতে পেরেছেন।

আমরা মানুষের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। এর পরের অধ্যায়ে আমরা মানুষের পূর্বগামীদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত নিয়াণ্ডারথালদের কথা বলব, যারা প্রায় মানুষ ছিল, কিন্তু সত্যিকারের আসল মানুষ ছিল না।

তবে এ কথাটা এখানেই পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল যে, কোন বিজ্ঞানীই এমন অনুমান করেন না যে, হাইডেলবার্গ বা ঊষা-মানব এ দুয়ের কেউ আজকালকার মানুষদের সরাসরি পূর্বপুরুষ। এরা বড়জোর সম্পর্কিত জাতের প্রাণী।

নিয়াণ্ডারথাল আর রোডেসিয় মানুষ

প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট হাজার বছর আগে, তখনও চতুর্থ হিমবাহী যুগের চরম পরিণতি হয় নি, পৃথিবীতে এক ধরনের প্রাণী বাস করত। এমনই মানুষের মত ছিল এটা যে, এর যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কয়েক বছর আগেও সেগুলো পুরোপুরি মানবীয় বলে মনে করা হত। আমরা এর মাথার খুলি, হাড় আর

* ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ মিউজিয়াম ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পিল্‌টডাউন মানুষের মাথার খুলিটা প্রকৃত বন-মানুষের হলেও এর চোয়ালের হাড় আর কুকুরে-দাঁত সম্পূর্ণ নকল। এটা এক নিপুণ বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি।

—অনুবাদক

যেসব বড় বড় অস্ত্র এ তৈরি আর ব্যবহার করত তার অনেকগুলো পেয়েছি। এ আগুন জ্বালতে পারত, ঠাণ্ডায় গুহার ভিতর আশ্রয় নিত, চামড়া পরত ; মানুষের মত এও ডান হাতে কাজ করত।

অথচ এখন নৃতত্ত্ববিদরা বলেন যে এ প্রাণীগুলো সত্যিকারের মানুষ ছিল না। এরা ছিল একই মূলজাতির অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন উপজাতি। এদের চোয়াল ছিল ভারী আর বেরিয়ে আসা, কপাল ছিল নিচু আর চোখের উপরে ভ্রূ দেশ ছিল উঁচু আর চওড়া। মানুষের মত এরা এদের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলগুলোর উলটো দিকে নাড়তে পারত না। এদের ঘাড় এমনভাবে তৈরি ছিল যে এরা পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে পারত না। খুব সম্ভব এরা সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নিচু করে হাঁটত। এদের চিবুকহীন চোয়ালের হাড় অনেকটা হাইডেলবার্গদের চোয়ালের হাড়ের মত—মানুষের চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে তার খুব কমই সাদৃশ্য আছে।

আর এদের দাঁতের গড়নের সঙ্গে মানুষের দাঁতের গড়নের অনেক তফাৎ। এদের কসের দাঁতের গড়ন আমাদের চেয়ে বেশি জটিল আর আমাদের মত এদের কসের দাঁতে লম্বা ছুঁচলো মুখ ছিল না। তাছাড়া এই আধা-মানুষদের সাধারণ মানুষদের মত কুকুরে-দাঁত ছিল না। এদের খুলির আয়তন মানুষের মতই ছিল, তবে মস্তিষ্কটা মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে পিছন দিকে বেশি বড় আর সামনের দিকে বেশি নিচু ছিল। এদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই অন্য ধরনের ছিল। এরা মানব-বংশের পূর্বপুরুষ ছিল না। দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে এরা ছিল অন্য এক বংশের লোক।

মানুষের এই অধুনা-বিলুপ্ত উপজাতির মাথার খুলি আর হাড় অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে নিয়াণ্ডারথাল একটা। সেই থেকে এই অদ্ভুত আধা-মানুষদের নিয়াণ্ডারথাল মানুষ বা নিয়াণ্ডারথালের নাম দেওয়া হয়েছে। বহু শত কিংবা বহু সহস্র বছর আগে নিশ্চয় ওরা ইউরোপে বসবাস করত।

সে সময়ে আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া আর ভূগোল এখনকার থেকে অনেক আলাদা ছিল। যেমন, দক্ষিণে টেমস, মধ্য-জার্মানি আর রাশিয়া পর্যন্ত ইউরোপ ছিল বরফে ঢাকা। ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে কোন চ্যানেল ছিল না। ভূমধ্য-সাগর আর লোহিত সাগর ছিল দুটো বিরাট উপত্যকা। বোধহয় তারই গভীরতর অংশগুলোয় ছিল কতকগুলো হ্রদ। চারদিকে স্থলভূমির মধ্যে একটা বিরাট সাগর এখনকার কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণ রাশিয়া হয়ে মধ্য-এশিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্পেন এবং ইউরোপের যেসব অংশ বরফে ঢাকা

ছিল না সেখানকার জলবায়ু ল্যাব্রাডরের চেয়েও তীব্র ছিল। উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছলে তবে একটু নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পাওয়া যেত। দক্ষিণ ইউরোপের ঠাণ্ডা স্টেপস্‌এর বিরল তুন্দ্রা-অঞ্চলীয় উদ্ভিজ্জের মধ্যে লোমশ ম্যামথ আর লোমশ গণ্ডার, বিরাটকায় ষাঁড় আর বলগা-হরিণ ঘুরে বেড়াত। নিশ্চয় তারা বসন্ত-কালে খাদ্যের সন্ধানে উত্তরে আর হেমন্তের সময় দক্ষিণে যেত।

এই দৃশ্যের মাঝখানে নিয়াণ্ডারথাল মানুষ ঘুরে বেড়াত; ছোটখাট জন্তু-জানোয়ার আর ফলমূল থেকে যেটুকু পারত খাদ্য সংগ্রহ করত। বোধহয় সে ছিল নিরামিষাশী, ডাঁটা আর কন্দ চিবোত। তার সমান, বড় বড় দাঁত দেখে মনে হয় তার খাদ্যের বেশির ভাগটাই ছিল নিরামিষ। কিন্তু আমরা তার গুহায় বড় বড় জন্তুর হাড়ও পাই, মজ্জা বার করার জন্য যেগুলো ফাটানো হয়েছে। তার অস্ত্র নিশ্চয় বড় বড় জন্তুর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ে খুব কাজ দিত না, তবে এটা মনে করা যেতে পারে যে সে তাদের দুর্গম নদী পার হওয়ার সময় বর্শা দিয়ে আক্রমণ করত, এমনকি তাদের ধরার জন্য গর্ত করে ফাঁদ পেতে রাখত। হয়ত সে তাদের দলের অনুসরণ করে, মারামারিতে নিহত জন্তুগুলো টেনে নিয়ে আসত। কিংবা তার সময়েও যে খড়্গদন্তী বাঘ ছিল তার ফেউয়ের কাজ করত। হয়ত হিমবাহী যুগের অসম্ভব কষ্টকর পরিস্থিতিতে বহু যুগ নিরামিষ আহারের পর ওরা জন্তুজানোয়ারদের আক্রমণ করতে শুরু করে।

এই নিয়াণ্ডারথাল মানুষ যে কী রকম দেখতে ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি না। খুব সম্ভব সে লোমশ আর অমানুষিক আকৃতির ছিল। সে সোজা হয়ে হাঁটত কি না তাও বলা শক্ত। হয়ত চলবার জন্য সে তার পায়ের সঙ্গে হাতও ব্যবহার করত। হয়ত সে একা থাকত কিংবা ছোট ছোট পরিবারে দল বেঁধে বাস করত। তার চোয়ালের গড়ন থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কথা বলা বলতে আমরা যা বুঝি, তা সে পারত না।

হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়াণ্ডারথাল মানুষই ছিল ইউরোপ অঞ্চলে দৃষ্ট সবচেয়ে উন্নত ধরনের জীব। তারপর তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে যখন আবহাওয়া আর-একটু গরম হয়ে এল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে ওদের অনুরূপ এক জাতের জীব ভেসে এল নিয়াণ্ডারথালদের দুনিয়ায়। তারা ছিল ওদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, জানত বেশি, কথা বলতে পারত আর একসঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করত। তারা নিয়াণ্ডারথালদের ওদের গুহা আর অন্যান্য আড্ডা থেকে হটিয়ে দিল। তারা একই খাদ্য শিকার করত। হয়ত তারা তাদের পূর্বগামীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মেরে ফেলেছিল। এই নবাগতেরা এসেছিল হয় দক্ষিণ নয় পূর্ব থেকে,

কেননা এখনও আমরা ঠিক জানিনা কোন অঞ্চলে তাদের উদ্ভব ঘটেছিল। এরা নিয়াণ্ডারথাল মানুষদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়ে দিয়েছিল। এরাই ছিল আমাদের রক্তের সম্বন্ধে আত্মীয়—প্রথম খাঁটি মানুষ। শরীর-সংস্থানের (anatomy) দিক দিয়ে দেখতে গেলে এদের মগজের খোল, হাতের বুড়ো আঙুল, ঘাড় আর দাঁত ছিল আমাদের মত। ক্রো-ম্যাগ্ননের (cro-magnon) এক গুহায় এবং গ্রিমালদির আর এক গহ্বরে কিছু কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে এগুলোই হল সবচেয়ে পুরনো সত্যিকার মানুষের দেহাবশেষ।

এমনি করেই পাষাণের ইতিহাসে (Record of the Rocks) আমাদের মানবজাতির আবির্ভাব হল, আর শুরু হল মানুষের কাহিনী।
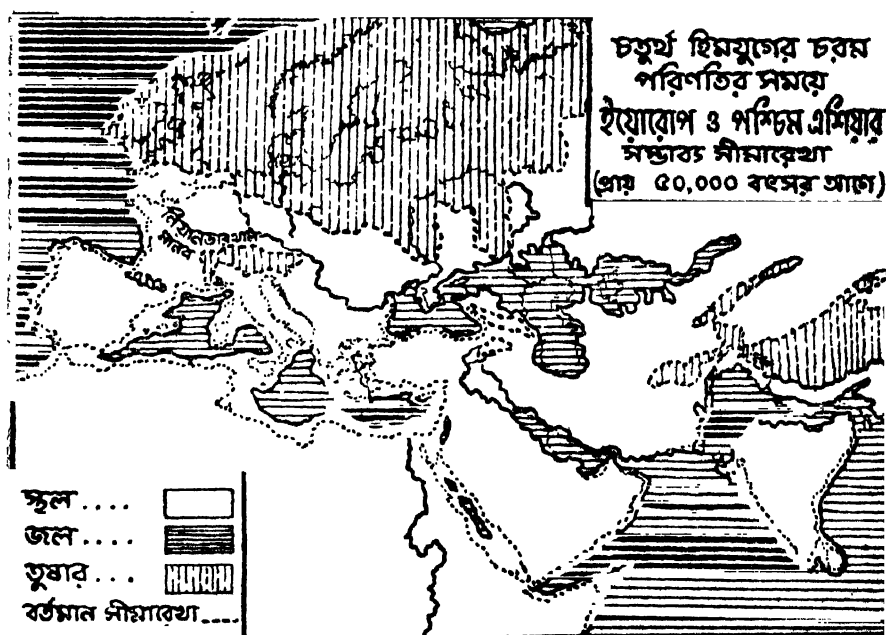
সে সময়টাতে পৃথিবীটা আমাদের এখনকার মত হয়ে আসছিল, যদিও আবহাওয়াটা ছিল আরও ক্লেশকর। ইউরোপে হিম যুগের গ্লেসিয়ারগুলো ক্রমেই হটে যাচ্ছিল। স্টেপভূমিগুলোতে তৃণের প্রাচুর্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল এসে ফ্রান্স আর স্পেনের বলগা হরিণদের স্থানচ্যুত করল আর দক্ষিণ ইউরোপে ম্যামথরা ক্রমশ কমতে কমতে শেষে একেবারে উত্তর দিকে হটে গেল।

আমরা জানি না সত্যিকারের মানুষের উদ্ভব কোথায় হয়েছিল। তবে ১৯২১ সনের গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রোকেন হিল-এ (Broken Hill)

একটা কঙ্কালের কতকগুলো টুকরোর সঙ্গে একটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক মাথার খুলি পাওয়া যায় যা দেখে মনে হয় যে সেটা নিয়াণ্ডারথাল এবং আধুনিক মানুষের মাঝামাঝি ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তৃতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী। এর মগজের খোল থেকে বোঝা যায় যে নিয়াণ্ডারথালদের চেয়ে এদের মগজ ছিল সামনের দিকে বড় আর পেছনের দিকে ছোট, আর খুলিটা একেবারে মানুষদের মত শিরদাঁড়ার উপর খাড়াভাবে ছিল। দাঁত আর হাড়গুলোও ছিল ঠিক মানুষের মত। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্রূর হাড় আর খুলির মাঝখান দিয়ে একটা উঁচু হাড়সমেত মুখখানা নিশ্চয় বানরদের মত ছিল। বলতে গেলে সত্যিই প্রাণীটা ছিল সত্যিকারের মানুষ, তবে নিয়াণ্ডারথালদের মত বানরমুখো। স্পষ্টতই এই রোডেসিয় মানুষ (Rhodesian Man) নিয়াণ্ডারথাল মানুষদের চেয়ে আসল মানুষদের নিকটতর।

হিম যুগের সূত্রপাত আর উপমানবীয় জাতিসকলের বংশধর এবং হয়ত তাদের নির্মূলকারী প্রকৃত মানুষদের আবির্ভাবের মাঝে যে বিরাট সময়ের ব্যবধান, তার মধ্যে যেসব উপমানবীয় জাতি এ পৃথিবীতে বাস করত শেষ পর্যন্ত হয়ত তাদের এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হবে যাতে দেখা যাবে যে এই রোডেসিয় খুলিটা সে তালিকার মাত্র দ্বিতীয় আবিষ্কার। এ খুলিটা খুব প্রাচীন নাও হতে পারে। এই বই প্রকাশের সময় পর্যন্ত (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) এর আনুমানিক বয়স সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় নি। এমনও হতে পারে যে, অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই উপমানবীয় প্রাণীটি দক্ষিণ আফ্রিকায় টিঁকে ছিল।

প্রথম সত্যিকারের মানুষ

অবিসংবাদিতভাবে আমাদের আত্মীয় এরকম মানুষদের প্রাচীনতম যা চিহ্ন এবং নিদর্শনের খোঁজ আজকের বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, তা পাওয়া গেছে পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্স আর স্পেনে। এ দু'দেশে পাওয়া গেছে—হাড়, হাতিয়ার, হাড় আর পাথরের উপর আঁচড়ের দাগ, খোদাই করা হাড়ের টুকরো আর গুহা আর পাথরের গায়ে আঁকা ছবি, যেগুলোর তারিখ তিরিশ হাজার বছর কি তারও আগেকার বলে অনুমান করা হয়। আমাদের সত্যিকারের মানুষ পূর্ব-পুরুষদের এইসব প্রথম নিদর্শনের দিক দিয়ে স্পেনই বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ।

অবশ্য আমাদের এসব জিনিসের সংগ্রহের কাজ সবে শুরু হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি যে, ভবিষ্যতে যখন সম্ভবপর সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখবার মত যথেষ্ট-সংখ্যক গবেষক পাওয়া যাবে এবং যেসব দেশ এখন

পুরাতত্ত্ববিদদের অগম্য সেই সব দেশ খুঁটিয়ে খুঁজে দেখা হবে তখন এসব জিনিসের পুঁজি আরও অনেক বাড়বে। এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গাতেই এসব ব্যাপারে উৎসাহী এবং অবাধে অনুসন্ধান করতে পারে এরকম কোন শিক্ষিত পর্যবেক্ষক পদার্পণ করেনি। অতএব আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আমরা—প্রথম সত্যিকারের মানুষেরা নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইউরোপের বাসিন্দা ছিল বা সেই অঞ্চলেই তাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, এমন সিদ্ধান্ত না করে বসি।

এশিয়া কিংবা আফ্রিকায় কিংবা আজকের সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত অবস্থায় হয়ত সত্যিকারের মানুষদের এমন সব দেহাবশেষ আছে যা এ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং বেশি দিনের পুরোনো। 'এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়' লিখছি অথচ আমেরিকার উল্লেখ করছি না তার কারণ, এ পর্যন্ত একটা দাঁত ছাড়া, সেখানে উন্নত প্রাইমেটদের কোন কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি—তা সে বড় লেজহীন বানরেরই হোক, উপমানব, নিয়াণ্ডারথাল মানব বা প্রথম সত্যিকারের মানুষেরই হোক। প্রাণের এই যে বিকাশ, মনে হয় এটা পুরোপুরিই পুরোনো পৃথিবীর ব্যাপার (an Old World development)। মনে হয় পুরোনো পাথরের যুগ (Old Stone Age) যখন শেষ হয়, তখনই প্রথম মানুষেরা এখন যেখানে বেরিং প্রণালী সেখানে তখন যে ডাঙায় ডাঙায় যোগ ছিল সেটা পেরিয়ে আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেছিল।

ইউরোপে এই যে প্রথম সত্যিকার মানুষদের কথা আমরা জানি, দেখতে পাওয়া যায় যে এর মধ্যেই তারা স্পষ্টত আলাদা অন্তত দুটো জাতের কোনটা না কোনটার মধ্যে পড়ে যায়। এই জাতগুলোর মধ্যে একটা সত্যিই খুব উন্নত ধরনের ছিল। এরা ছিল লম্বা আর বৃহৎ-মস্তিষ্ক। মেয়েদের যেসব খুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটার ধারণ-ক্ষমতা আজকালকার সাধারণ পুরুষদের খুলির চেয়ে বেশি। পুরুষ-কঙ্কালগুলোর মধ্যে একটা ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। এদের শরীরের ধাঁচটা ছিল অনেকটা উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। এই কঙ্কালগুলো প্রথম যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেই ক্রো-ম্যাগ্নন গুহার নাম অনুসারে এদের ক্রো-ম্যাগ্নার (Cro-magnard) বলা হয়। বর্বর হলেও, এরা ছিল উঁচুদরের বর্বর। দ্বিতীয় জাতটা, যাদের দেহাবশেষ গ্রিমাল্‌দি গুহায় পাওয়া গেছে, ছিল পরিষ্কার নিগ্রয়েড (Negroid) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এদের নিকটতম জীবিত আত্মীয় হচ্ছে দক্ষিণ-আফ্রিকার বুশম্যান আর হটেন্‌টটরা। মানুষের ইতিহাসের যেটুকু জানা গেছে তার সূচনাতেই এভাবে দেখতে পাওয়া

বিচিত্র লাগে যে মনুষ্যজাতি ইতিমধ্যেই জাতিগতভাবে অন্তত দুটো প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। যথেষ্ট যুক্তি না থাকলেও এ ধরনের অনুমান করতেও ইচ্ছে হয় যে এ দু'জাতের প্রথমটার রং সম্ভবত কালোর চেয়ে বেশি বাদামি-ঘেঁসা ছিল আর এসেছিল পুব কিংবা উত্তর থেকে, এবং শেষেরটার রং বাদামি না হয়ে কালো-ঘেঁসা ছিল, আর তারা এসেছিল নিরক্ষীয় দক্ষিণ অঞ্চল থেকে।

প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগেকার দিনের এই বর্বরেরা এতটা মানুষের মত ছিল যে তারা গলার হার বানাবার জন্য খোলা ফুটো করত, গায়ে রং মাখত, হাড় আর পাথর খোদাই করে মূর্তি গড়ত, পাথরে আর হাড়ে আঁচড় কেটে নানারকমের চেহারা আঁকত, আর গুহার মসৃণ দেয়ালে আর ঐ রকম বেশ পছন্দসই পাথরের উপর, খুব সূক্ষ্ম না হলেও অনেক সময় খুব নিপুণভাবে জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদির ছবি এঁকে রাখত। ওরা অনেক রকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করত। সেগুলো নিয়াণ্ডারথাল মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতির চেয়ে অনেক ছোট মাপের এবং সূক্ষ্মতর ছিল। আমাদের মিউজিয়ামগুলোয় এখন প্রচুর পরিমাণে ওদের তৈরি যন্ত্রপাতি, ছোট ছোট মূর্তি আর পাথরে আঁকা ছবি ইত্যাদি রয়েছে।

একেবারে গোড়ার দিকে ওরা ছিল শিকারী। ওদের প্রধান শিকার ছিল বুনো ঘোড়া—সেকালের দাড়িওয়ালা ছোট টাট্টু ঘোড়া। তারা চারণভূমির সন্ধানে ঘুরত আর ওরা তাদের অনুসরণ করত। ওরা বাইসনদেরও অনুসরণ করত। ম্যামথের কথাও ওদের জানা ছিল কারণ সেই জীবটির অদ্ভুত জোরালো সব ছবি ওরা আমাদের জন্য এঁকে রেখে গিয়েছে। কতকটা দ্ব্যর্থবোধক একটা ছবি দেখে মনে হয় ওরা তাকে ফাঁদে ফেলে মেরে ফেলত।

বর্শা আর পাথর ছুঁড়ে ওরা শিকার করত। ওদের ধনুক ছিল বলে মনে হয় না এবং তখনও ওরা কোন জন্তুকে পোষ মানাতে শিখেছিল কি না সন্দেহ। কুকুর ওদের ছিল না। খোদাই করা একটা ঘোড়ার মাথা আর দু'একটা নক্‌সা থেকে লাগাম-দেওয়া ঘোড়ার একটা আভাস পাওয়া যায় যার চারধারে একটা পাকানো চামড়া কিংবা শিরা। কিন্তু সেকালে সে অঞ্চলের ছোট ঘোড়ারা নিশ্চয় মানুষ বইতে পারত না। কাজেই যদি ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়েই থাকে তবে নিশ্চয় তার পিঠে মাল চাপিয়ে মুখে লাগাম দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। খাদ্যরূপে পশুদুগ্ধের ব্যবহার মানুষ তখন শিখেছিল কি না সেটা শুধু সন্দেহের বিষয়ই নয়, তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

মনে হয় না যে ওরা বাড়ি তৈরি করতে পারত যদিও হয়ত চামড়া দিয়ে তাঁবু বানাবার ক্ষমতা ওদের ছিল, এবং যদিও ওরা মাটির মূর্তি গড়ত, পোড়ামাটির জিনিস-

পত্র বানাবার মত উচ্চ স্তরে ওরা ওঠে নি। যেহেতু ওদের রাঁধবার কোন সরঞ্জাম ছিল না, রান্নার ব্যাপারটা ওদের নিশ্চয় ছিল খুবই প্রাথমিক অবস্থায় কিংবা একেবারেই ছিল না। চাষের বিষয়ে ওরা কিছুই জানত না আর জানত না ঝুড়ি কিংবা কাপড় বোনা। ওদের গায়ে জড়ানো চামড়া কিংবা লোমের আবরণ বাদ দিলে ওরা ছিল রঙ-মাখা উলঙ্গ বর্বর।

আমাদের জানা প্রাচীনতম এই মানুষেরা বোধহয় একশো শতাব্দী ধরে ইউরোপের উন্মুক্ত স্টেপভূমিতে শিকার করেছিল। তারপর তারা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল আর আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও পরিবর্তিত হতে লাগল। শতাব্দীতে শতাব্দীতে ইউরোপের জলবায়ু ক্রমশ মৃদু আর আর্দ্র হয়ে আসছিল। বল্গা হরিণেরা উত্তর আর পুবদিকে পেছিয়ে গেল তার তাদের অনুসরণ করল বাইসন আর ঘোড়ার দল। স্টেপভূমিগুলোর জায়গা অধিকার করল অরণ্য আর লাল হরিণেরা এসে দাঁড়াল ঘোড়া আর বাইসনের জায়গায়। প্রয়োগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলোর বিশেষত্বও বদলে গেল। নদীতে আর হ্রদে মাছ ধরাটা মানুষের কাছে খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল আর হাড়ের তৈরি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরঞ্জামের সংখ্যা বাড়তে লাগল। দ্য মর্তিয়ে (de Mortillet) বলেন যে, 'এ যুগের হাড়ের ছুঁচের মত ভাল ছুঁচ পরবর্তী যুগে, এমন কি রেনেসাঁসের আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিক সময়েও দেখা যায় নি। এ যুগের ছুঁচের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম ছুঁচ রোমানদেরও ছিল না।'

প্রায় পনের কি বার হাজার বছর আগে নতুন একদল লোক স্পেনে এসেছিল। সেখানকার খোলা পাহাড়ের গায়ে তারা নিজেদের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সব ছবি এঁকে রেখে গেছে। মা দা'জিল (Mas d'Azil) গুহার নামে এদের নাম দেওয়া হয়েছে আজিলিয়ান (Azilians)। এদের ধনুক ছিল, মনে হয় যে এরা পালকের শিরোভূষণ পরত। এরা খুব জোরালো ছবি আঁকত কিন্তু আঁকাগুলোকে এরা এক ধরনের সাঙ্কেতিক ব্যাপারে পরিণত করে নিয়েছিল—যেমন, একটা মানুষকে এরা দেখাত একটা খাড়া টান আর তার গায়ে দু'তিনটে আড়াআড়ি দাগ দিয়ে —যার থেকে লিখন-পদ্ধতির একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়। শিকারের ছবিগুলোর গায়ে প্রায়ই হিসেব রাখবার মত দাগ দেখা যায়। একটা আঁকার মধ্যে দেখা যায় দুজন লোক ধোঁয়া দিয়ে চাক থেকে মৌমাছি তাড়াচ্ছে।

শুধু চেঁচে-ছুলে হাতিয়ার বানাত বলে যাদের আমরা প্যালিওলিথিক (পুরোনো পাথরের) যুগের মানুষ বলে থাকি এরাই হচ্ছে তাদের শেষ দল। দশ কি বারো হাজার বছর আগে ইউরোপে এক নতুন ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব হল। মানুষ

এখন শুধু চাঁচতে আর ছিলতে নয়, তাদের হাতিয়ারগুলো ঘসতে আর পালিশ করতে শিখেছে আর সভ্যতার সূত্রপাত করেছে। নিওলিথিক (নতুন পাথরের) যুগের শুরু হচ্ছে।

এটা উল্লেখযোগ্য এবং কৌতূহলজনক যে একশো বছরও হয়নি, পৃথিবীর এক সুদূর অংশে, টাসমানিয়াতে, এমন এক জাতের মানুষ টিঁকে ছিল যারা, এই সব একেবারে আদিম মানুষ যারা ইউরোপে তাদের চিহ্ন রেখে গেছে তাদের চেয়েও শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে অনুন্নত ছিল। ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে এই টাসমানিয়াবাসীরা অনেকদিন আগেই তাদের স্বশ্রেণী থেকে এবং সব রকম প্রেরণা এবং উন্নতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মনে হয় যে তাদের উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়েছিল। ইউরোপীয় আবিষ্কারকরা যখন তাদের আবিষ্কার করল তখন তারা শামুক ঝিনুক আর ছোট ছোট জন্তুজানোয়ার খেয়ে অতি হীনভাবে জীবনযাপন করছিল। বাসস্থান বলে তাদের কিছু ছিল না, ছিল শুধু বসবার জায়গা। আমাদের শ্রেণীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রথম সত্যিকারের মানুষদের মত শারীরিক দক্ষতা বা শিল্প-প্রতিভা কোনটাই তাদের ছিল না।

আদিম চিন্তাধারা

এবার আসুন আমরা একটা চিত্তাকর্ষক কল্পনায় গা ভাসাই। মানব-ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চকর প্রথম দিনগুলোতে মানুষ হলে কী রকম লাগত? বীজবপন এবং শস্যসংগ্রহ শুরু হবারও ৪০০ শতাব্দী আগে, শিকার করা আর ঘুরে বেড়ানোর সুদূর দিনগুলোয়, মানুষ কেমন করে ভাবত আর কী ভাবত? মানুষের ধারণার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়ার বহুকাল আগের সেই দিনগুলো—কাজেই এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অনুমান আর আন্দাজের শরণ নিতে হবে।

আদিম মনের অবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা বহু বিচিত্র উৎসের সন্ধান করেছেন। মনে হয় আজকালকার বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ, যা শিশুর আত্মম্ভরী এবং সহজে উত্তেজনাশীল আবেগকে কী ভাবে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয় সেটা খুঁটিয়ে দেখে, আদিম সমাজের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। আর একটা জায়গা যেখান থেকে কার্যকরী সাহায্যের আভাস পাওয়া গেছে তা হচ্ছে যেসব বর্বর জাত এখনও টিঁকে আছে তাদের ধারণা এবং নিয়ম-কানুনগুলোর অনুশীলন। তাছাড়া আধুনিক সভ্য মানুষদের যেসব অন্তর্নিহিত অযৌক্তিক কুসংস্কার আর ধারণা রয়েছে তাতে, এবং লোকগাথাতে এক

ধরনের মানসিক ফসিল জমা হয়ে রয়েছে। এবং সর্বশেষে যতই আমরা আমাদের কালের সমীপবর্তী হই, ততই বেশি করে ছবি, মূর্তি, খোদাই, চিহ্ন ইত্যাদির মারফৎ ক্রমশ আরো পরিষ্কারভাবে জানতে পারি, কোন্ জিনিস মানুষের কৌতূহল জাগাত এবং কী সে রক্ষা আর প্রদর্শন করার যোগ্য বলে মনে করত।

আদিম মানুষ নিশ্চয় অনেকটা শিশুদের মত পরপর কতকগুলো কাল্পনিক ছবির ধারায় চিন্তা করত। সে মনে মনে কতকগুলো ছবি গড়ে তুলত কিংবা তার মনে আপনা থেকে কতকগুলো ছবির উদয় হত আর সেই ছবিগুলো তার মনে যে ধরনের আবেগ জাগাত, সেই অনুসারে সে কাজ করত। কোন শিশু কিংবা অশিক্ষিত লোক এখনও এভাবেই কাজ করে। মনে হয় প্রণালীবদ্ধ চিন্তা জিনিসটা মানুষের অভিজ্ঞতায় এসেছে অনেক পরে। ৩০০০ বছর আগে পর্যন্ত মানুষের জীবনে এর বিশেষ কোন বড় অংশ ছিল না। এমন কি আজকের দিনেও যারা তাদের চিন্তাধারা সংযত করতে আর শাসনে রাখতে পারে এমন লোকের সংখ্যা মানুষের মধ্যে খুবই কম। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই এখনও কল্পনা আর আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

বোধহয় সত্যিকারের মানুষের কাহিনীর শুরুর ধাপে আদিমতম মানব-সমাজগুলো ছিল ছোট ছোট পরিবারের দল। ঠিক যেমন একসঙ্গে বাস করত এবং বংশবৃদ্ধি করত এমন কতকগুলো পরিবার থেকে আগেকার স্তন্যপায়ী জীবেদের ঝাঁক এবং পালের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনই হয়ত সৃষ্টি হয়েছিল আদিমতম গোষ্ঠিগুলো। কিন্তু এটা হবার আগে প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার প্রাথমিক যে আত্মম্ভরিতা তার কিছুটা দমনের প্রয়োজন হয়েছিল। পিতাকে ভয় এবং মাতার উপর শ্রদ্ধাটা পূর্ণবয়স্কদের জীবনে ঢোকাতে হয়েছিল আর বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ পুরুষদের প্রতি দলের বৃদ্ধের যে স্বাভাবিক ঈর্ষা সেটা কিছুটা কমিয়ে আনতে হয়েছিল। অন্য দিকে মা ছিল অল্পবয়সীদের স্বাভাবিক পরামর্শদাতা এবং রক্ষক। এক দিকে অল্পবয়সীদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে জোড়া বেঁধে থাকবার স্থূল ইচ্ছা, অন্য দিকে আলাদা থাকবার বিপদ এবং অসুবিধে, এর সঙ্ঘাতে গড়ে ওঠে মানুষের সামাজিক জীবন। নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিরাট প্রতিভাবান লেখক জে. জে. অ্যাটকিনসন তাঁর 'প্রাইমাল ল'তে দেখিয়েছেন—বর্বরদের সাধারণ যে আইন—টাবু (Tabus), যেটা তাদের জীবনে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য—তার কতখানি আদিম মনুষ্য জীবটির প্রয়োজনের সঙ্গে একটা বিকাশোন্মুখ সমাজ-জীবনকে মনের দিক থেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া থেকে

উদ্ভূত। পরে মনোবিশ্লেষণকারীদের গবেষণাও তার এই সব সম্ভাবনার ব্যাখ্যা সমর্থন করতে অনেক সাহায্য করেছে।

কয়েকজন কল্পনাপ্রবণ লেখকের মতে, বৃদ্ধের প্রতি আদিম বর্বরদের শ্রদ্ধা ও ভয় এবং বয়স্কা রক্ষাকর্ত্রী স্ত্রীলোকদের প্রতি মানসিক আবেগসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া, স্বপ্নে ফেঁপে উঠে আর অলস মানসিক কল্পনায় সমৃদ্ধ হয়ে আদিম ধর্মের সূচনায় এবং দেবদেবীর কল্পনায় একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। এই সব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ভয় এবং মৃত্যুর পর এ ধরনের ব্যক্তিদের উচ্চাসন লাভ; এর কারণ—স্বপ্নে তাদের পুনরাবির্ভাব ঘটত। এটা বিশ্বাস করা খুব সোজা ছিল যে তারা সত্যিসত্যি মারা যায় নি, শুধু অদ্ভুতভাবে সরে গিয়ে কোন বৃহত্তর শক্তি লাভ করেছে।

আধুনিক পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের চেয়ে একটা শিশুর স্বপ্ন, কল্পনা এবং ভয় অনেক বেশি জীবন্ত এবং সত্য, এবং আদিম মানুষ সব সময়েই খানিকটা শিশু মত ছিল। সে পশুদেরও অনেক কাছাকাছি ছিল আর ভাবতে পারত যে তাদেরও তার মত উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া আছে। সে পশুদের সাহায্যকারী, বন্ধু এবং দেবতারূপে কল্পনা করতে পারত। শিশুকালে কল্পনাপ্রবণ ছিল এমন ব্যক্তি মাত্রেই সহজেই বুঝতে পারবে যে, পুরোনো পাথরের যুগের মানুষদের কাছে অদ্ভুত আকারের পাহাড়, কাঠের টুকরো, অসাধারণ গাছ ইত্যাদি কতখানি প্রয়োজনীয়, উদ্দেশ্যমূলক, ভীতিপ্রদ কিংবা বন্ধুভাবাপন্ন মনে হতে পারত,—কী ভাবে স্বপ্ন আর কল্পনা থেকে এসব জিনিসের সম্বন্ধে গল্প আর গুজবের সৃষ্টি হত, যেগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকে বিশ্বাস করত। কতকগুলো গল্প মনে রাখবার মত এবং দ্বিতীয়বার বলার মত ভাল হত। স্ত্রীলোকেরা সেগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বলত। এভাবে পুরুষপরম্পরাগত একটা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হত। আজকের দিনেও অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ শিশুরা কোন প্রিয় পুতুল কিংবা জানোয়ার কিংবা অদ্ভুত কোন আধা-মানুষ জীবকে নায়ক করে লম্বা গল্প বানিয়ে তোলে—আদিম মানুষও খুব সম্ভবত তাই করত—শুধু নায়ককে সত্যি মনে করার প্রবণতা তাদের আরও বেশি ছিল। কেননা সবচেয়ে আগেকার যে সত্যিকার মানুষের কথা আমরা জানি, বোধহয় তারা খুব বাক্যবাগীশ ছিল। এদিক দিয়ে তারা বোধহয় নিয়াণ্ডারথালদের থেকে আলাদা ছিল আর এখানেই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। নিয়াণ্ডারথালরা সম্ভবত ছিল এক ধরনের বোবা জীব। অবশ্য আদিম মানুষের কথা হয়ত ছিল সামান্য কতকগুলো নামের পুঁজি, হয়ত হাত পা নেড়ে আর ইসারা করে তারা কথার অভাব পূরণ করত।

কার্য-কারণ সম্বন্ধে কোনরকম জ্ঞান নেই, এত নিচু স্তরের কোন বর্বর

আজকের দিনে নেই। তবে আদিম মানুষ কার্যের সঙ্গে কারণের যোগাযোগ সম্বন্ধে খুব বিচার করত না; সে খুব সহজে একটা কাজের সঙ্গে তার কারণ থেকে একেবারে অন্য ধরনের জিনিসের যোগাযোগ ঘটাত। তুমি এই আর এই করলে, তার মতে, এই আর এই ঘটে। তুমি একটা ছোট ছেলেকে এক ধরনের বেরি খাওয়াও, সে মারা যায়। তুমি একজন সাহসী শত্রুর হৃৎপিণ্ডটা খাও, তোমার গায়ের জোর বাড়ে। এখানে আমরা দুটো কার্য-কারণ সম্বন্ধ দেখতে পাই, একটা সত্যি, একটা মিথ্যে। বর্বরদের মনে কার্য-কারণের এই যে প্রণালী, একে আমরা ফেটিশ (fetish) বলি। কিন্তু ফেটিশ হচ্ছে নিতান্ত বর্বরদের বিজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এর এই তফাৎ যে, এটা একেবারেই প্রণালীবদ্ধ নয়, আর কোন রকম বিচার করে এটা করা হয় নি। কাজেই এটায় আরও বেশি ভুল হয়।

অনেক ক্ষেত্রে কার্য-কারণের যোগাযোগ করাটা খুব শক্ত ছিল না। অনেক ভুল ধারণা শিগগিরই অভিজ্ঞতা দিয়ে শুধরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আদিম মানুষের পক্ষে খুব বেশি প্রয়োজনীয় অনেকগুলো ব্যাপার ছিল, যেগুলোর কারণ সম্বন্ধে সে অবিরাম অনুসন্ধান করে কতকগুলো ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল যেগুলো ভুল হলেও এতটা স্পষ্টভাবে ভুল ছিল না যে ধরা পড়তে পারে। প্রচুর পরিমাণে শিকার এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাছ পাওয়া এবং সহজে ধরা তার পক্ষে খুবই দরকারি একটা ব্যাপার ছিল। কাজেই নিঃসন্দেহে সে নানা ধরনের ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত আর সেগুলো খাটাবার চেষ্টা করত। অসুখ আর মৃত্যু ছিল তার আর-একটা বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। মাঝে মাঝে দেশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ত আর তাতে মানুষ মারা যেত। মাঝে মাঝে মানুষ অসুস্থ হয়ে মারা যেত কিংবা কোন স্পষ্ট কারণ ছাড়াই দুর্বল হয়ে পড়ত। আদিম মানুষের চপল আবেগপ্রবণ মনে এ-ও নিশ্চয় অনেক উত্তপ্ত চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। স্বপ্ন কি কল্পনাপ্রসূত অদ্ভুত অনুমান থেকে সে দোষারোপ করেছে এটার-ওটার উপর, সাহায্য চেয়েছে ঐ মানুষটার কি পশুটার কিংবা জিনিসটার কাছে। শিশুর মতই ছিল তার ভয় আর আতঙ্কপ্রবণতা।

এই ছোট মানুষজাতটার খুব গোড়ার দিকেই নিশ্চয় কতকগুলো বয়সে বড়, স্থিতধী লোক নিজেদের জাহির করে আদেশ-উপদেশ আর পরামর্শ দিতে শুরু করে। তারা মনে মনে এদের ভয় আর কল্পনায় অংশ গ্রহণ করত, কিন্তু অন্যদের চেয়ে তারা ছিল একটু বেশি প্রবল। তারা ঘোষণা করত—এটা অশুভ, ওটা করা উচিত, এটা একটা শুভ চিহ্ন, ওটা অমঙ্গলের দ্যোতক। ফেটিশ-এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Medicine Man) হল প্রথম পুরোহিত। সে ওদের যুক্তি দেখাত,

ওদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করত, ওদের সাবধান করত আর জটিল সব ভেল্‌কি দেখাত যা সৌভাগ্য নিয়ে আসে কিংবা দুর্ভাগ্যকে দূরে রাখে। আজকাল আমরা ধর্ম বলতে যে রীতিনীতি আর অনুষ্ঠান বুঝি, আদিম ধর্ম ঠিক ওরকমটা ছিল না। আদিম পুরোহিত যা নির্দেশ দিত, সত্যি কথা বলতে কি, সেটা ছিল একটা নিয়মহীন আদিম ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

কৃষিকর্মের সূচনা

গত পঞ্চাশ বছরের প্রচুর গবেষণা আর অনুমান সত্ত্বেও, পৃথিবীতে কৃষিকর্ম আর বসবাসের সূচনা সম্বন্ধে এখনও আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ। আমরা শুধু এটুকু এখন নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, ১৫০০০ আর ১২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি এক সময়ে, যখন আজিলিয়ানরা ছিল স্পেনের দক্ষিণে আর আদিম শিকারীদের অবশিষ্টাংশ ক্রমে উত্তর আর পুবমুখো যাচ্ছিল, উত্তর আফ্রিকা কি পশ্চিম এশিয়া কি সেই বিরাট ভূমধ্যসাগরীয় উপত্যকা যা এখন ভূমধ্যসাগরের তলায় নিমজ্জিত তার কোনখানে এমন লোক ছিল যারা যুগের পর যুগ ধরে দুটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করেছিল—চাষ করতে শুরু করেছিল আর জন্তুদের পোষ মানাচ্ছিল। তাদের শিকারী পূর্বপুরুষদের পাথর ছুলে তৈরি করা যন্ত্রপাতি ছাড়াও তারা পালিশ-করা পাথরের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করেছিল, ঝুড়ি বোনা আর গাছের আঁশ থেকে মোটামুটিভাবে বোনা কাপড়ের সম্ভাবনা তারা আবিষ্কার করেছিল আর মোটামুটিভাবে পোড়া মাটির জিনিসপত্র গড়তেও শুরু করেছিল।

মানবসংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ে (phase) তারা প্রবেশ করছিল। এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া যেতে পারে নিওলিথিক অধ্যায় (নতুন পাথরের যুগ), যাতে এর আগের প্যালিওলিথিক (পুরোনো পাথরের) অধ্যায় অর্থাৎ ক্রো-ম্যাঙ্গার, গ্রিমাল্‌দি, আজিলিয়ান প্রভৃতিদের যুগ থেকে একে আলাদা করে চেনা যায়।* আস্তে আস্তে এই নিওলিথিক মানুষেরা পৃথিবীর উষ্ণতর জায়গাগুলোয় ছড়িয়ে পড়ল; আর অনুকরণ ও অধিকারের মধ্য দিয়ে তাদের চেয়েও বেশিদূর ছড়াল সেই সব শিল্প যাতে তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল আর সেই সব উদ্ভিদ আর জন্তু যাদের ব্যবহার তারা শিখেছিল। ১০০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই প্রায় সমস্ত মানুষ জাতটাই নিওলিথিকদের স্তরে পৌঁছে গেল।

* 'প্যালিওলিথিক' কথাটা দিয়ে নিয়াণ্ডারথালের এমন কি এওলিথিক যন্ত্রপাতিও বোঝানো হয়। প্রাক্-মানুষ যুগকে বলে 'প্রাচীন প্যালিওলিথিক' আর সত্যিকারের মানুষ যে যুগে পালিশ-না-করা পাথর ব্যবহার করত, সে যুগটাকে বলে 'নবীন প্যালিওলিথিক।'

পৃথিবী গোল এই সাধারণ কথাটার মত, জমিতে লাঙল দেওয়া বীজ বোনা শস্য কাটা আছড়ানো এবং পেষা, এ সবই আধুনিক মানুষের বিকাশে অত্যন্ত সহজবোধ্য যুক্তিসঙ্গত পরম্পর কতকগুলো ধাপ বলে মনে হতে পারে। এ ছাড়া আর কী করত? লোকে প্রশ্ন করবে। এ ছাড়া আর কী হত? কিন্তু বিশ হাজার বছর আগেকার আদিম মানুষের কাছে এ ধরনের কাজ এবং যুক্তির প্রণালী যেটা আমাদের কাছে এতটা নিশ্চিত এবং পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে তার কোনটাই খুব সহজবোধ্য ছিল না। অসংখ্য পরীক্ষা আর ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে দিয়ে, অদ্ভুত আর অপ্রয়োজনীয় সব জটিলতায় জড়িয়ে আর প্রতি পদে ভুল ব্যাখ্যা করে করে তবে সে একটা কার্যকরী অভ্যাসে পৌছতে পেরেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোন এক জায়গায় আগাছার মত আপনা থেকে গম হত। বীজ বুনতে শেখার অনেক আগে মানুষ সেগুলো থেঁতো করে তার বিচিগুলো গুঁড়িয়ে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত। বীজ বুনতে শেখার আগে সে শস্য কাটতে শিখেছিল।

আর এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর সর্বত্র, যেখানেই বীজ বোনা আর শস্য কাটা হয়, সেখানেই বীজ বোনার সঙ্গে বলি, বিশেষ করে নরবলির একটা আদিম ধারণা প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। কৌতূহলী মনের পক্ষে এ দুটো জিনিসের প্রথম জড়িয়ে পড়ার ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক; আগ্রহশীল পাঠক স্যর জে. জি. ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও' (Golden Bough) নামক বিরাট গ্রন্থটিতে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাবেন। আমাদের মনে রাখা দরকার, এই জড়িয়ে-পড়াটা হয়েছে শিশুসুলভ স্বপ্ন আর কল্পনার জগতে বিচরণকারী আদিম মনে। কোন যুক্তিসঙ্গত প্রথায় এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগেকার জগতে যেন নিওলিথিক মানুষদের বীজ বোনার সময় এলেই একটা নরবলি হত। এ বলি আবার কোন হীন কিংবা জাতিচ্যুত লোকের হত না; সাধারণত বলি হত বাছাই করা কোন তরুণ অথবা তরুণী, এমন কেউ যাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা হত, এমন কি বলিদানের পুর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাকে পুজো করা হত। সে ছিল এক ধরনের উৎসর্গীকৃত দেবতা-রাজা, যার হত্যার খুঁটিনাটি বৃদ্ধ জ্ঞানী লোকদের দ্বারা পরিচালিত এক ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এর পিছনে সমর্থন ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত প্রথার।

প্রথম প্রথম আদিম মানুষদের ঋতু সম্বন্ধে অত্যন্ত আবছা ধারণার ফলে বীজ বোনার এবং বলিদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে নিশ্চয় খুব অসুবিধা হত। মানুষের অভিজ্ঞতার গোড়ার দিকটায় বছর বলে কোন জিনিসের ধারণা ছিল না, একথা অনুমান করার পেছনে কিছুটা যুক্তি আছে।

প্রথম কালানুক্রম (chronology) তৈরি হয় চান্দ্র মাসে। অনুমান করা হয়, বাইবেলে বর্ণিত গোষ্ঠিপতিদের বছরগুলো আসলে হচ্ছে মাস, আর ব্যাবিলনীয় ক্যালেণ্ডারে তেরটা চান্দ্র মাস নিয়ে (যাতে বীজ বোনার সময় আবার ফিরে আসে) বীজ বোনার সময় গণনার প্রচেষ্টার পরিষ্কার চিহ্ন আছে। ক্যালেণ্ডারের উপর চন্দ্রের এই যে প্রভাব, এটা আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এই যে খ্রীষ্টান চার্চে খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দিনগুলো তাদের ঠিকমত বার্ষিক দিনে পালিত না হয়ে এমন তারিখে হয় যেগুলো চন্দ্রকলার (phases of the moon) সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর বদলে যায়, যদি দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমাদের বিস্ময়বোধের ক্ষমতা ভোঁতা না হয়ে যেত তবে এটা নিশ্চয় আমাদের কাছে একটা খুব উল্লেখযোগ্য জিনিস বলে মনে হত।

প্রথম কৃষকেরা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করত কি না এটা সন্দেহের বিষয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে পশুদলচালকদের পক্ষেই নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার সম্ভাবনা বেশি। তারা সেগুলো দিক্‌নির্ণয়ের সুবিধাজনক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু যেই একবার ঋতু নিরূপণের ব্যাপারে সেগুলোর কার্যকারিতা বোঝা গেল, অমনি কৃষির পক্ষে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুব বেড়ে গেল। বীজ বোনার সময়ের বলি কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের উত্তরে কিংবা দক্ষিণে যাওয়ার সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত হল। এর থেকে সেই নক্ষত্রের সম্বন্ধে মনগড়া কাহিনী আর তার পূজা আদিম মানুষদের পক্ষে একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

খুব সহজেই বোঝা যায় যে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ, বলিদান এবং নক্ষত্রদের সম্বন্ধে জানে এরকম মানুষ, নিওলিথিক জগতের গোড়ার দিকে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানী লোক এবং স্ত্রীলোকদেরও শক্তির আর একটা উৎস ছিল—অপরিচ্ছন্নতা আর কলুষের ভয় আব শোধনের বিহিত নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান। কারণ চিরকালই যেমন ডাইন ছিল তেমনি ডাইনীরাও ছিল, যেমন পুরোহিত ছিল তেমনি স্ত্রী-পুরোহিতও ছিল। আদিম পুরোহিতরা ততটা ধর্মের চর্চা করত না, যতটা করত ফলিত বিজ্ঞানের চর্চা। তার বিজ্ঞান ছিল মোটামুটিভাবে পরীক্ষামূলক এবং প্রায়ই ভুল; সে এটাকে খুব সতর্কভাবে সাধারণ লোকের কাছে গোপন রাখত। কিন্তু তাতে এ তথ্য অপ্রমাণ করা যায় না যে তার প্রাথমিক কাজ ছিল জ্ঞানচর্চা আর তার প্রাথমিক প্রয়োগটা ছিল কার্যকরী বিষয়ে।

বারো কি পনেরো হাজার বছর আগে, পুরোনো পৃথিবীর গরম ও ভালো-রকম জল পাওয়া যায় মোটামুটি এরকম সব জায়গায় এই নিওলিথিক মানব-সমাজ তাদের শ্রেণী এবং পুরোহিত স্ত্রী-পুরোহিতদের ধারা, তাদের

চাষ করা মাঠ আর গ্রাম আর দেয়ালঘেরা শহরের বিকাশ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। যুগের পর যুগ ধরে এই সব সমাজের মধ্যে ভাবধারার সঞ্চালন ও আদান-প্রদান চলে। এলিয়ট স্মিথ এবং রিভার্স এইসব প্রথম কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'হেলিওলিথিক কালচার' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। হেলিওলিথিক (সূর্য আর পাথর) শব্দটা হয়ত এ হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ নয়, তবু যতদিন না বিজ্ঞানীরা আমাদের এর চেয়ে ভালো কোন শব্দ দিচ্ছেন, ততদিন আমাদের এটাই ব্যবহার করতে হবে। ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম এশীয় অঞ্চলের কোথাও এর সূত্রপাত হয়েছিল। সেখান থেকে এটা যুগে যুগে পূর্বদিকে আর দ্বীপ থেকে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে হয়ত আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেখানে হয়ত উত্তর দিক থেকে যেসব মঙ্গোলীয় দেশান্তরীর দল নেমে আসছিল তাদের আরও আদিম জীবন-যাপন ধারার সঙ্গে এরা মিশে গিয়েছিল।

যেখানেই এই বাদামি-ঘেঁসা লোকেরা তাদের হেলিওলিথিক কালচার নিয়ে গেছে, সেখানেই তারা তাদের সঙ্গে কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা এবং ক্রিয়াকলাপের সবটা কিংবা কতকটা নিয়ে গেছে। তার মধ্যে কতকগুলো এমনই অদ্ভুত যে তাদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিতে হয়। তারা পিরামিড আর বিরাট বিরাট স্তূপ তৈরি করত আর সম্ভবত পুরোহিতদের জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য পাথরের বড় বড় বৃত্ত তৈরি করত। তারা তাদের মৃতদের মধ্যে কয়েকজনকে কিংবা সবাইকে মমি করে রাখত। তারা উল্‌কি পরত আর ইন্দ্রিয়াবরক ত্বক ছেদন করত। কুভাদ (Couvade) বলে তাদের এক পুরোনো প্রথা ছিল যাতে শিশু জন্মাবার সময় তার পিতাকে বিশ্রাম দেবার জন্য শুতে পাঠানো হত; আর তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল আমাদের বহুপরিচিত স্বস্তিক চিহ্ন।

যদি আমরা পৃথিবীর একটা ম্যাপে ফুটকি দিয়ে দেখাই এইসব দলগত অভ্যাস কোথায় কোথায় তাদের চিহ্ন রেখে গেছে, তাহলে স্টোনহেঞ্জ আর স্পেন থেকে পৃথিবীর সমস্ত নাতিশীতোষ্ণ আর প্রায়োষ্ণমণ্ডলীয় তীরভূমির মধ্য দিয়ে মেক্সিকো আর পেরু পর্যন্ত একটা বলয়ের সৃষ্টি হবে। তবে বিষুবরেখার নিচের আফ্রিকা, উত্তর-মধ্য ইউরোপ আর উত্তর এশিয়ায় কোন ফুটকি পড়বে না; সেখানে যে সব জাত থাকত তারা একেবারে ভিন্ন ধারায় উন্নতি লাভ করছিল।

আদিম নিওলিথিক সভ্যতা

প্রায় ১০০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর ভূগোলের মোটামুটি খসড়াটা অনেকটা আজকের পৃথিবীর মত ছিল। খুব সম্ভবত ততদিনে, জিব্রাল্টার প্রণালীর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত যে বিরাট প্রাচীরটা এতদিন ভূমধ্যসাগর উপত্যকা থেকে সমুদ্রের জল ঠেকিয়ে রেখেছিল, সেটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল আর ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি অনেকটা আজকের দিনের মতই ছিল। কাস্পিয়ান সাগর খুব সম্ভবত এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। এও হতে পারে যে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে তার যোগ ছিল এবং সেটা ককেশাস পর্বতমালার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট মধ্য-এশিয় সমুদ্রের চারধারেযে জমি এখন স্টেপস্ ও মরুভূমি, সেটা তখন উর্বর আর বাসযোগ্য ছিল। সাধারণভাবে দেখতে গেলে সেটা ছিল আরো আর্দ্র আর উর্বর এক জগৎ। ইউরোপীয় রাশিয়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশি হ্রদ আর জলাভূমিতে ভর্তি ছিল এবং এশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে তখনও হয়ত বেরিং প্রণালীর ওখানে জমিতে জমিতে যোগ ছিল।

মানুষের যে প্রধান জাতিগত বিভাগগুলোর কথা আমরা জানি, ইতিমধ্যেই সেগুলো আলাদা করে চেনা সম্ভব ছিল। তখনকার কিছুটা উষ্ণতর এবং অধিক বনরাজিবিশিষ্ট জগতের উষ্ণ এবং নাতিতীব্র অঞ্চল আর তীরভূমিগুলোতে হেলিওলিথিক সভ্যতার বাদামি-ঘেঁসা লোকেরা ছড়িয়ে ছিল। এরাই ছিল আজকের ভূমধ্যসাগরীয় জগতের জীবিত অধিবাসীদের, বেরবেরদের আর মিশরীয়দের অনেকের, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীর পূর্বপুরুষ। অবশ্য এই বিরাট জাতি ছিল নানা প্রকারের। আইবেরীয় অথবা ভূমধ্য-সাগরীয় কিংবা ভূমধ্যসাগর আর আটলান্টিকের তীরভূমির 'কৃষ্ণ-শ্বেত' জাতি, 'হামিটিক' জাতি, যাদের ভিতর পড়ে বেরবের আর মিশরীয়রা, ভারতবর্ষের কৃষ্ণতর দ্রাবিড়ীয় জাতি, অসংখ্য পূর্ব ভারতীয় (East Indian) জাতি, বহু পলিনেসিয় জাতি আর মাওরীরা সকলেই ছিল মনুষ্যজাতির এই বিরাট প্রধান শাখা থেকে উদ্ভূত ছোট বড় প্রশাখা। এর পশ্চিমের প্রশাখাগুলো পূর্ব-প্রশাখাগুলোর চেয়ে বেশি শ্বেতকায় ছিল। মধ্য এবং উত্তর ইউরোপের অরণ্যাঞ্চলে এক ধরনের বেশি পিঙ্গলবর্ণ ও নীল চোখ বিশিষ্ট মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল, বাদামি-ঘেঁসা মানুষদের মূল স্রোত থেকে যারা আলাদা হয়ে যেতে শুরু করেছিল। এই মানুষগুলোকে অনেকে এখন নর্দিক (Nordic) জাতি বলে। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার আরও উন্মুক্ত অঞ্চলে এই বাদামি-ঘেঁসা মানুষের আর এক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছিল। তাদের চোখ হয়ে উঠছিল আরো তির্যক, চোয়ালের হাড়

আরো স্পষ্ট, চামড়া হলদেটে আর চুল খুব সিধে আর কালো। এদেরই মঙ্গোলীয় মানুষ বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় আর দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দ্বীপে ছিল আদিম নিগ্রয়েড (Negroid) জাতির অবশিষ্ট বংশধরেরা। আফ্রিকার মধ্যভাগ ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছিল জাতিগত মিশ্রণের একটা ক্ষেত্র। মনে হয় আজকের আফ্রিকার প্রায় সব কৃষ্ণকায় জাতিই উত্তরের বাদামি-ঘেঁসা লোকেদের সঙ্গে একটা নিগ্রয়েড অন্তঃস্রোতের মিশ্রণের ফল।

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিলিত হতে পারে ; মেঘের মতই তারা দূরে চলে যায়, আবার কাছে আসে, আবার মিলিত হয়। গাছের শাখা যেমন কখনও পুনর্মিলিত হয় না, মানবজাতির শাখা সে রকম নয়। এই জিনিসটা আমাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সুযোগ পেলেই জাতিসমূহের এই পুনর্মিশ্রণ ঘটে। যদি একথা মনে রাখি তবে আমরা অনেক নিষ্ঠুর ভুল-বোঝা এবং সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারব। জাতি কথাটা অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত অসঙ্গত সমস্ত সাধারণ নিয়ম নির্ধারিত হয়। 'ব্রিটিশ' জাতি কিংবা 'ইউরোপীয়' জাতির কথা বলা হয়, কিন্তু প্রায় সব ইউরোপীয় জাতিই বাদামি-ঘেঁসা, কৃষ্ণ-শ্বেত এবং মঙ্গোলীয় উপাদানের একটা জগাখিচুড়ি।

মানুষের উন্নতির এই নিওলিথিক পর্যায়েই মঙ্গোলীয় জাতের লোকেরা প্রথম আমেরিকায় ঢোকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তারা বেরিং প্রণালীর পথে এসে দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরে তারা আমেরিকার বল্‌গাহরিণ, কারিবু (Caribou) দেখা পায় আর দক্ষিণে দেখতে পায় বাইসনদের বড় বড় দল। যখন তারা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছোয় তখনও সেখানে গ্লিপ্টোদোন (Glyptodon) বলে এক ধরনের বড় আর্মাদিলো (Armadillo) আর মেগাথেরিয়াম (Megatherium) বলে হাতীর মত বড় এক ধরনের দৈত্যাকৃতি বেঢপ স্লথ (sloth) ছিল। খুব সম্ভব তারা শেষের জীবটাকে নির্মূল করেছিল কারণ সেগুলো ছিল যেমন বেঢপ তেমনই অসহায়।

এই আমেরিকান জাতগুলোর অধিকাংশই শিকারী যাযাবর নিওলিথিক জীবনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। তারা লোহার ব্যবহার শেখে নি। তাদের প্রধান ধাতব সম্পত্তি ছিল স্থানীয় সোনা আর তামা। কিন্তু মেক্সিকো, য়ুকাটান আর পেরুতে স্থায়ী চাষবাসের সুবিধাজনক অবস্থা ছিল, আর সেখানেই প্রায় ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ কি ঐ রকম সময়ে এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সভ্যতা গড়ে ওঠে যেটা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতার অনুরূপ, তবে

অন্য ধরনের। প্রাচীন পৃথিবীর অনেক দিন আগেকার আদিম সভ্যতাগুলোর মত এদের মধ্যেও বীজ বোনা আর শস্য কাটার সময় নরবলির চল দেখা যায়। তবে প্রাচীন পৃথিবীতে যেমন এসব আদিম ধারণা ক্রমশ হাল্‌কা, জটিল হয়ে অন্যান্য ধারণার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, আমেরিকায় এগুলোকে আরো বাড়িয়ে, ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তীব্রতার একটা খুব উঁচু স্তরে তোলা হয়েছিল। এই আমেরিকান সভ্য দেশগুলো ছিল মূলত পুরোহিতশাসিত ধর্মভীরু দেশ; তাদের সেনাপতি আর শাসকেরা আইন এবং পূর্বলক্ষণের (omen) একটা কড়াকড়ি নিয়মে বাঁধা ছিল।

এই পুরোহিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নির্ভুলতার এক উঁচু স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাবিলনীয় যে সব লোকেদের কথা আমরা এবার বলব, তাদের চেয়ে এদের বছরের ধারণা ভাল ছিল। য়ুকাটানে মায়া লিপি বলে তাদের এক ধরনের লিপি ছিল, যার অক্ষরগুলো ছিল খুব অদ্ভুত আর জটিল। আজ পর্যন্ত আমরা তার পাঠোদ্ধার করতে পারি নি। এটা সাধারণত ব্যবহার করা হত সঠিক আর জটিল সব ক্যালেণ্ডার তৈরির কাজে, যে কাজে পুরোহিতরা তাঁদের মগজ খাটাতেন। মায়া সভ্যতার শিল্পের চরম পরিণতি হয় ৭০০ কি ৮০০ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক পর্যবেক্ষকেরা এদের স্থাপত্যের নমনীয় শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রাচুর্য দেখে যেমন স্তম্ভিত হয়, আবার এদের এক ধরনের অদ্ভুত এবং উন্মত্ত নিয়মতান্ত্রিকতা আর জটিলতা তাদের ধারণার গণ্ডির বাইরে হওয়ায় তাদের হতবুদ্ধি করে তোলে। প্রাচীন পৃথিবীতে ঠিক এ ধরনের কোন জিনিস নেই। এর সবচেয়ে কাছাকাছি যেটা যায়, সেটাও এর থেকে অনেক দূর। সেটা হচ্ছে অপ্রচলিত ভারতীয় খোদাই। এর সর্বত্র পালকের বুনুনি, আর সাপেরা জড়িয়ে জাড়য়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। অনেক মায়া শিলালিপির সঙ্গে প্রাচীন পৃথিবীর অন্য কোন কাজের চেয়ে ইউরোপের উন্মাদাগারের পাগলদের আঁকা জটিল চিত্রের সাদৃশ্য বেশি। মায়াদের মন যেন প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের মনের থেকে অন্য ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল। তাদের ধারণায় যেন অন্য ধরনের পাক। প্রাচীন পৃথিবীর মানদণ্ড অনুসারে সে মনকে আদপেই সুস্থ-বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মন বলা চলে না।

এই বিকারগ্রস্ত আমেরিকান সভ্যতার সঙ্গে সাধারণ মানসিক বিকারের ধারণাটাকে জড়ানোর সমর্থন পাওয়া যায় নর-রক্তপাতের প্রতি তাদের অসাধারণ আকর্ষণ থেকে। বিশেষ করে মেক্সিকান সভ্যতায় যেন রক্তের স্রোত বইত। প্রতি বছর তারা হাজার হাজার মানুষ বলি দিত। জীবন্ত মানুষ কেটে তাদের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বার করে আনার কাজটা এই সব অদ্ভুত পুরোহিতদের

জীবনমনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। জনজীবন, জাতীয় উৎসব, সব এই অদ্ভুত রকমের বীভৎস প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে আবর্তিত হত।

এই সব সমাজের সাধারণ লোকেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্যান্য বর্বর কৃষক সম্প্রদায়ের সাধারণ জীবনযাত্রার খুব মিল ছিল। তাদের মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প এবং রঞ্জনশিল্প খুবই ভাল ছিল। মায়া লিপি শুধু পাথরে খোদাই করা হত না, চামড়া প্রভৃতির উপরও লেখা এবং রং দিয়ে আঁকা হত। ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু মিউজিয়ামে অনেক রহস্যময় মায়া পাণ্ডুলিপি আছে আজ পর্যন্ত যার তারিখ ছাড়া বিশেষ কিছু পাঠোদ্ধার করা যায় নি। পেরুতেও এ ধরনের একপ্রকার লিপির সূচনা দেখা যায়; কিন্তু দড়িতে গিঁট বেঁধে নজির রাখবার এক প্রক্রিয়ায় সেটা চাপা পড়ে যায়। চীনদেশে হাজার হাজার বছর আগে স্মৃতিশক্তির সহায় হিসেবে এ ধরনের দড়ির ব্যবহার করা হত।

মানবজাতি সমূহের পরস্পরের ভিতর সম্বন্ধ সম্পর্কে বর্তমান ধারণার সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ (এটা মনে রাখতে হবে যে মানুষের জাতিতে জাতিতে অবাধমিশ্রণ।

প্রাচীন পৃথিবীতে ৪০০০ কি ৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে, অর্থাৎ তিন কি চার হাজার বছর আগে এই সব আমেরিকান সভ্যতাগুলোর মত কতকগুলো আদিম সভ্যতা ছিল। এ সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল মন্দিরকে কেন্দ্র করে: অসংখ্য বলিদান এবং অত্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান-সচেতন একদল পুরোহিত ছিল এর অঙ্গ। কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর আদিম সভ্যতাগুলো পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের আজকের পৃথিবীর অবস্থার দিকে বিকাশ লাভ করে।

আমেরিকার এই আদিম সভ্যতাগুলো কখনও তাদের আদিম দশা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাদের প্রত্যেকটাই ছিল নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ এক-একটা ছোট-ছোট পৃথিবী। যতদিন না ইউরোপীয়রা আমেরিকায় এসেছে, ততদিন, মনে হয়, মেক্সিকোর লোকেরা পেরুর সম্বন্ধে কিছুই জানত না। আলু, যেটা পেরুর লোকেদের খাদ্যের প্রধান উপাদান, মেক্সিকোতে একেবারে অপরিচিত ছিল।

যুগের পর যুগ ধরে লোকে একভাবে দিন কাটাত—তাদের দেবতাদের দেখে অবাক মানত, বলি দিত আর মারা যেত। মায়াশিল্প অলঙ্কার-সৌন্দর্যের (decorative beauty) খুব উঁচু স্তরে উঠেছিল। মানুষ প্রেম করত আর জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হত। অনাবৃষ্টি আর প্রাচুর্য, মড়ক আর স্বাস্থ্য একের পর এক আসত। পুরোহিতেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ক্যালেণ্ডারের আর বলিদানের সময়কার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু আর কোন দিকে বিশেষ অগ্রসর হয় নি।

সুমেরিয়া, প্রাচীন মিশর ও লিখন-পদ্ধতি

নতুন পৃথিবীর (New world) চেয়ে প্রাচীন পৃথিবী ছিল এক বিস্তৃততর এবং বিচিত্রতর রঙ্গমঞ্চ। ৬০০০ কি ৭০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই এশিয়া এবং নীলনদের উপত্যকার বহু উর্বর অঞ্চলে প্রায় পেরুদেশীয় সমাজের স্তরের অর্ধসভ্য সমাজ দেখা দিতে শুরু করেছে। সে সময়ে উত্তর পারস্য, পশ্চিম তুর্কীস্থান আর দক্ষিণ আরব সবই আজকের চেয়ে অনেক বেশি উর্বর ছিল আর সেসব অঞ্চলে খুব প্রাচীন সমাজের চিহ্নও আছে। তবে নিম্ন-মেসোপটেমিয়া আর মিশরেই প্রথম, নগর মন্দির সেচ-ব্যবস্থা এবং বর্বর গ্রাম-নগরের স্তরের উপরে উঠেছে এরকম এক সমাজ-ব্যবস্থার আরও সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। তখনকার কালে ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদী আলাদা আলাদা মোহানা দিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়ত। তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সুমেরীয়রা তাদের প্রথম নগরের পত্তন করে। প্রায় সেই সময়েই, কারণ কালানুক্রম তখনও অস্পষ্ট, মিশরের বিশাল ইতিহাসের সূচনা হচ্ছিল।

মনে হয় এই সুমেরীয়রা ছিল লম্বা নাক ওয়ালা বাদামি-ঘেঁসা রঙের লোক। তারা এক ধরনের লিপি ব্যবহার করত, যার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তাদের ভাষা এখন আমরা জানি। তারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল আর রোদে শুকনো ইঁট দিয়ে বিরাট বিরাট টাওয়ারের মত মন্দির তৈরি করেছিল। সে দেশের মাটি ছিল খুব মিহি; তারা তার উপর লিখত, আর এভাবে তাদের লিপি আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। তাদের গোরু-বাছুর, ভেড়া, ছাগল

আর গাধা ছিল, তবে ঘোড়া ছিল না। তারা ঘন-শ্রেণীবদ্ধ হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্শা আর চামড়ার ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করত। তাদের পোশাক ছিল পশমের আর তারা মাথা কামাত।

মনে হয় প্রত্যেক সুমেরীয় নগরই ছিল তার নিজস্ব দেবতা এবং পুরোহিত-দের নিয়ে এক-একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু মাঝে-মাঝে এক-একটা নগর অন্য-গুলোর চেয়ে প্রবল হয়ে উঠত আর তাদের অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করত। নিপ্‌পুরের একটা খুব প্রাচীন লিপিতে 'সাম্রাজ্য' কথাটা লেখা আছে—সুমেরীয় নগর ইরেক-এর (Erech) সাম্রাজ্য—প্রথম সাম্রাজ্য, যার হদিশ পাওয়া যায়। এর দেবতা এবং এর পুরোহিত-রাজা পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত তাঁর অধিকার দাবি করতেন।

প্রথমে লেখা ব্যাপারটা ছিল ছবি এঁকে বিবরণ রাখারই একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এমনকি নিওলিথিক যুগেরও আগে মানুষ লিখতে শুরু করেছিল। যেসব আদি প্রস্তর-চিত্রের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেগুলো থেকে এই প্রক্রিয়ারই সূচনা বোঝা যায়। তাদের অনেকগুলোয় শিকার ও অভিযানের বিবরণ আছে এবং তাদের বেশির ভাগেই মানুষের মূর্তি পরিষ্কারভাবে আঁকা রয়েছে। তবে কতকগুলোয় চিত্রকর আর হাত পা মাথা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কেবল একটা খাড়া টান দিয়ে আর একটা কি দুটো এড়ো টান দিয়ে সে মানুষ বুঝিয়েছে।

এর থেকে একটা নিয়ম-সঙ্গত সংক্ষিপ্ত চিত্র-লিপিতে (Picture writing) পৌঁছনো খুব সহজ ছিল। সুমেরিয়ায়, যেখানে মাটির উপর কাঠি দিয়ে লেখা হত, সেখানে লিপিগুলোর দাগ দেখে কোন্ জিনিস বোঝাতে তাদের আঁকা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই আর তা বোঝা যেত না। কিন্তু মিশরে, যেখানে মানুষ দেয়ালের উপর আর পাপিরাস ঘাসের লম্বা সরু ফালির (প্রথম কাগজ) উপর ছবি আঁকত, যে জিনিসটার অনুকরণ করা হত তার সাদৃশ্যটা থেকে যেত। সুমেরিয়ায় ব্যবহৃত কাঠের কলমের কীলক-আকৃতি দাগ হত, এই কারণে সুমেরীয় লিপিকে কিউনিফর্ম (কীলকাকৃতি) বলা হয়।

লেখার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায় যখন ছবিতে একটা জিনিস না দেখিয়ে সেই ধরনের অন্য জিনিস দেখানো হয়। ছোট ছেলেমেয়ে-দের ধাঁধায় এ জিনিসটা এখনও চলে। একটা তাঁবু (camp) আর একটা ঘণ্টা (bell) আঁকলে শিশুরা খুব উল্লাসের সঙ্গে অনুমান করে যে এটা হচ্ছে স্কচ্ নাম ক্যাম্পবেল (Campbell)। সুমেরীয় ভাষা ছিল শব্দমাত্রার সমষ্টি (Syllable)।

অনেকটা ইদানীং কালের কয়েকটা আমেরিণ্ডিয়ান (Amerindian) ভাষার মত এটাও খুব সহজে শব্দমাত্রিক (Syllable) লিপিনিয়মে চলতে পারত অর্থাৎ যেসব কথা ছবি দিয়ে সরাসরি বোঝানো যায় না, লিখে সেগুলোর ভাবটা বোঝানো হত। মিশরীয় লিপিরও অনুরূপ বিকাশ ঘটে। পরে যখন বিদেশী লোক, যাদের কথাবার্তায় শব্দমাত্রিক ভেদটা অতটা স্পষ্ট ছিল না, এই চিত্রলিপি শিখে ব্যবহার করতে শুরু করে, আরো পরিবর্তন আর সরলীকরণের ফলে তারা এটাকে বর্ণমালামূলক লিপিতে পরিণত করে। পৃথিবীর পরের যুগের সমস্ত সত্যিকারের বর্ণমালা সুমেরীয় কিউনিফর্ম আর মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফিকএর(পুরোহিত-লিপি) এক মিশ্রণ। পরে চীনে এক ধরনের নিয়মসঙ্গত চিত্রলিপির বিকাশ হয়, তবে সেখানে এটা কোনদিন বর্ণমালার ধাপে গিয়ে পৌছয় নি।

লিপির আবিষ্কার মানবসমাজের বিকাশের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। এতে চুক্তি, আইন, আদেশ প্রভৃতির বিবরণ রাখা যেত। এতে পুরোনো নগর-রাষ্ট্রের চেয়ে বড় রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্ভব হয়।

এর ফলে একটা ধারাবাহিক ঐতিহাসিক চেতনা সম্ভব হয়েছিল। পুরোহিত কিংবা রাজার আদেশ অথবা তাঁর সীল, তাঁর দৃষ্টি অথবা স্বরের চেয়ে অনেক দূরে পৌছতে পারত এবং তাঁর মৃত্যুর পরও থাকত। এটা উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন সুমেরিয়ায় সীলের ব্যবহার খুব বেশি ছিল। রাজা কিংবা অভিজাত-বংশীয় বা শ্রেষ্ঠীদের সীল অনেক সময় খুব নিপুণভাবে খোদাই করা হত। এগুলো দিয়ে তাঁরা যে নরম মাটির দলিলে তাঁদের সম্মতি জানাতে চাইতেন তার ওপর ছাপ দিতেন। তারপর সেই নরম মাটিটা শুকিয়ে শক্ত করে নিলে স্থায়ী হত। ছ'হাজার বছর আগে সভ্যতা মুদ্রণ-শিল্পের এতটা কাছাকাছি এসেছিল। পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, মেসোপটেমিয়ায় অসংখ্য বছর ধরে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, হিসেবপত্র সবই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী টালীর উপর লেখা হত। জ্ঞানের যে বিরাট সম্পদ আমরা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি, এই ঘটনার কাছে আমরা সেজন্য ঋণী।

ব্রোঞ্জ, তামা, সোনা, রুপো, এবং একটা বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস হিসেবে উল্কার লোহা (meteoric iron) বহু আগে থেকেই সুমেরিয়া ও মিশরে পরিচিত ছিল।

পুরোনো পৃথিবীর এই সব নগরে, মিশরে আর সুমেরিয়ায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিশ্চয় অনেকটা একরকম ছিল। এবং রাস্তাঘাটের গাধা আর গোরু-বাছুরগুলোকে বাদ দিলে, তিন চার হাজার বছর পরের আমেরিকার মায়া নগরগুলোর জীবন-

যাত্রাও নিশ্চয় এরকমই ছিল। শান্তির সময় বেশিরভাগ লোকই কৃষি আর সেচকার্যে ব্যস্ত থাকত, অবশ্য ধর্মমূলক উৎসবের দিন ছাড়া। তাদের টাকাকড়ি বলে কিছুই ছিল না। মাঝে-মাঝে তাদের ছোটখাট কেনাবেচাগুলো তারা বিনিময়ে সারত। রাজারাজড়া এবং শাসকদেরই যা কিছু সম্পত্তি ছিল। কোন আকস্মিক কেনাবেচার জন্য তারা সোনারুপোর পাত আর মূল্যবান রত্নরাজি ব্যবহার করত। মন্দিরই তাদের জীবনে প্রধান ছিল। সুমেরিয়ায় ছিল এক বিরাট উঁচু মন্দির যার ছাদ থেকে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হত ; মিশরে ছিল এক বিশাল গৃহ, যার শুধু একটা তলা ছিল। সুমেরিয়ায় পুরোহিত-শাসকই ছিল সর্বপ্রধান, সর্বাপেক্ষা মহিমময় ব্যক্তি। মিশরে অবশ্য একজন ছিলেন যাঁর স্থান পুরোহিতদের উপরে। তিনি হচ্ছেন দেশের প্রধান দেবতার জীবন্ত অবতার—ফারাও, দেবতা-রাজা।

তখনকার দিনে পৃথিবীতে খুব কমই পরিবর্তন লক্ষিত হত। মানুষের দিন ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল, শ্রমবহুল আর গতানুগতিক। বাইরে থেকে খুব কমই আগন্তুক আসত, যারা আসত তাদের অবস্থা বিশেষ সুবিধের হত না। অতি প্রাচীন সব নিয়ম অনুসারে পুরোহিতরা জীবনযাত্রা পরিচালনা করতেন আর বীজবপনের সময় নির্ধারণের জন্য নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন, বলিদানের শুভাশুভ চিহ্ন নির্ণয় করতেন আর স্বপ্নের সাবধানবাণী ব্যাখ্যা করতেন। মানুষ সানন্দেই কাজ করত, ভালবাসত, মারা যেত। নিজেদের জাতির বর্বর অতীত তাদের মনে পড়ত না, আর ভবিষ্যতের কোন ভাবনাও তারা ভাবত না। কখনও কখনও শাসক দয়ালু হতেন, যেমন ছিলেন দ্বিতীয় পেপি, যিনি মিশরে নব্বই বছর রাজত্ব করেছিলেন। কখনও কখনও তাঁর উচ্চ আশা থাকত আর তিনি সৈন্য গঠন করে প্রতিবেশী নগরে যুদ্ধ আর লুঠতরাজ করতে পাঠাতেন কিংবা তাদের দিয়ে বড়-বড় বাড়ি তৈরি করাতেন। যেমন ছিলেন খিঅপস আর খেপ্রেন আর মিসেরিনাস, যাঁরা গিজএর ঐ সব পিরামিড, বিরাট কবরের স্তূপ তৈরি করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টা ৪৫০ ফুট উঁচু আর তার পাথরের ওজন ৪,৮৮৩,০০০ টন। এ সমস্ত নীল নদ দিয়ে নৌকোয় করে এনে ঠিক জায়গায় লাগানো হয়েছে প্রধানত মনুষ্যপেশীর সাহায্যে। এটা তৈরি করতে মিশরকে যতটা হৃতবল হতে হয়েছিল, একটা মহাযুদ্ধেও বোধহয় ততটা হতে হয় না।

আদিম যাযাবর জাতি

৬০০০ আর ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে শুধু মেসোপটেমিয়া আর নীল নদের উপত্যকাতেই যে মানুষ চাষবাস আর নগর-রাষ্ট্র গড়তে মন দিয়েছিল, তাই নয়।

যেখানেই সেচ-ব্যবস্থার আর সারাবর্ষব্যাপী খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, শিকার করা এবং ঘুরে-বেড়ানোর অনিশ্চয়তা আর কষ্ট ছেড়ে সেখানেই মানুষ বসবাসের বাঁধাধরা নিয়মে বাঁধা পড়ছিল। টাইগ্রিস নদীর উপরাংশে আসিরীয়ান নামক এক জাতি নগর প্রতিষ্ঠা করছিল; এশিয়া মাইনরের উপত্যকাগুলোতে আর ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি আর দ্বীপগুলোতে ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সভ্যতাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। বোধহয় ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ ও চীনের সুবিধাজনক অঞ্চলে মানব-জীবনের অনুরূপ বিকাশ ঘটছিল। ইউরোপের বহু অংশে, যেখানে হ্রদে প্রচুর পরিমাণে মাছ ছিল, মানুষের ছোট-ছোট গোষ্ঠী অনেকদিন থেকেই খুঁটি গেড়ে জলের উপর বাড়ি তৈরি করে, মাছ ধরে আর শিকার করে কৃষির অভাব পূরণ করছিল। কিন্তু পুরোনো গোলার্ধের অনেক বড়-বড় অঞ্চলেই কোনরকম বসবাস করা সম্ভব ছিল না। জমি ছিল অত্যন্ত রুক্ষ, নিবিড় বনে ভরা কিংবা শুষ্ক, অথবা ঋতু-পরিবর্তন এতই অনিশ্চিত ছিল যে মানুষের পক্ষে তখনকার যুগের যন্ত্রপাতি আর বিজ্ঞান নিয়ে সেখানে গেড়ে বসা সম্ভব ছিল না।

আদিম সভ্যতার সেই অবস্থায় বসবাসের জন্য মানুষের প্রয়োজন ছিল নিয়মিত জল সরবরাহ, উষ্ণতা এবং রৌদ্রালোক। যখন এসব প্রয়োজন মিটত না, তখন মানুষ অস্থায়ীভাবে বাস করত, শিকারের পেছনে ধাওয়া করত কিংবা চারণ-ভূমির সন্ধান করত—কিন্তু স্থায়ীভাবে ডেরা গাড়তে পারত না। শিকারীর জীবন থেকে পশুপালকের জীবনে পরিবর্তনটা হয়ত খুব আস্তে আস্তে হয়েছিল। বুনো গরু-মোষ কিংবা (এশিয়াতে) বুনো ঘোড়ার দলের পেছনে ধাওয়া করতে করতে হয়ত মানুষের মনে তাদের পোষ মানানোর চিন্তা এসেছিল। তাদের তারা উপত্যকার মধ্যে আটকে রাখতে শিখেছিল, তাদের জন্য তারা নেকড়ে, বুনো কুকুর এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করত।

কাজেই এদিকে যেমন প্রধানত বড়-বড় নদীর উপত্যকাগুলোতে কৃষকদের আদিম সভ্যতা গড়ে উঠছিল, তেমনই আর-এক ধরনের জীবনধারা গড়ে উঠছিল যেটা যাযাবরদের জীবনধারা,—যে জীবনে শুধুই গতি, শুধুই শীতের চারণভূমি থেকে গ্রীষ্মের চারণভূমিতে যাওয়া-আসা। মোটের উপর যাযাবর জাতিগুলো কৃষিকর্মে নিযুক্ত জাতিগুলোর চেয়ে কষ্টসহিষ্ণু ছিল। তারা কম সন্তানের জন্ম দিত আর সংখ্যাতেও কম ছিল। তাদের কোন স্থায়ী মন্দির বা উঁচুদরের শৃঙ্খলাযুক্ত পুরোহিত-সম্প্রদায় ছিল না; তাদের সাজসরঞ্জামও ছিল অল্প। কিন্তু এ থেকে পাঠক যেন মনে না করেন যে সেজন্য তাদের জীবনযাপন প্রণালীটা কিছু কম উন্নত ছিল। অনেক দিক দিয়েই তাদের এই স্বাধীন জীবন মৃত্তিকা-কর্ষণকারীদের

চেয়ে পূর্ণতর ছিল। মানুষ অধিক আত্ম-নির্ভরশীল ছিল, জনতার একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র ছিল না। দলপতির মর্যাদাই বেশি ছিল, রোজার (medicine-man) প্রতিপত্তি বোধহয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

দেশের বিস্তীর্ণ অংশের উপর দিয়ে চলাফেরার ফলে যাযাবরের জীবন সম্বন্ধে ধারণা অপেক্ষাকৃত উদার ছিল। সে এ-বসতির সীমা আর ও-বসতির সীমা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেত। অপরিচিত মুখ দেখতেও সে অভ্যস্ত ছিল। চারণভূমি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাকে মতলব আঁটতে হত কিংবা তাদের সঙ্গে কোন রফায় আসতে হত। কর্ষিত ভূমির অধিবাসীদের চেয়ে খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে তার জ্ঞান বেশি ছিল, কারণ তাকে পর্বত-পথ (mountain passes) এবং পাথুরে জায়গা দিয়ে যেতে হত। হয়ত তার ধাতুবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান আরও বেশি ছিল। বোধহয় ব্রোঞ্জ এবং খুব সম্ভবত লোহা গলানোর প্রক্রিয়া যাযাবরদের আবিষ্কার। আদিম সভ্য দেশগুলো থেকে অনেক দূরে, মধ্য ইউরোপে, খুব গোড়ার দিকেই ধাতুপিণ্ড থেকে নিষ্কাশিত লোহার কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে।

অন্য দিকে বসতিকারী লোকদের বয়ন-শিল্প এবং মৃৎশিল্প ছিল এবং তারা অনেক লোভনীয় জিনিস তৈরি করত। এটা অবশ্যম্ভাবী যে কৃষিমূলক আর যাযাবর, এই দুই ধরনের জীবনে যেমন তফাৎ ছিল, তেমনই দুই দলের মধ্যে কিছুটা লুঠতরাজ এবং ব্যবসাকর্ম চলত। বিশেষ করে সুমেরিয়ায়, যেখানে একদিকে মরুভূমি অন্যদিকে চাষের উপযুক্ত জমি ছিল, যাযাবরেরা সাধারণত চাষ-করা জমির কাছেই হয়ত তাঁবু গাড়ত আর আজকালকার বেদেদের মত ব্যবসা করত, চুরি করত আর বোধহয় তৈজসপত্র ঝালাই করত। (তবে তারা মুরগি চুরি করত না, কারণ মুরগি, প্রথমটা যাকে ভারতবর্ষের বনে পাওয়া যেত,—১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে মানুষ পোষ মানাতে পারেনি) তারা মূল্যবান পাথর আর ধাতু আর চামড়ার তৈরি জিনিস নিয়ে আসত। শিকারী হলে তারা চামড়া নিয়ে আসত, তার বদলে তারা পেত মাটির জিনিস, পুঁতি, কাঁচ, কাপড়-চোপড় এবং এই ধরনের তৈরি জিনিস।

প্রথম সভ্যতার সেই সুদূর অতীতে সুমেরিয়া আর প্রাচীন মিশরে তিনটি প্রধান অঞ্চল আর তিনটি প্রধান যাযাবর এবং মোটামুটি ভাবে বসতিকারী জাতি ছিল। এদিকে ইউরোপের জঙ্গলে ছিল পিঙ্গলবর্ণ নর্দিক জাতির শিকারী এবং পশুপালক, এক নিম্নশ্রেণীর জাতি। ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে আদিম সভ্যতার সঙ্গে এ জাতির বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ওদিকে পূর্ব-এশিয়ার স্টেপসএ নানারকম মঙ্গোল জাতি, হুনদের মত এক জাতি, ঘোড়াকে পোষ মানাচ্ছিল

আর তাদের মধ্যে গ্রীষ্মের আর শীতের তাঁবু গাড়ার জায়গার মধ্যে ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরার একটা বহুদূরবিস্তারী অভ্যাস গড়ে উঠছিল। খুব সম্ভব রাশিয়ার জলাভূমি এবং তখনকার বৃহত্তর কাস্পিয়ান সাগর নর্দিক এবং হুন ধরনের জাতিকে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, কেননা রাশিয়ার বেশির ভাগই তখন ছিল হ্রদ আর জলাভূমিতে ভর্তি। সিরিয়া আর আরবের মরুভূমিগুলোয়, যেগুলো ইতিমধ্যে আরও শুষ্ক হয়ে উঠছে, কৃষ্ণ, শ্বেত অথবা বাদামি-ঘেঁসা সেমিটিক জাতির লোকেরা ভেড়া ছাগল আর গাধার পাল এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। এই সেমিটিক পশুপালকেরা আর দক্ষিণ পারস্যের কিছু-বেশি নিগ্রয়েড ইলামাইট জাতিব লোকেরাই হচ্ছে প্রথম যাযাবর যারা আদিম সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। তারা এসেছিল বণিক এবং লুণ্ঠনকারী হিসেবে, অবশেষে তাদের মধ্যে আরও দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে দলপতিদের আবির্ভাব হল; তারা হল বিজয়ী।

২৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সারগন বলে একজন বিখ্যাত সেমিটিক দলপতি সমস্ত সুমেরিয়া দেশ অধিকার করেছিলেন। পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পৃথিবীর তিনিই ছিলেন অধীশ্বর। তিনি ছিলেন নিরক্ষর বর্বর, আর তাঁর জাতি অর্থাৎ আক্কাদীয় জাতির লোকেরা সুমেরীয় লিপি শিখেছিল আর তাদের কর্মচারী আর বিদ্বান লোকেরা সুমেরীয় ভাষাতেই কথাবার্তা বলত। যে সাম্রাজ্য তিনি স্থাপন করেছিলেন, দু'শতাব্দী পরেই তা ধ্বংস হয়ে যায়। ইলামাইটদের এক অভিযানের পর আমোরাইট বলে এক নতুন সেমিটিক জাতি ক্রমশ সুমেরিয়ার উপর তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের রাজধানী করে ব্যাবিলনে, যেটা তখন নদীর উপর দিকের একটা ছোট সহর ছিল। তাদের সাম্রাজ্যকে বলা হয় প্রথম ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। হামুরাবি (আনুমানিক ২১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) বলে এক বিখ্যাত রাজা এর প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে প্রথম যে-সমস্ত বিধিবদ্ধ আইন পাওয়া যায় সেগুলো তাঁর করা।

নীলনদের সঙ্কীর্ণ উপত্যকা মেসোপটেমিয়ার মত যাযাবর আক্রমণের মুখে উন্মুক্ত ছিল না। কিন্তু হামুরাবির সময়ে মিশরেও এক সফল সেমিটিক আক্রমণ হয় এবং হিক্‌সোস (Hyksos) বা 'পশুপালক-রাজ'দের এক ফারাও বংশ স্থাপিত হয় যেটা বহু শতাব্দী টিঁকে ছিল। এই সেমিটিক বিজয়ীরা কখনও মিশরীয়দের সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি। তাদের সবসময় বিদেশী ও বর্বর হিসেবে শত্রুর চোখে দেখা হত। শেষ পর্যন্ত ১৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এক জনঅভ্যুত্থানে তারা বিতাড়িত হয়।

তবে ভালই হোক আর মন্দই হোক, সেমিটিকরা স্থমেরিয়ায় চিরকালের জন্যই এসেছিল। দুটো জাত মিশে গিয়েছিল আর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ভাষা ও বৈশিষ্ট্য সেমিটিক হয়ে উঠেছিল।

প্রথম সমুদ্রযাত্রী মানুষ

প্রায় পঁচিশ কি তিরিশ হাজার বছর আগে খুব সম্ভব প্রথম নৌকো আর জাহাজের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অন্তত নিওলিথিক যুগের শুরুতে মানুষ একটা কাঠের গুড়ি কিংবা ফোলানো চামড়ার সাহায্যে জলে হাত-পা ছুঁড়ে বেড়াত। মিশর এবং স্থমেরিয়া সম্বন্ধে আমরা যখন থেকে জানি তখন থেকেই সেখানে হাতে বোনা ও চামড়ায় ঢাকা নৌকোর সমস্ত ছিদ্র ভালভাবে বুজিয়ে ব্যবহার করা হত। এখনও ওখানে এ-ধরনের নৌকো ব্যবহার করা হয়। আজও আয়ার্ল্যাণ্ড আর ওয়েলসে এগুলো ব্যবহার করা হয় আর আলাস্কায় সীলের চামড়ার তৈরি নৌকো এখনও বেরিং প্রণালী পারাপার করে। যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফাঁপা গুড়ির প্রচলন হয়। তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আসে প্রথমে নৌকো, তারপরে জাহাজ।

বোধহয় নোয়ার জাহাজের (Noah's Ark) উপাখ্যান জাহাজ-নির্মাণের কোন আদিম প্রচেষ্টার স্মৃতিকে রক্ষা করছে। প্লাবনের কাহিনী, যেটা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এতটা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটাও হয়ত ভূমধ্যসাগরীয় নিম্নভূমি প্লাবিত হওয়ার একটা পুরুষ-পরম্পরাগত কিংবদন্তী।

পিরামিডগুলো তৈরি হওয়ার অনেক আগেই লোহিত সাগরের বুকে জাহাজ চলেছিল আর ৭০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই ভূমধ্যসাগর আর পারস্য উপসাগরের বুকে জাহাজ দেখা দিয়েছিল। এগুলোর বেশিরভাগ ছিল জেলেদের জাহাজ। কিন্তু কতকগুলো এর মধ্যেই লাগত বাণিজ্য আর লুণ্ঠনের কাজে—কারণ সেযুগের মানুষ সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার থেকে আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি যে প্রথম নাবিকেরা যেখানে পারত লুট করত আর যেখানে না করে উপায় ছিল না সেখানে বাণিজ্য করত।

যেসব সাগরের বুকে এ সমস্ত প্রথম যুগের জাহাজের দুঃসাহসিক অভিযান চলত, সেগুলো ছিল স্থলমধ্যবর্তী সাগর (inland sea)। সেখানে বাতাস বইত খামখেয়ালীভাবে আর সেখানে প্রায়ই দিনের পর দিন বায়ুশূন্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। কাজেই পালের ব্যাপারটা আনুসঙ্গিক হিসেবের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। সবে গত চারশো বছরের ভালভাবে পাল আর রসারসি খাটানো সমুদ্রযাত্রী

জাহাজের আবির্ভাব হয়েছে। প্রাচীন পৃথিবীর জাহাজগুলো আসলে ছিল দাঁড়-টানা জাহাজ ; সেগুলো তীর ঘেঁসে যেত আর দুর্যোগের প্রথম আভাসেই বন্দরে ঢুকে পড়ত। যেমন জাহাজগুলো বিরাট বিরাট দাঁড়-টানা জাহাজ (galley) হয়ে উঠতে লাগল, দরকার পড়ল দাঁড় টানবার ক্রীতদাস (galley-slaves) হিসেবে যুদ্ধবন্দীদের।

ভবঘুরে যাযাবর হিসেবে সিরিয়া ও আরবে সেমিটিক জাতির লোকদের আবির্ভাব আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি আর লক্ষ্য করেছি কিভাবে তারা স্থমেরিয়া দখল করে প্রথমে আক্কাদীয় ও পরে প্রথম ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পশ্চিমে এই একই সেমিটিক জাতির লোকেরা সমুদ্রযাত্রা করছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বকূলে তারা পর পর কতকগুলো বন্দর-নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার মধ্যে টায়ার (Tyre) আর সিদোন (Sidon) ছিল প্রধান। ব্যাবিলনে যখন হামুরাবির আমল তখন তারা বণিক, ভবঘুরে আর ঔপনিবেশিক হিসেবে সারা ভূমধ্যসাগরীয় নিম্নভূমির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এই সামুদ্রিক সেমাইটদের (Sea Semites) বলা হত ফিনিশীয় (Phœnicians)। পুরোনো আইবেরীয় বাস্ক (Basque) অধিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে এরা বহুল-সংখ্যায় স্পেনে বসতি স্থাপন করে আর জিব্রাল্টার প্রণালীর ভিতর দিয়ে সমুদ্রের ধারে অভিযান চালায়। এরা আফ্রিকার উত্তর কূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। কার্থেজ হচ্ছে এ-সমস্ত ফিনিশীয় নগরের একটা, যার সম্বন্ধে আমাদের পরে অনেক কিছু বলতে হবে।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরের জলে ফিনিশীয়দের দাঁড়-টানা জাহাজই প্রথম ছিল না। সাগরের কূলে এবং তার মধ্যের দ্বীপগুলোতে এর মধ্যেই পরপর কতকগুলো সহর আর নগর ছিল ঈজীয় জাতির লোকদের। মনে হয় রক্ত এবং ভাষার দিক থেকে পশ্চিমের বাস্কদের সঙ্গে এবং দক্ষিণের বেরবের ও মিশরীয়দের সঙ্গে এরা যুক্ত ছিল। এদের সঙ্গে গ্রীকদের গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না ; তারা আমাদের কাহিনীতে আসবে অনেক পরে। এরা ছিল প্রাক্-গ্রীক, তবে গ্রীসে আর এশিয়া মাইনরে এদের সহর ছিল, যেমন মিসেনি (mycenee) আর ট্রয়,—আর ক্রীটের নোসোজএ (Cnossos) এদের এক বিশাল সমৃদ্ধিশালী বসতি ছিল।

সবে গত অর্ধশতাব্দীতে খননকারী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের পরিশ্রমের ফলে ঈজীয় জাতির লোকদের সভ্যতার পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি। সারা নোসোজ খুব তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে এর পরে কোন এত বড় সহর এর উপর গড়ে ওঠে নি, যা এর ধ্বংসাবশেষকে নষ্ট করে

ফেলতে পারত। কাজেই এই একটা বিস্মৃতপ্রায় সভ্যতা সম্বন্ধে জানবার এইটেই আমাদের প্রধান সূত্র।

নোসোজএর ইতিহাস মিশরের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই দুই দেশ সমুদ্র পার হয়ে সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য করত। ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ প্রথম সারগন এবং হামুরাবির মধ্যবর্তী সময়ে ক্রীটের সভ্যতা তার চরম শিখরে উঠেছিল।

নোসোজ ততটা সহর ছিল না যতটা ছিল ক্রীটের রাজা এবং তাঁর প্রজাদের থাকবার বিরাট প্রাসাদটি। এমনকি শত্রু-আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার মত কোন ব্যবস্থাও এর ছিল না। শুধু পরে যখন ফিনিশীয়রা প্রবল হয়ে ওঠে আর গ্রীক বলে এক নতুন এবং আরও ভয়ঙ্কর জাতের জলদস্যুরা উত্তর দিকের সমুদ্র দিয়ে আসে, তখনই এর রক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়।

রাজাকে বলা হত মিনোস (Minos), যেমন মিশরীয় রাজাকে বলা হত ফারাও (Pharao)। যে প্রাসাদ থেকে তিনি রাজ্যশাসন করতেন তাতে প্রবহমান জল, বাথরুম ইত্যাদি সুবিধার ব্যবস্থা ছিল যা আমরা অন্য কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে দেখতে পাই না। সেখানে তিনি বড় বড় উৎসব ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। ষাঁড়ের লড়াই (bull-fight) হত ; সে লড়াই এখনও যে-ধরনের লড়াই হয় একেবারে সেই ধরনের। এমনকি ষাঁড়ের সঙ্গে যারা লড়ত, এখনকার লড়িয়ে-দের পোশাকের সঙ্গে তাদের পোশাকের পর্যন্ত মিল ছিল। তা ছাড়া ব্যায়াম-প্রদর্শনী হত। স্ত্রীলোকদের পোশাক ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে আধুনিকতাসূচক। তারা কার্পেট এবং ঝালর-দেওয়া পোশাক পরত। ক্রীটবাসীদের মৃৎশিল্প, বয়ন-শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, অলঙ্কার-শিল্প, হাতীর দাঁতের, ধাতুর এবং মিনার কাজ ছিল আশ্চর্যরকম সুন্দর। তাছাড়া তাদের এক ধরনের লিপি ছিল, যেটার এখনও পাঠোদ্ধার করা যায় নি।

এই সুখী, সূর্যকরোজ্জ্বল সভ্য জীবন কয়েক হাজার বছর টিঁকে ছিল। ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি নোসোজ আর ব্যাবিলনে অনেক লোক ছিল যারা মনে হয় খুব সুখে জীবনযাপন করত। তাদের নানারকম প্রদর্শনী আর ধর্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান হত, তাদের গার্হস্থ্য ক্রীতদাসেরা তাদের সুখ-সুবিধে দেখত আর তাদের ব্যবসায়ের ক্রীতদাসেরা তাদের জন্য ব্যবসা করত। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল আর নীল সমুদ্র দিয়ে ঘেরা নোসোজএর বাসিন্দাদের কাছে জীবন নিশ্চয় খুব নিরাপদ বলে মনে হত। মিশর হয়ত তখনকার দিনে একটা পড়ন্ত দেশ বলে মনে হত, তার শাসন তখন অর্ধসভ্য পশুচারক রাজাদের হাতে। রাজনীতিতে

উৎসাহী কোন ব্যক্তি নিশ্চয় লক্ষ্য করত সেমিটিক জাতির লোকেরা কিরকম ভাবে যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—মিশরে শাসন করছে, সুদূর ব্যাবিলনে শাসন করছে, টাইগ্রিস নদীর উপরাংশে নিনেভে নগরী তৈরি করছে, পশ্চিমে হারকিউলিসের স্তম্ভ (জিব্রাল্টার প্রণালী) পর্যন্ত যাচ্ছে এবং সেই সব সুদূর সমুদ্রতীরে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করছে।

নোসোজএ নিশ্চয় কিছু উৎসাহী এবং কৌতূহলী লোকের বাস ছিল, কারণ পরবর্তী গ্রীকরা দিদালাস বলে একজন নিপুণ ক্রীটবাসী কারিগরের কাহিনী বলত যে একরকম ওড়বার যন্ত্র তৈরি করবার চেষ্টা করেছিল, বোধহয় গ্লাইডার ধরনের; সেটা ভেঙে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল।

নোসোজএর জীবনযাত্রা আর আমাদের জীবনযাত্রার মিল আর অমিলগুলো খুঁটিয়ে দেখলে অদ্ভুত লাগে। ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কোন ক্রীটবাসী ভদ্রলোকের কাছে লোহা ছিল একটা দুষ্প্রাপ্য ধাতু যেটা আকাশ থেকে পড়ত, যেটা সাধারণ নয় বরং একটু অদ্ভুত; কারণ তখনও শুধু উল্কার লোহাই পরিচিত ছিল: খনিজ পদার্থ থেকে লোহা তখনও পাওয়া যায়নি। এর সঙ্গে আমাদের আজকালকার দিনের তুলনা করুন—লোহায় চতুর্দিক ছেয়ে আছে। ঘোড়া আর-একটা প্রাণী যা ক্রীটবাসীর কাছে বেশ একটা আজগুবি জানোয়ার মনে হত—এক ধরনের বড় গাধা যার কৃষ্ণসাগর ছাড়িয়ে বহু দূরে উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে বাস। তার কাছে সভ্যতা ছিল ঈজীয় গ্রীস আর এসিয়া মাইনরে সীমাবদ্ধ, সেখানে লীডিয়ান, কারিয়ান আর ট্রোজানরা (Lydians and Carians and Trojans) তাদের মত জীবন যাপন করত এবং খুব সম্ভবত তাদের মত ভাষায় কথা বলত। স্পেনে এবং উত্তর আফ্রিকায় ফিনিশীয় এবং ঈজীয়রা বসতিস্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু তার কল্পনার কাছে ওগুলো ছিল খুবই সুদূর অঞ্চল। ইটালি তখনও একটা জনশূন্য স্থান, গভীর বনে ভর্তি। বাদামি চামড়া এট্রুস্কানরা (Etruscans) তখনও এশিয়া মাইনর থেকে সেখানে যায় নি। আর-একদিন হয়ত এই ক্রীটবাসী ভদ্রলোক বন্দরে গিয়ে এক বন্দীকে দেখল। তার সুন্দর গায়ের রং আর নীল চোখ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। বোধহয় আমাদের ক্রীটবাসী ভদ্রলোক তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল এবং উত্তর পেয়েছিল এক অবোধ্য অস্পষ্ট ভাষায়। এ প্রাণীটি কৃষ্ণসাগরের ওধারের কোন জায়গা থেকে এসেছিল—দেখে মনে হয়েছিল একেবারে আদিম যুগের এক বর্বর। কিন্তু সত্যি-সত্যি সে ছিল আর্যজাতির লোক, যে জাতি এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা শিগগিরই অনেক কথা বলব,—এবং যে অদ্ভুত অস্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলেছিল সেটা পরে

সংস্কৃত, ফার্সী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ইংরিজি এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রধান ভাষায় বিভক্ত হয়েছিল।

উন্নতির চরম শিখরে ছিল এই নসোজবাসী—বুদ্ধিমান, উৎসাহী, দীপ্ত এবং সুখী। কিন্তু ১৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সম্ভবত খুব আকস্মিকভাবে এর সমৃদ্ধির উপরে সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছিল। মিনোসের প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল—তার ধ্বংসাবশেষ আজ পর্যন্ত আর পুনর্নির্মিত হয়নি কিংবা তাতে আর কেউ বসবাস করেনি। আমরা জানিনা কী ভাবে এই সর্বনাশটা ঘটে। খননকারীরা লুঠতরাজ ও আগুনের চিহ্ন বলে মনে হয় এরকম জিনিস লক্ষ্য করেছে। কিন্তু একটা অত্যন্ত ধ্বংসকারী ভূমিকম্পের চিহ্নও পাওয়া গেছে। হয়ত প্রকৃতি একাই নসোজএর ধ্বংসসাধন করেছিল, কিংবা ভূমিকম্প যা শুরু করেছিল গ্রীকেরা তা শেষ করেছিল।

মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরিয়া

মিশরীয়েরা কখনই খুব সহজে তাদের সেমিটিক পশুচারক রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করে নি। ১৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ এক তীব্র জাতীয় আন্দোলন দ্বারা এইসব বিদেশীদের তাড়ানো হয়। মিশরের পুনরভ্যুত্থানের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়, মিশরবিদ্‌দের (Egyptologists) কাছে যেটা নতুন সাম্রাজ্য (New Empire) বলে পরিচিত। হিক্‌সোস আক্রমণের আগে মিশর দৃঢ়-নিবদ্ধ ছিল না, এখন হয়ে উঠল এক দেশ। আর বশ্যতা আর অভ্যুত্থানের এই দশা কেটে যাওয়ার পর সে সামরিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল। ফারাওরা দেশে দেশে অভিযান শুরু করলেন। হিক্‌সোসদের আনীত যুদ্ধ-অশ্ব এবং যুদ্ধরথ এখন তাদের কাজে লাগল। তৃতীয় থোথমিস আর তৃতীয় আমেনোফিসএর আমলে এশিয়ার ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত মিশর তার শাসন বিস্তার করেছিল।

মেসোপটেমিয়া আর নীল নদের দুই সভ্যতার মধ্যে হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধের ভিতর আমরা এখন প্রবেশ করছি। এই দুই সভ্যতা একদা একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রথমে মিশর ছিল উপরে। সপ্তদশ বংশ, (Seventeenth Dynasty) যার মধ্যে ছিলেন তৃতীয় এবং চতুর্থ অ্যামেনোফিস এবং বিখ্যাত রাণী হাতাসু, আর উন-বিংশতি বংশ, যখন দ্বিতীয় রামেশিস (কেউ কেউ যাঁকে মোজেস-বর্ণিত ফারাও বলে মনে করেন) সাতষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন—এই বিখ্যাত বংশগুলি মিশরকে সমৃদ্ধির উঁচু স্তরে তুলেছিল। এর মধ্যে মধ্যে মিশরের অবনতির দশা গেছে, সিরিয়া তাকে জয় করেছে এবং পরে দক্ষিণ থেকে ইথিওপীয়রা তাকে জয় করেছে। মেসোপটেমিয়ায় ছিল ব্যাবিলনের শাসন, পরে হিটাইটরা

(Hittites) আর দামাস্কাসের সিরীয়রা একটা ক্ষণস্থায়ী প্রাধান্য লাভ করে। এক সময় সিরীয়রা মিশর অধিকার করে। নিনেভেতে আসিরীয়দের ভাগ্যের জোয়ার-ভাঁটা চলতে থাকে; কখনও বিজিত হয়, কখনও বা আসিরীয়রা ব্যাবিলন শাসন করে আর মিশর আক্রমণ করে। মিশরীয় সেনাবাহিনী ও এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন সেমিটিক শক্তির আসা-যাওয়ার কথা বলবার মত জায়গা আমাদের এখানে নেই। সেসব সৈন্যদলে ছিল যুদ্ধরথের বিরাট বিরাট বাহিনী, কেননা ঘোড়া—যেটা তখনও শুধু যুদ্ধ আর গৌরববর্ধনের জন্য ব্যবহার করা হত, ততদিনে মধ্য-এশিয়া থেকে প্রাচীন সভ্য দেশগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই সুদূর অতীতের অস্পষ্ট আলোয় বড় বড় দিগ্বিজয়ীরা আবির্ভূত হয়ে মিলিয়ে যান—যেমন মিতান্নির রাজা তুশরাত্তা (Tushratta, King of Mitanni), যিনি নিনেভে অধিকার করেছিলেন, আসিরিয়ার রাজা প্রথম তিগলাথ পিলেজার (Tiglath Pileser I), যিনি ব্যাবিলন জয় করেন। অবশেষে আসিরীয়রা সেকালের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি হয়ে উঠল। তৃতীয় তিগলাথ পিলেজার ৭৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন জয় করে, ঐতিহাসিকেরা যাকে বলেন 'নতুন আসিরীয় সাম্রাজ্য' (New Assyrian Empire) তার প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর দিক থেকে লোহাও তখন সভ্যসমাজে এসে পৌঁছেছে; আর্মেনীয়দের পূর্বে হিটাইটরা প্রথমে লোহা পেয়ে এর ব্যবহার আসিরীয়দের জানায়, যার ফলে দ্বিতীয় সারগন নামে আসিরিয়ার এক জবরদখলকারী রাজা লোহার অস্ত্র দিয়ে তাঁর সেনা-বাহিনীকে সজ্জিত করেছিলেন। আসিরিয়াই প্রথম রাষ্ট্র যে নির্মম বলপ্রয়োগ-নীতির (Doctrine of blood and iron) প্রবর্তন করে। সারগনের ছেলে সেনাকেরিব (Sennacherib) মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত এক সেনাদল নিয়ে গিয়ে-ছিলেন কিন্তু তিনি হেরে যান, যুদ্ধে নয়—মহামারীর আক্রমণে।

সেনাকেরিবের নাতি অস্থরবানিপাল (Assurbanipal), যিনি ইতিহাসে গ্রীকদের দেওয়া সারদানাপালুস (Sardanapalus) নামেও পরিচিত, ৬৭০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সত্যি-সত্যি মিশর জয় করেন। কিন্তু মিশর তখন এক ইথিওপীয় রাজ-বংশের অধিকৃত বিজিত দেশ। সারদানাপালুস এলেন শুধু এক বিজেতার জায়গায় আর-এক বিজেতা রূপে।

ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ যুগের, এই দশ শতাব্দীর ব্যবধানকালের একপ্রস্থ রাজনীতিক মানচিত্র যদি থাকত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে অণুবীক্ষণের নিচে আমিবার (amœba) মত মিশর দেশ সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হচ্ছে,

এবং ব্যাবিলন, আসিরিয়া, হিটাইট আর সিরিয়া এই সব সেমিটিক রাষ্ট্রগুলো আসছে যাচ্ছে, পরস্পরকে গ্রাস করছে আবার উদ্‌গীরণ করছে। এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে দেখা যাবে ছোট-ছোট ঈজীয় রাষ্ট্র, যেমন লিডিয়া, যার রাজধানী সার্দিস (Sardis), আর ক্যারিয়া (Caria)। কিন্তু প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর, কিংবা তার কিছু আগে থেকেই, উত্তর-পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম থেকে একপ্রস্থ নতুন নাম দেখা দেবে প্রাচীন পৃথিবীর মানচিত্রে। এগুলো হবে কয়েকটা বর্বর উপজাতির নাম। এরা লোহার অস্ত্রশস্ত্র আর ঘোড়ায়-টানা রথ ব্যবহার করত আর ঈজীয় এবং সেমিটিক সভ্যতাগুলোর উত্তর সীমানায় প্রবল উৎপাতের কারণ হয়ে উঠেছিল। এরা সবাই যেসব বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত, তা নিশ্চয় এককালে ছিল এক—আর্যভাষা।

কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্ব দিক ঘিরে এগিয়ে আসছিল মীড আর পারসীকরা (Medes and Persians)। মহাকালের পুঁথিতে এদের সঙ্গে জট পাকিয়ে রয়েছে শক আর সর্মেশিয়ানরা (Sythians and Sarmatians)। আর্মেনিয়ানরা এল উত্তর-পূর্ব কিংবা উত্তর-পশ্চিম থেকে, সাগর-প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম থেকে বল্কান উপদ্বীপের মধ্যে দিয়ে এল সিমেরিয়ানরা (Cimmerians), ফ্রিজিয়ানরা (Phrygians) আর যাদের আমরা এখন গ্রীক বলি সেই সব হেলেনীয় (Hellenic) উপজাতিরা। পূর্বেরই হোক আর পশ্চিমেরই হোক, এই আর্যরা সবাই ছিল হানাদার দস্যু আর লুণ্ঠনকারী। তারা সকলেই ছিল পরস্পর-সম্পর্কিত সমশ্রেণীর জাতি ; লুণ্ঠনব্যবসায়ী, কষ্টসহিষ্ণু পশুচারকের দল। পূর্বদিকে এরা কখনও সীমান্ত প্রদেশে হানা দিয়ে লুটতরাজ করত, কিন্তু পশ্চিমে তারা সহর দখল করে সুসভ্য ঈজীয় অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। ঈজীয় জাতগুলো এমনই চাপের মুখে পড়েছিল যে তারা আর্যদের নাগালের বাইরে নতুন দেশে বাসা খুঁজছিল। কেউ কেউ নীলনদের বদ্বীপে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে মিশরীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হচ্ছিল। কেউ বা, যেমন এট্রুস্কানরা, মনে হয় মধ্য-ইটালির বিস্তীর্ণ অরণ্যে গিয়ে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া মাইনর থেকে সাগর-পাড়ি দিয়েছিল। কয়েক দল ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে কয়েকটা সহর গড়ে তুলেছিল। এরাই পরে ইতিহাসে ফিলিস্টাইন (Philistines) বলে পরিচিত হয়।

যে আর্যেরা এরকম উদ্ধতভাবে প্রাচীন সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে এসে স্থান অধিকার করল, তাদের কথা আমরা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বলব। ১৬০০ এবং ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের বনানী আর প্রান্তর-সমূহের ভিতর থেকে

বেরিয়ে এসে এই আর্য বর্বরদের ধীর এবং অবিরাম অগ্রগতির ঘূর্ণিপাকের ফলে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের লীলাভূমিগুলোতে যে আলোড়ন এবং দেশত্যাগ চলেছিল, এখানে শুধু সেইটাই উল্লেখ করা হল।

তারপরে আর-এক পরিচ্ছেদে ফিনিসিয়া আর ফিলিস্টাইন উপকূলের পিছনকার পাহাড়ের হিব্রু (Hebrew) বলে ছোট একটা সেমিটিক জাতির কথাও আমাদের বলতে হবে। এই যুগের শেষের দিকটায় তারা পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে এবং পরবর্তী ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক সাহিত্যের সৃষ্টি করে। সেটা হল হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল—ইতিহাস, কাব্য, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভবিষ্যদ্বাণী-সম্বলিত একগ্রন্থ সংগ্রহ।

৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে পর্যন্ত মিশরে আর মেসোপটেমিয়াতে আর্যদের আগমনের ফলে মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রীকদের ভয়ে ঈজীয়দের পালানো, এমন কি নসোজএর ধ্বংসও নিশ্চয় ব্যাবিলন আর মিশরের অধিবাসীদের কাছে খুব সুদূরের একটা গণ্ডগোল বলে মনে হয়েছিল। সভ্যতার ধাত্রীস্বরূপ এই সব রাষ্ট্রে কত রাজবংশের উত্থান আর পতন হল, কিন্তু মানুষের জীবনের মূল ছন্দটা অব্যাহত রইল আর তার সূক্ষ্মতা এবং জটিলতা যুগে যুগে ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। মিশরে আরও সুদূর অতীতের সঞ্চিত স্মৃতিস্তম্ভ পিরামিডগুলো তিনহাজার বছর বয়সে পা দিয়েছে আর তখনই তারা ঠিক এখনকার মত দর্শকদের দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সপ্তদশ আর উনবিংশ রাজবংশের আমলে গড়ে-ওঠা অনেক নতুন নতুন জমকালো ইমারত। কার্নাক (Karnak) আর লুক্সরের (Lusor) মন্দিরগুলো এই সময়ের। নিনেভের সব প্রধান স্মৃতিস্তম্ভ, সেখানকার যত দেবদেউল, মানুষের মাথা আর পাখাওয়ালা ষাঁড়ের মূর্তি, রাজা আর রথ—এই ১৬০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেকার শতাব্দীগুলোতে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যাবিলনের বেশির ভাগ গৌরবের জিনিসও এই সময়ের।

মেসোপটেমিয়া আর মিশর এই দুই জায়গাকারই প্রচুর সরকারি নথিপত্র, ব্যবসার হিসেব, গল্প-কবিতা আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এখন আমাদের হাতে এসেছে। আমরা জানি যে ব্যাবিলন এবং মিশরের থিবসের (Thebes) মত সহরের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের জীবন ইতিমধ্যেই প্রায় এখনকার আয়েসী ধনীদের জীবনের মত মার্জিত এবং বিলাসী হয়ে উঠেছিল। এ-ধরনের লোকেরা সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত এবং আসবাবপত্রে সুসজ্জিত সুন্দর সুন্দর বাড়িতে সুশৃঙ্খল এবং উৎসবমুখর জীবন যাপন করত। তাদের পরিধানে থাকত কারুকার্য-বহুল পোশাক আর চমৎকার মণিরত্নরাজি। তাদের বহু উৎসব ও পার্বণ হত।

তারা একে অন্তকে নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়ন করত, সুশিক্ষিত ভৃত্যেরা তাদের পরিচর্যা করত আর চিকিৎসক এবং দন্তচিকিৎসকেরা তাদের শরীরের যত্ন নিত। তারা ঘুরে বেড়াত না বিশেষ বটে, তবে নীল এবং ইউফ্রেটিস এই দুই নদীতেই নৌ-বিহার একটা সাধারণ গ্রীষ্মকালীন আমোদের মধ্যে পড়ত। ভারবাহী জীব ছিল গাধা; ঘোড়া তখন পর্যন্ত শুধু যুদ্ধের জন্য রথে আর রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতে ব্যবহৃত হত। খচ্চর তখনও ছিল নতুন জানোয়ার, আর উট মেসোপটেমিয়ায় পরিচিত হলেও মিশরে তখনও আসেনি। লোহার তৈজসপত্র বিশেষ ছিল না; ধাতুর মধ্যে তামা আর ব্রোঞ্জেরই বেশি প্রচলন ছিল। সূক্ষ্ম লিনেন, সুতির কাপড় এবং উল তাদের অজানা ছিল না। কাচের কথা জানা ছিল, তাতে সুন্দর রং করাও হত কিন্তু সাধারণত ছোট ছোট জিনিসই কাচের তৈরি হত। পরিষ্কার কাচ বা চশমার কাচ ছিল না। তারা সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধাত কিন্তু তাদের নাকের উপর চশমা ছিল না।

প্রাচীন থিব্‌স্‌ অথবা ব্যাবিলনের জীবন আর আধুনিক জীবনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তখন পর্যন্ত টাকাপয়সার চল হয় নি। তখনও বেশির ভাগ ব্যবসা হত বিনিময়ে। আর্থিক ব্যাপারে ব্যাবিলন মিশরের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। সোনা আর রুপো বিনিময়ের কাজে ব্যবহার করা হত আর সেগুলো বাট (ingots) তৈরি করে রেখে দেওয়া হত। আর টাকাকড়ি তৈরি হবার আগে, এমন সব শ্রেষ্ঠী ছিল যারা এইসব মূল্যবান ধাতুপিণ্ডের উপর নিজেদের নাম আর পিণ্ডটার ওজনের ছাপ দিয়ে দিত। বণিক আর পথিকদের সঙ্গে দামি পাথর থাকত যা বেচে তারা তাদের প্রয়োজন মেটাত। বেশির ভাগ চাকর আর মজুর ছিল ক্রীতদাস, তাদের মাইনে দেওয়া হত, জিনিস দিয়ে। টাকার চল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দলপ্রথার পদ্ধতি শুরু হল।

প্রাচীন জগতের মুকুটমণি এই সহরগুলোয় এলে আধুনিক দর্শক তাঁর খাদ্যের প্রধান দুটি উপাদানের দেখা পেতেন না: ওখানে মুরগি কিংবা ডিম ছিল না। ফরাসী রাঁধুনিরা ব্যাবিলনে এলে সুখ পেত না। ও দুটো জিনিস পুবদেশ থেকে এসেছিল শেষ আসিরীয় সাম্রাজ্যের সময় নাগাদ।

অন্য সবকিছুর মত ধর্মও অনেকটা মার্জিত হয়ে উঠেছিল; নরবলি অনেক দিন আগেই উঠে গিয়েছিল। তার বদলে পশু কিংবা রুটি দিয়ে তৈরি তার প্রতিমূর্তি (dummy) বলি হিসেবে ব্যবহার করা হত। তবে ফিনিসীয়দের, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকায় তাদের সবচেয়ে বড় উপনিবেশ কার্থেজের অধিবাসীদের নামে পরেও নরবলি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। আগেকার

কালে একজন বড় সর্দার মারা গেলে নিয়ম ছিল তার কবরের উপর তার স্ত্রীদের এবং ক্রীতদাসদের বলি দিয়ে তার বর্শা আর ধনুক ভেঙে ফেলা, যাতে তাকে সঙ্গীহীন নিরস্ত্র অবস্থায় প্রেতলোকে যেতে না হয়। এই অন্ধকার ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি ছিল মিশরের একটা মনোরম প্রথার মধ্যে। মৃতদেহের সঙ্গে তারা ছোট-ছোট খেলনার বাড়ি, দোকান, চাকর, গোরু ইত্যাদির কবর দিত। এই নমুনাগুলো থেকে আজ আমরা ৩০০০ বছর কি তারও আগেকার এইসব প্রাচীন জাতির নিরাপদ ও মার্জিত জীবনযাত্রার সবচেয়ে পরিষ্কার ধারণা করতে পারি।

উত্তরের অরণ্য আর প্রান্তরসমূহ থেকে আর্যদের বেরিয়ে আসার আগে প্রাচীন জগৎটা ছিল এইরকম। ভারতবর্ষে আর চীনেও অনুরূপ উন্নতি হয়েছিল। এ দু' অঞ্চলেই বড় নদীর উপত্যকায় বাদামি-ঘেঁসা মানুষদের কৃষিপ্রধান নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তবে মিশর আর মেসোপটেমিয়ার মত ভারতবর্ষের নগররাষ্ট্রগুলো অত তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে বা এক হয়ে যেতে পারেনি। তারা অনেকটা প্রাচীন সুমেরীয় অথবা আমেরিকার মায়া সভ্যতার স্তরে ছিল। এখনও অনেক উপকথার জঞ্জাল সাফ করে, চীনের পণ্ডিতদের আধুনিক প্রথায় চীনের ইতিহাস লিখতে হবে। সম্ভবত চীন সে-সময় ভারতবর্ষ থেকে এগিয়ে ছিল। মিশরের সপ্তদশ রাজবংশের সমসাময়িক কালে চীনে শাঙ নামে এক সম্রাট-বংশ ছিল। এই যাজক সম্রাটের আধিপত্য ছিল কতকগুলো অধীন রাজ্যকে নিয়ে শিথিলভাবে গ্রথিত এক সাম্রাজ্যের উপর। এইসব আদিম সম্রাটের প্রধান কাজ ছিল ঋতুকালীন বলিদান অনুষ্ঠান। শাঙ বংশের সময়কার সুন্দর ব্রোঞ্জের পাত্র এখনও আছে। সেগুলোর সৌন্দর্য আর শিল্পকুশলতা দেখলে এ কথাটা আমাদের মেনে নিতেই হয় যে সেগুলো তৈরি হওয়ার পেছনে নিশ্চয় বহুশতাব্দী ব্যাপী সভ্যতার দান আছে।

আদিম আর্য জাতি

চারহাজার বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউরোপের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং মধ্য-এশিয়া বোধহয় এখনকার চেয়ে বেশি গরম ছিল, স্যাঁত-সেতে ছিল আর বনে ভর্তি ছিল। পৃথিবীর এইসব অঞ্চলে প্রধানত গৌরবর্ণ এবং নীলচক্ষু-বিশিষ্ট নর্দিক জাতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো উপজাতি ঘুরে বেড়াত। এই উপজাতিগুলোর মধ্যে এতটা সংস্রব ছিল যে রাইন নদী থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত তারা একই মূল ভাষার কয়েকটা অপভ্রংশ মাত্র ব্যবহার করত। সে সময় তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। তখন হামুরাবি ব্যাবিলনের অধিবাসীদের আইন

তৈরি করে দিচ্ছিলেন আর ইতিমধ্যেই প্রাচীন এবং সুসভ্য দেশ মিশর বিদেশীদের অধিকারের দুঃখ অনুভব করেছিল। তারা ঘুণাক্ষরেও এদের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে নি।

এই নর্দিক জাতির ভাগ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে বাস্তবিক একটা খুব বড় ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ছিল। তারা ছিল প্রান্তর আর বনের ফাঁকা জায়গার মানুষ। প্রথম-প্রথম তাদের ঘোড়া ছিল না, তবে গোরু-ছাগল ছিল। ঘুরে বেড়াবার সময় তারা তাদের তাঁবু আর মালপত্র গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিত। কিছুকাল এক জায়গায় থাকতে হলে তারা মাটি-লেপা ছিটে-বেড়ার কুঁড়ে ঘর তৈরি করে নিত। তাদের প্রধান ব্যক্তিদের শব তারা দাহ করত—বাদামি রঙের লোকদের মত ঘটা করে কবর দিত না। আরো বড় নেতাদের চিতাভস্ম পাত্রের মধ্যে রেখে সেটাকে ঘিরে তারা বিরাট বিরাট গোলাকার স্তূপ তৈরি করত। এইগুলো সেই গোলাকার সমাধিস্তূপ (round barrows), যা উত্তর ইউরোপের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পূর্বগামী বাদামি রঙের লোকেরা দাহ না করে তাদের মৃতদেহগুলোকে বসা অবস্থায় লম্বা ধরনের ঢিবিতে কবর দিত। সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘাকার সমাধিস্তূপ (long barrows)।

আর্যেরা গমের ফসল ফলাত, বলদ দিয়ে হাল চাষ করত, তবে ফসলের পাশে তারা বসতি স্থাপন করত না। ফসল কাটা হয়ে গেলেই তারা সেখান থেকে চলে যেত। ব্রোঞ্জ তাদের ছিল, আর ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ কোন সময়ে তারা লোহার অধিকারী হয়েছিল। হয়ত লোহা গলানোর প্রক্রিয়ার (iron smelting) তারাই প্রথম আবিষ্কর্তা। আর এরই কাছাকাছি কোন সময়ে তারা ঘোড়ার ব্যবহার শেখে, যদিও গোড়ার দিকে তারা ঘোড়াকে শুধু ভারবহনের কাজেই লাগাত। তাদের সমাজ-জীবন ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের অপেক্ষাকৃত স্থিতিবান লোকদের মত মন্দিরকেন্দ্রিক ছিল না এবং তাদের প্রধানরা পুরোহিত ছিল না, ছিল নেতা। তাদের সমাজ-ব্যবস্থাটা পুরোহিত বা নৃপতিশ্রেণীকে নিয়ে তৈরি না হয়ে বরং অভিজাতশ্রেণীকে নিয়ে হয়েছিল। খুব গোড়ার ধাপ থেকেই তারা কয়েকটা পরিবারকে নায়কোচিত ও সম্রান্তশ্রেণীর বলে আলাদাভাবে দেখত।

তারা খুব কইয়ে-বলিয়ে লোক ছিল। পানভোজনে ও উৎসবে তাদের ভ্রাম্যমান জীবন আনন্দময় হয়ে উঠত। চারণ বলে এক বিশেষ ধরনের লোকেরা এই সব উৎসবে গান গাইত আর আবৃত্তি করত। সভ্যতার সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত তাদের কোন লিপি ছিল না। এই চারণদের স্মৃতিশক্তিই ছিল তাদের জীবন্ত সাহিত্য। এইভাবে ভাষার আবৃত্তিকে তারা প্রচুর আনন্দদানের কাজে লাগাল। এতে

করেই তাদের ভাষাটা ভাবপ্রকাশের এক সুকুমার ও শোভন বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং এটাকেই পরবর্তীকালে আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলোর প্রাধান্যের আংশিক কারণ বলে নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রতিটি আর্য জাতির কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস দানা বেঁধেছিল এই চারণদের আবৃত্তির মধ্যে, যেগুলোকে মহাকাব্য (epic), বীরগাথা (saga), বেদ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল।

এদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র ছিল এদের দলপতিদের ঘর-বাড়ি, যেখানে তারা কিছুদিনের জন্য বসবাস করত। সেখানে তাদের সর্দারের হলঘরটা প্রায়ই হত খুব প্রশস্ত একটা কাঠের বাড়ি। পশুপালের জন্য মাটির, আর বাইরে খামারবাড়ি অবশ্যই ছিল; কিন্তু বেশির ভাগ আর্যজাতির পক্ষেই এই হলটাই ছিল সাধারণ মিলনকেন্দ্র। পানভোজন করতে, চারণদের গান শুনতে আর খেলাধুলোয় আর আলোচনায় অংশগ্রহন করতে সকলেই সেখানে যেত। এর চারদিকে থাকত গোয়াল আর আস্তাবল। সর্দার আর তার স্ত্রী একটা উঁচু মঞ্চ কিংবা বারান্দা-মত জায়গায় শয়ন করত। সাধারণ লোকেরা যে যেখানে পারত শয়ন করত যেমন এখনও ভারতীয়েরা করে। অস্ত্রশস্ত্র, গহনাপত্র, যন্ত্রপাতি এবং ঐ ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাদ দিলে, প্রত্যেক দলের মধ্যে কুলপতির কর্তৃত্বে এক ধরনের সমান অধিকার ছিল। সর্বসাধারণের স্বার্থে সর্দার সমস্ত গোধন এবং গোচারণক্ষেত্রের মালিক ছিলেন; অরণ্য আর নদীর কোন মালিক ছিল না।

মেসোপটেমিয়া আর নীলনদের বিরাট সভ্যতার অভ্যুত্থানের সময়ে যে জাতি মধ্য-ইউরোপ আর পশ্চিম-মধ্য-এশিয়ার বিরাট প্রান্তর-সমূহে বংশবৃদ্ধি করছিল, আর যে জাতিকে আমরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দতে সর্বত্র হেলিওলিথিক মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেখতে পাই, তাদের ধরনধারন ছিল এই রকম। ফ্রান্সে, বৃটেনে আর স্পেনে তারা আসতে শুরু করেছিল। দুই তরঙ্গে তারা পশ্চিমদিকে ঠেলে এল। এই মানুষদের মধ্যে প্রথমে যারা বৃটেনে আর আয়ার্ল্যাণ্ডে এল তারা ব্রোঞ্জের অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। বৃটানির কার্নাক আর ইংলণ্ডের স্টোনহেঞ্জ আর এভবেরিতে বিরাট পাথরের স্তম্ভগুলো যারা বানিয়েছিল, তাদের এরা হয় ধ্বংস নয় পদানত করল। এরা আয়ার্ল্যাণ্ডে পৌছল। এদের বলে গয়েডেলিক কেল্ট (Goidelic Celts)। দ্বিতীয় তরঙ্গটা এদের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত কতকগুলো জাতির সঙ্গে বোধহয় আরো কতকগুলো জাতির লোক মিশে লোহা সঙ্গে নিয়ে এসে পৌছল গ্রেট বৃটেনে। এদের বলা হয় বৃটনিক কেণ্টদের (Brythonic Celts) তরঙ্গ। ওয়েলশরা এদের থেকেই তাদের ভাষা পেয়েছে।

এদেরই সগোত্র অন্যান্য কেল্টিক জাতির লোকেরা দক্ষিণদিকে স্পেনের ভিতর ঢোকবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। ফলে এরা শুধু ঐ দেশের বাসিন্দা হেলিওলিথিক বাস্ক (Basque) জাতির সঙ্গেই নয়, সাগরোপকূলের সেমিটিক ফিনিসীয় উপনিবেশগুলোরও সংস্পর্শে আসছিল। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আর-এক শ্রেণীর কতকগুলো উপজাতি, ইটালীয়রা, অরণ্যসমাকুল বন্য ইটালি উপদ্বীপ ধরে নিচে নেমে আসছিল। এরা যে সবসময় জিতত তা নয়। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে টাইবার নদীর তীরে এক বাণিজ্য-নগরীর রূপে ইতিহাসে রোমের আবির্ভাব হল। এর অধিবাসীরা ছিল আর্য ল্যাটিন জাতি কিন্তু এর শাসনকর্তা ছিল এট্রুস্কান রাজা আর অভিজাত সম্প্রদায়।

আর্য জাতিমালার একেবারে অন্য প্রান্তে একই ধরনের অন্য কতকগুলো উপজাতি একই ভাবে দক্ষিণমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। সংস্কৃতভাষী আর্য মানুষেরা খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের অনেক আগেই পশ্চিমের গিরিসঙ্কটগুলোর মধ্যে দিয়ে উত্তর ভারতে নেমে এসেছিল।

সেখানে এসে তারা আগেকার এক বাদামি-রঙা সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসে। এই দ্রাবিড়-সভ্যতা থেকে তারা অনেক কিছু শিখেছিল। অন্যান্য আর্য জাতিগুলিও হয়ত মধ্য-এশিয়ার গিরিপথগুলো পার হয়ে এখন তাদের যতদূর সীমা তার চেয়ে অনেক পূর্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব তুর্কস্থানে এখনও ফরসা নর্দিক উপজাতির দেখা মেলে যাদের চোখ নীল; তবে, এখন তারা মঙ্গোল ভাষায় কথা বলে।

১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগেই কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যেকার প্রাচীন হিটাইট জাতি আর্মেনীয় জাতি কর্তৃক প্লাবিত এবং 'আর্যীকৃত' হয়ে গিয়েছিল। আর ইতিমধ্যেই আসিরীয় আর ব্যাবিলনীয়রা তাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এক নতুন দুর্ধর্ষ রণনিপুণ বর্বরদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছিল—সে উপজাতি শ্রেণীর মধ্যে শক, মীড এবং পারসীকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বল্কান উপদ্বীপের মধ্যে দিয়েই আর্য উপজাতিগুলো প্রাচীন জগতের সভ্যতার মর্মস্থলে তাদের প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানে। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের বহু শতাব্দী আগে থেকেই তারা দক্ষিণমুখো এসে এশিয়া মাইনরে ঢুকতে শুরু করেছিল। প্রথম যে উপজাতির দলটা আসে তার মধ্যে ফ্রিজীয়রা ছিল সবচেয়ে প্রধান। তারপর পর পর আসে এওলীয়, আয়োনীয়, এবং ডোরীয় গ্রীকেরা। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভিতর তারা গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে এবং বেশির ভাগ দ্বীপে প্রাচীন ঈজীয় সভ্যতাকে মুছে ফেলে। মাইসিনি আর টিরিন্স শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আর নসসএর কথা প্রায় ভুলেই গেল সকলে। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগেই গ্রীকেরা

সমুদ্রযাত্রা শুরু করে। তারা ক্রীট এবং রোডস দ্বীপে বসতি স্থাপন করে এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছড়ানো ফিনিসীয় বাণিজ্যনগরগুলোর ধরনে তারাও সিসিলি এবং দক্ষিণ ইটালিতে উপনিবেশ স্থাপন করে।

কাজেই যখন তৃতীয় টিগলাথ পিলেজার, দ্বিতীয় সারগন এবং সারদানাপালুস আসিরিয়াতে রাজত্ব করছিলেন আর ব্যাবিলনিয়া, সিরিয়া আর মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন ইটালিতে, গ্রীসে আর উত্তর-পারস্যে আর্য জাতিরা সভ্যতার কায়দাকানুনগুলো শিখে নিয়ে সেগুলোকে তাদের নিজেদের কাজে লাগাচ্ছিল। খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে তার পরবর্তী ছ-শতাব্দীর ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে, কী করে এই আর্যজাতিগুলোর শক্তি আর কর্মপ্রচেষ্টা বাড়তে লাগল আর কীভাবে অবশেষে তারা সেমিটিক ঈজীয় মিশরীয় নির্বিশেষে সমস্ত প্রাচীন জগৎকে পদানত করেছিল তার কাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে আর্যজাতিগুলো সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হলেও রাজদণ্ড আর্যদের হাতে আসার বহুদিন পরে পর্যন্ত আর্য, সেমিটিক আর মিশরীয় ভাবধারা এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে। সত্য কথা বলতে কী, এই সংগ্রাম এ-ইতিহাসের বাকি সমস্তটার মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে, এবং আজকের দিনে এখনও একই ধরনে চলছে।

শেষ ব্যাবিলনীয় এবং প্রথম দারিয়ুসের সাম্রাজ্য

আমরা আগেই বলেছি, তৃতীয় টিগলাথ পিলেজার আর জবরদখলকারী রাজা দ্বিতীয় সারগনের আমলে কিভাবে আসিরিয়া এক বৃহৎ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সারগন এই মানুষটির আসল নাম ছিল না। বিজিত ব্যাবিলনীয়দের খুশি করার জন্য তিনি এই নাম নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর আমলের দু-হাজার বছর আগের প্রথম সারগন, যিনি প্রাচীন আক্কাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর কথা তাদের মনে পড়ে। বিজিত নগর হলেও, লোকসংখ্যা আর গুরুত্বের দিক থেকে ব্যাবিলন ছিল নিনেভের চেয়ে বড়। তাই এর মহান দেবতা, বেল-মারদুক (Bel Marduk)এর বণিক আর এর পুরোহিতদের খাতির করে চলতে হত। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই মেসোপটেমিয়াতে আমরা সেসব বর্বর যুগকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি যখন একটা নগর অধিকার করা মানেই ছিল নির্বিচারে হত্যা আর লুণ্ঠন। বিজেতারা চেষ্টা করত কীভাবে বিজিত জাতিকে তুষ্ট করে তাদের চিত্ত জয় করা যায়। সারগনের পর এই নতুন আসিরীয় সাম্রাজ্য দেড়শো বছর টিকে ছিল, আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অসুরবানিপাল (সারদানাপালুস) অন্ততপক্ষে নিম্ন-মিশর অধিকার করেছিলেন।

কিন্তু আসিরিয়ার ক্ষমতা ও সংহতি দ্রুত ক্ষয় হতে লাগল। প্রথম সামেটিকাস বলে এক ফারাওর নেতৃত্বে মিশর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বিদেশীদের সরিয়ে দিল, আর দ্বিতীয় নেকোর আমলে এক যুদ্ধে সিরিয়া-জয়ের চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে আসিরিয়া তার ঘরের কাছের শত্রুদের সঙ্গে লড়ছে এবং আত্মরক্ষায় বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না। দক্ষিণ-পূর্ব মেসোপটেমিয়ার এক সেমিটিক জাতি, চালদীয়রা, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত আর্যজাতীয় মীড আর পারসীকদের সঙ্গে নিনেভের বিরুদ্ধে একজোট হল। খৃষ্টপূর্ব ৬০৬ অব্দে—এবার আমরা সঠিক তারিখের যুগে প্রবেশ করছি—তারা শহরটা দখল করে।
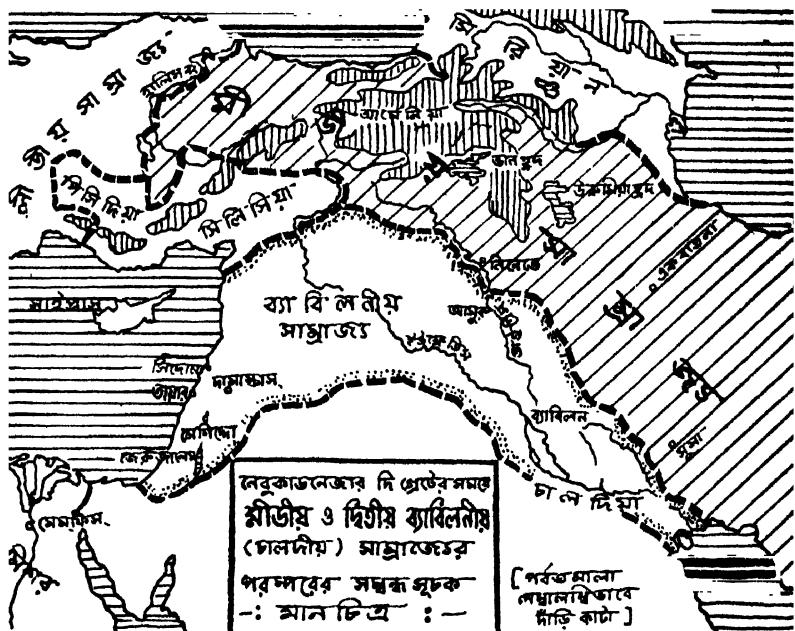
আসিরিয়া-জয়লব্ধ সম্পত্তির ভাগাভাগি হল। স্যাক্সারেসএর (Cyaxares) নেতৃত্বে উত্তরে এক মীডীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। নিনেভে এর অন্তর্ভুক্ত হল এবং এর রাজধানী হল একবাতানা। পূর্বদিকে এটা ভারতবর্ষের সীমান্ত স্পর্শ করল আর দক্ষিণে এক বিশাল অর্ধচন্দ্রের আকারে হল এক নতুন চালদীয় সাম্রাজ্য —দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। মহান নেবুকাডনেজারের আমলে (বাইবেলের Nebuchadnezzar the Great) এই সাম্রাজ্য সম্পদ এবং ক্ষমতার খুব উঁচু স্তরে উঠেছিল। ব্যাবিলনের শেষ গৌরবের যুগ, সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগের শুরু

হল। কিছুদিন পর্যন্ত দুটো সাম্রাজ্য শান্তিতে রইল। নেবুকাডনেজারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল অ্যাস্ত্যারেসএর।

ওদিকে এই সময়ে দ্বিতীয় নেকো অবলীলাক্রমে সিরিয়াতে তাঁর বিজয়-অভিযান চালাচ্ছিলেন। ৬০৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে মেগিদোর যুদ্ধে তিনি জুডার রাজা জোসায়াকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই ছোট দেশ জুডার কথা শিগগিরই আমাদের আরও বলতে হবে। তারপর তিনি ইউফ্রেটিস পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন কিন্তু সম্মুখীন হলেন পতনোন্মুখ আসিরিয়ার বদলে জীবিত ব্যাবিলনিয়ার। চালদীয়রা মিশরীয়দের কঠোর শিক্ষা দিল। হেরে গিয়ে, তাড়া খেয়ে নেকো মিশরে ফিরে গেলেন। আর ব্যাবিলনের সীমান্ত প্রসারিত হল প্রাচীন মিশরের সীমারেখা অবধি।

৬০৬ থেকে ৫৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ অবধি এই দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য টালমাটাল অবস্থায় টিঁকে রইল। যতদিন উত্তরে প্রবলতর এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু মীডীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে এদের বনিবনা ছিল ততদিনই এদের অবস্থা ভাল ছিল। আর এই সাতষট্টি বছরে এই প্রাচীন নগরে শুধু জীবনযাত্রা নয়, বিদ্যাচর্চারও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। এমন কি আসিরীয় রাজাদের আমলে, বিশেষ করে সারদানাপালুসের রাজত্বকালে, ব্যাবিলন ছিল প্রবল মানসিক কর্মপ্রচেষ্টার এক কেন্দ্র। আসিরীয় হয়েও সারদানাপালুস পুরোপুরি ব্যাবিলনীয়ই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এক গ্রন্থাগার তৈরি করেন—কাগজের বইয়ের নয়, আদিম স্থমেরীয়দের সময় থেকে মেসোপটেমিয়াতে লেখবার জন্য যে মৃৎফলকের ব্যবহার হয়ে এসেছে তার। তাঁর এই সংগ্রহ মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে এবং এটাই বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদানের সবচেয়ে মূল্যবান ভাণ্ডার। ব্যাবিলনে চালদীয় বংশের শেষ রাজা নবনিদাসের সাহিত্যিক রসবোধ ছিল আরও তীক্ষ্ণ। তিনি পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এবং তাঁর গবেষকেরা প্রথম সারগনের সিংহাসনে আরোহনের যে তারিখটা বার করলেন, সেই সময়ে তিনি বহু শিলালিপিতে ব্যাপারটা স্মরণীয় করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে অনৈক্যের অনেক লক্ষণ দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্থানীয় দেবদেবীদের ব্যাবিলনে আনিয়ে সেখানে তাদের মন্দির করে দিয়ে তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে রোমানেরা এই কৌশল অবলম্বন করে বেশ সফলতা লাভ করেছিল। কিন্তু ব্যাবিলনে তা হয়নি। ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতা বেল-মারডুকের পরাক্রান্ত পুরোহিত সম্প্রদায় এর ফলে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তারা নবনিদাসের পরিবর্তে কাকে আনা সম্ভব খুঁজতে খুঁজতে পার্শ্ববর্তী মীডীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি পারসীক সাইরাসকে (Cyrus the

Persian) পেল। পূর্ব এশিয়া-মাইনরের লীডিয়া রাজ্যের ধনী রাজা ক্রীসাসকে (Crœsus) জয় করে সাইরাস ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগর-প্রাকারের বাইরে যুদ্ধ হয় এবং নগরের দ্বার তাঁকে খুলে দেওয়া হয় (৫৩৮ খৃঃ পূঃ)। বিনা যুদ্ধে তাঁর সৈন্যেরা নগরে প্রবেশ করে। বাইবেলে আছে যে নবনিদাসের পুত্র যুবরাজ বেলসাজার পান-ভোজনে মত্ত ছিলেন, এমন সময় একটা হাত এসে ঘরের দেওয়ালে আগুনের অক্ষরে এই কটা রহস্যময় শব্দ লিখে দিল : মীনে, মীনে, টিকেল, উফারসিন (Mene, Mene, Tekel, Upharsin)। দানিয়েল নামে এক নবীকে (prophet) প্রহেলিকার ব্যাখ্যার জন্য ডাকা হল। তিনি তার এই অর্থ করলেন : ভগবান তোমার রাজত্ব চিহ্নিত করেছেন এবং তাকে শেষ করেছেন ; তোমাকে
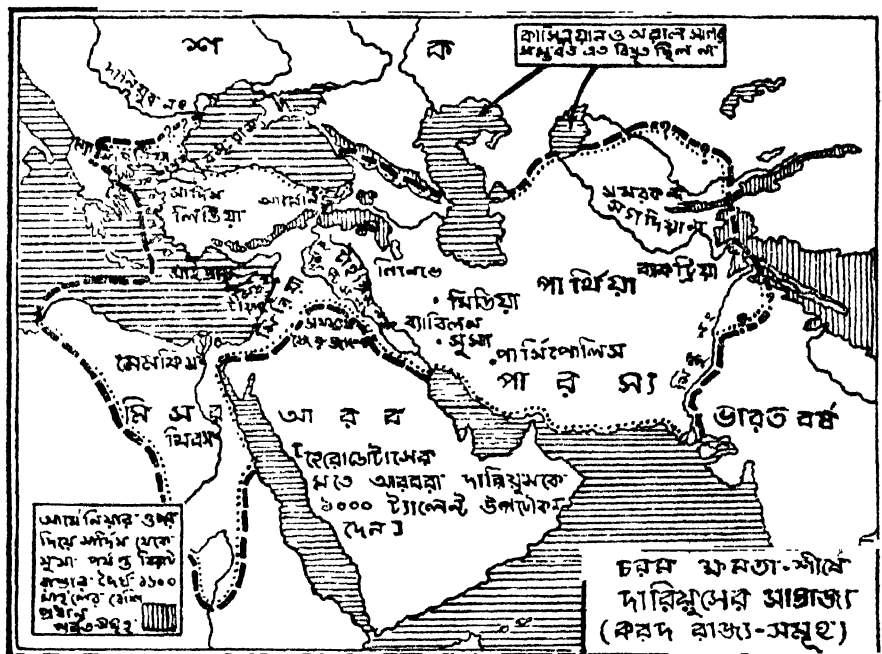
তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে তুমি অনুপযুক্ত। তোমার রাজত্ব মীড আর পারসীকদের দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত বেল-মারদুকের পুরোহিতেরা দেওয়ালের লেখাটার সম্বন্ধে জানত। বাইবেলে বলে যে, সেই রাত্রেই বেলসাজার নিহত হন, নবনিদাস হন বন্দী, আর এত শান্তভাবে শহর দখল করা হয়, যে বেল-মারদুকের পূজায় কোন ছেদ পড়ে না।

এমনি করে ব্যাবিলনীয় আর মীডীয় সাম্রাজ্য এক হয়ে যায়। সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বাইসিস মিশর জয় করেন। ক্যাম্বাইসিস পাগল হয়ে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর জায়গায় আসেন মীডজাতীয় দারিয়ুস (Darius the Mede) বা প্রথম দারিয়ুস। তিনি ছিলেন সাইরাসের প্রধান পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম হিস্টাসপিসের ছেলে।

প্রথম দারিয়ুসের পারসীক সাম্রাজ্য হল প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পীঠভূমিতে নতুন আর্য সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে বৃহত্তম। সমগ্র এশিয়া-মাইনর আর সিরিয়া, প্রাচীন আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সবটা, মিশর, ককেসাস আর কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ভারতবর্ষের ভিতরেও সিন্ধুনদ অবধি ছিল এর বিস্তার। অশ্ব আর অশ্বারোহী আর রথ আর তৈরি-রাস্তার গাধা, বলদ আর মরুভূমিতে ব্যবহারের জন্য উট—এরাই দ্রুততম যাতায়াতের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হত বলেই এ সম্ভব হয়েছিল। পারসীক সম্রাটেরা তাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য বড় বড় যোগাযোগের রাস্তা তৈরি করলেন। সম্রাটের দূত অথবা সরকারী ছাড়পত্র-সহ পথিকের জন্য সব সময় ডাকের ঘোড়া অপেক্ষা করত। তাছাড়া তখন পৃথিবীতে মুদ্রার আকারে অর্থ চালু হতে শুরু হয়, যার ফলে বাণিজ্য এবং মেলামেশার সুবিধা অনেক বাড়ে। কিন্তু ব্যাবিলনে আর এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকে না। বিশ্বাসঘাতকতা করে শেষ পর্যন্ত বেল-মারডুকের পুরুষদের কোন লাভ হয় না। তখন পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ব্যাবিলন তখন এক পতনোন্মুখ নগর। নতুন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ছিল পার্সিপোলিস, সুসা আর একবাতানা। রাজধানী ছিল সুসা। নিনেভে এর আগেই পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমশ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল।

ইহুদীদের আদিম ইতিহাস

এবার আমরা হিব্রুদের প্রসঙ্গে আসতে পারি। এই সেমিটিক জাতিটি তাদের নিজেদের কালে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাসে তাদের প্রভাবের জন্যই তাদের গুরুত্ব। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অনেকদিন আগে থেকেই তারা জুডিয়াতে বসবাস করত আর ঐ সময়ের পর থেকে তাদের রাজধানী ছিল জেরুজালেম। দক্ষিণে মিশর আর উত্তরে সিরিয়া আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের পরিবর্তনশীল সাম্রাজ্য—দুপাশের এইসকল বৃহৎ সাম্রাজ্যের কাহিনীর সঙ্গে তাদের

কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। মিশর আর ঐ সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে তাদের দেশটা ছিল একটা অপরিহার্য চলাচলের পথ।

পৃথিবীতে তাদের গুরুত্ব এইজন্য যে তারা একটা লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল—পৃথিবীর একটা ইতিহাস, আইন, সাময়িক বার্তা, স্তোত্র, জ্ঞানের বই, কবিতা, গল্প আর রাজনীতিক উক্তিসমূহের একটা সংগ্রহ—যাকে ওল্ড টেস্টামেণ্ট (Old Testament) বলে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে এই সাহিত্যের আবির্ভাব হয়।

বোধহয় ব্যাবিলনেই প্রথম এই সাহিত্য একত্র সংগৃহীত হয়। আমরা আগেই বলেছি, আসিরিয়া যখন প্রাণের দায়ে মীড পারসীক আর চালদীয়দের সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন ফারাও দ্বিতীয় নেকো কীভাবে আসিরীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং জুডার রাজা জোসায়া তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে মেগিডোর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হন (৬০৮ খৃঃ পূঃ)। জুডা মিশরের করদ রাষ্ট্র হয়, আর যখন ব্যাবিলনের নতুন চালদীয় রাজা নেবুকাডনেজার দি গ্রেট এসে নেকোকে পাততাড়ি গুটিয়ে মিশরে ফিরতে বাধ্য করলেন তখন তিনি জেরুজালেমে কয়েকজন নামমাত্র রাজা বসিয়ে জুডার কাজ চালাবার চেষ্টা করলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, সেখানকার জনসাধারণ তাঁর ব্যাবিলনীয় কর্মচারীদের হত্যা করল। তাছাড়া অনেকদিন ধরেই এই ছোট দেশটা একবার এর আর একবার ওর পক্ষ হয়ে মিশর আর উত্তর সাম্রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া বাধাচ্ছিল। তাই তিনি এবার এটাকে একেবারে ভেঙে ফেলবেন স্থির করলেন। জেরুজালেম লুঠ করে পুড়িয়ে দেওয়া হল। লোকজন যা রইল তাদের সবাইকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হল।

সেইখানেই তারা ছিল যতদিন না সাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন (৫৩৮ খৃঃপূঃ)। তিনি তাদের একত্র করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা আবার নিজেদের বসতি স্থাপন করে জেরুজালেমের মন্দির ও প্রাচীরগুলো পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

তার আগে ইহুদীরা খুব একটা সভ্য অথবা ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত তাদের মধ্যে অল্প লোকই লিখতে পড়তে পারত। তাদের নিজেদের ইতিহাসেও বাইবেলের গোড়ার দিকের বইগুলো পড়ার কোনও নজির পাওয়া যায় না। বইয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় জোসায়ার সময়ে। ব্যাবিলনের বন্দীদশা তাদের সভ্য এবং ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। নিজেদের সাহিত্য সম্বন্ধে ওকিবহাল, তীব্রভাবে আত্মসচেতন এবং রাজনীতিক এক জাতি হিসেবে তারা দেশে ফেরে।

মনে হয় সেসময়ে শুধু পেণ্টাটিউক (Pentateuch), অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্টটা আমরা যেভাবে জানি তার প্রথম পাঁচখানা বই নিয়েই ছিল ওদের বাইবেল। তা ছাড়া, আলাদা আলাদা বই হিসেবে তাদের আরও অনেকগুলো বই ছিল যেগুলো পরে পেণ্টাটিউকের সঙ্গে বর্তমান হিব্রু বাইবেলের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, যেমন, ক্রনিকল্‌স্‌, সাম্‌স্‌, প্রোভার্বস্‌ (Chronicles Psalms and Proverbs)।

জগতের সৃষ্টি, আদম ও ইভের সৃষ্টি এবং প্লাবনের (the Flood) যেসব বিবরণ দিয়ে বাইবেলের শুরু, ব্যাবিলনে প্রচলিত ঐ ধরনের কিংবদন্তীগুলোর

সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। মনে হয় ওগুলো সমস্ত সেমিটিক জাতির সাধারণ বিশ্বাসসমূহের অঙ্গ। মোজেস আর স্যামসনের গল্পের অনুরূপও এরকম সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাব্রাহামের কাহিনী, এবং তার পর থেকেই এমন একটা কিছু শুরু হল যা বিশেষ করে ইহুদী জাতির।

অ্যাব্রাহাম অনেক কালের পুরোনো লোক। হয়ত ব্যাবিলনের হামুরাবির আমলে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এক যাযাবর সেমিটিক গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি। তাঁর পর্যটন, তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির কাহিনী এবং কী করে তারা মিশর দেশে বন্দী হয়েছিল, সে কথা জানতে হলে পাঠককে বুক অব জেনেসিস (Book of Genesis) পড়তে হবে। তিনি কনানের (Canaan) মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেলের কাহিনীতে বলে যে অ্যাব্রাহামের যিনি ঈশ্বর, তিনি এই সমৃদ্ধ নগররাজি-শোভিত আনন্দময় দেশটি অ্যাব্রাহাম ও তাঁর সন্ততিদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

তারপর, দীর্ঘকাল মিশর প্রবাসের শেষে এবং মোজেসের নেতৃত্বে অরণ্যে প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে ঘোরবার পর, অ্যাব্রাহামের সন্তানরা পুবের আরব মরুভূমির দিক থেকে কনান দেশ আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে হতে তারা বারোটা উপজাতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আক্রমণটা বোধ-হয় তারা করেছিল ১৬০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে—মোজেস কিংবা কনান সম্বন্ধে সে সময়কার কোন মিশরীয় নথি নেই যা এই কাহিনীকে সাহায্য করতে পারে। যাই হোক, তারা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমির (Promised land) পশ্চাৎপটস্বরূপ যে পাহাড়গুলো, তার বেশি কিছু জয় করতে পারে নি। উপকূল ভূমিটা সেসময় কনানাইটদের হাতে ছিল না, ছিল নবাগত সেই ঈজিয়ান জাতি, ফিলিস্টাইনদের হাতে। আর তাদের শহরগুলো—গাজা, গাথ, অ্যাশডড, অ্যাস্কালন এবং জোপ্পা হিব্রুদের আক্রমণ সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করল। বহু পুরুষ ধরে অ্যাব্রাহামের সন্তানসন্ততিরা পেছনকার ঐ পাহাড়ি জায়গায় এক অখ্যাত উপজাতি হয়ে রইল। ফিলিস্টাইন আর তাদের সম্পর্কিত জাতি মোয়াবাইট (Moabites) আর মিডিয়ানাইটদের (Midianites) সঙ্গে তাদের অবিরাম খুঁটিনাটি ঝগড়া লেগেই রইল। বুক অব জাজেসএ পাঠক তাদের এই সময়কার সংগ্রাম ও বিপর্যয়ের ইতিহাস পাবেন। কারণ এর বেশির ভাগটাই হচ্ছে খোলাখুলি ভাবে বলা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার ইতিহাস।

এপর্যন্ত বেশির ভাগ সময়েই, হিব্রুদের মধ্যে শাসনকার্য বলে যা কিছু ছিল তা চালাতেন পুরোহিত বিচারকেরা। তাঁদের বাছাই করতেন জনসাধারণের মধ্যে

বয়োজ্যেষ্ঠ যারা, তাঁরা। কিন্তু অবশেষে, ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ মাগাদ কিন্তু তাঁরা সল (Saul) বলে একজনকে রাজা নির্বাচন করলেন, যিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু সলের নেতৃত্বে বিচারকদের নেতৃত্বের চেয়ে কোন উন্নতি হল না। মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে তিনি ফিলিস্টাইনদের তীরবর্ষণে প্রাণ হারালেন, তাঁর বর্ম গেল ফিলিস্টাইন ভিনাস দেবীর মন্দিরে আর তাঁর দেহ বেথ-সান শহরের প্রাচীরে পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখা হল।

তাঁর উত্তরাধিকারী ডেভিড তাঁর চেয়ে বেশি হুঁশিয়ার ছিলেন এবং বেশি সফল হয়েছিলেন। ডেভিডের সময়েই এল হিব্রুজাতির একমাত্র সমৃদ্ধির যুগ। এর মূলে ছিল ফিনিসীয় নগর টায়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। মনে হয় টায়ারের রাজা হিরাম অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি হিব্রুদের পাহাড়ি দেশের মধ্যে দিয়ে লোহিত সাগরে যাবার একটা বাণিজ্য-পথের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন। সাধারণত ফিনিসীয় বানিজ্যসম্ভার মিশরের পথে লোহিত সাগরে পৌঁছত, কিন্তু মিশরের তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, আর সে পথে ফিনিসীয়দের বাণিজ্য চালাবার হয়ত অন্যান্য বিঘ্নও ছিল। যাই হোক, ডেভিড এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সলোমনের সঙ্গে হিরাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। হিরামের প্রসাদে জেরুজালেমের প্রাকার, প্রাসাদ আর মন্দির গড়ে উঠল আর তার বদলে হিরাম জাহাজ তৈরি করে লোহিত সাগরের জলে ভাসালেন। জেরুজালেমের মধ্যে দিয়ে উত্তর আর দক্ষিণমুখে এক বিপুল বাণিজ্যের স্রোত বইতে লাগল। আর সলোমন তাঁর জাতির অভিজ্ঞতায় অভূতপূর্ব এক সমৃদ্ধি আর সমারোহ লাভ করলেন। এমন কি স্বয়ং ফারাওয়ের এক মেয়ে তাঁকে সম্প্রদান করা হল।

এ জিনিসগুলোর মাপকাঠিটা মনে মনে ঠিক করে রাখা ভাল। গৌরবের শিখরেও সলোমন ছিলেন ছোট্ট এক শহরের ছোট্ট এক সামন্ত রাজা মাত্র। তাঁর ক্ষমতা এতই ক্ষণস্থায়ী ছিল যে তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বাবিংশ রাজবংশের প্রথম ফারাও শিশাক (Shishak) জেরুজালেম অধিকার করে তার বেশির ভাগ ঐশ্বর্য লুঠ করে নিয়েছিলেন। বাইবেলের কিংস্ এবং ক্রনিকল্স্ (Kings and Chronicles) নামক বইগুলোতে সলোমনের মহিমার যে বিবরণ আছে, অনেক সমালোচক তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, পরবর্তী কালের লেখকেরা স্বজাতিগর্বে স্ফীত হয়ে আসল ব্যাপারটাকে বাড়িয়েছেন এবং অতিরঞ্জিত করেছেন। কিন্তু যত্ন করে পড়লে দেখা যাবে যে বাইবেলের বিবরণটা প্রথমবার পড়লে যতটা মনে হয় ততটা সাংঘাতিক কিছু নয়।

মাপগুলো হিসেব করলে দেখা যাবে যে সলোমনের মন্দির সহরতলীর একটা ছোট গির্জের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। আর তাঁর ১৪০০ রথের কাহিনীও আমাদের মনে আর ছাপ রাখতে পারে না যখন আমরা একটা আসিরীয় স্মৃতিস্তম্ভ থেকে জানতে পারি যে, সলোমনের উত্তরাধিকারী আহাব আসিরীয় সেনাদলে ২০০০ রথের এক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। বাইবেলের বিবরণী থেকে এই কথাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সলোমন জাঁকজমকেই সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন আর অতিরিক্ত কর আর কাজের চাপে তাঁর প্রজাদের জর্জরিত করে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর রাজ্যের উত্তরাংশ জেরুজালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ইস্রায়েল রাজ্যে পরিণত হল। জেরুজালেম জুডার রাজধানী হয়ে রইল।

হিব্রুদের সমৃদ্ধি ছিল ক্ষণস্থায়ী। হিরাম মারা গেলেন। টায়ারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জেরুজালেমের ক্ষমতা কমতে লাগল। মিশর আবার পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। ইস্রায়েল আর জুডার রাজাদের ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল উত্তরে প্রথমে সিরিয়া তারপর আসিরিয়া আর তারপর ব্যাবিলন এবং দক্ষিণে মিশর কর্তৃক নিষ্পেষিত দুটো ছোট রাজ্যের ইতিহাস। সে কাহিনী চরম সর্বনাশের এবং চরম সর্বনাশকে একটু ঠেকিয়ে রাখার মত সাময়িক পরিত্রাণের কাহিনী। সে কাহিনী একটা বর্বর জাতিকে কয়েকজন বর্বর রাজার শাসনের কাহিনী। ৭২১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আসিরীয়রা ইস্রায়েল রাজ্যের সব লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল আর ইতিহাস থেকে তারা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। জুডার অধিবাসীরা ৬০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কোন রকমে যুঝেছিল, তারপর তাদেরও দশা ইস্রায়েলের মত হয়, সেকথা আমরা বলেছি। বিচারকদের (Judges) সময় থেকে হিব্রুদের ইতিহাসের যে কাহিনী বাইবেলে আছে তার খুঁটিনাটি নিয়ে তর্ক চলতে পারে বটে, কিন্তু এটা একটা মোটামুটি সত্য কাহিনী এবং গত শতাব্দীতে মিশরে, আসিরিয়াতে আর ব্যাবিলনে খননকার্য চালানোর ফলে যা জানা গিয়েছে তার সঙ্গে খাপ খায়।

ব্যাবিলনেই হিব্রুজাতি তাদের ইতিহাসকে সুসম্বদ্ধ করে। সেখানেই তাদের ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন হয়। যে জাতিটা বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে গিয়েছিল আর যে জাতিটা সাইরাসের আদেশে জেরুজালেমে ফিরে এসেছিল, মনোবৃত্তি আর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের পার্থক্য ছিল অনেকটা। সভ্যতা কাকে বলে তারা তা শিখেছিল। প্রধানত কয়েকজন লোকের অনুপ্রেরণার ফলে এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছিল। তাঁরা হচ্ছেন এক নতুন ধরনের মানুষ, প্রফেট (Prophets)। এদের দিকে আমাদের এখন মন দিতে হবে। মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের মূলে এই প্রফেটরা এক নতুন এবং উল্লেখযোগ্য শক্তির আবির্ভাবের সূচনা করেছিলেন।

জুডিয়াতে পুরোহিত ও প্রফেটগণ

যে দুর্ঘটনা-পরম্পরা পরে সেমিটিক জাতিগুলোর ভাগ্যে ঘটেছে, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের পতন মাত্র তার প্রথমটা। খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে মনে হতে পারত যে হয়ত সেমিটিক শাসকেরাই সভ্য জগতের সবটাতে প্রভুত্ব করবে। তারা বিরাট আসিরীয় সাম্রাজ্য শাসন করছে আর মিশর জয় করেছে। আসিরিয়া, ব্যাবিলন, সিরিয়া—সবই সেমিটিক এবং তারা পরস্পরের বোধগম্য ভাষায় কথা বলে। দুনিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য সেমিটিকদের হাতে। ফিনিসীয় উপকূলের টায়ার, সিডন প্রভৃতি বিরাট নগরমাতা (Mother cities) স্পেনে, সিসিলিতে, আফ্রিকায় যে সব উপানবেশ স্থাপন করেছিল সেগুলো শেষে আয়তনে আরও বড় হয়ে উঠল। ৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দেরও আগে প্রতিষ্ঠিত কার্থেজ নগরের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ লক্ষেরও বেশি হয়ে দাঁড়াল। কিছুকাল ধরে এটাই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নগর। এর বাণিজ্যপোত বৃটেনে যেত এবং আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরেও পাড়ি দিত। হয়ত তারা ম্যাডিরা (Madeira) দ্বীপে পৌছেছিল। আমরা আগেই দেখেছি কীভাবে হিরাম সলোমনের সহযোগিতায় আরব দেশে এবং বোধহয় ভারতে বাণিজ্যের জন্য লোহিতসাগরে জাহাজ তৈরি করেছিলেন। ফারাও নেকোর আমলে এক ফিনিসীয় অভিযান জাহাজে করে সারা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করেছিল।

আর্যরা তখনও ছিল বর্বর। শুধু গ্রীকরা, যে সভ্যতা তারা ধ্বংস করেছে তারই ভগ্নাবশেষের ওপর এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলছে আর মধ্য-এশিয়ায় মীডজাতি 'দুর্ধর্ষ' হয়ে উঠছে বলে এক আসিরীয় শিলালিপিতে লেখা পাওয়া গেছে। ৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে কেউ এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত না যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর আগেই আর্যভাষাভাষী বিজেতারা সেমিটিক আধিপত্যের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলবে এবং সর্বত্রই সেমিটিক জাতি হয় পরাধীনতা স্বীকার করবে নয়তো একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। সর্বত্রই—শুধু এক উত্তর আরবের মরুভূমিগুলোয় ছাড়া। বেদুইনরা সেখানে যাযাবর জীবনধারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইল। সে জীবন ছিল প্রথম সারগন আর তাঁর আক্কাদীয় সেনাদল সুমেরিয়া জয় করতে নেমে আসার আগেকার সেমিটিক জাতির প্রাচীন জীবনধারা। কিন্তু আর্য প্রভুরা কখনও আরব বেদুইনকে জয় করতে পারে নি।

এই পাচটা ঘটনাবহুল শতাব্দীর মধ্যে যেসব সুসভ্য সেমিটিক জাতি হেরে গিয়ে চাপা পড়ে গেল তাদের মধ্যে শুধু একটাই ঐক্যবদ্ধ থেকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ছিল। তারা হচ্ছে এই ছোট ইহুদী জাতি, পারসীক সাইরাস

যাদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন তাদের জেরুজালেম শহরটা গড়ে তোলার জন্য। আর এটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, কেননা তারা ব্যাবিলনে তাদের এই সাহিত্য, তাদের বাইবেল সঙ্কলন করেছিল। ইহুদীরা বাইবেল তৈরি করেছে না বলে বাইবেল ইহুদীদের তৈরি করেছে বললেই ঠিক বলা হয়। এই বাইবেলের ভিতরে কতকগুলো অত্যন্ত উদ্দীপনাময় এবং সতেজ ধারণা ছিল যেগুলো তাদের আশেপাশের লোকেদের ধারণা থেকে ছিল আলাদা এবং যেগুলো আঁকড়ে ধরে পঁচিশ শতাব্দী ধরে কষ্ট, বিপদ এবং অত্যাচার সহ্য করা তাদের কপালে লেখা ছিল।

ইহুদীদের এই ধারণাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে তাদের ভগবান অদৃশ্য এবং সুদূর, হাতে-গড়া নয় এমন এক মন্দিরে অধিষ্ঠিত নয়নের অগোচর এক দেবতা, সমস্ত জগতের একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর (God of Righteousness)। আর সব জাতের দেবতাই ছিল মন্দিরবাসী বিগ্রহে প্রতিমূর্ত জাতীয় দেবতা। বিগ্রহ ভেঙে মন্দির ধূলিসাৎ করে দিলেই, কিছু-দিনের মধ্যে দেবতারও মৃত্যু ঘটত। কিন্তু এই ধারণাটা ছিল নতুন, ইহুদীদের এই দ্যুলোকনিবাসী ভগবান, যিনি পুরোহিতদের এবং বলিদানের অনেক ঊর্ধ্বে। আর ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে অ্যাব্রাহামের এই ভগবান তাদেরই তাঁর বিশেষ জাতি বলে বেছে নিয়েছেন, যাতে তারা জেরুজালেমকে আবার গড়ে তুলে পৃথিবীব্যাপী এক ধর্মরাজ্যের রাজধানী করতে পারে। তাদের সকলের নিয়তিই এক, এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ এক জাতি ছিল ইহুদীরা। এই বিশ্বাসে নিষিক্ত ছিল তাদের সবাইয়ের মন যখন ব্যাবিলনে বন্দীদশার পর তারা জেরুজালেমে ফিরে এল।

তাই, যখন এরা পরাজিত ও পরপদানত হল, তখন যে অনেক ব্যাবিলনীয়, সিরীয় প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালে অনেক ফিনিসীয়—যারা মোটের উপর প্রায় একই ভাবে কথা বলত এবং যাদের মধ্যে অসংখ্য রীতিনীতি, চালচলন, রুচি এবং ঐতিহ্যের মিল ছিল—তারা যে এই উৎসাহোদ্দীপক ধর্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হবে এবং এর সৌভ্রাত্রের ও আশার অংশীদার হতে চাইবে, এতে কি আশ্চর্যের কিছু আছে? টায়ার, সিডন, কার্থেজ এবং স্পেনে ফিনিসীয়দের যেসব নগর ছিল, তাদের পতনের পর ফিনিসীয়রা হঠাৎ ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আর ঠিক সেইরকম হঠাৎই আমরা দেখতে পাই যে শুধু জেরুজালেমেই নয়,—স্পেনে, আফ্রিকায়, মিশরে, আরবে, পুবদেশে, যেখানেই ফিনিসীয়রা পদার্পণ করেছিল, সেখানেই ইহুদীদের সমাজ গড়ে উঠেছিল। আর তারা সকলেই বাইবেল দিয়ে এবং বাইবেল মাঠের মধ্যে দিয়ে একসূত্রে গাঁথা। প্রথম থেকেই জেরুজালেম ছিল তাদের নামমাত্র রাজধানী, তাদের আসল নগর ছিল এই মহাগ্রন্থ।

ইতিহাসে এ এক নতুন ধরনের জিনিস। এর বীজ অনেকদিন আগেই বপন করা হয়েছিল যখন সুমেরীয় আর মিশরীয়রা তাদের হিয়েরোগ্লিফিকগুলোকে লেখায় পরিণত করতে শুরু করেছিল। এই ইহুদী জাতিটা ছিল এক নতুন ধরনের জাতি —সে জাতির কোন রাজা ছিল না, আর কিছুদিন পরেই কোন মন্দিরও ছিল না (কেননা আমরা পরে বলব যে ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেমই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল)। অথচ সে জাতটা এক হয়ে গিয়েছিল এবং নানা বিসদৃশ উপাদান সত্ত্বেও সংহত হয়ে উঠেছিল কেবলমাত্র লিখিত শব্দের শক্তিতে।

আর ইহুদীদের এই যে মানসিক একতা, এটা আগে থেকে বোঝা যায়নি কিংবা এর জন্য আগে থাকতে পরিকল্পনা করাও হয়নি। পুরোহিত বা রাজনীতিকরাও এটা করেনি। ইহুদী জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে শুধু নতুন ধরনের সমাজই নয়, নতুন ধরনের লোকও দেখা দিল। সলোমনের সময়ে হিব্রুদের দেখলে মনে হত যে সেই সময়কার অন্যান্য ছোট জাতিগুলোর মতই এরাও রাজদরবার আর দেবমন্দিরের আশেপাশে ভিড় জমায়, পুরোহিতের বুদ্ধিতে শাসিত হয় আর রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এর মধ্যেই, পাঠক বাইবেল থেকে জানতে পারেন, এই যে নতুন ধরনের মানুষের কথা আমরা বলছি, সেই 'প্রফেট'রা (Prophets) দেখা দিয়েছিল।

বিভক্ত হিব্রুজাতিকে ঘিরে যতই বিপদ ঘনাতে লাগল ততই এই প্রফেটদের গুরুত্ব বাড়তে লাগল।

কারা এই প্রফেট? তারা ছিল বিভিন্ন শ্রেণী থেকে উদ্ভূত মানুষ। প্রফেট এজেকিয়েল (Ezekiel) ছিলেন পুরোহিতশ্রেণীর লোক আর প্রফেট এমস (Emos) পরতেন মেষপালকদের ছাগচর্ম-নির্মিত আলখাল্লা। কিন্তু তাঁদের সকলেরই মধ্যে এই মিল ছিল যে তাঁরা একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়াতেন না আর তাঁরা সোজাসুজি জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁদের না ছিল কোন পরোয়ানা, না কোনরকম দীক্ষা। 'ভগবানের বাণী আমার কাছে এসেছে'—এই ছিল তাঁদের ধুয়া। তাঁরা খুব বেশি করে রাজনীতি করতেন। মিশরের বিরুদ্ধে কিংবা আসিরিয়া বা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে তাঁরা ইহুদীদের প্রণোদিত করতেন, পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অলসতা এবং রাজাদের গুরুতর পাপের নিন্দা করতেন। আমরা আজকাল যাকে 'সমাজ সংস্কার' বলি, তাঁদের কেউ-কেউ সেদিকেও মন দিয়েছিলেন। 'ধনীরা গরিবদের পিষে ফেলছে, বিলাসীরা শিশুদের অন্ন গ্রাস করছে, ধনী লোকেরা বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের আড়ম্বর আর পাপাচারের অনুকরণ করছে', এ সবই অ্যাব্রাহামের

ভগবান জিহোভার (Jehovah) নিকট ঘৃণ্য ; তিনি নিশ্চয় এ দেশকে শাস্তি দেবেন।

এই সব জ্বালাময়ী বাণী লিপিবদ্ধ করে সযত্নে রক্ষা করা হত, পাঠ করা হত। যেখানেই তাঁরা যেতেন সেইখানেই এই বাণী যেত, সেখানেই তাঁরা এক নতুন ধর্মচেতনার বিস্তার করতেন।

তাঁরা সাধারণ মানুষকে পুরোহিত আর মন্দির পার করে, রাজা আর রাজদরবার অতিক্রম করে, তাকে ধর্মরাজ্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। মানুষের ইতিহাসে এইখানেই তাঁদের চরম গুরুত্ব। আইজায়ার (Isaiah) মহান উক্তিসমূহে প্রফেটের কণ্ঠ অপূর্ব এক দূরদৃষ্টির স্তরে উঠেছে এবং তাতে একই ভগবানের অধীনে শান্তিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড পৃথিবীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ইহুদী ভবিষ্যদ্বাণীর এইটিই শেষ কথা।

সব প্রফেট এভাবে কথা বলতেন না। বুদ্ধিমান পাঠক এই প্রফেটদের বইতে অনেক বিদ্বেষ, অনেক অহেতুক আক্রোশ খুঁজে পাবেন, আরও অনেক জিনিস পাবেন যা তাঁকে সেই কদর্য বস্তুটির কথা স্মরণ করিতে দেবে—একালের প্রচার-সাহিত্য। তবু ব্যাবিলনে বন্দীদশা-কালীন সময় নাগাদ হিব্রু প্রফেটরাই জগতে এক নতুন শক্তির আবির্ভাবের সূচনা করেছিলেন। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে নৈতিক আবেদনের শক্তি। এতকাল ধরে যে-সব ফেটিশ, বলিদান এবং দাসসুলভ শ্রদ্ধার শিকল আমাদের জাতিকে বেঁধে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে মানব-জাতির স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির কাছে এই আবেদন।

গ্রীক জাতি

ওদিকে যখন সলোমনের পর (যাঁর রাজত্ব ছিল সম্ভবত ৯৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ) ইস্রায়েল এবং জুডিয়ার বিভক্ত রাজ্যদুটো ধ্বংস আর নির্বাসনের সম্মুখীন হয়েছিল আর যখন ইহুদী জাতি ব্যাবিলনে বন্দীদশার মধ্যেই তাদের ঐতিহ্য গড়ে তুলছিল, তখন মানুষের মনের উপর আর-একটা বিরাট প্রভাব—গ্রীক ঐতিহ্যের অভ্যুদয় হচ্ছিল। হিব্রু প্রফেটরা যখন চিরন্তন সার্বভৌম এক ন্যায়বান ভগবান এবং মানুষের মধ্যে সরাসরি নৈতিক দায়িত্বের এক নতুন বোধ জাগিয়ে তুলছিলেন, গ্রীক দার্শনিকরা তখন মানুষের মনকে মানসলোকে অভিযানের এক নতুন পন্থা এবং চেতনার তালিম দিচ্ছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি যে গ্রীক উপজাতিগুলো আর্য-ভাষাভাষী মূল কাণ্ডের একটা শাখা। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কয়েক শতাব্দী আগেই তারা ঈজীয় নগর

এবং দ্বীপগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ে। ফারাও থথমিস যখন বিজিত ইউফ্রেটিসের পরপারে হাতী শিকার করতেন তার আগেই বোধহয় তাদের দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঐ সময়ে মেসোপটেমিয়াতে হাতী এবং গ্রীসে সিংহ ছিল।

সম্ভবত গ্রীকদেরই এক আক্রমণের ফলে নসস পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন গ্রীক কিংবদন্তীতে এ বিজয়কাহিনী পাওয়া যায় না, যদিও মিনোস, তাঁর রাজপ্রাসাদ (ল্যাবিরিন্থ) এবং ক্রীটদেশীয় কারুশিল্পীদের নিপুণতার কাহিনী পাওয়া যায়। অধিকাংশ আর্যদের মত গ্রীকদের মধ্যেও গায়ক ও আবৃত্তিকার ছিল যাদের অনুষ্ঠানগুলো ছিল প্রয়োজনীয় সামাজিক বন্ধন। ওদের বর্বর আদিযুগ থেকে দুটো মহাকাব্য ওরা বয়ে নিয়ে এসেছিল—একটা হচ্ছে ইলিয়াড, যাতে বলা হয়েছে কীভাবে গ্রীক উপজাতিদের একটা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এশিয়া-মাইনরের ট্রয় নগর অবরোধ জয় এবং ধ্বংস করেছিল;—আর অপরটা হচ্ছে অডিসি, যাতে বিজ্ঞ সেনানায়ক অডিসিয়ুসের ট্রয় থেকে নিজের দেশে ফিরে আসার এক দীর্ঘ রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম কি সপ্তম শতাব্দীতে এগুলো লিপিবদ্ধ হয় যখন গ্রীকেরা তাদের সভ্যতর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বর্ণমালার ব্যবহার শেখে; যদিও অনুমান করা হয় যে আরও অনেক প্রাচীনকালেও এদের অস্তিত্ব ছিল। আগে এগুলো হোমার বলে এক বিশেষ অন্ধ চারণ কবির রচনা বলে চলে আসছিল। লোকে মনে করত মিলটন যেমন করে প্যারাডাইস লস্ট রচনা করেছিলেন তেমনি তিনিও বসে বসে এই কাব্য-দুখানা রচনা করেছিলেন। এরকম কোন কবি সত্যি-সত্যি ছিলেন কি না এবং তিনি এগুলো রচনা করেছিলেন, না শুধু লিপিবদ্ধ এবং মার্জিত করেছিলেন, এসব কথা পণ্ডিতদের প্রিয় তর্কস্থল। এখানে আমাদের সেসব খিটিমিটি নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের দিক থেকে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই গ্রীকরা তাদের মহাকাব্যদুটো পেয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এই বই-দুখানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা যোগসূত্র এবং সর্বজনীন সম্পদ ও এটা তাদের মধ্যে বাইরের বর্বরদের বিরুদ্ধে এক সৌভ্রাত্রবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। ওদের কথ্য ভাষা এবং পরবর্তীকালে লেখ্য ভাষা এক ছিল এবং আচারগত ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক একই আদর্শে ওরা অনুপ্রাণিত হত।

মহাকাব্যগুলো থেকে দেখা যায় যে গ্রীকেরা ছিল এক বর্বর জাতি; তারা লোহার ব্যবহার জানত না, লিখতে পারত না এবং তখনও পর্যন্ত নগরে বাস করত না। তারা সম্ভবত থাকত এমন গ্রামে যেখানকার কুঁড়েঘর গুলো বেড়া

দিয়ে ঘেরা নয়, তাদের সর্দারদের হলের (Hall) চারপাশে ছড়ানো কতকগুলো কুঁড়েঘরের সমষ্টিমাত্র। ঈজীয়দের যেসব নগর তারা ধ্বংস করেছিল তাদেরই ধ্বংসাবশেষের বাইরে এগুলো অবস্থিত ছিল। তারপর তারা দেয়াল দিয়ে তাদের নগরগুলো ঘিরতে লাগল আর বিজিত জাতিদের কাছ থেকে মন্দির তৈরি শিখল। শোনা যায় যে আদিম সভ্য মানুষদের নগরগুলো কোন-না-কোন উপজাতীয় দেবতার বেদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এবং প্রাচীরটা তাতে পরে যোগ করা হয়; গ্রীক নগরগুলোতে কিন্তু প্রাচীর.তৈরি হয় মন্দিরের আগে। তারা বাণিজ্য করতে এবং বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। পূর্বগামী ঈজীয় নগর এবং সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্মৃতচেতন একসার নতুন শহর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই গ্রীসের দ্বীপে উপত্যকায় গড়ে উঠল। এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থীবস, স্যামোস, মিলেটাস, এগুলো ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। এর মধ্যেই কৃষ্ণসাগরের তীরে এবং ইটালিতে আর সিসিলিতে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। ইটালির গোড়ালি আর বুড়ো-আঙুলের মত জায়গাটাকে বলা হত বিশাল গ্রীস (Magna Græcia); মার্সাই (Marseilles) ছিল এক গ্রীক নগর, প্রাচীনতর ফিনিসীয় উপনিবেশের জায়গায় তার প্রতিষ্ঠা হয়।

যেসব দেশ বিরাট একটা সমতলভূমি, কিংবা যেখানে যাতায়াতের প্রধান উপায় হল নীল বা ইউফ্রেটিসের মত কোন বড় নদী, সেগুলোর এক শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবার দিকে ঝোঁক থাকে, মিশরের কিংবা সুমেরিয়ার শহরগুলি যেমন এক শাসন-প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রীকরা বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ ও পাহাড়ী উপত্যকায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল; গ্রীস এবং বিশাল গ্রীস দুটিই অত্যন্ত পর্বতবহুল; এবং সেখানে এই ঝোঁক অন্য পথে চালিত হয়েছিল। ইতিহাসে গ্রীকদের প্রথম পদক্ষেপের সময় তারা অসংখ্য ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনরকম সম্ভাবনাই তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। এমন কি তাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যও ছিল। কোন কোন রাজ্যে ছিল আয়োনিক, এয়োলিয়ান অথবা ডোরিক উপজাতির মধ্যে কোন এক উপজাতীয় অধিবাসী; কোন কোন রাজ্যে ছিল গ্রীক ও প্রাক-গ্রীক ভূমধ্যসাগরীয় জাতির বংশধরদের মিশ্রণ আবার কয়েক রাজ্যে ছিল অমিশ্রিত স্বাধীন গ্রীক অধিবাসী— যাঁরা স্পার্টার 'হেলট'দের মত বিজিত অধিবাসীদের দাসবদ্ধ করে নবাবী করত। কয়েক রাজ্যে প্রাচীন নেতৃস্থানীয় আর্যবংশীয়েরা এক কুলীন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল; আবার কয়েক রাজ্যে সমস্ত আর্য অধিবাসীদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; কোথাও বা নির্বাচিত এমন কি জবরদখলকারী বা অত্যাচারী রাজা ছিল।

যে ভৌগোলিক পরিস্থিতি গ্রীক রাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নরূপী করে রেখেছিল, তা তাদের বড় হতেও দেয় নি। সবচেয়ে বড় রাজ্যগুলি ইংলণ্ডের অনেক কাউন্টির চেয়ে ছোট ছিল, এবং তাদের কোন নগরীর জন-সংখ্যা দশ লক্ষের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল কি না সন্দেহ। খুব কমসংখ্যক নগরীর জনসংখ্যা এমন কি ৫০,০০০ ও ছিল না। আদর্শ ও সহানুভূতির একতা সত্বেও সংযুক্ত হওয়ার কোনরকম ইচ্ছা তাদের ছিল না। বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরীগুলি নিজেদের মধ্যে দল ও মৈত্রী গঠন করত, এবং ছোট ছোট নগরী বড় বড় নগরীর রক্ষণাবেক্ষণে আসত। তবুও সমস্ত গ্রীস মাত্র দুটি জিনিসের জন্য এক সমাজগত অনুভূতি ও সৌহার্দে আবদ্ধ থাকত : তাদের মহাকাব্য, ও প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিয়ায় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার প্রথা। এর জন্য যুদ্ধ বা মারামারি বন্ধ ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের বর্বরতা অনেকখানি কমে গেছিল এবং এক সাময়িক সন্ধি-চুক্তি বলে এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যাতায়াত-রত প্রত্যেকটি লোক আক্রমণ থেকে রক্ষিত হত। যতই দিন যেতে লাগল ততই এক ঐতিহ্যের সংস্কার নিজেদের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল, এবং এই অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের রাজ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল ; শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় এল যখন শুধু যে গ্রীকরাই যোগ দিত তা নয়, উত্তরের এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়ার রাজ্যগুলি থেকেও প্রতিযোগীদের গ্রহণ করা হত।

গ্রীক নগরীগুলির বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তৃত হতে লাগল, এবং খৃষ্টপূর্ব সপ্তম ও পঞ্চম শতাব্দীতে তাদের সভ্যতার মান বাড়তে থাকল। ঈজীয় ও নদী-উপত্যকা সভ্যতার যুগের থেকে তাদের সামাজিক জীবন অনেক দিক দিয়ে পৃথক ছিল। তাদের চমৎকার মন্দির ছিল, কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর মত পৌরোহিত্যই সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যময়, সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, কিংবা সমস্ত আদর্শের উৎস ছিল না। তাদের মধ্যেও নেতা এবং সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল, কিন্তু আড়ম্বরময় রাজসভা-বিশিষ্ট দৈব-ক্ষমতাময় সম্রাট ছিল না। বরং তাদের নেতৃস্থানীয় পরিবারবর্গ নিয়ে এক সংগঠন ছিল এবং তারা পরস্পরকে সংযত রাখত। এমন কি তাদের 'গণতন্ত্র'ও ছিল সম্ভ্রান্ত। প্রত্যেকেই জনসমাজের কাজে অংশ গ্রহণ করত, প্রত্যেকেই গণতান্ত্রিক মতে সভায় আসত। কিন্তু প্রত্যেকেই নাগরিক ছিল না। আমাদের আধুনিক গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই মতাধিকার প্রদানের ক্ষমতার মত গ্রীক গণতন্ত্র ছিল না। অনেক গ্রীক গণতন্ত্রে ছিল মাত্র কয়েক শত বা কয়েক সহস্র নাগরিক, কিন্তু জনসাধারণের কাজে অংশগ্রহণে হাজার হাজার দাস, দাসত্বমুক্ত লোক প্রভৃতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে গ্রীসের সমস্ত ব্যাপার সমৃদ্ধ এক গোষ্ঠী ব্যক্তিবর্গের হাতেই

ছিল। তাদের রাজা কিংবা স্বেচ্ছাচারীকে হয় অন্য লোকদের উপরে তুলে দেওয়া হয়েছে, কিংবা তাঁরা ক্ষমতাবলে নেতৃত্ব অধিকার করেছেন; কারাও, মিনোস বা মেসোপটেমিয়ার সম্রাটদের মত তাঁদের প্রায় দেবতার তুল্য বলে মনে করা হত না। প্রাচীন কোন সভ্যতায় যা ছিল না, গ্রীক সভ্যতায় সেই চিন্তা ও শাসনের একরকম স্বাধীনতা ছিল। গ্রীকরা তাদের নগরীতে ব্যক্তিত্ব এনেছিল, উত্তর দেশের যাযাবর জীবনে ব্যক্তিগত অগ্রগতি এনেছিল। ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য প্রথম গণতন্ত্রী তারাই ছিল।

বর্বর যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের পর তাদের চিন্তাজগতে এক নতুন ব্যাপার দেখা যায়। যাঁরা পুরোহিত নন, তাঁদের জ্ঞানপিপাসা ও তা লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়: মানব-জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে তাঁদের ব্রতী দেখতে পাই, যা এতকাল শুধু মাত্র পুরোহিতদের অধিকার কিংবা রাজাদের চিত্ত-বিনোদনের মাত্র ব্যাপার ছিল। হয়ত যখন আইজায়া তখনও ব্যাবিলনে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন, সেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেটাসের থেলস ও আনাক্সি-মাণ্ডার এবং এফেসাসের হেরাক্লিটাসের মত স্বাধীন-চেতা ব্যক্তিরা, যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবীর সম্বন্ধে কঠিন প্রশ্নের সমাধানে মনোনিবেশ করতেন—কী তার প্রকৃত প্রকৃতি, কোথা থেকে এসেছে, কী তার ভবিষ্যৎ—এইসব প্রশ্ন করতেন এবং তাঁদের পূর্বজ্ঞাত কিংবা ফাঁকি-দেওয়া উত্তর বাতিল করতেন। সৌরজগৎ সম্বন্ধে গ্রীকদের এই অনুসন্ধান সম্বন্ধে একটু পরে আমরা এই ইতিহাসে আরো কিছু বলব। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য এই গ্রীক অনুসন্ধিৎসুগণই পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক, প্রথম 'জ্ঞান-প্রেমিক' ছিলেন।

মানুষের ইতিহাসে এই খৃঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী যে কী পরিমাণ প্রাধান্য লাভ করেছে তা এখানে উল্লেখনীয়। কারণ, শুধু যে এই গ্রীক দার্শনিকেরাই এই সৌরজগতের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং মানুষের তাতে অংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন ও আইজায়া ইহুদী সভ্যতাকে সুন্দরতম শীর্ষে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা-ই নয়, ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ ও চীনে কনফুসিয়াস আর লাওৎসে তাঁদের মতবাদ প্রচার করছিলেন—একথা আমরা পরে বিবৃত করব। এথেন্স থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত মানুষের মনে সাড়া জেগে উঠেছিল।

গ্রীক ও পারসীকদের যুদ্ধ

যখন গ্রীস, ইটালি ও এশিয়া মাইনরে গ্রীকরা স্বাধীনভাবে জ্ঞান-অনুসন্ধানে রত এবং হিব্রুদের শেষ প্রফেটরা ব্যাবিলন ও জেরুজালেমে সমগ্র মানবজাতির

বিবেকের মুক্তিসাধনায় ব্যাপৃত, তখন মীড ও পারসীক নামে দুই দুঃসাহসী আর্য জাতি প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতা অধিকার করে বিরাট পারস্ত সাম্রাজ্য সৃষ্টি করছিল। এই পারস্ত সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত পৃথিবীর যে-কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বড় ছিল। সাইরাসের অধীনে ব্যাবিলন ও লিডিয়ার ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন সভ্যতা পারস্ত সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়েছিল; লেভান্টের ফিনিসীয় নগরগুলি ও এশিয়া মাইনরের সমস্ত গ্রীক নগরীগুলি করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, ক্যাম্বাইসিস মিশর অধিকার করেছিলেন এবং তৃতীয় পারস্ত-সম্রাট মীড-বংশীয় প্রথম দারিয়ুস (খৃঃ পূঃ ৫২১) প্রায় সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর দূতদের তাঁর আদেশ-পত্র নিয়ে দার্দানেলস থেকে সিন্ধু এবং উত্তর মিশর থেকে মধ্য-এসিয়া পর্যন্ত গতায়াত ছিল।

এ কথা সত্য যে ইউরোপের গ্রীকরা, ইটালি, কার্থেজ, সিসিলি এবং স্পেনীয় ফিনিশিয়ান উপনিবেশগুলি পারস্ত-শাসনাধীনে ছিল না; কিন্তু তারা এই সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করত। একমাত্র যারা তাদের সত্যকার উত্যক্ত করত, তারা হল দক্ষিণ রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার আদি জাতি নর্দিক জাতির শকরা—তারা সাম্রাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করত।

অবশ্য এই বিরাট পারস্ত সাম্রাজ্যের জনসাধারণের সকলেই পারসীক ছিল না। তারা এই বিরাট সাম্রাজ্যের অল্পসংখ্যক বিজয়ী বীর ছিল। জনসাধারণের অবশিষ্টাংশ, স্মরণাতীত যুগ থেকে পারসীকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যারা ছিল, তখনও তারাই ছিল। শুধু রাজ-ভাষা তখন পারসীক হয়েছিল। বাণিজ্য ও সম্পদ তখনও সেমিটিকদের হাতে, প্রাচীন যুগের মতই টায়ার ও সিডন ভূমধ্যসাগরের প্রধান বন্দর ছিল, এবং সেমিটিকদের জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিত। কিন্তু দেশবিদেশে গিয়ে এই সেমিটিক বণিক ও ব্যবসায়ীরা হিব্রু ঐতিহ্য ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে তাদের নিজেদের পছন্দ-মত ও সহানুভূতিপূর্ণ এক ইতিহাস দেখতে পেত। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রীক উপাদান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমুদ্রে গ্রীকরা সেমিটিকদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের বলিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির ফলে তারা পক্ষপাতহীন সুযোগ্য কর্মচারী হিসেবে সুনাম অর্জন করছিল।

শকদের জন্যই প্রথম দারিয়ুস ইউরোপ আক্রমণ করেন। শক অশ্বারোহীদের বাসভূমি দক্ষিণ রাশিয়ায় যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল। তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বসফোরাস অতিক্রম করে বুলগারিয়ার ভিতর দিয়ে দানিয়ুব নদীর তীরে উপস্থিত হলেন এবং নৌকোর পুল তৈরি করে এই নদী পার হয়ে আরো উত্তরমুখে অভিযান চালালেন। তাঁর ছিল প্রধানত পদাতিক বাহিনী, এবং শক

অশ্বারোহীরা তাঁর সৈন্যবাহিনীর চতুর্দিক ঘিরে ফেলে তাঁর রসদ বন্ধ করে দিল, দলভ্রষ্ট সৈন্যদের হত্যা করল এবং একবারও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামল না। অত্যন্ত অগৌরবের মধ্য দিয়ে দারিয়ুস পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

তিনি নিজে সুসায় প্রত্যাবর্তন করলেন বটে, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর একাংশ রেখে এলেন থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ায় এবং ম্যাসিডোনিয়া দারিয়ুসের কাছে নতি স্বীকার করল। এই ব্যর্থতার পরেই এশিয়ার গ্রীক নগরীগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবং এই সংঘর্ষে ইউরোপীয় গ্রীকরাও এসে যোগ দেয়। ইউরোপীয় গ্রীকদের পদানত করতে দারিয়ুস কৃতসঙ্কল্প হলেন। ফিনিসীয় নৌবাহিনী তাঁর আয়ত্তে থাকায় তিনি একটির পর একটি দ্বীপ অধিকার করতে লাগলেন, এবং অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে তিনি এথেন্স আক্রমণ করলেন। অসংখ্য রণতরী এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি থেকে যাত্রা করে এথেন্সের উত্তরে ম্যারাথনে সৈন্য অবতরণ করাল। এথেনিয়ানদের সঙ্গে সেখানে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

এ সময়ে এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটে। গ্রীসে এথেন্সের চরমতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্পার্টা। স্পার্টার গ্রীকরা যাতে বর্বরদের দাস না হয়, এই অনুনয় করে এখন এই স্পার্টার কাছেই এথেন্স আবেদন জানাতে এক দ্রুত দৌড়বীর দূত পাঠাল। এই দৌড়বীর (সমস্ত 'ম্যারাথন' দৌড়বীরের মূল) দু-দিনের কমেই পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে একশো মাইলের বেশি অতিক্রম করে। স্পার্টানরা সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উদারভাবে এই আবেদনে সাড়া দেয় ; কিন্তু যখন তিন দিন পরে স্পার্টান সৈন্য এথেন্সে এসে পৌছল তখন যুদ্ধক্ষেত্র ভরে পারসীক সৈন্যদের মৃতদেহ ; যুদ্ধ শেষ হয়েছে। পারসীক নৌবাহিনী এশিয়ায় ফিরে গেছিল। পারসীকদের প্রথম গ্রীস অভিযান এইভাবে শেষ হয়।

এর পরেরটি ছিল আরো অনেক চিত্তাকর্ষক। ম্যারাথনে তাঁর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছনর পরেই দারিয়ুস মারা যান, এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জেরেক্সেস গ্রীকদের ধ্বংস করার জন্য চার বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেন। ভয় কিছুদিন সমস্ত গ্রীককে ঐক্যবদ্ধ করে। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বিরাট সৈন্যবাহিনী দেখা গেছে, জেরেক্সের সৈন্যবাহিনী তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিরাট ছিল। ভিন্ন মতে বিভক্ত সে এক বিরাট সৈন্যদল ছিল। নৌকোর পুল দিয়ে খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে এই বাহিনী দার্দানেলস অতিক্রম করে এবং তাদের উপকূল ধরে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট নৌবাহিনী রসদ-সম্ভার নিয়ে চলে। থার্মোপাইলির সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটে স্পার্টান সেনাধ্যক্ষ লিওনিডাসের অধীনে মাত্র

ি,৪০০ লোকের এক ছোট বাহিনী এই বিরাট বাহিনীকে প্রতিহত করে এবং যেরূপ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে একেবারে বিধ্বস্ত হয় তার তুলনা নেই। প্রত্যেকটি লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু পারসীকদের তারা প্রচুর ক্ষতি করে গেছিল, এবং জেরেক্সেসের বাহিনী থীবস ও এথেন্সে প্রচুর শিক্ষালাভ করে উপস্থিত হল। থীবস* আত্মসমর্পণ করে সন্ধি করল। এথেনিয়ানরা তাদের নগরী ত্যাগ করে পালায় এবং এথেন্স ভস্মীভূত হয়।

গ্রীস বিজয়ীদের করায়ত্ত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত আশা ও সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই আবার তারা বিজয় লাভ করল। পারসীক নৌবাহিনীর একতৃতীয়াংশেরও কম শক্তিশালী এক গ্রীক নৌবাহিনী সালামিসের উপসাগরে পারসীকদের নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। জেরেক্সেস তাঁর সমস্ত বাহিনী-সহ রসদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং তিনি সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেললেন। তিনি তাঁর অর্ধেক বাহিনী নিয়ে এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর পরিত্যক্ত বাহিনী প্লাটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হল (৪৭৯ খৃঃ পূঃ)। এই সময়েই পারসীক নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশকে তাড়া করে গ্রীকরা এশিয়া মাইনরের মাইকেলে ধ্বংস করে।

পারস্যের কাছ থেকে আর বিপদের ভয় রইল না। এশিয়ার অধিকাংশ গ্রীক নগরী স্বাধীন হল। এই সব কাহিনী অনেক বিশদভাবে এবং অনেক বিচিত্রতায় পৃথিবীর প্রথম লিখিত ইতিহাস, হেরোডোটাসের ইতিহাসে (History of Herodotus) লেখা আছে। এশিয়া মাইনরের আয়োনীয়দের হালিকার্নাসাস নগরীতে ৪৮৪ খৃঃপূঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন এবং সঠিক ঘটনা অনুসন্ধানে তিনি ব্যাবিলন ও মিশরে যান। মাইকেল থেকে আরম্ভ করে পারস্যের সর্বত্রই রাজবংশীয় দলাদলি দেখা দিল। জেরেক্সেস ৪৬৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে নিহত হলেন এবং মিশর, সিরিয়া ও মিডিয়ার বিদ্রোহ এই বিরাট সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট করে দিল। হেরোডোটাসের ইতিহাস পারস্যের দুর্বলতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই ইতিহাস বাস্তবিক পক্ষে এ-যুগের প্রচারকার্যের মত—সমস্ত গ্রীসকে একত্রিত করে পারস্য অধিকার করার জন্য প্রচার। অ্যারিস্টোগোরাস নামে একটি চরিত্রকে হেরোডোটাস তখনকার জানা পৃথিবীর এক মানচিত্র নিয়ে স্পার্টানদের কাছে এনে বলিয়েছেন :

*একটি গ্রীক নগরী ; এই নামেরই মিশরের এক প্রধান নগরীর সঙ্গে ভুল যেন না হয়।

'এই বর্বররা সাহসী যোদ্ধা নয়। · সোনা, রুপো, পেতল, সূচীকার্যময় পোশাক, জন্তু-জানোয়ার, দাস—তাদের যা আছে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির তা নেই। **তোমাদের ইচ্ছা হলে এ সমস্তই তোমরা পেতে পার।'**

গ্রীসের সমৃদ্ধি

পারস্যের পরাজয়ের পরের দেড় শতাব্দীতে গ্রীক সভ্যতা শ্রী ও সমৃদ্ধির চরম শীর্ষে ওঠে। গ্রীসে এথেন্স, স্পার্টা এবং অন্যান্য রাজ্য প্রাধান্যের জন্য দুরন্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল (পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ, ৪৩১-৪০৪ খৃঃ পূঃ) এবং খৃষ্টপূর্ব ৩৩৮ সালে ম্যাসিডোনিয়া কার্যত গ্রীসের অধীশ্বর হয়েছিল—একথা অত্যন্ত সত্য : তবুও এই যুগেই গ্রীকজাতির চিন্তাধারা, সৃজনীশক্তি ও শিল্পকৃতির মান এত উঁচুতে ওঠে যে ইতিহাসের পরবর্তী যুগের সমস্ত মানুষের কাছে তাদের কৃতিত্ব দীপশিখার মত প্রতিভাত হয়ে এসেছে।

এই বুদ্ধিবৃত্তির দিন হৃদয় ও মস্তিষ্ক ছিল এথেন্স। ত্রিশ বছরেরও বেশি (৪৬৬ থেকে ৪১৮ খৃঃ পূঃ) পেরিক্লিস নামে এক অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও উদার-হৃদয় ব্যক্তি এথেন্সের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন এবং পারসীকদের দ্বারা ভস্মীভূত নগরীকে আবার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। আজও যে ধ্বংসাবশেষ এথেন্সকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে, তা এই বিরাট প্রচেষ্টারই চিহ্ন। তিনি এথেন্সকে শুধু বস্তুতান্ত্রিক পুনর্গঠন করেন নি, তিনি বুদ্ধি-জগতেও এথেন্সকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি শুধু স্থপতি বা ভাস্কর আনেন নি, সঙ্গে সঙ্গে এনেছিলেন কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক। হেরোডোটাস তাঁর ইতিহাস শোনাতে এথেন্সে এসেছিলেন (খৃঃ পূঃ ৩৩৮)। সূর্য ও নক্ষত্রের প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ভাষ্য নিয়ে অ্যানাক্সাগোরাস এসেছিলেন। ঈস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিস একের পর এক গ্রীক নাটককে সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের চরমতম উৎকর্ষে নিয়ে গেছিলেন।

এথেন্সের মানসিক জীবনে পেরিক্লিস যে আবেগের সঞ্চার করেছিলেন সেটা তাঁর মৃত্যুর পরেও স্থায়ী হয়েছিল, যদিও গ্রীসের শান্তি তখন পেলোপ-নেসিয়ান যুদ্ধে ব্যাহত হয়েছিল এবং প্রাধান্যলাভের জন্য এক ক্ষতিকর যুদ্ধ শুরু হচ্ছিল। সত্য কথা বলতে কি, রাজনৈতিক দিগন্তের এই অন্ধকার যেন কিছু সময়ের জন্য মানুষের মনকে নিরুৎসাহ করবার বদলে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

এর মধ্যেই, পেরিক্লিসের যুগের অনেক আগেই, গ্রীক প্রতিষ্ঠানগুলোর অদ্ভুত স্বাধীনতা আলোচনার দক্ষতার উপর খুব বেশি মূল্য আরোপ করেছিল।

চূড়ান্ত মত দেবার ক্ষমতা রাজার হাতেও ছিল না পুরোহিতের হাতেও ছিল না, ছিল নেতৃস্থানীয় মানুষ অথবা সাধারণ জনসমষ্টির হাতে। কাজেই সুন্দরভাবে বলার ক্ষমতা এবং তর্ক করার দক্ষতা ছিল অত্যন্ত কাম্য গুণ এবং সোফিস্ট (Sophists) বলে এক শ্রেণীর শিক্ষকের আবির্ভাব হল যাঁরা যুবকদের এই বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার ভার নিলেন। কিন্তু বস্তু ছাড়া যুক্তি দেখানো যায় না, কাজেই বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে এল জ্ঞান। এই সোফিস্টদের কর্মপ্রচেষ্টা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভঙ্গিমার (style), বিস্তারপ্রণালীর এবং সারবত্তার সূক্ষ্ম বিচার শুরু হল। পেরিক্লিস যখন মারা যান, তখন এক সক্রেটিস কু-যুক্তির একজন দক্ষ এবং বিধ্বংসী সমালোচক বলে খ্যাতিলাভ করছেন—এবং সোফিস্টদের বেশির ভাগ শিক্ষাই ছিল কু-যুক্তি। সক্রেটিসের চারিধারে একদল তীক্ষ্ণধী যুবক জড় হল। শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসকে জনসাধারণের মনে আলোড়ন জাগাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল (৩৯৯ খৃঃ পূঃ)। এথেন্সের সম্মানজনক প্রথা অনুসারে তাঁকে নিজের বাড়িতে বন্ধুপরিবেষ্টিত হয়ে হেমলক থেকে প্রস্তুত একটা বিষাক্ত পানীয় খেতে হল। কিন্তু তাঁর এই দণ্ডের পরেও জনসাধারণের মানসিক আলোড়ন বন্ধ হল না। তাঁর যুবক শিষ্যেরা তাঁর শিক্ষা চালাতে থাকলেন।

এই যুবকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্লেটো (৪২৭ থেকে ৩৪৭ খৃঃ পূঃ), যিনি কিছুদিনের মধ্যেই আকাদেমির উপবনে দর্শন শেখাতে শুরু করলেন। তাঁর শিক্ষাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—মানুষের চিন্তার ভিত্তি এবং প্রণালীসমূহের পরীক্ষা, আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরীক্ষা। তিনিই প্রথম লোক যিনি ইউটোপিয়া লিখেছিলেন, অর্থাৎ এমন একটা সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন যা তখনকার যে-সব সমাজ ছিল তাদের সকলের থেকে আলাদা এবং ভাল। মানুষের মনের পক্ষে এ এক একেবারে অভূতপূর্ব সাহসিকতা,—যে মানুষের মন এতদিন সামাজিক ঐতিহ্য এবং অভ্যাসগুলোকে বলতে গেলে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করত। প্লেটো সোজাসুজি মানবজাতিকে বললেন : যে-সমস্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক দোষত্রুটি থেকে তোমরা কষ্ট পাও তার বেশির ভাগই তোমাদের হাতে ; শুধু যদি সেগুলো বদলাবার ইচ্ছা এবং সাহস তোমাদের থাকে। তোমরা এর চেয়ে অন্য এক সুনিশ্চিত ধরনের জীবন যাপন করতে পার, যদি তোমরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করে এর সংশোধনের চেষ্টা কর। তোমরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে নিজেরাই অচেতন। এটা এক অত্যন্ত দুঃসাহসিক শিক্ষা যা আমাদের জাতির সাধারণ লোকের অন্তরে এখনও প্রবেশ করে নি। তাঁর সবচেয়ে গোড়ার দিকের বইয়ের মধ্যে একটা হল 'রিপাবলিক', যেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের (Communist

Aristocracy) স্বপ্ন। তাঁর শেষ অসম্পূর্ণ বই হচ্ছে 'আইন' (Laws) ; এ-ধরনের আরেকটা অবাস্তব রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

চিন্তার এবং শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা প্লেটোর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল চালাতে থাকেন। তিনি লাইসিয়ামে (Lyceum) পড়াতেন। অ্যারিস্টটল ম্যাসিডোনিয়ার স্টাজিরা নগর থেকে এসেছিলেন, সেখানে তাঁর বাবা ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার রাজ-চিকিৎসক। কিছুদিন অ্যারিস্টটল রাজার ছেলে অ্যালেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন। এই অ্যালেকজাণ্ডার পরে খুব বড় বড় কাজ করবেন ; যে-সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই বলব। চিন্তাপ্রণালীর উপর অ্যারিস্টটলের কাজ ন্যায়শাস্ত্রকে (Science of Logic) যে স্তরে তুলেছিল, সেখানেই সেটা প্রায় পনেরো শো বছর কি তারও বেশিদিন ছিল, যতদিন না মধ্যযুগীয় শিক্ষকেরা আবার সেই প্রাচীন প্রশ্নগুলো তুললেন। তিনি কোন ইউটোপিয়া তৈরি করেন নি। প্লেটোর শিক্ষামত মানুষ নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার আগে, অ্যারিস্টটল দেখলেন যে তার যা আছে তার থেকে অনেক বেশি জ্ঞান, অনেক বেশি অভ্রান্ত জ্ঞানের দরকার। কাজেই অ্যারিস্টটল সেই প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চয় শুরু করলেন যাকে আমরা আজকাল বিজ্ঞান বলি। তিনি অনুসন্ধানকারীদের পাঠালেন তথ্য (facts) সংগ্রহ করবার জন্য। তিনি ছিলেন রাজনীতি-বিজ্ঞানের স্থাপয়িতা। তাঁর লাইসিয়ামের ছাত্ররা ১৫৮টি বিভিন্ন রাজ্যের শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করেছিল।...

এই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আমরা এমন লোকদের দেখা পাই যাঁরা বলতে গেলে আধুনিক ধরনে চিন্তা করেন। আদিম চিন্তার শিশুসুলভ স্বপ্নময় প্রণালীর বদলে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং জীবনের সমস্যার সমালোচনামূলক অভিযান দেখা দিয়েছে। অদ্ভুত এবং বীভৎস সমস্ত বিশ্লেষণ এবং দেবদানবগণের সমস্ত কল্পনা, সব রকম বিধিনিষেধ, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় আর বাধা যা এতদিন চিন্তাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, সব একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল। স্বাধীন, চুলচেরা, প্রণালীবদ্ধ চিন্তা শুরু হয়েছে। উত্তরের অরণ্য থেকে বহিরাগত এই সব নবীন আগন্তুকদের সতেজ বন্ধনহীন মন মন্দিরের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে দিনের আলো প্রবেশের পথ করে দিয়েছে।

অ্যালেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য

৪৩১ থেকে ৪০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পেলোপনেসীয় যুদ্ধ গ্রীসকে ক্ষয় করেছিল। এর মধ্যে গ্রীসের উত্তরে, একই ধরনের দেশ ম্যাসিডোনিয়া ক্রমশ শক্তি ও সভ্যতায়

উন্নত হয়ে উঠছিল। ম্যাসিডোনিয়ার লোক যে-ভাষায় কথা বলত সেটা ছিল গ্রীকের খুব কাছাকাছি এবং ম্যাসিডোনিয়ার প্রতিযোগীরা অনেকবার অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ৩৫৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে বহু গুণ এবং উচ্চাশার অধিকারী এক ব্যক্তি এই ছোট দেশটার রাজা হলেন—তাঁর নাম ফিলিপ। ফিলিপকে আগে গ্রীসে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা পুরোপুরি গ্রীক ধরনে হয়েছিল এবং হেরোডোটাসের যে ধারণাটা ছিল, সেটা দার্শনিক আইসোক্রেটিসও (Isocrates) বড় করে তুলেছিলেন—ঐক্যবদ্ধ গ্রীসের দ্বারা যে বিজয় সম্ভব, এ-কথা হয়ত তিনি জানতেন।

প্রথমেই তিনি তাঁর রাজ্য বৃদ্ধি এবং সংগঠন করা এবং তাঁর সৈন্যদল পুনর্গঠন করার কাজ শুরু করেন। এক হাজার বছর ধরে তখন যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়ের প্রধান কারণ হয়ে আসছিল আক্রমণকারী অশ্বচালিত রথ আর হাতাহাতি যুদ্ধ করার জন্য পদাতিক বাহিনী। অশ্বারোহীরাও যুদ্ধ করত, তবে মেঘের মত একঝাঁক খণ্ডযোদ্ধা হিসেবে, আলাদা আলাদা, এবং বিশৃঙ্খল ভাবে। ফিলিপ তাঁর পদাতিকদের ঘনসন্নিবদ্ধ একটা বস্তু হিসেবে যুদ্ধ করালেন, যেটাকে বলা হত ম্যাসিডনীয় ব্যূহ (Macedonian phalanx) ; আর তাঁর অশ্বারোহী সম্ভ্রান্ত লোকদের, নাইট অথবা তাঁদের সঙ্গীদের সারি বেঁধে যুদ্ধ করালেন, এবং এভাবে অশ্বারোহী বাহিনী আবিষ্কার করলেন। তাঁর এবং তাঁর পুত্র অ্যালেকজাণ্ডারের বেশির ভাগ যুদ্ধেই প্রধান চালটা ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ। ব্যূহটা শত্রুর পদাতিকদের সামনে আটকে রাখত, আর দুপাশ দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর অশ্বারোহীদের ভাসিয়ে নিয়ে তার পদাতিকদের দুপাশে আর পিছনে গিয়ে পড়ত। তীরন্দাজরা ঘোড়াদের তীর মেরে রথগুলো অকর্মণ্য করে দিত।

এই নতুন বাহিনীর সাহায্যে ফিলিপ থেসালির মধ্য দিয়ে গ্রীস পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তার করলেন এবং এথেন্স এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কিরোনিয়া যুদ্ধে (Battle of Chœronea—৩৩৮ খৃঃ পূঃ) সমস্ত গ্রীসকে তাঁর পদানত করলেন। অবশেষে হেরোডোটাসের স্বপ্ন সফল হতে শুরু করল। সমস্ত গ্রীক রাষ্ট্রের এক মিলিত সভাতে ফিলিপকে পারস্যের বিরুদ্ধে এক গ্রীক-ম্যাসিডনীয় মৈত্রীর নায়ক-সেনাপতির (Captain General) পদে নিয়োগ করা হল এবং ৩৩৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে এই বহুপূর্বকল্পিত অভিযানের পথে এশিয়ায় প্রবেশ করল। কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হল। মনে হয় তাঁর রানী অ্যালেকজাণ্ডারের মা অলিম্পিয়াসের প্ররোচনায় এই গুপ্তহত্যা হয়েছিল। ফিলিপ দ্বিতীয় বার বিবাহ করায় তিনি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ফিলিপ তাঁর পুত্রের শিক্ষার জন্য অসাধারণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে ছেলের গৃহশিক্ষক রূপে এনেছিলেন; শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে তাঁর নিজের ধারণাসমূহের অংশীদার করেছিলেন এবং তাঁর উপর সামরিক অভিজ্ঞতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যালেকজাণ্ডারের যখন আঠারো বছর বয়স, কিরোনিয়ার যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। কাজেই উত্তরাধিকার লাভের সময় মাত্র কুড়ি বছর বয়সেও তাঁর পক্ষে তাঁর বাবার কাজ হাতে নিয়ে পারসীক অভিযান সাফল্যজনক ভাবে চালানো সম্ভব হয়েছিল।

৩৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে—কারণ ম্যাসিডোনিয়া আর গ্রীসে প্রতিষ্ঠালাভ এবং অবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য দুটি বছরের প্রয়োজন ছিল—তিনি এশিয়ায় প্রবেশ করলেন এবং গ্র্যানিকাসের যুদ্ধে তাঁর বাহিনীর চেয়ে সামান্য বড় একটা পারসীক বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং এশিয়া মাইনরে কয়েকটা শহর দখল করলেন। তিনি সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হলেন। উপকূলের সব কটা নগর দখল করে সেগুলিতে তাঁকে সৈন্য বসাতে হয়েছিল, কারণ টায়ার আর সিডনের নৌবাহিনী পারসীকদের কর্তৃত্বে ছিল, কাজেই সমুদ্র ছিল তাদের হাতে। যদি তিনি পিছনে কোন শত্রু-বন্দর ফেলে যেতেন তাহলে হয়ত পারসীকরা সেখানে সৈন্য নামিয়ে তাঁর সরবরাহ-পথের উপর আক্রমণ চালিয়ে বন্ধ করে দিত। ইসাসএ (খৃঃ পূঃ ৩৩৩) তিনি তৃতীয় দারিয়ুসের নেতৃত্বে এক বিরাট পাঁচমিশেলি বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তাদের বিধ্বস্ত করেন। দেড়শো বছর আগে জেরেক্সেসের নেতৃত্বে যে বাহিনী দার্দানেলেস পার হয়েছিল, তার মত এটাও ছিল কতকগুলো দলের জোড়াতালি-দেওয়া সমষ্টি এবং এর উপর এক-দঙ্গল দরবারের কর্মচারী ও দারিয়ুসের হারেম ও বহু শিবির অনুসরণকারীর দ্বারা এ ছিল ভারাক্রান্ত। সিডন অ্যালেকজাণ্ডারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। কিন্তু টায়ার গোঁয়ার্তুমি করে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে সেই বিরাট শহর আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হল; গাজাও আক্রান্ত হল এবং ৩৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের শেষ দিকে বিজয়ী সেনাপতি মিশরে প্রবেশ করে পারসীকদের কাছ থেকে তার শাসনভার গ্রহণ করলেন।

অ্যালেকজাণ্ড্রেটা আর অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় তিনি এমন সব বিরাট শহর তৈরি করলেন যেগুলোয় স্থলভাগ থেকে যাওয়া যায়; কাজেই তারা বিদ্রোহ করতে পারবে না। ফিনিসীয় নগরগুলোর ব্যবসাবাণিজ্য এই শহরগুলির দিকে চালান করা হল। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের ফিনিসীয়রা হঠাৎ ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া এবং অ্যালেকজাণ্ডারের পর অন্যান্য বাণিজ্য-নগরের ইহুদীদের সেখানে আবির্ভাব হল।

৩৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে অ্যালেকজাণ্ডার মিশর থেকে বার হয়ে ব্যাবিলনে অভিযান করলেন যেমন তাঁর আগে থৎথমিস, রামেসিস আর নেকো করেছিলেন। তবে তিনি অভিযান করলেন টায়ারের পথে। নিনেভের ধ্বংসাবশেষের কাছে আরবেলায় তিনি দারিয়ুসের মুখোমুখি হলেন এবং চূড়ান্ত লড়াইটা এখানেই সঙ্ঘটিত হল। পারসীকদের রথের আক্রমণ ব্যর্থ হল, ম্যাসিডনীয় অশ্বারোহী বাহিনীর এক আক্রমণ সেই বিরাট পাঁচমিশেলি বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলল এবং পদাতিক ব্যূহ জয় সম্পূর্ণ করল। দারিয়ুস পশ্চাদপসরণকারীদের নেতা হলেন। তিনি আর আক্রমণকারীদের বাধা দেবার কোন চেষ্টা না করে উত্তরে মীডদের দেশে পলায়ন করলেন। অ্যালেকজাণ্ডার তাঁর বাহিনী নিয়ে চললেন ব্যাবিলনে—তখনও ব্যাবিলন সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সুসায় আর পার্সিপোলিসে। সেখানে এক মস্ত উৎসবের শেষে তিনি রাজাধিরাজ দারিয়ুসের প্রাসাদ পুড়িয়ে দিলেন।

সেখান থেকে অ্যালেকজাণ্ডার মধ্য-এশিয়ায় এক সামরিক কুচকাওয়াজ চালালেন। তিনি পারসীক সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সীমানা অবধি অগ্রসর হলেন। প্রথমে তিনি উত্তর দিকে মুখ ফেরালেন। দারিয়ুসের অনুসরণ করা হল। ভোরবেলায় তাঁকে তাঁর রথে মরণাপন্ন অবস্থায় ধরে ফেলা হল : তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে মেরেছিল। যখন পুরোবর্তী গ্রীকেরা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। অ্যালেকজাণ্ডার এসে দেখলেন তিনি মৃত। অ্যালেকজাণ্ডার কাস্পিয়ান সাগরের ধার দিয়ে গেলেন, পশ্চিম তুর্কস্থানের পাহাড়গুলোর উপর উঠলেন, হিরাট, (যেটা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) কাবুল আর খাইবার পথ দিয়ে ভারতবর্ষে নেমে এলেন। সিন্ধুনদের তীরে তিনি ভারতীয় রাজা পুরুর সঙ্গে এক বিরাট যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং এখানে ম্যাসিডনীয় সৈন্যেরা প্রথম হস্তীচালিত বাহিনীর মুখোমুখি হল এবং তাদের হারাল। অবশেষে তিনি জাহাজ তৈরি করে সিন্ধুনদের মোহানা অবধি জাহাজে করে গেলেন এবং বেলুচিস্তানের তীর দিয়ে আবার সুসায় ফিরলেন ৩২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে ছ-বছর অনুপস্থিতির পর। তারপর তিনি তাঁর এই জয়লব্ধ বিশাল সাম্রাজ্য ঐক্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। তিনি তাঁর নতুন প্রজাদের মন জয় করতে চাইলেন। তিনি পারসীক নৃপতিদের পোশাক ও মুকুট পরতে লাগলেন এবং এতে তাঁর ম্যাসিডনীয় সেনাপতিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তাদের নিয়ে তাঁর অনেক অসুবিধায় পড়তে হল। তিনি এই ম্যাসিডনীয় সেনানায়কদের সঙ্গে পারসীক ও ব্যাবিলনীয় স্ত্রীলোকদের কয়েকটা বিবাহের সম্বন্ধ করলেন,

তাকে বলা হল 'পূর্ব ও পশ্চিমের বিবাহ'। তাঁর এই একীকরণের চেষ্টার ফলাফল দেখবার জন্য তিনি বেঁচে থাকেন নি। ব্যাবিলনে এক সুরাপানোৎসবের পর তাঁকে জ্বরে ধরে এবং ৩২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি মারা যান।

সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সেলিউকাস বলে তাঁর এক সেনাপতি এফেসাস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত পুরনো পারসীক সাম্রাজ্যের অধিকাংশই তাঁর দখলে রাখেন। আরেকজন টলেমি (Ptolemy) মিশর দখল করেন এবং অ্যান্টিগোনাস ম্যাসিডোনিয়া নিজের অধিকারে আনেন। সাম্রাজ্যের বাকি অংশ স্থিরতা পায় না, পর পর ক্ষমতালোভীদের হাত থেকে হাতে বদল হয়। উত্তর থেকে বর্বরদের আক্রমণের তীব্রতা আর শক্তি বাড়তে থাকে—শেষ পর্যন্ত যতদিন না এক নতুন শক্তি, রোমক প্রজাতন্ত্রের শক্তি, (যার কথা আমরা বলব) পশ্চিম থেকে বেরিয়ে এসে একের পর এক এই খণ্ডাংশগুলোকে জয় করে সেগুলো একসঙ্গে ঢেলে এক নতুন এবং অধিকতর স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার মিউজিয়াম আর গ্রন্থাগার

অ্যালেকজাণ্ডারের আমল থেকেই গ্রীকরা বণিক, শিল্পী, কর্মচারী আর ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে পারসীক সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। জেরেক্সেসের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিবাদ হয় তাতে জেনোফোনের (Xenophon) নেতৃত্বে ১০,০০০ গ্রীক ভাড়াটে সৈন্যের এক দল অংশ গ্রহণ করেছিল। ব্যাবিলন থেকে এসিয়াটিক গ্রীসে তাদের প্রত্যাবর্তনের কাহিনী তাঁর 'রিট্রীট অব্ দি টেন থাউজ্যাণ্ড'-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সেনাধ্যক্ষদের লেখা যুদ্ধ-কাহিনীর মধ্যে এটা একেবারে গোড়ার দিককার একটা। তবে অ্যালেক-জাণ্ডারের দিগ্বিজয় এবং তাঁর অধস্তন সেনাপতিদের মধ্যে তাঁর ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি, প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যে গ্রীকদের এই অনুপ্রবেশ, তাদের ভাষা ফ্যাশান ও সংস্কৃতিকে যথেষ্ট জোরদার করে তোলে। এই বিস্তারের চিহ্ন সুদূর মধ্য-এশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পের বিকাশের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

বহু শতাব্দী ধরে শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে এথেন্স তার সম্মান বজায় রেখেছিল। সত্য কথা বলতে কী, ৫২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় হাজার বছর ধরে রেখেছিল। কিন্তু পৃথিবীর মানসিক অনুশীলনের নেতৃত্ব কিছুদিনের মধ্যেই ভূমধ্যসাগর পার হয়ে অ্যালেকজাণ্ডারের স্থাপিত নতুন বাণিজ্য-নগর অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় চলে এল। এখানে ম্যাসিডনীয় সেনাপতি টলেমি ফারাও

হয়েছেন। তাঁর দরবারের লোকেরা সকলে গ্রীক ভাষায় কথা বলে। রাজা হবার আগে তিনি অ্যালেকজাণ্ডারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং অ্যারিস্টটলের ভাবধারায় তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। খুব উৎসাহ এবং যোগ্যতার সঙ্গে তিনি জ্ঞান এবং অনুসন্ধান সংগঠন করতে শুরু করলেন। তিনি অ্যালেকজাণ্ডারের আক্রমণ-গুলির এক ইতিহাসও লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেটা হারিয়ে গেছে।

অ্যারিস্টটলের অনুসন্ধান-কার্য চালাবার জন্য অ্যালেকজাণ্ডার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা ঢেলেছিলেন, কিন্তু প্রথম টলেমিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম লোক যিনি বিজ্ঞানের জন্য একটা স্থায়ী দান করেন। তিনি অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় এক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যেটা কলাদেবীর নামে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসর্গ করা হয়। এটা হচ্ছে আলেকজাণ্ড্রিয়ার মিউজিয়াম। দু-তিন পুরুষ পর্যন্ত অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় বিজ্ঞানের কাজ অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ করে। ইউক্লিড, এরাস্টোস্থেনিস—যিনি পৃথিবীর আয়তন মাপেন এবং তার সত্যিকারের ব্যাসের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েন, অ্যাপোলোনিয়াস—যিনি কনিক সেকশনের উপর লেখন, হিপারকাস—যিনি প্রথম তারার মানচিত্র এবং তালিকা প্রস্তুত করেন এবং হিরো—যিনি প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করেন,—এঁরা হচ্ছেন সেই বিজ্ঞানী পথিকৃৎদের অসাধারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর কয়েকটা উজ্জ্বলতর নক্ষত্র। আর্কিমিডিস সিরাকিউস থেকে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় আসেন পড়াবার জন্য। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মিউজিয়মের চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলত। হেরোফিলাস ছিলেন গ্রীক শরীর-সংস্থানবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়দের একজন। বলা হয়, তিনি ব্যবচ্ছেদ (Vivisection) অভ্যাস করতেন।

প্রায় এক পুরুষ ধরে, প্রথম টলেমি এবং দ্বিতীয় টলেমির আমলে জ্ঞানের এবং আবিষ্কারের এমন একটা আলো অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ায় জলে উঠেছিল যা পৃথিবীতে ষোড়শ শতাব্দীর আগে আর দেখা যাবে না। কিন্তু এটা চলল না। এই অবনতির অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে প্রধান যেটা স্বর্গীয় অধ্যাপক মহাফি বলেছেন সেটা হচ্ছে এই যে মিউজিয়ামটা ছিল একটা রাজকীয় অধ্যয়নশালা এবং এর সমস্ত অধ্যাপক এবং গবেষকরা ফারাও দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং ফারাও-এর কাছ থেকে মাইনে পেতেন। এ সবই বেশ ছিল যতদিন প্রথম টলেমি ছিলেন ফারাও। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের বন্ধু এবং শিষ্য। কিন্তু টলেমি-বংশ ক্রমশ মিশরীয়-ভাবাপন্ন হতে লাগল। তাঁরা মিশরীয় পুরোহিত এবং মিশরীয় ধর্মের বিকাশধারার প্রভাবাধীন হয়ে পড়লেন। তাঁরা আর নতুন যে সব কাজ হচ্ছে সেগুলো দেখতেন না, আর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধিৎসার একেবারে টুঁটি টিপে

মারল। প্রথম একশো বছরের কর্মব্যস্ততার পর মিউজিয়ামটা খুব কমই ভাল কাজ করতে পেরেছিল।

প্রথম টলেমি শুধু অত্যন্ত আধুনিক মন নিয়ে নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান-প্রচেষ্টাই সংগঠিত করেন নি। অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগারে তিনি একটা জ্ঞানের সর্বব্যাপী ভাণ্ডার স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এটা শুধু একটা ভাণ্ডার ছিল না, এটা ছিল উপরন্তু একটা বই নকল ও বিক্রি করার জায়গা। নকলনবিশদের এক বিরাট বাহিনী এখানে অবিরাম বইয়ের কপি বাড়িয়ে যেত।

এখানেই তাহলে আমরা সেই মানসিক প্রক্রিয়ার প্রথম উদ্‌ঘাটন দেখতে পাই যার ভিতর আমরা আজ বাস করছি। এখানে আমরা জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা দেখতে পাই। এই মিউজিয়াম আর গ্রন্থাগারের স্থাপনা মানুষের ইতিহাসের এক বিরাট যুগের সূচনা করে। আধুনিক কালের এখান থেকেই সত্য করে শুরু হয়েছে।

গবেষণা এবং প্রচার, দুটোর কাজই অনেক বাধার ভিতর দিয়ে চলে। এর একটা হচ্ছে—দার্শনিক : যাঁরা সাধারণত ভদ্রলোক হতেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়ী আর কারিগরদের বিরাট সামাজিক পার্থক্যটা। সেকালেও যথেষ্ট কাচের কারিগর এবং ধাতুশিল্পী ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে চিন্তাশীল লোকদের মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কাচের কারিগর অত্যন্ত সুন্দর রঙীন পুঁথি, শিশি ইত্যাদি তৈরি করত কিন্তু সে কখনও ফ্লোরেণ্টাইন ফ্লাস্ক বা লেন্স তৈরি করত না। মনে হয় পরিষ্কার কাচ তাকে আকৃষ্ট করত না। ধাতুশিল্পীরা অস্ত্রশস্ত্র ও গয়নাপত্র তৈরি করত বটে কিন্তু তারা রাসায়নিক দাঁড়িপাল্লা তৈরি করত না। দার্শনিকরা পরমাণু এবং বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে উঁচুস্তরের গবেষণা চালাতেন কিন্তু এনামেল, রং বা মন্ত্রঃপূত কবচ সম্বন্ধে তাঁদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। জাগতিক বস্তু তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করত না। কাজেই অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া তার ক্ষণস্থায়ী সুযোগের দিনে কোন অনুবীক্ষণ-যন্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রের জন্ম দিতে পারে নি। এবং যদিও হিরো বাষ্পীয় যন্ত্র (steam engine) আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা কখনো পাম্প করা কি নৌকো চালানো কিংবা অন্য কোন দরকারি কাজে লাগানো হয় নি। চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল না বললেই চলে, আর ব্যবহারিক প্রয়োগের আকর্ষণ এবং উত্তেজনা ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি উজ্জীবিত করা কি বজায় রাখা যায় না। কাজেই যখন প্রথম টলেমি আর দ্বিতীয় টলেমির মানসিক কৌতূহল সরিয়ে নেওয়া হল, কাজগুলো চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কিছুই রইল না। মিউজিয়ামের আবিষ্কারগুলো অস্পষ্ট পাণ্ডুলিপির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল

এবং যতদিন না রেনেসাঁসের সময়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, ততদিন পর্যন্ত সেগুলো কখনও জনসাধারণের কাছে পৌঁছয় নি।

গ্রন্থাগারটা থেকেও বই তৈরির কোন উন্নতি হয় নি। সেই প্রাচীন জগতে ছেঁড়া কাপড়ের মণ্ড থেকে নির্দিষ্ট মাপের কাগজ তৈরি হত না। কাগজ হচ্ছে চীনদেশীয় আবিষ্কার। নবম শতাব্দীর আগে সেটা পশ্চিমী জগতে পৌঁছয় নি। বইয়ের একমাত্র উপাদান ছিল পার্চমেণ্ট আর ধারে-ধারে-জোড়া-দেওয়া প্যাপিরাস ঘাসের ফালি। এই ফালিগুলো জড়িয়ে রাখা হত। এগুলো নাড়াচাড়া এবং পড়বার পক্ষে অত্যন্ত বৃহৎ এবং গবেষণা-কাজের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক ছিল। এই জিনিসগুলোই ছাপা আর পাতাওয়ালা বইয়ের বিকাশের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। ছাপা জিনিসটা পৃথিবীর লোকেরা জানত, মনে হয় পুরোনো পাথরের যুগ থেকে। প্রাচীন সুমেরিয়ায় নামাঙ্কিত ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রচুর কাগজ ছাড়া বই ছেপে কোন লাভ হত না এবং এই উন্নতির বিরুদ্ধে হয়ত কাজে-নিযুক্ত নকলনবিশদের ট্রেড-ইউনিয়নের কাছ থেকে বাধা এসেছিল। অ্যালেকজাণ্ড্রিয়াতে প্রচুর বই ছাপা হত, তবে সেগুলো শস্তা বই নয় এবং সেগুলো থেকে কখনও ধনী এবং প্রভাবশীল শ্রেণী ছাড়া নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে নি।

কাজেই এই মানসিক অভিযানের আগুন প্রথম দুই টলেমি কর্তৃক সংগৃহীত দার্শনিকগোষ্ঠীর সংস্পর্শে যারা এসেছিল সেই ছোট গণ্ডীর লোকগুলোর বাইরে কখনও পৌঁছল না। এ ছিল একটা কালো লণ্ঠনের ভিতরের আলোর মত, যেটা বাইরের পৃথিবীর থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। ভিতরে হয়ত আগুনের দীপ্তি চোখ ঝলসে দিচ্ছে, কিন্তু তবুও সেটা রয়ে গেল অদৃশ্য। বাকি পৃথিবীটা সেই পুরোনো পথে চলল, জানল না যে একদিন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে তার বীজ বপন করা হয়ে গেছে। তারপর এক গোঁড়ামির অন্ধকার ছায়া এমন কি অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার উপরও পড়ল। তারপর অ্যারিস্টটলের বপন করা বীজ এক হাজার বছর ধরে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল। এক হাজার বছরের পর সেটা নড়ে উঠল, বিকশিত হতে শুরু করল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেটা হয়ে উঠল জ্ঞান ও সুষ্ঠু ধারণার সেই বিরাট মহীরুহ, যা এখন সমস্ত মানবজীবনকে বদলে দিচ্ছে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়াই গ্রীক মানসিক সঙ্কলনের একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। অ্যালেকজাণ্ডারের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নপ্রায় অংশগুলোর ভিতর আরো অনেক শহর ছিল যেগুলো এক দীপ্তিশীল মানসিক জীবনের পরিচয় দিয়েছিল। যেমন ধরুন ছিল সিসিলির গ্রীক শহর সিরাকিউস যেখানে দু-

শতাব্দী ধরে চিন্তা ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়, আরও ছিল এশিয়া মাইনে পের্গামাম, যেখানে এক বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। কিন্তু এই উজ্জ্বল হেলেনিক জগতের উপর এখন উত্তরের থেকে আক্রমণ ঘনাচ্ছিল। নতুন নর্দিক এক বর্বর-জাতি, গলেরা, সেই পথ ধরে আক্রমণ চালাচ্ছিল, যে-পথ এককালে গ্রীক, ফ্রিজীয় ও ম্যাসিডনীয়দের পূর্বপুরুষরা অনুসরণ করেছে। তারা আক্রমণ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করত, বিধ্বস্ত করত। আর এই গলদের পথ বেয়ে ইটালি থেকে এক নতুন বিজেতা জাতি এল। এই রোমানরা ক্রমশ দারিয়ুস ও অ্যালেকজাণ্ডারের বিরাট রাজ্যের সমস্ত পশ্চিমাংশ জয় করল। তারা ছিল দক্ষ, কিন্তু তাদের কল্পনাশক্তি ছিল না। বিজ্ঞান কি শিল্পের চেয়ে তারা আইন এবং আর্থিক লাভ পছন্দ করত। মধ্য এশিয়া থেকেও নতুন আক্রমণকারীরা নেমে আসছিল। তারা সেলিউকাসের সাম্রাজ্য ধ্বংস আর পদানত করল আর পশ্চিম জগৎ থেকে ভারত-বর্ষকে বিচ্ছিন্ন করল। তারা ছিল পার্থিয়ান,—অশ্বারোহী, ধনুকধারী এক জাতের লোক যারা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পার্সিপোলিস আর সুসার গ্রীক-পারসীক সাম্রাজ্যের সেই অবস্থা করল, যে অবস্থা তার করেছিল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে মীড এবং পারসীকেরা। আরও একদল যাযাবর জাতি এখন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বেরিয়ে আসছিল, যে জাতির লোকেরা ফর্সা, নর্দিক অথবা আর্য-ভাষাভাষী নয়, যাদের চামড়া হলদে, চুল কালো এবং ভাষা মঙ্গোলীয়। তবে শেষের এই জাতিটার কথা আমরা পরের এক অধ্যায়ে বলব।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী

কিন্তু এবার আমাদের কাহিনীকে তিন শতাব্দী পিছনে নিয়ে যেতে হবে। এমন একজন মহান শিক্ষকের কথা আমরা বলব যিনি সমস্ত এশিয়ার ধর্মচিন্তা ও ভাবধারায় প্রায় একটা বিপ্লব এনেছিলেন। ইনি হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। যে সময় আইজায়া ব্যাবিলনে ইহুদীদের ভিতর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং হেরাক্লিটাস এফেসাসে বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনুমানমূলক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন, প্রায় সেই একই সময়ে তিনি ভারতবর্ষের বারাণসীতে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেন। এঁরা সবাই পৃথিবীতে একই সময়ে ছিলেন—খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—অথচ একে অন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতেন না।

সত্যই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী সমস্ত মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শতাব্দীগুলির মধ্যে একটা। সব জায়গায়—কারণ এবার আমরা বলব যে চীনেও একই ব্যাপার ঘটছিল—মানুষের মন এক নতুন সাহস দেখাচ্ছিল।

সব জায়গায় তারা রাজতন্ত্র, পুরোহিত, নরবলি প্রভৃতির ঐতিহ্য থেকে জেগে উঠে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং গভীর সমস্ত প্রশ্ন শুরু করেছিল। যেন ২০,০০০ বছরের শৈশবের পর মানব জাতি সদ্য-যৌবনপ্রাপ্তের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ভারতবর্ষের গোড়ার দিককার ইতিহাস এখনও খুব অস্পষ্ট। সম্ভবত ২,০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে আর্যভাষাভাষী এক জাতি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে নেমে আসে, হয় এক কিংবা পরপর কতকগুলো অভিযানের মধ্যে দিয়ে। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তারা তাদের ভাষা এবং ঐতিহ্য ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এদের আর্য ভাষার বিশেষ রূপটা ছিল সংস্কৃত। এক বাদামি-রঙা জাতির তারা দেখা পেল যাদের সভ্যতা আরো জটিল কিন্তু ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল—এই সিন্ধু-গঙ্গার দেশের অধিকারী। কিন্তু গ্রীকরা যেভাবে পারসীকদের সঙ্গে মিশেছিল তারা তাদের পূর্বগামীদের সঙ্গে অতটা খোলাখুলি ভাবে মিশেছিল বলে মনে হয় না। তারা আলাদা ছিল। যখন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের অতীত অস্পষ্টভাবে ধরা দেয়, তখন ভারতীয় সমাজ ইতিমধ্যেই বহু স্তরে ভাগ হয়ে গেছে; সেই স্তরগুলোর আবার নানারকম উপবিভাগ আছে যারা একসঙ্গে খায় না, যাদের ভিতর বিবাহ হয় না, এবং যারা খোলাখুলি ভাবে মেশে না। এবং সারা ইতিহাস জুড়ে এই জাতি-বিভাগ চলে এসেছে। এতে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যে অবাধে মিলনক্ষম ইউরোপীয় অথবা মঙ্গোলীয় জনসাধারণ থেকে একটা আলাদা জিনিস করে তুলেছে। সত্য কথা বলতে কি, এটা একটা সমাজের সমাজ (Community of Communities)।

সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন এক অভিজাত বংশের পুত্র যাঁরা হিমালয়ের সানুদেশে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। উনিশ বছর বয়সে এক সুন্দরী দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি শিকার করতেন, খেলাধুলো করতেন আর উদ্যান, উপবন এবং জলসিঞ্চিত ধান্যক্ষেত্রে ভরা তাঁর রৌদ্রালোকিত পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। এবং এই জীবনের মধ্যেই এক পরম অশান্তি তাঁর উপর নেমে এল। করবার কাজ না পেলে তীক্ষ্ণধী লোকেরা এই অসুখে ভোগেন। তিনি অনুভব করলেন যে, যে জীবন তিনি যাপন করছেন সেটাই সত্য জীবন নয়—সেটা এমন একটা ছুটি, যা খুব বেশি দিন ধরে চলেছে।

রোগ, মৃত্যু, সমস্ত সুখের অনিশ্চয়তা এবং অতৃপ্তি-বোধ গৌতমের মন ছেয়ে ফেলল। তাঁর মেজাজ যখন এইরকম, তাঁর সঙ্গে এক ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর দেখা হল। তখন ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা প্রচুর ছিল। এঁরা অত্যন্ত কঠোর নিয়মবদ্ধ জীবন যাপন করতেন, আর ধ্যান এবং ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় প্রচুর সময় ব্যয়

করতেন। লোকের ধারণা ছিল যে এঁরা জীবনের গভীরতর কোন সত্যে অনুসন্ধান করছেন। কাহিনীতে বলে, অনুরূপ এক তীব্র ইচ্ছা গৌতমকে পেয়ে বসল।

তিনি এই পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় তাঁর কাছে খবর এল যে তাঁর স্ত্রীর প্রথম পুত্রসন্তান হয়েছে। 'এই আর একটা বন্ধন কাটাতে হবে'—গৌতম বললেন।

আত্মীয় সখাদের আনন্দের মধ্যে তিনি গ্রামে ফিরে এলেন। বিরাট এক ভোজ হল, নর্তকীরা নাচল এই নতুন বন্ধনের জন্মকে স্মরণীয় করে রাখার উৎসবে। মনে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে গৌতম রাত্রে জেগে উঠলেন, যেরকম ভাবে বাড়িতে আগুন লেগেছে শুনলে লোকে জেগে ওঠে। তিনি ঠিক করলেন তখনই তিনি এই উদ্দেশ্যহীন সুখের জীবন ছেড়ে যাবেন। তিনি আস্তে আস্তে তাঁর স্ত্রীর ঘরের দরজা অবধি গেলেন, প্রদীপের আলোয় দেখলেন চারিদিকে ফুলের মাঝখানে শিশু-সন্তানকে কোলে নিয়ে তিনি মধুর সুপ্তিতে মগ্ন। তাঁর খুব ইচ্ছা হল ছেলেটাকে প্রথম আর শেষবারের মত একবার জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু পাছে তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায় এই ভয় তাঁকে নিবৃত্ত করল। অবশেষে তিনি মুখ ফিরিয়ে ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লেন আর পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়লেন ঘোড়া চালিয়ে।

সে রাত্রে তিনি অনেক দূরে গেলেন। ভোরবেলায় তিনি তাঁদের রাজ্যের বাইরে এসে এক বালুকাময় নদীর তীরে ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর তিনি তলোয়ার দিয়ে তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম কাটলেন, আর তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে,—সেগুলো, তাঁর ঘোড়া এবং তাঁর তলোয়ার, বাড়িতে ফেরত পাঠালেন। তারপর যেতে যেতে তাঁর সঙ্গে এক ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত লোকের দেখা হল। তিনি তার সঙ্গে পোশাক বদল করলেন এবং এভাবে পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে তিনি স্বাধীন ভাবে জ্ঞানের অনুসন্ধানে অগ্রসর হলেন। তিনি দক্ষিণদিকে বিন্ধ্য পর্বতমালার এক শাখায় সাধু-সন্ন্যাসীদের এক আশ্রমের দিকে গেলেন। সেখানে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় বাস করতেন। তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিসের জন্য শহরে যেতেন আর যারা তাঁদের কাছে আসত তাদের মুখে-মুখে জ্ঞান বিতরণ করতেন। গৌতম সে সময়কার সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের যেসব উপায় তাঁকে সেখানো হল, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেগুলো মেনে নিতে পারল না।

ভারতীয়েরা সব সময় এ বিশ্বাস করে যে কঠোর তপস্যা, উপবাস, অনিদ্রা এবং

আত্মনিগ্রহ দ্বারা শক্তি এবং জ্ঞান পাওয়া যায়। এবার গৌতম এই সব ধারণার পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী পাঁচজন শিষ্যকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে উপবাস এবং ভয়ঙ্কর তপস্যা করতে লাগলেন। আকাশের চাঁদোয়ায় টাঙানো বিরাট ঘণ্টার ধ্বনির মত তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এতে তাঁর সত্য-প্রাপ্তির কোন বোধ লাগল না। একদিন তিনি পায়চারি করছেন, দুর্বলতা সত্ত্বেও চেষ্টা করছেন চিন্তা করবার। হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল তখন জ্ঞানলাভের এই সব প্রায়-অলৌকিক পথের অসঙ্গতি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সাধারণ খাদ্য খেয়ে এবং কঠোর সাধনা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করে তিনি তাঁর সঙ্গীদের সন্ত্রস্ত করে তুললেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ যে-সত্যেই পৌঁছতে যাক না কেন সেটায় সবচেয়ে ভালভাবে পৌঁছন যায় সুস্থ শরীরের মধ্যে পুষ্ট মস্তিষ্কের দ্বারা। এ ধারণা দেশের সে-সময়ের ধারণার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কশূন্য। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে দুঃখিত চিত্তে বারাণসী চলে গেল। গৌতম একা ঘুরতে লাগলেন।

যখন মন একটা বিরাট জটিল সমস্যার সঙ্গে যোঝে, সে অগ্রসর হয় ধাপে ধাপে, বুঝতেই পারে না কতটুকু সে এগিয়েছে যতক্ষণ-না হঠাৎ একটা আলোর ঝলকের মত সে তার সাফল্য বুঝতে পারে। গৌতমের তাই হয়েছিল। তিনি নদীর ধারে বিরাট একটা গাছের তলায় খেতে বসেছিলেন, যখন এই স্বচ্ছ দৃষ্টির ভাবটা তাঁর মনে এল। তাঁর মনে হল যে তিনি জীবনটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। শোনা যায় যে, তিনি সারা দিন সারা রাত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে ছিলেন, তারপর পৃথিবীতে তাঁর এই দর্শন পৌঁছে দেবার জন্য উঠলেন। তিনি বারাণসীতে গিয়ে তাঁর হারানো শিষ্যদের খুঁজে বার করলেন এবং তাদের তাঁর এই নতুন শিক্ষায় দীক্ষিত করলেন। বারাণসীতে রাজার মৃগোদ্যানে তাঁরা কুটির নির্মাণ করে এক ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যেখানে জ্ঞানানুসন্ধিৎসু বহু লোক আসত।

তাঁর শিক্ষার শুরু ছিল ভাগ্যবান যুবক হিসাবে তাঁর নিজের প্রশ্ন : আমি সম্পূর্ণ সুখী নই কেন? এটা একটা অন্তর্মুখী প্রশ্ন। থেলস এবং হেরাক্লিটাস যে সরল আত্মবিস্মৃত বহিরঙ্গ কৌতূহল দিয়ে বিশ্বের সমস্যাগুলোকে আক্রমণ করছিলেন অথবা ঠিক একই রকম আত্মবিস্মৃত নৈতিক দায়ের ভার যা শেষের দিকের প্রফেটরা হিব্রু মানসের উপর চাপাচ্ছিলেন, সেগুলো থেকে এ প্রশ্নের ধরন ছিল একেবারে আলাদা। এই ভারতীয় শিক্ষাদাতা অহং-কে ভুলে যান নি, তিনি অহং-এর উপরই সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে সেটা ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন যে সমস্ত দুঃখের জন্য দায়ী মানুষের লোভী বাসনা কামনা। যতদিন-

না মানুষ তার নিজের বাসনা জয় করতে পারবে ততদিন তার জীবন কষ্টের এবং দুঃখেই তার শেষ। জীবনের এই বাসনা তিনটি রূপ গ্রহণ করে, তার তিনটিই অসৎ। প্রথমটা হচ্ছে ক্ষুধা, লোভ এবং সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বাসনা, দ্বিতীয়টা একটা নিজস্ব এবং অহংসর্বস্ব অমরত্বের বাসনা, এবং তৃতীয়টা হচ্ছে নিজস্ব সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা, সাংসারিকতা, লোভ ইত্যাদি। জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে এই সমস্ত ধরনের বাসনাকে জয় করতে হবে। যখন এগুলো জয় করা হবে, যখন অহং-বোধ একেবারে বিলুপ্ত হবে, তখনই আত্মার প্রশান্তি, নির্বাণ—অর্থাৎ চরম কল্যাণ লাভ হবে।

এই হচ্ছে তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার। সত্য কথা বলতে কী, এ এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দার্শনিক শিক্ষা ; নির্ভীক ও সঠিক ভাবে দেখা এবং জানার গ্রীক অনুজ্ঞা এবং ভগবানকে ভয় করা ও সৎকর্ম করার হিব্রু আদেশের মত এটা বোঝা ততটা সোজা নয়। এমনকি এ শিক্ষা ছিল গৌতমের সাক্ষাৎ শিষ্যদেরও বুদ্ধির অনেক বাইরে। কাজেই এটা আশ্চর্য নয় যে যেই তাঁর নিজস্ব প্রভাব সরিয়ে নেওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে এটা বিকৃত এবং স্থূল হয়ে উঠল। সে সময় ভারতবর্ষে একটা বহুপ্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে বহুদিন অন্তর পৃথিবীতে জ্ঞানের আগমন হয় এবং কোন নির্ধারিত ব্যক্তির দেহে তিনি আবির্ভূত হন যাঁকে বুদ্ধ বলা হয়। গৌতমের শিষ্যরা ঘোষণা করল যে তিনি একজন বুদ্ধ, সর্বাধুনিক বুদ্ধ,—যদিও তিনি নিজে কখনও এ উপাধি স্বীকার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মারা যেতে-না-যেতেই তাঁকে ঘিরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনীর জাল বোনা হতে লাগল। মানুষের মন চিরকালই নৈতিক প্রচেষ্টার চেয়ে অলৌকিক কাহিনীই বেশি পছন্দ করে। গৌতম বুদ্ধ অলৌকিকত্ব লাভ করলেন।

তবু পৃথিবীর সত্যকারের কিছু লাভ হল। যদিও 'নির্বাণ' বেশির ভাগ মানুষের কল্পনার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ এবং সূক্ষ্ম, যদিও জাতির অলৌকিক কাহিনী গড়বার প্রবণতায় গৌতমের জীবনের সরল ঘটনাগুলো ঢাকা পড়ে, তবু তারা গৌতমের অষ্টপথ, আর্যপথ বা জীবনে মহৎ পথের কিছুটা উদ্দেশ্য অন্তত বুঝতে পেরেছিল। এতে মানসিক দৃঢ়তা, সৎ উদ্দেশ্য এবং বাক্য, সৎ কর্ম এবং জীবিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এতে বিবেককে উজ্জীবিত করা হয় এবং উদার আত্মবিস্মৃত উদ্দেশ্যের আবেদন জানানো হয়।

রাজা অশোক

গৌতমের মৃত্যুর পর কয়েক পুরুষ এই সুমহান বৌদ্ধ শিক্ষা, এই প্রথম সরল শিক্ষা যে মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ হচ্ছে আত্মসংযমে, পৃথিবীতে বিশেষ বিস্তার লাভ

করতে পারে নি। তারপরে সেটা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নৃপতির কল্পনাকে অধিকার করল।

আমরা আগেই বলেছি, কীভাবে অ্যালেকজাণ্ডার দি গ্রেট ভারতে আসেন এবং সিন্ধুনদের তীরে পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে একজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অ্যালেকজাণ্ডারের শিবিরে এসে তাঁকে গঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অ্যালেকজাণ্ডার সেটা করতে পারেন নি কারণ তাঁর ম্যাসিডনীয় সৈন্যরা এই অপরিচিত দেশে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে চায় নি। পরে (৩২১ খৃঃ পূঃ) চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতির সাহায্য পেয়েছিলেন এবং গ্রীক সাহায্য ছাড়াও তাঁর স্বপ্ন সফল করতে পেরেছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই (৩০৩ খৃঃ পূঃ) পাঞ্জাবের প্রথম সেলিউকাসকে আক্রমণ করে ভারতবর্ষ থেকে গ্রীকদের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত দূর করেন। তাঁর পুত্র এই নতুন সাম্রাজ্য আরো বর্ধিত করেন। তাঁর পৌত্র অশোক, যে রাজার কথা আমরা এবার বলব, ২৬৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে দেখেন যে তিনি আফগানিস্তান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত শাসন করছেন।

প্রথমে অশোক তাঁর পিতা আর পিতামহের উদাহরণ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ জয় সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন (২৫৫ খৃঃ পূঃ)। এটা হচ্ছে মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলের একটা রাজ্য। তিনি তাঁর সামরিক শক্তি-প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনিই একমাত্র বিজেতা, যিনি যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এবং ভয়কাতরতায় এত বীতরাগ হয়েছিলেন যে যুদ্ধ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের শান্তির বাণী গ্রহণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন, এবার থেকে তাঁর জয়যাত্রা হবে ধর্মের জয়যাত্রা।।

তাঁর আটাশ বছরের রাজত্বকাল হচ্ছে মানবজাতির অশান্ত ইতিহাসের মধ্যে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তিনি ভারতবর্ষে বহু কূপ খনন করান এবং ছায়ার জন্য বৃক্ষ রোপন করান। তিনি অনেক হাসপাতাল, জনসাধারণের জন্য উদ্যান এবং ওষধি প্রস্তুতের জন্য উদ্যান স্থাপনা করেন। তিনি ভারতবর্ষের আদিবাসী এবং অধীন জাতিদের জন্য এক মন্ত্রীদপ্তরের সৃষ্টি করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্থাপনের জন্য প্রচুর দান করেন এবং চেষ্টা করেন যাতে তারা নিজেদের সঞ্চিত সাহিত্যের আরো ভালো এবং সত্য সমালোচনায় উৎসাহিত হয়। কারণ নানারকমের মানুষ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতা খুব দ্রুতভাবে সেই মহান ভারতীয় শিক্ষকের পবিত্র এবং সরল শিক্ষার উপর জমা হয়েছিল। অশোকের ধর্মপ্রচারকেরা কাশ্মীরে, পারস্যে, সিংহলে এবং অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় গিয়েছিল।

এইরকম ছিলেন অশোক, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার জন্ম তিনি কোন রাজপুত্র বা মানুষের সংগঠন রেখে যান নি এবং তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই বিধ্বস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভারতবর্ষে তাঁর রাজত্বকালের মহান্ দিনগুলো এক গৌরবময় স্মৃতি হয়েই রইল। ভারতীয় সমাজদেহের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাপন্ন জাতি, পুরোহিতদের জাতি, ব্রাহ্মণেরা, চিরকালই বুদ্ধের সরল খোলাখুলি শিক্ষার বিরোধী ছিল। ক্রমশ তারা দেশে বৌদ্ধ প্রভাব ক্ষয় করে আনল। পুরোনো সেই ভয়ঙ্কর দেবতারা, হিন্দুধর্মের সেই অসংখ্য মতবাদ, আবার প্রাধান্ত লাভ করল। জাতিভেদ আরো কঠোর এবং জটিল হল। বহু দীর্ঘ শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ আর হিন্দুধর্ম পাশাপাশি চলল, তারপর আস্তে আস্তে বৌদ্ধধর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম বহু রূপে তার স্থান অধিকার করল। তবে ভারতবর্ষ এবং জাতিভেদের রাজত্বের বাইরে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ল যতদিন না চীন, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ আর জাপান সে জয় করল—যেসব দেশে আজও তার প্রাধান্ত রয়েছে।

কনফুসিয়াস ও লাওৎসে

এই যে বিস্ময়কর খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, যখন মানবজাতির সন্ত যৌবনপ্রাপ্তির শুরু, এতে জীবিত ছিলেন এমন আরও দুজন মহাপুরুষের কথা আমাদের এখনও বলা বাকি।

এই ইতিহাসে এ-পর্যন্ত চীনদেশের গোড়ার দিককার কথা আমরা খুব কমই বলেছি। এখনও গোড়াকার সেই ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। নতুন যে চীন উঠছে তার আবিষ্কারক আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি এই আশায় যে, তারা তাদের অতীত সেইভাবে খুঁটিয়ে বার করবে যেমন করে গত শতাব্দীতে ইউরোপের অতীত আবিষ্কার করা হয়েছে। বহুকাল আগে চীন দেশের প্রথম আদিম সভ্যতা বিরাট নদী-উপত্যকাগুলোয় আদিম হেলিওলিথিক কালচার থেকে উঠে এসেছিল। মিশর আর সুমেরিয়ার মত হেলিওলিথিক কালচারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরও ছিল। তাদেরও কেন্দ্র ছিল মন্দির, যেখানে পুরোহিত এবং পুরোহিত-নৃপতিরা ঋতুতে ঋতুতে বলি দিত। এসব শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিশ্চয় ছ-সাত হাজার বছর আগের মিশরীয় অথবা সুমেরীয় জীবনযাত্রার এবং এক হাজার বছর আগের মধ্য-আমেরিকার মায়াদের জীবনযাত্রার খুব মিল ছিল। নরবলি দেওয়ার প্রথা যদি বা থাকত, সেটা নিশ্চয় ইতিহাসের আলো ফোটবার অনেকদিন আগেই পশুবলিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর এক হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের অনেক আগেই এক ধরনের চিত্রলিপি গড়ে উঠছিল।

আর ঠিক যেভাবে ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ার আদিম সভ্যতাগুলোর সঙ্গে মরুভূমির যাযাবর আর উত্তর দিকের যাযাবরদের সংঘর্ষ বাধছিল, ঠিক সেইভাবে যাযাবর জাতির এক বিরাট মেঘ জড় হয়েছিল আদিম চীন সভ্যতা-গুলোর উত্তর সীমানায়। কতকগুলো উপজাতি ছিল যাদের ভাষা এবং জীবনযাত্রার ধরন প্রায় একরকম—ইতিহাসে যাদের পরপর হুন, মঙ্গোল, তুর্ক এবং তাতার বলা হয়। তারা বদলেছে, ভাগ হয়ে গেছে, মিলেছে, আবার মিলেছে,—ঠিক যেভাবে উত্তর ইউরোপের আর মধ্য এশিয়ার নর্দিক জাতিগুলো বদলেছে; এবং পরিবর্তনটা হয়েছে তাদের নামের, তাদের প্রকৃতির নয়। এই মঙ্গোলীয় যাযাবররা নর্দিক জাতিগুলোর আগে ঘোড়া ব্যবহার করতে শিখেছিল আর হয়ত আলতাই পর্বতাঞ্চলে ১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা স্বাধীনভাবে লোহা আবিষ্কার করেছিল। এবং ঠিক পশ্চিমের মত এই পুবের যাযাবরেরাও প্রায়ই এক ধরনের রাজনৈতিক একতায় বদ্ধ হত আর কোন-না-কোন স্থিত সভ্যতার বিজেতা প্রভু বা উজ্জীবনকারী হয়ে উঠত।

এটা খুবই সম্ভব যে চীনের একেবারে গোড়াকার সভ্যতা একেবারেই মঙ্গোলীয় ছিল না, যেমন ইউরোপ বা পশ্চিম এশিয়ার একেবারে গোড়াকার সভ্যতা নর্দিক বা সেমিটিক ছিল না। এও খুবই সম্ভব যে চীনের একেবারে গোড়াকার সভ্যতা ছিল এক বাদামি সভ্যতা,—একেবারে গোড়াকার মিশরীয়, সুমেরীয় এবং দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে একগোত্রের এবং যখন চীনে প্রথম লিখিত ইতিহাসের শুরু হয়েছে তার মধ্যেই বহু জয় এবং মিশ্রণ ঘটে গেছে। যাই হোক, ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দেই আমরা দেখতে পাই যে চীন এর মধ্যেই কতকগুলো ছোট-ছোট রাজ্য আর নগররাষ্ট্রের এক বিরাট সম্মেলন হয়ে উঠেছে, যাদের সকলেই একটা নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে এবং কম-বেশি নিয়মিতভাবে, কম-বেশি নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্রীয় কর দেয় একজন বিরাট পুরোহিত-নৃপতি—'স্বর্গের পুত্র'কে। শাঙ বংশ ১১২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে শেষ হল। শাঙ-বংশের পরে এল এক 'চৌ' বংশ। ভারতবর্ষে অশোক আর মিশরে টলেমিদের সময় পর্যন্ত তারা চীনকে একটা আলগা ঐক্যবন্ধনে ধরে রেখেছিল। এই দীর্ঘ 'চৌ' আমলে চীন ক্রমে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। হুনদের মত এক জাতের লোকের নেমে এসে ছোটখাট নগর গড়ে তুলল। স্থানীয় শাসকেরা কর দেওয়া বন্ধ করে স্বাধীন হয়ে উঠল। এক চীন-বিশেষজ্ঞের মতে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে পাঁচ কি ছ-হাজার প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এটাকেই চীনারা তাদের নথিপত্রে 'বিশৃঙ্খলার যুগ' বলে।

কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার যুগের সঙ্গে তীব্র মানসিক সক্রিয়তা এবং বহু স্থানীয় কলা এবং সভ্য জীবনযাপন কেন্দ্রের অবস্থিতির মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিল না।

চীনের ইতিহাস আরো জানলে আমরা দেখতে পাব যে চীনেরও মিলেটাস এবং এথেন্স ছিল, পের্গামাম আর ম্যাসিডোনিয়া ছিল। চীনের বিভাগের এই যুগ সম্বন্ধে এখন আমাদের অস্পষ্ট এবং অল্পভাষী হতেই হবে, কারণ একটা সুসম্বদ্ধ এবং ধারাবাহিক কাহিনী গঠন করবার পক্ষে পর্যাপ্ত জ্ঞান আমাদের নেই।

আর ঠিক যেমন বিভক্ত গ্রীসে দার্শনিকেরা ছিলেন আর বিধ্বস্ত আর বন্দী ইহুদীদের মধ্যে ছিলেন প্রফেটরা, তেমনি বিশৃঙ্খল চীনে এই সময়ে দার্শনিক এবং শিক্ষকেরা ছিলেন। এই সবগুলো স্থলেই উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তাই বোধহয় উঁচু ধরনের চিন্তাকে উজ্জীবিত করেছে। কনফুসিয়াস ছিলেন এক অভিজাত বংশের লোক। লু বলে একটা ছোট রাষ্ট্রে তাঁর কিছু রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাও ছিল। এখানে গ্রীসদের সঙ্গে খুব মিল আছে এমন এক মেজাজে তিনি জ্ঞানের আবিষ্কার এবং শিক্ষার জন্য আকাদেমি স্থাপন করলেন। চীনের অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলায় তিনি গভীর বেদনা বোধ করতেন। তিনি উৎকৃষ্টতর শাসনব্যবস্থা এবং জীবন-যাপনের এক আদর্শ মনের মধ্যে গঠন করে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে এমন রাজপুত্রের সন্ধানে ঘুরেছেন যিনি তাঁর শাসনতান্ত্রিক এবং শিক্ষামূলক ধারণাগুলোকে রূপ দেবেন। তিনি তাঁর রাজপুত্রকে খুঁজে পান নি: একজন রাজপুত্র তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজদরবারের ষড়যন্ত্র গুরুর প্রভাব ক্ষয় করে শেষ পর্যন্ত তাঁর সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলো নষ্ট করে দেয়। দেখলে বিচিত্র লাগে যে দেড়শো বছর পরে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও একজন রাজপুত্র খুঁজেছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য সিসিলিতে সিরাকিউসের অত্যাচারী রাজা ডায়োনিসিয়ুসের পরামর্শদাতা ছিলেন।

নিরাশ হৃদয়ে কনফুসিয়াস মারা যান। তিনি বলেছিলেন, কোন বুদ্ধিমান শাসক আমাকে গুরু বলে স্বীকার করতে এল না, আর এখন আমার মরবার সময় এসেছে। কিন্তু তাঁর শেষের দিককার অসহায় দিনগুলোয় তিনি যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে তাঁর শিক্ষার মধ্যে বেশি সজীবতা ছিল এবং চীনের অধিবাসীদের উপর তা একটা বিরাট গঠনমূলক প্রভাব হয়ে উঠল। চীনারা যাকে ত্রি-শিক্ষা (Three Teachings) বলে এটা তার একটা হয়ে উঠল। আর দুটো হচ্ছে বুদ্ধ আর লাওৎসের শিক্ষা।

কনফুসিয়াসের শিক্ষার সারমর্ম হচ্ছে, উঁচু বা অভিজাত-বংশীয় লোকদের চালচলন। গৌতম যেমন আত্মবিস্মৃতির শান্তি নিয়ে মাথা ঘামাতেন, গ্রীকেরা যেমন বাইরের জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করত এবং ইহুদীরা চিন্তা করত ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে, তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামাতেন। সব বড়-বড়

শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সরকারী-মনোভাবসম্পন্ন। তিনি পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা এবং দুঃখ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতেন এবং মানুষকে মহান করতে চাইতেন, যাতে এক মহত্তর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। তিনি ব্যবহারকে অত্যধিকরূপে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সঠিক নিয়ম সরবরাহ করতে। এক নম্র, সমাজ-চেতনাসম্পন্ন ভদ্রলোক, কিছুটা কঠোর ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণকারী—এই ধারণাটা উত্তর চীনের সর্বত্র তিনি ইতিমধ্যেই গড়ে উঠতে দেখেছিলেন। এটাকেই তিনি স্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন।

লাওৎসে বহুকাল চৌ বংশের রাজকীয় পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষা কনফুসিয়াসের চেয়ে বেশি রহস্যময়, অস্পষ্ট এবং প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি পৃথিবীর সুখ এবং শক্তির প্রতি একটা সন্ন্যাসীসুলভ অবহেলার ভাবই যেন প্রচার করেন এবং চান যে আমরা অতীতের কাল্পনিক সরল জীবনে ফিরে যাই। তিনি যেসব লেখা রেখে গেছেন সেগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ধরনের, এবং দুর্বোধ্য। তিনি হেঁয়ালি করে লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষাও গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার মতই, কলুষিত হয়েছিল। তাদের উপর নানারকম কাহিনী চাপানো হয়েছিল এবং অত্যন্ত জটিল ও অদ্ভুত সব অনুষ্ঠান এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা আমাদের জাতির শিশুসুলভ অতীত থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে লড়াই করে তার উপর অদ্ভুত, অযৌক্তিক, প্রাচীন সব অনুষ্ঠানের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। চীনদেশ এখন যেভাবে দেখতে পাওয়া যায় তাতে বৌদ্ধ এবং তাও ধর্ম (যেটা বহুল ভাবে লাওৎসের গড়া বলে বলা হয়) বাদে শ্রমণ, মন্দির, পুরোহিত এবং নৈবেদ্য নিয়ে যে রূপ সেটা হচ্ছে চিন্তার দিক থেকে না হলেও রূপের দিক থেকে প্রাচীন সুমেরিয়া ও মিশরের বলি-দেওয়া ধর্মগুলোর সগোত্র। তবে, কনফুসিয়াসের শিক্ষার উপর এভাবে কিছু চাপানো যায় নি, কারণ তা ছিল সীমাবদ্ধ, সরল, সোজাসুজি ; এবং তাকে এভাবে বিকৃত করা সম্ভব ছিল না।

উত্তর চীন, হোয়াং-হো নদীর চীন, চিন্তায় এবং ভাবে কনফুসিয়ান হয়ে উঠল। দক্ষিণ চীন, ইয়াংসিকিয়াং-এর চীন, তাও ধর্ম গ্রহণ করল। সেইদিন থেকে চীনের ব্যাপারে সব সময় একটা সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়—সেটা হচ্ছে উত্তর আর দক্ষিণের ভাবধারার সংঘর্ষ, যেটা (পরে) পিকিং এবং নানকিং-এর সংঘর্ষ,—নিয়মতান্ত্রিক, ঋজু এবং রক্ষণশীল উত্তরের সঙ্গে অবিশ্বাসী, শিল্পীসুলভ, আলগা এবং পরীক্ষানিরত দক্ষিণের সংঘর্ষ।

বিশৃঙ্খলার যুগের চীনের বিভাগগুলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। চৌ বংশ এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের এত দুর্নাম হয়েছিল যে লাওৎসে সেই নিরানন্দ রাজদরবার ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবন যাপন করেন। তিনটে মোটামুটি নিচু স্তরের শক্তি তখনকার অবস্থায় প্রাধান্য করত—ৎশি আর ৎশিন দুটোই উত্তরের শক্তি আর চু, যেটা ছিল ইয়াংসি উপত্যকার একটা আক্রমণকারী সামরিক শক্তি। শেষ পর্যন্ত ৎশি আর ৎশিন মৈত্রীস্থাপন করে চু-কে বশ্যতা স্বীকার করাল আর চীনে নিরস্ত্রকরণ এবং শান্তির একটা সাধারণ সন্ধি স্থাপন করল। ৎশিন-এর শক্তি ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করল। অবশেষে অশোকের সময় নাগাদ ৎশিন নৃপতি চৌ সম্রাটের যজ্ঞপাত্র এবং তাঁর যাজ্ঞিক কর্তব্যগুলোও গ্রহন করলেন। তাঁর পুত্র, শি হোয়াং-তিকে (২৪৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা, ২২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট) চীনের ইতিহাসে 'প্রথম বিশ্বজনীন সম্রাট' বলা হয়।

অ্যালেকজাণ্ডারের চেয়ে সৌভাগ্যশালী শি হোয়াংতি ছত্রিশ বছর ধরে রাজা এবং সম্রাট হিসাবে রাজত্ব করেন। তাঁর শক্তিশালী রাজত্বকাল চীনের অধিবাসীদের পক্ষে ঐক্য এবং সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করে। উত্তর মরুভূমির হুনজাতীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তিনি সতেজে যুদ্ধ করেন এবং তাদের আক্রমণকে সীমাবদ্ধ করার জন্য তিনি চীনের বিরাট প্রাচীর নির্মাণের প্রকাণ্ড কাজ শুরু করেন।

ইতিহাসে রোমের প্রবেশ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্য-এশীয় ও ভারতীয় পর্বতমালা দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাঠকেরা এই সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসে এক সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। প্রথমে হাজার হাজার বছরের পুরাতন পৃথিবীর উষ্ণ উর্বর নদীর ধারে ধারে হেলিওলিথিক সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল এবং মন্দির-রীতি ও তার যজ্ঞীয় ঐতিহ্য ঘিরে পুরোহিত শাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। স্পষ্টত এই প্রবর্তনকারীরা ছিল সেই কৃষ্ণবর্ণের মানুষ, যাদের আমরা মানব-সমাজের কেন্দ্রীয় জাতি বলে এসেছি। তারপর মরশুমী ঘাসের দেশ থেকে এল যাযাবরেরা; তারা আদিম সভ্যতার উপর নিজেদের প্রভাব এবং প্রায় সময়েই নিজেদের ভাষাও আরোপ করল। তারা এদের পরাভূত করে সজীব করার প্রয়াস করল এবং নিজেরাও নতুন করে বিকশিত হল, এখানে একভাবে অন্যখানে অন্যভাবে। মেসোপটেমিয়ায় এরা ছিল প্রথমে এলামাইট, পরে সেমাইট, এবং সবশেষে

সর্দিক মীড পারসীক এবং গ্রীক, যারা এই মাতনে যোগ দেয় ; ঈজীয় অঞ্চলে এরা ছিল গ্রীক ; মিশরে অতিমাত্রায় পরিপূর্ণ পুরোহিত-সভ্যতার মধ্যে অল্পসংখ্যক বিজেতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ; চীনে হুনেরা জয়ী হয়ে দেশের লোকের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, এবং আবার নতুন করে হুনেরা এসেছিল। গ্রীস ও উত্তর-ভারত যেমন আর্য-সভ্যতা-সম্পন্ন হয়েছিল, মেসোপটেমিয়া আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাসম্পন্ন হয়েছিল, চীনও অনুরূপ মঙ্গোলীয় হয়ে উঠল। প্রতিটি দেশে যাযাবরের দল অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু সব দেশেই এনে দিয়েছে মুক্ত অনুসন্ধান ও নৈতিক মতবাদের পুনর্নব উৎসাহ। স্মরণাতীত যুগের বিশ্বাসে তারা আঘাত হেনেছিল, ধর্ম-জীবনে এনেছিল নতুন জ্ঞানের আলো। তারা তৈরি করেছে রাজা যাঁরা পুরোহিত নন দেবতাও নন—তাদের সঙ্গী ও সর্দারদের মধ্যে শুধু দলপতি তাঁরা।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আমরা দেখি প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরাট বিলোপ-সাধন এবং পরিবর্তে নৈতিক ও চৈতন্যময় অনুসন্ধিৎসার নব জাগরণ, যে-উৎসাহ সমগ্র মানব-সমাজের দুর্দম অগ্রগতিতে কোনদিনই আর দমিয়ে রাখা যায় নি। শাসক এবং বিত্তশালী গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা লেখা ও পড়া সহজ এবং উপভোগ্য কৃতিত্ব বলে পরিগণিত হতে দেখি ; পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সযত্ন-রক্ষিত গুপ্ত রহস্য বলে তা আর রইল না। ভ্রমণ দিন দিন বাড়তে লাগল এবং পথঘাটের জন্য পরিবহনও সহজ হয়ে উঠল। মুদ্রার উদ্ভাবনীতে বাণিজ্যের সুবিধার এক নতুন এবং সহজ উপায়ও পাওয়া গেল।

এবার আমাদের দৃষ্টি পুরাতন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের চীন থেকে ফিরিয়ে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমার্ধে আনা যাক। এখানে আমরা দেখি এক নতুন নগরীর অভ্যুদয়, যে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল : রোম।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গল্পে আমরা ইটালির সম্বন্ধে খুব কম কথা বলেছি। খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে ইটালি ছিল বনজঙ্গল ও পাহাড়ময় এক দেশ এবং বসতি ছিল খুব কম। আর্যভাষী বহু উপজাতি এই উপদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ছোট ছোট শহর ও নগর গড়ে তুলেছিল এবং দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীকেরা বহু উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এইসব প্রথম গ্রীক উপনিবেশের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের কিছু কিছু নিদর্শন আজও পিস্টামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। সম্ভবত ঈজীয়দের অনুরূপ এট্রুস্কান নামে এক অনার্য জাতি এই উপদ্বীপের মধ্য-অঞ্চলে তাদের বসতি পত্তন করেছিল। আর্যদের দ্বারা পরাস্ত না হয়ে, তারা বহু আর্য

জাতিকে পরাস্ত করে তাদের অধীনে এনে (নিয়মিত ধারার বিপরীতভাবে), এক উদাহরণ সৃষ্টি করে। ইতিহাসের পাতায় যখন রোমের নাম পাওয়া যায়, তখন রোম এট্রুস্কান রাজার অধীনে টাইবার নদীর উপর ল্যাটিনভাষী একটি ছোট বাণিজ্য-নগরী। পুরাতন কালপঞ্জীতে রোমের প্রতিষ্ঠা ৭৫৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে, পরম শক্তিশালী ফিনিসীয় নগরী কার্থেজের প্রতিষ্ঠার অর্ধ-শতাব্দী এবং প্রথম অলিম্পিয়াডের তেইশ বছর পরে। অবশ্য, ৭৫৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেও এট্রুস্কান সমাধি-মন্দিরের চিহ্ন রোম্যান ফোরামে খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

সেই গৌরবময় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এট্রুস্কান রাজারা বিতাড়িত হলেন (৫১০ খৃষ্টপূর্ব) এবং রোমকে একটি সম্ভ্রান্ত সাধারণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে উচ্চবংশীয় (Patrician) অভিজাত এক শ্রেণী জন-সাধারণের (Plebian) উপর আধিপত্য শুরু করল। একমাত্র ল্যাটিনভাষী হওয়া ছাড়া অন্যান্য গ্রীক সাধারণতন্ত্র রাজ্যের সঙ্গে এর কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

কয়েক শতাব্দী ধরে রোমের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস ছিল জনসাধারণের স্বাধীনতা ও শাসনকার্যের অংশীদার হওয়ার সুদীর্ঘ ও দুর্নিবার সংগ্রামের কাহিনী। গ্রীকদের মধ্যেও এই ধরনের বিরোধের কাহিনী পাওয়া দুষ্কর হবে না, যদিও গ্রীকেরা একে বলত অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর প্রায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে শাসনকার্যে তাদের সঙ্গে সমদায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়। প্রাচীন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে ধীরে ধীরে বহির্দেশীয় লোকদের পক্ষে রোমের নাগরিকত্বের অধিকার সাদরে গ্রহণ করা সম্ভব হয় : কারণ, দেশের আভ্যন্তরীণ এই সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে তার শক্তি ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছিল।

রোমের শক্তির প্রসার শুরু হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে। এতদিন পর্যন্ত তারা এট্রুস্কানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হয়েছিল। রোম থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভেঈ নামে এক এট্রুস্কান দুর্গ ছিল, যা রোম্যানরা কোনদিন অধিকার করতে পারে নি। কিন্তু ৪৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে এট্রুস্কানেরা চরম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়। তাদের যুদ্ধজাহাজের বহর সিসিলিতে সিরাকিউসের গ্রীকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ঠিক সেই সময় গল নামে একদল নর্দিক আক্রমণকারী উত্তর থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রোম্যান ও গলের মাঝখানে পড়ে এট্রুস্কানেরা পরাভূত এবং ইতিহাস থেকে অবলুপ্ত হয়। রোম্যানরা ভেঈ অধিকার করে। গলরা রোম পর্যন্ত এসে নগরীটি লুণ্ঠন করে (৩৯০ খৃঃ পূঃ), কিন্তু ক্যাপিটল অধিকার করতে পারে না। এক অতর্কিত নৈশ

আক্রমণ কতকগুলি হাঁসের চিৎকারে ব্যর্থ হয় এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আক্রমণকারীরা ইটালির উত্তরে আবার সরে যায়।

মনে হয়, গলের আক্রমণ রোমকে দুর্বল করার চেয়ে বরং সতেজ করে তুলেছিল। রোম্যানরা এট্রুস্কানদের পরাজিত করে তাদের নিজেদের সঙ্গে এক করে নিয়েছিল এবং আর্নো থেকে নেপল্‌স্‌ পর্যন্ত সমস্ত মধ্য-ইটালিতে তারা শক্তি বিস্তার করেছিল। এই শক্তি বিস্তার করতে তাদের ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের পর মাত্র কয়েক বছর লাগে। তাদের ইটালীয় জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসে ফিলিপের শক্তির অভ্যুত্থান এবং অ্যালেকজাণ্ডারের মিশর ও সিন্ধুর ভয়ঙ্কর অভিযান চলছিল। অ্যালেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের ভাঙনে পূর্বাঞ্চলের সভ্য জগতে রোম্যানরা বিশিষ্ট আসন লাভ করে।

রোম্যান শক্তির উত্তরে ছিল গলেরা, দক্ষিণে ছিল গ্রীকদের বিশাল গ্রীস উপনিবেশ, অর্থাৎ সিসিলি এবং ইটালির দক্ষিণতম প্রান্ত। গলরা ছিল দৃঢ়কায় সমরপটু জাতি, সেইজন্য রোম্যানরা তাদের সীমান্ত সুদৃঢ় দুর্গ ও দুর্ভেদ্য উপনিবেশ দিয়ে সুরক্ষিত করেছিল। ট্যারাণ্টাম (এখন টারাণ্টো) ও সিসিলির সিরাকিউসের নেতৃত্বে দক্ষিণের গ্রীক নগরীগুলি রোম্যানদের আশঙ্কার কারণ না হয়ে বরং ভয় করেছে। এই নতুন বিজয়ীদের বিরুদ্ধে বরং তারা অন্য কোথাও কোন সাহায্যের সন্ধান করেছে।

আমরা আগেই বলেছি কী করে অ্যালেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে তাঁর সেনাপতি ও সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যালেকজাণ্ডারের এক জ্ঞাতি, পিরাস; ইটালির দক্ষিণতম প্রান্তে আড্রিয়াটিক সাগরস্থিত এপিরাসে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল বিশাল গ্রীসে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার ফিলিপের ভূমিকা অভিনয় করবেন এবং ট্যারাণ্টাম, সিরাকিউস ও পৃথিবীর ঐ অঞ্চলের অবশিষ্টাংশের রক্ষাকর্তা ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ হবেন। কালানুযায়ী তাঁর এক অত্যন্ত পারদর্শী আধুনিক সেনাবাহিনী ছিল, তাঁর পদাতিক বাহিনীর এক সুরচিত ব্যূহ ছিল, আর ছিল আদি ম্যাসিডনীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সমকক্ষ থেসালির অশ্বারোহী বাহিনী ও কুড়িটি সমর-কুশল হাতী। ইটালি আক্রমণ করে তিনি রোম্যানদের হেরাক্লিয়া (২৮০ খৃঃ পূঃ) এবং আউসকিউলামের (২৭৯ খৃঃ পূঃ) দুটি ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাদের উত্তরে তাড়িয়ে দিয়ে সিসিলি বিজয়ের দিকে দৃষ্টি দেন।

কিন্তু তার ফলে তাঁকে সম্মুখীন হতে হল তখনকার রোম্যানদের চেয়ে অনেক

শক্তিশালী এক শত্রুর: সে-যুগের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নগরী, ফিনিসীয়দের বাণিজ্যনগরী কার্থেজ। নতুন এক অ্যালেকজাণ্ডারকে স্বাগত জানানোর পক্ষে সিসিলি কার্থেজের অত্যন্ত কাছে বলে কার্থেজবাসীদের মনে হল: অর্ধ-শতাব্দী আগে তার আদি-জননী টায়ারের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা কার্থেজের স্মরণে ছিল। সুতরাং সে এক রণতরী বাহিনী পাঠিয়ে রোমকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত বা বাধ্য করল এবং পিরাসের সমস্ত বহিঃসংযোগ ছিন্ন করে দিল। পিরাসকে আবার নতুন করে রোম্যানদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল এবং নেপলস ও রোমের মধ্যবর্তী বেনেভাণ্টামের শিবির আক্রমণ করে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হল।

হঠাৎ একটি সংবাদে তাঁকে এপিরাসে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। গলরা দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করেছে। কিন্তু এবারে তারা ইটালির মধ্য দিয়ে আক্রমণ করে নি; দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত রোম-সীমান্ত তাদের অনতিক্রম্য ছিল। তারা আক্রমণ চালিয়েছিল ইলিরিয়ার (বর্তমান সার্বিয়া ও আলবানিয়া) মধ্য দিয়ে ম্যাসিডোনিয়া ও এপিরাসের দিকে। রোমের কাছে পরাস্ত, কার্থেজের কাছে সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত এবং গলদের দ্বারা স্বদেশ আক্রান্ত দেখে পিরাস তাঁর পৃথিবী-বিজয়ের স্বপ্নে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন (২৭৫ খৃঃ পূঃ) এবং রোমের শক্তি মেসিনা প্রণালী পর্যন্ত প্রসারিত হল।

এই মেসিনা প্রণালীর সিসিলির দিকে ছিল গ্রীক নগরী মেসিনা এবং এই নগরী কিছুদিনের মধ্যেই একদল জলদস্যুর করায়ত্ত হল। কার্থেজবাসীরা ইতিমধ্যে কার্যত সিসিলির একচ্ছত্রাধিপতি হয়ে উঠেছিল এবং সিরাকিউসের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল; তারা এই জলদস্যুদের দমন করে (২৭০ খৃঃ পূঃ) সেখানে এক সৈন্যবাহিনী রাখল। জলদস্যুরা আবেদন জানাল রোমের কাছে এবং রোম তাদের আবেদনে সাড়া দিল। সুতরাং মেসিনা প্রণালীর দুই দিকে মহাপরাক্রমশালী বাণিজ্য-নগরী কার্থেজ এবং এই নতুন বিজয়ী শক্তি, রোম্যান, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

রোম ও কার্থেজ

রোম এবং কার্থেজের মধ্যে দুরন্ত সংগ্রাম, পিউনিক যুদ্ধ, শুরু হল ২৬৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে। সেই বছর বিহারে অশোকের রাজত্ব শুরু হয়। শি হোয়াংতি তখন ছোট শিশু, অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার মিউজিয়াম তখনও চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত এবং বর্বর গলরা এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হয়ে পেরগামামের কাছ থেকে কর

আদায় করছে। অনধিক্রম্য দূরত্ব তখন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে বিযুক্ত করে রেখেছে এবং হয়ত মনুষ্য-জাতির অবশিষ্টাংশ স্পেন, ইটালি, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় দেশে সেমিটিক শক্তির শেষ ঘাঁটি এবং আর্যভাষীদের মধ্যে নবাগত রোমের মধ্যে সার্ধ-শতাব্দীব্যাপী জীবন-মরণ সংগ্রামের অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট গুজব শুনতে পাচ্ছে।

সেই যুদ্ধের কয়েকটি প্রশ্ন আজও সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত করছে। কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে রোম বিজয়ী হল, কিন্তু আর্য ও সেমিটিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশেষে অ-ইহুদী (Gentiles) ও ইহুদীর মধ্যে বিবাদ হয়ে দেখা দিল। আমাদের ইতিহাস ধীরে ধীরে এমন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এসে পড়ছে, যার পরিণাম ও বিকৃত ঐতিহ্য আজকের বিবাদ ও বিসংবাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী এক মুমূর্ষু প্রাণশক্তির ছাপ এবং এক জটিল ও বিশৃঙ্খল প্রভাব বিস্তার করেছে।

খৃষ্টপূর্ব ২৬৪ সালে মেসিনার জলদস্যুদের নিয়ে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত সিরাকিউসের গ্রীক রাজার রাজ্য বাদ দিয়ে সমগ্র সিসিলি অধিকারের সংগ্রাম হয়ে এই যুদ্ধ দাঁড়াল। প্রথম-প্রথম সমুদ্রের সুবিধা ও কর্তৃত্ব ছিল কার্থেজের হাতে। তাদের রণতরী ছিল তখনকার পক্ষে কল্পনাতীত বিরাট আকৃতির—পাঁচ সারি তার দাঁড়, বর্শা-ফলকের মত সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ লৌহ-অগ্রভাগ। দুই শতাব্দী আগে সালামিসের যুদ্ধে সুখ্যাত রণতরীগুলির ছিল মাত্র তিন সারি দাঁড়। কিন্তু নৌ-বিদ্যার সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়েও রোম অসামান্য উদ্যমে কার্থেজের চেয়েও বিরাট রণতরী নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়। প্রধানত গ্রীক নৌ-সেনা দিয়েই তারা তাদের নৌ-বাহিনী গঠন করে এবং শত্রুদলের উন্নত নৌ-চালনার প্রতিপূরক হিসাবে আবিষ্কার করে বিরাট আঁকড়া ও রণতরী থেকে সহজে ওঠা-নামার জন্য বিরাট পাটাতন। কার্থেজের রণতরী রোমের রণতরী ছিদ্র বা বিদীর্ণ করার জন্য অগ্রসর হলেই বিরাট আঁকড়া তাকে আটকে ফেলত এবং রোম্যান সৈনিকেরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলত। মাইলি (২৬০ খৃঃ পূঃ) এবং এক্নমিসএ (২৫৬ খৃঃ পূঃ) কার্থেজ ভীষণভাবে পরাজিত হল। কার্থেজের নিকট রোমের অবতরণ প্রতিরোধ করতে তারা সমর্থ হল বটে, কিন্তু পালের্মোতে তারা ভীষণভাবে পরাজিত হল, হস্তচ্যুত হল একশো চারটি হাতী। সেই বিজয়-গৌরব স্মরণীয় করবার জন্য ফোরামের মধ্য দিয়ে রোমে এক অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা হয়। তারপর রোম্যানদের দু-বার পরাজয় এবং পুনরুজ্জীবন। শেষ সঙ্ঘর্ষে কার্থেজের অবশিষ্ট নৌ-বাহিনীও ইজেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে রোমের কাছে পরাজিত হয় (২৪১ খৃঃ পূঃ) এবং

কার্থেজ রোমের কাছে শান্তির আবেদন জানায়। সিরাকিউসের রাজা হিয়েরোর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র সিসিলি রোম্যানদের সমর্পণ করতে হল।

বাইশ বছর রোম এবং কার্থেজ শান্তি রক্ষা করে এসেছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রচুর ঝঞ্ঝাট নিয়েই উভয়ে ব্যস্ত ছিল। আবার ইটালিতে গলরা দক্ষিণমুখী অভিযান চালিয়ে রোম আক্রমণ করেছিল—আতঙ্ক-বিহ্বল রোম ভগবানের নামে নরবলিও পর্যন্ত দিল!—এবং গলরা টেলামনের যুদ্ধে পর্যুদস্ত হল। রোম আল্পস পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হল, এমন কি তার সাম্রাজ্য অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল ধরে ইলিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল। আভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং কর্সিকা ও সার্দিনিয়ার বিদ্রোহে কার্থেজ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল এবং পুনরভ্যুদয়ের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অবশেষে এক অত্যন্ত লজ্জাজনক আক্রমণে রোম ঐ দুটি বিদ্রোহী দ্বীপকে অবরোধ করে গ্রাস করে।

উত্তরে এবরো নদী পর্যন্ত স্পেন সে-সময় কার্থেজের অধিকারে ছিল। ঐ পর্যন্ত রোম্যানরা তাদের সীমা নির্দিষ্ট করে দিল, কার্থেজিনিয়ানরা নদী পার হলে যুদ্ধ ঘোষণা হল বলে বিবেচিত হবে। রোম্যানদের চড়াও হয়ে আক্রমণে উত্যক্ত হয়ে অবশেষে ২১৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র ইতিহাসের অন্যতম প্রতিভাদীপ্ত সেনাধ্যক্ষ, তরুণ সেনাপতি হানিবলের নেতৃত্বে কার্থেজ বাহিনী এবরো নদী অতিক্রম করল! স্পেন থেকে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আল্পস ডিঙিয়ে তিনি ইটালিতে প্রবেশ করলেন, রোম্যানদের বিরুদ্ধে গলদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে উৎসাহিত করলেন এবং এক ইটালিতেই পনের বছর ধরে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। লেক ট্রাসিমিন ও ক্যানির যুদ্ধে তিনি রোম্যানদের ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন এবং তাঁর সমগ্র ইটালি-অভিযানে কোন রোম্যান সেনাবাহিনীই তাঁর সম্মুখীন হয়ে ধ্বংসের কবল থেকে রেহাই পায় নি। কিন্তু এক রোম্যান বাহিনী মার্সেইলসে অবতরণ করে স্পেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়, এবং রোম অধিকার করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবশেষে, দেশে নিউ-মিডিয়ানদের বিদ্রোহে ভীত হয়ে কার্থেজিনিয়ানদের আফ্রিকায় নিজেদের নগরীর সাহায্যে ফিরতে হয়; এক রোম্যান সৈন্যবাহিনীও আফ্রিকায় অবতরণ করে এবং সিপিও আফ্রিকানাস এল্ডারের হাতে জামা-র যুদ্ধে হানিবল জীবনে সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করেন (২০২ খৃঃ পূঃ)। জামা-র যুদ্ধেই এই দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সমাপ্তি হল। কার্থেজ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করল; রোম্যানদের হাতে সমর্পণ করতে হল স্পেন ও রণতরী, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে হল, এবং রোম্যানদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হানিবলকে তাদের হাতে তুলে দিতে

স্বীকৃত হল। কিন্তু হানিবল এশিয়ায় পালিয়ে যান এবং পরে সেখানে নিষ্ঠুর শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়ার সম্ভাবনায় তিনি বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন।
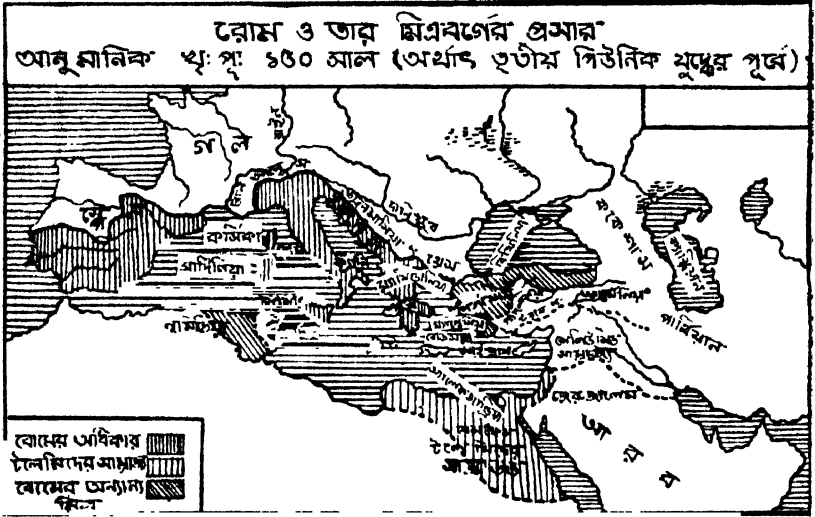
ছাপান্ন বছর রোম এবং ছিন্নভিন্ন কার্থেজ নগরী শান্তিতে ছিল। এই অবসরে রোম বিশৃঙ্খল ও বিভক্ত গ্রীসে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে এবং ম্যাগ্নেসিয়ার (লিডিয়া) সেলিউসিড সম্রাট তৃতীয় অ্যান্টিওকাসকে পরাজিত করে। মিশর, যা তখনও পর্যন্ত টলেমিদের অধিকারে ছিল, পেরগামাম এবং এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ ছোট-ছোট রাজ্যগুলিকে রোম তার মিত্র রাজ্যে পরিণত করল, কিংবা এখন তাদের আমরা যেমন বলব, আশ্রিত রাজ্যে।

ইতিমধ্যে পরাভূত ও হীনবল কার্থেজ ধীরে ধীরে তার পূর্ব শ্রী ও সম্পদ ফিরিয়ে আনছিল। তার এ হৃতশ্রী-পুনরুদ্ধারের চেষ্টা রোম্যানদের ঘৃণা ও সন্দেহের উদ্রেক করে। অত্যন্ত সামান্য কারণে এবং কাল্পনিক এক কলহের সূত্র ধরে রোম্যানরা তাকে আক্রমণ করল (১৪৯ খৃঃ পূঃ)। দুর্নিবার দৃঢ়তায় কার্থেজ প্রতিরোধ করে দাঁড়াল এবং সুদীর্ঘ অবরোধ সহ্য করে বিধ্বস্ত হল (১৪৬ খৃঃ পূঃ)। পথে-ঘাটে সঙ্ঘর্ষ বা নির্মম হত্যাকাণ্ড চলল ছয় দিন ধরে, এবং যখন দুর্গ আত্ম-সমর্পণ করল তখন আড়াই লক্ষ কার্থেজিনিয়ানদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার অবশিষ্ট ছিল। দাস হিসাবে তাদের বিক্রয় করা হল, তারপর নগরীকে ভস্মীভূত করে সযত্নে ধ্বংস করা হল। কার্থেজের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে মুছে ফেলার জন্য দগ্ধ ধ্বংসাবশেষের উপর লাঙল চালিয়ে বীজ বপন করা হল।

এইভাবে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়। পাঁচ শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীতে যত সেমেটিক রাজ্য বা নগরীর উত্থান হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র একটি ছোট দেশ দেশীয় শাসকের অধীনে স্বাধীন রইল। এটি জুডিয়া; সেলিউসিডদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তখন দেশীয় ম্যাকাবিয়ান রাজার শাসনাধীন ছিল। এই সময় তাদের বাইবেল প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এবং আজ আমরা যেমন জানি, সেই ধরনের ইহুদী-জগতের এক বিশেষ ঐতিহ্য সেখানে বিকশিত হচ্ছিল। কার্থেজিনিয়ান, ফিনিসিয়ান এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ানো অনুরূপ জাতি তাদের প্রায় একই ধরনের ভাষায় এবং এই আশা ও সাহসের সাহিত্যে যে এক সাধারণ যোগসূত্র খুঁজে পাবে তা খুবই স্বাভাবিক। সত্য কথা বলতে গেলে, তারা তখনও বিশ্বের বণিক ও মহাজন সম্প্রদায়। এতে যে সেমেটিক জগতের পরিবর্তে নতুন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হল তা নয়; সেমেটিক জগৎ বরং চাপা পড়ে রইল বলা যেতে পারে।

জেরুজালেম জুডাইজমের কেন্দ্র না হয়ে বরাবর তার প্রতীক বলেই স্বীকৃত হয়েছে। সেই জেরুজালেম ৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোম্যানরা অধিকার করে, এবং বহু ভুয়া-স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের ঘূর্ণিপাকের পর রোম্যানরা ৭০ খৃষ্টাব্দে এই নগরী অবরোধ করে এবং দুর্নিবার সংগ্রামের পর পুনরধিকার করে। মন্দির ধ্বংস করা হয়। ১৩২ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ নগরীর ধ্বংস সম্পূর্ণ করে, এবং আজ যে জেরুজালেমকে আমরা জানি, তা রোম্যানদের প্রচেষ্টায় পুনর্গঠিত হয়। রোম্যানদের দেবতা, জুপিটার ক্যাপিটলিনাসের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল আগের মন্দিরের জায়গায়, এবং এই নগরীতে ইহুদীদের বসবাস নিষিদ্ধ হল।

রোম সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে পশ্চিম জগতের উপর প্রভুত্ব করলেও, এই রোম্যান শক্তি তখন পর্যন্ত যে-কোনো বিরাট সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল। এখানে প্রথমে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নি এবং কোন বিশেষ বীরও এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। সাধারণতন্ত্র রাজ্যের মধ্যেও এটি প্রথম নয়; পেরিক্লিসের সময় এথেন্স একদল মিত্র ও আশ্রিত রাজ্যের উপর আধিপত্য করেছে, এবং কার্থেজ যখন রোমের সঙ্গে তার চরম সংগ্রামে লিপ্ত তখন সার্দিনিয়া ও কর্সিকা, মরোক্কো, আলজিয়ার্স, টিউনিস এবং স্পেন ও সিসিলির অধিকাংশের উপর কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু রোমই হল প্রথম সাধারণতন্ত্র সাম্রাজ্য, যা ধ্বংস এড়িয়ে নিজস্ব নতুন বিকাশের পথে এগিয়ে গেছে।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের নদীবহুল উপত্যকা নিয়ে গঠিত সাম্রাজ্যের বহু-অতীত কেন্দ্রের অনেক পশ্চিমে ছিল এই নতুন ধারার কেন্দ্র। এই পশ্চিমমুখী অবস্থান রোমকে তাদের সভ্যতার মধ্যে বহু অঞ্চল ও বহু লোককে আনতে সাহায্য করে। রোম্যান শক্তি মরোক্কো ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সত্বর উত্তর-পশ্চিমে আজকের ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে বৃটেন এবং উত্তর-পূর্বে হাঙ্গারি ও দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত তাদের অভিযান নিয়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে, শাসন-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকায় মধ্য-এশিয়া কিংবা পারস্যে তাদের শক্তি কোনদিন স্থাপন করতে পারেনি। তাই রোমান সাম্রাজ্যে নর্দিক আর্য ভাষা-ভাষী বহু নতুন লোক অন্তর্ভুক্ত হল, অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত গ্রীকও তাদের সঙ্গে একত্রিত হল, এবং পূর্বের যে-কোনো সাম্রাজ্যের চেয়ে এর অধিবাসী অনেক কম হেমেটিক বা সেমেটিক ছিল।

যে অতীত আবর্ত একদা পারস্য ও গ্রীসকে অতি সত্বর গ্রাস করে ফেলে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার মধ্যে এই রোম্যান সাম্রাজ্য ঘুরপাক খায় নি, বরং সমস্তটা কাল তার বৃদ্ধিই হয়েছে। মীড ও পারস্যের শাসনকর্তারা প্রায় এক পুরুষেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাবিলোনীয় হয়ে গেছিল; দেশবিদেশের রাজাদের পরাজিত করে সম্রাটের মুকুট মাথায় পরেছিলেন, মন্দির ও দেব-পুরোহিতদেরও অধিকর্তা হয়েছিলেন; অ্যালেকজাণ্ডার ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা সংমিশ্রণের এই সহজ পথই অনুসরণ করেছিলেন। সেলিউসিড সম্রাটদের রাজসভা বা শাসন-পদ্ধতি প্রায় নেবুকাডনেজারের মত ছিল। টলেমিরা হলেন ফারাও এবং সম্পূর্ণরূপে মিশরীয়। সুমেরিয়ার সেমেটিক বিজেতাদের মতই তাদের সংমিশ্রণ হল। কিন্তু রোম্যানরা শাসন করত তাদের নিজেদের নগরীতে এবং কয়েক শতাব্দী তাদের সুবিধামত আইনকানুন চালু রেখেছিল। খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে একমাত্র গ্রীকরাই তাদের উপর কিছু মানসিক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। সুতরাং রোম্যান সাম্রাজ্যই ছিল আর্য প্রণালীতে পরাধীন রাজ্য শাসনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। তখন পর্যন্ত তা ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত, এক প্রসারিত আর্য সাধারণতন্ত্র। শরৎ-লক্ষ্মীর (Harvest god) মন্দির ঘিরে গড়ে-ওঠা কোন নগরীর উপর কোন যোদ্ধার ব্যক্তিগত শাসনের পুরাতন পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা যায় না। রোম্যানদেরও দেবতা এবং মন্দির ছিল, কিন্তু গ্রীকদের মত তাদের দেবতাও ছিলেন অমর অর্ধমানব, স্বর্গীয় এবং অভিজাত। রোম্যানদেরও বলিদান-প্রথা ছিল এবং দুর্দিনে নরবলিও চালু ছিল; হয়ত তারা তাদের কৃষ্ণবর্ণ এট্রুস্কান শিক্ষকদের কাছে এই প্রথা শিখেছিল। কিন্তু রোমের গৌরবময় দিনের মধ্যে কোনদিনই মন্দির বা ধর্মযাজকেরা রোমের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নি।

রোম্যান সাম্রাজ্য ছিল এক ক্রমবর্ধমান শক্তি, অপরিকল্পিত অভিনব এক শক্তি; প্রায় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এক বিরাট শাসনকার্যের পরীক্ষায় তারা জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাকে ঠিক সফল পরীক্ষা বলা চলে না। শেষ পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হয়েছিল। এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে এই পরীক্ষার আকার ও প্রণালী ভিন্ন রূপ গ্রহণ করত। হাজার বছরে বঙ্গদেশ, মেসোপটেমিয়া বা মিশরের যতটুকু পরিবর্তন হয়নি, মাত্র একশো বছরে রোমের তার চেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে। সদা-পরিবর্তনশীল এই সাম্রাজ্য কখনো কোন স্থায়িত্বে পৌঁছতে পারেনি।

একদিক দিয়ে তাদের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। আর একদিক দিয়ে সে পরীক্ষা আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে; রোম্যানরা পৃথিবীব্যাপী রাজনীতির যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, ইউরোপ ও আমেরিকা আজও সেই সমস্যার সমাধানে নিবদ্ধ।

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত রোম্যান সাম্রাজ্যের সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, ইতিহাসের ছাত্রদের তা মনে রাখা ভাল। রোম্যান শাসনকে সুসম্পন্ন, স্থায়ী, দৃঢ়, পরিমার্জিত, মহৎ এবং চূড়ান্ত কিছু বলে কল্পনা করার দিকে মানুষের অতি প্রবল ঝোঁক আছে। মেকলের 'লে-জ অব্ এনশেণ্ট রোম', এস. পি. কিউ. আর, বড়ো কেটো, সিপিও, জুলিয়াস সীজার, ডায়োক্লেশিয়ান, কনস্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেট, যুদ্ধজয়, বাগ্মীতা, অস্ত্রক্রীড়কের দ্বন্দ্ব (gladiatorial combats), খৃষ্টধর্মের শহীদ—এই সমস্ত মিলে এমন এক ছবি মানসচক্ষে ফুটে ওঠে যা একাধারে সুমহান, নিষ্ঠুর ও মর্যাদাসম্পন্ন। এই উপাদান-গুলিকে গ্রন্থিমুক্তি করতে হবে। যে ক্রমিক পরিবর্তন-ধারা উইলিয়ম দি কঙ্কারারের লণ্ডন থেকে আজকের লণ্ডনকে পৃথক করেছে, তার চেয়ে আরও অনেক গভীর, এক পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা থেকে এই বিষয়গুলি সংগৃহীত।

রোমের এই বিস্তারকে সুবিধামত চার ধাপে ভাগ করা যায়। প্রথম ধাপ শুরু হয় ৩৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গলদের রোম লুণ্ঠনের পর এবং প্রথম পিউনিক যুদ্ধ (২৪০ খৃঃ পূঃ) পর্যন্ত চলে। এই ধাপকে আমরা সংমিশ্রিত সাধারণতন্ত্র রাজ্যের ধাপ বলতে পারি। রোমের ইতিহাসে এইটিই হল সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধাপ। উচ্চবংশীয় (Patrician) ও সাধারণ লোকের (Plebian) যুগব্যাপী বিরোধের প্রায় অবসান হয়ে এসেছে, অতি ধনী বা অতি দরিদ্র বলতে কেউ ছিল না, এবং অধিকাংশই ছিল জনহিতৈষী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের মত, কিংবা ১৮০০ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী আমেরিকান ইউনিয়নের উত্তরদেশীয় রাজ্যগুলির মত এটি এক সাধারণতন্ত্র রাজ্য ছিল, যেন মুক্ত চাষীদের এক সাধারণ-

তন্ত্র রাজ্য। এই ধাপের প্রথমে রোম ছিল মাত্র কুড়ি বর্গ-মাইলের এক ছোট রাজ্য। রোম তার পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে; কিন্তু তাদের ধ্বংসের পরিবর্তে মিলন কামনা করেছে। শতাব্দীব্যাপী ঘরোয়া বিরোধ তাদের আপোষ ও ত্যাগের শিক্ষা দিয়েছে। কতগুলি বিজিত নগরী সম্পূর্ণ রোম্যান হয়ে সরকারে ভোট প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করেছে, রোমে বিবাহ ও বাণিজ্য করার অধিকার-সমেত কতকগুলি রয়ে গেছে সম্পূর্ণ স্বয়ং-শাসিত। সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণ সেই দেশের লোক নিয়েই সৈন্যবাহিনী গড়া হয়েছে এবং নব-বিজিত জনসাধারণ নিয়ে নানা অধিকার-বিশিষ্ট নানা উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। বড় রাস্তা তৈরি হয়েছে। সমগ্র ইটালিকে দ্রুত ল্যাটিনপন্থী করা সম্ভব হয়েছিল শুধু এই রীতি অনুসরণ করে। ৮৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইটালির সমস্ত স্বাধীন অধিবাসী রোমের নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করেছিল। কালক্রমে সমস্ত রোম্যান সাম্রাজ্য এক প্রসারিত নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ২১২ খৃষ্টাব্দে সুবিস্তৃত রোম্যান সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্বাধীন মানুষকে রোমের নাগরিক করা হল; উপস্থিতি সম্ভব হলে রোমের নগরী-সভায় তার ভোট প্রদানের অধিকারও ছিল।

শাসন-তন্ত্র নগরী এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে এই নাগরিকত্বের ব্যাপ্তিই ছিল রোম্যান বিস্তারের সবিশেষ উদ্ভাবনা। তার ফলে রাজ্যজয় ও অধিকারের অতীত ধারাও পরিবর্তিত হল। রোম্যান ধারায় বিজেতা বিজিতকে আপন করে নিত।

কিন্তু প্রথম পিউনিক যুদ্ধ ও সিসিলির অন্তর্ভুক্তির পর পুরাতন রাজ্যজয়-পদ্ধতির পাশাপাশি আর-এক পদ্ধতি গড়ে উঠল। যেমন, সিসিলিকে এক বিজিত শিকার বলে মনে করা হত। এটিকে রোম্যানদের 'জমিদারী' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। রোমকে বিত্তশালী করার জন্য তার উর্বর মাটি আর কর্মঠ লোকদের কাজে লাগান হত। এই ঐশ্বর্যের অধিকাংশই আহরণ করত উচ্চবংশীয় এবং অভিজাত (Patricians) শ্রেণী এবং সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার উপর যুদ্ধও অনেক ক্রীতদাস এনে দিত। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের আগে এই সাধারণতন্ত্র রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল চাষী-নাগরিক। সামরিক বৃত্তি ছিল তাদের স্বাধিকার ও দায়িত্ব। যুদ্ধে যাবার ফলে তাদের জোত-জমি ঋণগ্রস্ত হত এবং ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষ করানোর প্রথা ব্যাপক আকারে দেখা দিত এবং ফলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে তারা দেখত যে তাদের ফসলকে সিসিলির ও দেশের নতুন জমিদারীর উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হয়েছে। যুগও পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যও তার চরিত্র পরিবর্তন করেছে। শুধু যে সিসিলিই রোমের পদানত হয়েছে তা নয়, জনসাধারণ ও বিত্তশালী মহাজনও

ধনী প্রতিযোগীর পদানত। রোম তার দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হল : ক্ষমতাপ্রিয় ধনীর সাধারণতন্ত্র রাজ্য।

দুশো বছর ধরে রোমের চাষী-সৈনিকেরা স্বাধীনতা ও রাজ্য-সরকারে অংশীদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে ; এবং একশো বছর তারা স্বাধিকার ভোগ করেছে। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ তার সবই নষ্ট করে দিল এবং তাদের সমস্ত জয়লাভ নিঃশেষে হরণ করল।

নির্বাচনের অধিকারের মূল্যও আর কিছু রইল না। রোমের সাধারণতন্ত্র রাজ্যের দুটি সাধারণ পরিষদ ছিল। প্রথম এবং প্রধান ছিল সেনেট। এই পরিষদের সভ্যরা প্রথমে ছিলেন অভিজাত-বংশীয়েরা, পরে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা, যাঁদের কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ, অধিনায়ক (consul) বা বিশিষ্ট পরিদর্শক (censor) আহ্বান করতেন। বৃটিশ হাউস অব লর্ডসের মতই এই পরিষদ বড় জমিদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতির মেলা হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকান সেনেটের চেয়ে বৃটিশ হাউস অব লর্ডসের সঙ্গেই সাদৃশ্য এর বেশি। পিউনিক যুদ্ধের পরবর্তী তিন শতাব্দী এই পরিষদই রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার প্রাণকেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয় পরিষদটি ছিল পপুলার অ্যাসেম্বলি বা সাধারণ সমাবেশ। এটিকে রোমের সমস্ত নাগরিকের সভা বলে মনে করা হত। যখন রোম ছিল মাত্র বিশ বর্গ-মাইলের এক ছোট রাজ্য, তখন এই সভা সম্ভবপর ছিল ; কিন্তু যখন রোমের নাগরিকাধিকার ইটালির সীমা ছাড়িয়ে বাইরেও প্রসারিত হল, তখন এই সম্মেলন হয়ে পড়ল একেবারে অসম্ভব। তখন এই সভা ডাকা হত ক্যাপিটল ও নগর-প্রাচীরের উপর থেকে শিঙা বাজিয়ে এবং দিন দিন এই সভা পেশাদার রাজনৈতিক ও ইতরজনের সম্মেলন হয়ে দাঁড়াল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই পপুলার অ্যাসেমব্লি সেনেটের সবিশেষ প্রতিবন্ধ ছিল, জনসাধারণের দাবি ও অধিকারের উপযুক্ত প্রতিনিধি ছিল। পিউনিক যুদ্ধের অবসানে এই সভা বিধ্বস্ত জনপ্রিয়-কর্তৃত্বের অক্ষম স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রইল। ক্ষমতাশালী লোকদের উপর কার্যত আর কোন প্রতিবন্ধ রইল না।

রোম্যান সাধারণতন্ত্র রাজ্যে কোনদিনই প্রতিনিধিমূলক শাসনের মত কিছু ছিল না। নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্য-নির্বাচনের কথা কেউই কোনদিন চিন্তা করেন নি। এই উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি ছাত্রদের বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে। পপুলার অ্যাসেমব্লি কোনদিনই আমেরিকান হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা বৃটিশ হাউস অব কমন্সের সমকক্ষ

হতে পারে নি। কাগজ-কলমে এটি ছিল সমস্ত নাগরিকের সভা, কিন্তু কার্যত এটি আদৌ কোন বিবেচনার যোগ্য ছিল না।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর তাই রোম্যান সাম্রাজ্যের জনসাধারণ অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল; সকলেই নিঃস্ব, অধিকাংশই জোতজমিহীন, ক্রীতদাস কর্তৃক লাভজনক উৎপাদন থেকে তারা উৎখাত এবং এ-সবের নিরসনের জন্য তাদের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও নেই। রাজনৈতিক সুবিধা-বঞ্চিত জনতার দাবি-প্রকাশের একমাত্র উপায় হল ধর্মঘট ও বিদ্রোহ। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ছিল ব্যর্থ বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। এই ইতিহাসের পরিমাপের মধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ, মুক্ত চাষীদের জমি প্রত্যাবর্তন ও আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণ রদ করানোর দুর্দম সংগ্রামের কাহিনী বিবৃতি সম্ভবপর হবে না। বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ লেগে ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৭৩ সালে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহে ইটালির বিপদ আরো ঘনীভূত হয়। ইটালির দাসদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত গ্ল্যাডিয়েটর থাকায় তাদের বিদ্রোহ কিছুটা কার্যকরী হয়েছিল। দু-বছর স্পার্টাকাস ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মুখপ্রদেশ আঁকড়ে রইলেন—মনে হয় সে সময় ভিসুভিয়াস ছিল নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি। শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়। রোমের দক্ষিণমুখী বিরাট জনপথ আপ্পিয়ান ওয়ের (Appian way) দু-ধারে ছয় হাজার বন্দী স্পার্টাকাস-পন্থীদের ক্রুশ-বিদ্ধ করে রাখা হয় (৭১ খৃঃ পূঃ)।

যে সৈনিকদলের কাছে তারা পরাস্ত বা অবনমিত হয়েছে, জনসাধারণ কখনো তাদের সম্বন্ধে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু যে ধনী সম্প্রদায় জনসাধারণকে পরাজিত করেছে, সেই পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তারা তাদের নিজেদের এবং জনসাধারণের উপর উদ্যত আর-এক নতুন শক্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছিল—সৈন্যবাহিনীর শক্তি।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের আগে রোম্যান সৈন্যবাহিনী ছিল মুক্ত চাষীদের নিয়ে গঠিত—তাদের যোগ্যতানুসারে তারা অশ্বারোহণে বা পদব্রজে যেত। নিকটবর্তী দেশে যুদ্ধের পক্ষে এই সৈন্যবাহিনী বেশ ভালই ছিল; কিন্তু যে বাহিনীকে বহু দূরে যেতে হবে বা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে, তার পক্ষে এই বাহিনী কার্যকরী ছিল না। তার উপর ক্রীতদাস এবং জমিদারীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনচেতা চাষী-সৈনিকের আমদানিও কমতে লাগল। মারিয়াস (Marius) নামে এক জনপ্রিয় নেতা এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। কার্থেজিনিয়ান সভ্যতার পতনের পর উত্তর আফ্রিকায় নুমিডিয়া নামে এক অর্ধ-বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজ্যের রাজা জুগুর্থার (Jugurtha) সঙ্গে সংঘাতে

রোম্যান শক্তি লিপ্ত হয় এবং তাঁকে দমন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। নিদারুণ গণ-বিক্ষোভে এই অখ্যাতিকর যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য মারিয়াসকে সেনাধিনায়ক করা হয়। বেতন-ভোগী সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং তাদের রীতিমত শিক্ষিত করে তিনি তা সম্ভব করেন। জুগুর্থাকে বন্দী করে রোমে আনা হল (১০৬ খৃঃপূঃ) ; কিন্তু তাঁর কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নব-গঠিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মারিয়াস তাঁর সেনাধিনায়কের পদ ধরে রাখলেন। তাঁকে বাধা দেওয়ার মত কোন শক্তি তখন রোমে ছিল না।

মারিয়াসের সঙ্গে রোম্যান শক্তি-বিকাশের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়—সমরাধিনায়কের সাধারণতন্ত্র রাজ্য। কারণ, এখন যে যুগের সূত্রপাত হয় সে সময় পেশাদারী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কেরা রোম্যান জগতের কর্তৃত্বের জন্য যুদ্ধ করতেন। মারিয়াসের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন অভিজাতবংশীয় সুল্লা (Sulla) : তিনি একদা মারিয়াসের অধীনেই আফ্রিকায় যুদ্ধ করেছেন। উভয়েই বিরুদ্ধ-পক্ষীয় বহু লোককে হত্যা করেন। হাজার হাজার লোককে অপরাধী ঘোষণা করে হত্যা করা হয়, তাদের জমিজমা বিক্রি করা হয়। এদের দুজনের নিষ্ঠুর বিরোধের পর এবং স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে লুকুল্লাস, পম্পি দি গ্রেট, ক্রাসাস ও জুলিয়াস সীজার সমগ্র রাজ্যে কর্তৃত্ব করেন। ক্রাসাসই স্পার্টাকাসকে পরাজিত করেন। লুকুল্লাস এশিয়া মাইনর জয় করে আর্মেনিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং বহু ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে গার্হস্থ্য জীবনে অবসর গ্রহণ করেন। ক্রাসাস আরো দূর অগ্রসর হয়ে পারস্য আক্রমণ করে পার্থিয়ানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। বহুদিন ব্যাপী বিরোধের পর জুলিয়াস সীজার পম্পিকে পরাজিত (৪৮ খৃঃ পূঃ) এবং মিশরে হত্যা করেন ; ফলে জুলিয়াস সীজার রোম্যান জগতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হন।

জুলিয়াস সীজার এমন একটি চরিত্র, যা মানুষের সমস্ত কল্পনাশক্তিকে আলোড়িত করে তাঁর সত্যকার গুরুত্ব বা কৃতিত্ব আজ সমস্ত সীমার বাইরে নিয়ে গেছে। তাঁর কাহিনী আজ উপকথা, তিনি এক প্রতীক। আমাদের কাছে তাঁর গুরুত্ব এইজন্য যে, তিনিই সমরাধিনায়কের যুগ থেকে রোম্যান বিস্তারের চতুর্থ যুগ, আদি সাম্রাজ্য পরিবর্তনের উদ্গাতা ছিলেন। কারণ, গভীরতম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, গৃহযুদ্ধ এবং সমাজ-জীবনের অধঃপতন সত্ত্বেও এই যুগের সমস্ত সময় রোম্যান রাজ্যের সীমা প্রসারিত হয়ে চলে এবং এই ক্রম-বর্ধমান রাজ্য-সীমা ১০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সর্বোচ্চে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সংশয়ান্বিত যুগে একবার এই বিস্তারে ভাঁটা দেখা দিয়েছিল, এবং

মারিয়াসের সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের পূর্বে আবার স্পষ্টই শক্তিক্ষয় দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়বার দেখা গেল স্পার্টাকাসের বিদ্রোহকালে। সমরাধিনায়ক হিসাবে জুলিয়াস সীজার খ্যাতি অর্জন করেন গলএ—বর্তমানের ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম। (এই দেশের প্রধান উপজাতিরা ছিল গলদের মত একই কেল্টিক বংশজাত। এই গলরাই কিছুদিন উত্তর-ইটালি অধিকার করেছিল এবং পরে এশিয়া-মাইনর আক্রমণ করে সেখানে গ্যালেশিয়ান নাম নিয়ে বসবাস করে।) সীজার জার্মানদের গল আক্রমণ ব্যর্থ করে সেই দেশগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং দু-বার ডোভার প্রণালী অতিক্রম করে (৫৫ এবং ৫৪ খৃঃ পূঃ) বৃটেন আক্রমণ করেন; যদিও এখানে তিনি চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নি। এই অবসরে তখন পম্পি দি গ্রেট কাম্পিয়ান সাগরের পুবের রোম্যান অধিকারকে একত্রিত করছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি রোম্যান সেনেট রোম্যান সরকারের নামমাত্র কেন্দ্র ছিল, শুধু সেনাধিনায়ক বা অন্যান্য রাজকর্মচারী নিয়োগ বা ক্ষমতা অর্পণ ইত্যাদিতেই তার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল; এবং কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, যাঁদের মধ্যে সিরেরো অনস্বীকার্যভাবে প্রধান, সাধারণতন্ত্রী রোমের মহান ঐতিহ্য রক্ষা এবং তার আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সংগ্রাম করছিলেন। কিন্তু মুক্ত চাষীদের বিনষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে ইটালি থেকে রোমের নাগরিকত্বের উৎসাহ দূর হয়ে গেছিল। তখন ইটালি ক্রীতদাস ও নিঃস্ব জনসাধারণের দেশ, স্বাধীনতার বোধশক্তি বা ইচ্ছা তাদের ছিল না। সেনেটের এই সাধারণ-তন্ত্রী নেতাদের পিছনে কেউ ছিল না; কিন্তু যে সমরাধিনায়কদের তাঁরা ভয় করতেন বা আয়ত্বে আনতে চাইতেন, তাঁদের পিছনে ছিল সৈন্য-বাহিনী। এই সেনেটের চোখের উপর দিয়েই ক্রাসাস, পম্পি ও সীজার তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্য-শাসন ভাগ করে নেন (প্রথম ট্রায়াম্‌ভিরেট)। কিছুদিনের মধ্যেই যখন ক্রাসাস সুদূর পার্থিয়ানদের হাতে ক্যারিতে নিহত হলেন, তখন পম্পি এবং সীজার পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হন। পম্পি সাধারণতন্ত্রের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং আইন-ভঙ্গ ও সেনেটের ঘোষণার প্রতি অনানুগত্যের অপরাধে সেনেটে এক আইন প্রণয়ন করালেন এবং সেই আইনে সীজারের বিচারের ব্যবস্থা হল।

কোন সেনাপতির পক্ষে তাঁর শাসন-সীমার বাইরে সৈন্য আনা বেআইনী ছিল, এবং সীজারের শাসিত অঞ্চল ও ইটালির সীমা ছিল রুবিকন। খৃষ্টপূর্ব ৪৯ সালে 'পাশার দান ফেলা হয়েছে' (The die is cast) বলে তিনি রুবিকন অতিক্রম করে পম্পি ও রোমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সামরিক দুর্দশার কালে রোমে তখনকার মত রাজত্ব করার জন্য অসীম ক্ষমতা দিয়ে এক ডিক্টেটর নির্বাচন করার এক প্রথা প্রচলিত ছিল। পম্পির পরাজয়ের পর সীজারকে ডিক্টেটর নির্বাচন করা হল—প্রথমে দশ বছর, পরে চিরজীবনের জন্য (খৃঃ পূঃ ৪৫)। কার্যত তাঁকে সারা জীবনের জন্য সাম্রাজ্যের সম্রাটই করে দেওয়া হল। রাজা করার কথাও উঠেছিল, যদিও পাঁচ শতাব্দী পূর্বে এট্রুস্কানদের বিতাড়নের পর এই কথাটি রোমে ঘৃণিত হয়ে এসেছে। সীজার রাজা হতে অস্বীকার করলেন; কিন্তু রাজসিংহাসন ও রাজদণ্ড গ্রহণ করলেন। পম্পির পরাজয়ের পর সীজার মিশরে যান এবং শেষ-টলেমিদের দেবী-রানী, মিশরের ক্লিওপেট্রার প্রেমাসক্ত হন। মনে হয় ক্লিওপেট্রা তাঁর মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরের দেবতা-রাজার ধারণা তিনি রোমে নিয়ে এলেন। একটি মন্দিরে তাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে লেখা হল, 'অজেয় দেবতার উদ্দেশ্যে।' একবার শেষ প্রতিবাদে ক্ষীণায়মান সাধারণতন্ত্র জ্বলে ওঠে, এবং সেনেটের মধ্যে তাঁরই নিহত প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পি দি গ্রেটের মর্মর-মূর্তির নিচে তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়।

ক্ষমতামত্ত নেতাদের বিরোধের আরো তের বছর অতিবাহিত হল। লেপিডাস, মার্ক অ্যাণ্টনি ও জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়ান সীজারকে নিয়ে দ্বিতীয় ট্রায়াম্‌ভিরেট সৃষ্টি হল। পিতৃব্যের মত অক্টেভিয়ান বেছে নিলেন দরিদ্র অথচ শ্রমশীল পশ্চিম প্রদেশগুলি; এখান থেকেই শ্রেষ্ঠ সৈন্য সংগ্রহ করা হত। ৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি তাঁর একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মার্ক অ্যাণ্টনিকে অ্যাক্টিয়ামের নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করে রোম্যান জগতের একচ্ছত্র প্রভু হন। কিন্তু অক্টেভিয়ান জুলিয়াস সীজারের থেকে একেবারে ভিন্ন-প্রকৃতির ছিলেন। রাজা বা দেবতা হওয়ার মত হাস্যকর ইচ্ছা তাঁর মনে কখনো আসেনি। কোন চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত প্রেমাস্পদা রানীও তাঁর ছিল না। তিনি সেনেট এবং রোমের অধিবাসীদের স্বাধীনতা এনে দিলেন। ডিক্টেটর হওয়াও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। কৃতজ্ঞ সেনেট তার পরিবর্তে তাঁকে কার্যত শাসনের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করল। তাঁকে বাস্তবিক রাজা বলা হয়নি, বলা হত 'প্রিন্সেপস' ও 'অগস্টাস' (মহামহিম)। তিনি পরিচিত হলেন অগস্টাস সীজার নামে, প্রথম রোম-সম্রাট হিসাবে (২৭ খৃঃ পূঃ থেকে ১৪ খৃঃ)।

তাঁর পরে সম্রাট হলেন টাইবেরিয়াস সীজার (১৪ থেকে ৩৭ খৃঃ) এবং তাঁর পর কালিগুলা, ক্লডিয়াস, নিরো প্রভৃতি থেকে, ট্রাজান (৯৮ খৃঃ), হাড্রিয়ান (১১৭ খৃঃ) অ্যাণ্টনিনাস পাইয়াস (১৩৮ খৃঃ) এবং মার্কাস অরেলিয়াস (১৬১—১৮০ খৃঃ)

পর্যন্ত। এইসব সম্রাট ছিলেন সেনাবাহিনীর সম্রাট। সৈন্যরা তাঁদের সিংহাসনে বসাত, তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করত। ক্রমে ক্রমে রোমের ইতিহাস থেকে সেনেট মুছে যায় এবং সম্রাট ও তাঁর শাসন-পরিষদ তার স্থান গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের পরিসর এখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায়। বৃটেনের অধিকাংশই রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ট্র্যানসিলভানিয়াকে করা হয়েছে এক নতুন প্রদেশ ডাসিয়া; ট্রাজান ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে যান। হাড্রিয়ানের কল্পনা আমাদের পুরাতন পৃথিবীর অপর প্রান্তে একদা-সংঘটিত ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। শি হোয়াং-তির মত তিনি উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর তুলেছিলেন: একটি বৃটেনে, অপরটি রাইন ও দানিয়ুব নদীর মাঝে। ট্রাজান যে-সব দেশ জয় করেছিলেন, তার কতগুলি তিনি ত্যাগ করেন।

রোম্যান সাম্রাজ্যের বিস্তার শেষ হয়ে এসেছিল।

রোম ও চীনের মাঝে

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দী মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এক নূতনত্বের সূচনা করে। মেসোপটেমিয়া ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল আর তখন কৌতূহলের কেন্দ্র নয়। মেসোপটেমিয়া ও মিশর তখন পর্যন্তও উর্বর, জনসমৃদ্ধ এবং মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী; কিন্তু তারা তখন আর পৃথিবীর প্রবল অঞ্চল নয়। ক্ষমতা তখন সরে গেছে পশ্চিমে আর পুবে। দুটি বিরাট সাম্রাজ্য তখন পৃথিবীকে শাসন করছে, এই নতুন রোম্যান সাম্রাজ্য, আর পুনরুজ্জীবিত চীন সাম্রাজ্য। রোমের শক্তি ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু সেই সীমা আর অতিক্রম করতে পারে নি। রোম থেকে সে অত্যন্ত বেশি দূর, আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ইউফ্রেটিস নদীর ওপারে পূর্বতন পারসীক ও ভারতীয়দের সেলিউসিড রাজ্য অনেক নতুন রাজার শাসনাধীনে চলে গেছে। শি হোয়াংতির মৃত্যুর পর সে'ইন বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে হুন বংশের অধীনে চীন তার শক্তি তিব্বত ছাড়িয়ে সু-উচ্চ পামিরের গিরিবর্ত্মের পরপারে পশ্চিম তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তার করেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত এসেই তার সীমা শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারও ওপারে আর যাওয়া সম্ভব হয় নি। চীন সে সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুগঠিত ও সবচেয়ে সভ্য রাজনৈতিক ধারায় চালিত হত। রোম সাম্রাজ্যের শক্তির শীর্ষের সময়ের চেয়েও চীন আয়তনে ও জনসংখ্যায় অনেক বড় ছিল। পরস্পরের কাছে একেবারে অজ্ঞাত থেকেও সে-সময়ে এই পৃথিবীতে এই দুই বিরাট ধারার

বিকাশ তখনকার দিনে সম্ভব ছিল। পরস্পরের সম্মুখ সংঘর্ষে আসার মত স্থল বা জলপথের যোগাযোগ-ব্যবস্থা তখনও যথেষ্ট সংগঠিত ও বর্ধিত হয় নি।

অথচ তাদের পরস্পরের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হত, এবং তাদের মধ্যকার মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষের অঞ্চলগুলির ভাগ্যের উপর তাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সামান্য বাণিজ্য চলত—যেমন, পারস্যের মধ্য দিয়ে উটের সাহায্যে, কিংবা ভারত ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট বাণিজ্য-তরণীর মাধ্যমে। খৃষ্টপূর্ব ৬৬ সালে পম্পির অধীনে রোম্যান সৈন্য অ্যালেকজাণ্ডার দি গ্রেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাস্পিয়ান সাগরের পুব তীরে উপস্থিত হয়েছিল। ১০২ খৃষ্টাব্দে এক চীনা অভিযান-বাহিনী পান চাও-এর নেতৃত্বে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এসে পৌছেছিল এবং রোমের শক্তি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণের জন্য কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার এই বিরাট জগতের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান বা পরস্পরের সাক্ষাৎ-সংযোগের জন্য আরও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়।

এই দুই বিরাট সাম্রাজ্যের উভয়েরই উত্তরে ছিল বর্বর-অধ্যুসিত অরণ্যভূমি। বর্তমান জার্মানি প্রধানত অরণ্যময় ছিল এবং এই বনজঙ্গল রাশিয়ার অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও সেখানে বিরাটাকারের বৃষ বাস করত। তারপর এশিয়ার বিরাট পর্বতশ্রেণীর উত্তরে ছিল মরুভূমি, প্রান্তর, অরণ্য ও তুষার-জমাট দেশ। এশিয়ার উচ্চ প্রদেশের পুব প্রান্তে ছিল মাঞ্চুরিয়ার বিরাট ত্রিভুজ। দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই ছিল জলবায়ুর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বাসের অযোগ্য। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বৃষ্টিপাতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ দেশের উপর মানুষের ভরসা ছিল না। বেশ কয়েক বছর হয়ত দেখা দিল সবুজ মাঠ, ফসলের উর্বর ক্ষেত; পরেই হয়ত এল আর্দ্রতা-কমে-আসার ও অনাবৃষ্টির কয়েকটি দুরন্ত বছর।

জার্মান অরণ্যভূমি থেকে দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান এবং গথল্যাণ্ড থেকে আল্পস পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত এই যে বর্বর উত্তরাঞ্চল, তার পশ্চিম দেশ ছিল নর্দিক জাতি ও আর্য ভাষার উৎস। মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি ও প্রান্তর-প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ছিল হুন, মঙ্গোল, তাতার ও তুর্কিদের উৎসস্থান—কারণ এই সব বিভিন্ন লোকের ভাষা, জাত এবং জীবন-প্রণালী প্রায় একই ধরনের ছিল। নর্দিক লোকেরা যেমন অনবরত নিজেদের সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে মেসোপটেমিয়া ও ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী বর্ধিষ্ণু সভ্যতার উপর চাপ দিচ্ছিল, সেই রকমই এই হুন উপজাতীয়রা তাদের বাড়তি লোকদের ভবঘুরে ও দস্যু করে দেশ-বিজয়ের

জন্য চীনের স্থিতিশীল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিত। উত্তরাঞ্চলের প্রাচুর্যে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত: তৃণের অল্পতা বা পশু-মড়ক. ক্ষুধার্ত রণপ্রিয় উপজাতিদের দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত করত।

কিছুদিন পৃথিবীতে একই সঙ্গে এমন দুই শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল, যারা শুধু যে বর্বরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই সক্ষম ছিল, তা নয়—রাজ্যের সীমান্তকেও অগ্রসর করার ক্ষমতা রাখত। উত্তর চীন থেকে মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে হান সাম্রাজ্যের আক্রমণ সুদৃঢ় এবং নিরবচ্ছিন্ন ছিল। চীনের বাড়তি জনতা বিরাট প্রাচীরের (Great Wall) বেড়া ডিঙিয়ে ওধারে বসবাস শুরু করল। সীমান্ত রাজরক্ষীদলের পিছনে চীনা কৃষকেরা লাঙল ও ঘোড়া নিয়ে আসত, তৃণ-ভূমিতে চাষ করত ও সেই সেই গোচারণ-ভূমি স্ব-অধিকারে রাখত। হুন উপজাতিরা এই ঔপনিবেশিকদের লুণ্ঠন এবং হত্যা করত, কিন্তু চীনের প্রতিহিংসা-মূলক অভিযান রোধ করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। যাযাবরদের হয় কৃষি-বৃত্তি গ্রহণ করে চীনের করদাতা হিসাবে বাস করতে হত, নয় তো অন্য কোন নতুন গোচারণ-ভূমির সন্ধান করতে হত। অনেকে প্রথম পন্থা বেছে নিয়ে চীনাদের সঙ্গে এক হয়ে গেল, আবার অনেকে গিরিবর্ত্ম পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর দিকে সরে গিয়ে পশ্চিম তুর্কিস্থানে আশ্রয় নিল।

খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকেই মঙ্গোলীয় অশ্বারোহীদের এই উত্তরাভিমুখী অভিযান শুরু হয়েছিল। আর্যজাতির উপর এরা একটা পশ্চিমমুখী চাপ দিত, তার ফলে এই আর্যজাতিদের চাপও রোম্যান সীমান্তের উপর পড়ত এবং কোথাও দুর্বল মনে হলেই তা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করত। মঙ্গোলীয় সংমিশ্রিত শকদেরই এক জাত, পার্থিয়ানরা, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। পম্পি দি গ্রেটের পুবমুখী অভিযানে তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারা ক্রাসাসকে পরাজিত ও নিহত করে। পারস্যের সেলিউসিড সম্রাটদের সিংহাসনচ্যুত করে পার্থিয়ান রাজাদের এক বংশ, আর্সাসিড বংশকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু কিছুদিনের জন্য বুভুক্ষু যাযাবরদের কাছে নিম্নতম প্রতিরোধের পথ পশ্চিম বা পুবে ছিল না, ছিল মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পুবে খাইবার গিরিপথ পার হয়ে ভারতবর্ষে। এই কয় শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষই একমাত্র রোম ও চীনের সমকক্ষ মঙ্গোলীয় শক্তির পরিচয় পেয়েছে। বার-কয়েক কয়েকজন লুণ্ঠনকারী বিজয়-গৌরবে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে ভারতের বিরাট সমতল ভূমিতে এসে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছে। অশোকের সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর কিছুকালের জন্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘন তমিস্রায় হারিয়ে গেল। অভিযাত্রী দলগুলির অন্যতম ভারত-শকদের প্রতিষ্ঠিত কোন কুষাণ বংশ কিছুকাল উত্তর ভারতে রাজত্ব করে এবং এই ধরনের আক্রমণ চলে। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ই এফ্‌থেলাইট বা শ্বেতাঙ্গ হুনদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয় এবং তারা ছোট ছোট ভারতীয় রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে এবং সমস্ত ভারতবর্ষকে এক বিভীষিকার মধ্যে রাখে। প্রতি গ্রীষ্মে তারা পশ্চিম তুর্কিস্তানে ঘুরে বেড়াত এবং প্রতি শরতে গিরিপথ ধরে ভারতকে আতঙ্কিত করতে নেমে আসত।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম ও চীন সাম্রাজ্যে এক নিদারুণ দুর্ভাগ্য দেখা দেয়, যার ফলে বর্বরদের আক্রমণের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা উভয় সাম্রাজ্যেরই কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। অদৃষ্টপূর্ব তীব্র মহামারী দেশকে গ্রাস করে। চীনে এগার বছর ধরে এর তাণ্ডব নৃত্য চলে এবং সামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে বিশৃঙ্খল করে দেয়। হান বংশের পতন হয় এবং ভাগাভাগি ও বিশৃঙ্খলতার এক যুগ শুরু হয়,—খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দীতে মহান তাঙ বংশের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে দুর্দশা এসেছিল তা থেকে চীন আর লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে নি।

এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া থেকে ইউরোপে। সমগ্র রোম্যান সাম্রাজ্যে ১৬৪ থেকে ১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর প্রকোপ থাকে। এই মহামারী রোমের রাজশক্তিকে বিশেষ ভাবে দুর্বল করে ফেলে। এর পর আমরা রোম্যান প্রদেশ জনশূন্য করার কথা শুনতে পাই এবং রাজ-সরকারেও পারদর্শিতা ও শাসন-ক্ষমতার বিরাট অবনতি দেখা দেয়। যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই আমরা দেখি যে সীমান্ত আর দুর্ভেদ্য নয়, আজ এখানে কাল ওখানে তার পতন হচ্ছে। সুইডেনের গথল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী, এক নতুন নর্দিক জাতি, গথরা, রাশিয়া অতিক্রম করে। ভল্‌গা অঞ্চল ও কৃষ্ণসাগরের তীরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে সামুদ্রিক অভিযান ও নৌ-দস্যুতা অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে তারা হয়ত হুনদের পশ্চিমমুখী চাপ অনুভব করেছে। ২৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা এক বিরাট স্থল-যুদ্ধে দানিয়ুব পার হয়ে বর্তমান সার্বিয়ার একটি অঞ্চলে সম্রাট ডেসিয়ুসকে পরাজিত ও নিহত করে। ২৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্ক নামে আর-এক জার্মান জাতি রাইন নদীর নিম্নভাগ অতিক্রম করে এবং আলেমান্নিরা প্রবেশ করে অ্যালসেসএ। গলএর সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করে; কিন্তু বল্কান উপদ্বীপের গথরা বার-বার আক্রমণ চালায়। রোমের ইতিহাস থেকে দাসিয়া প্রদেশটি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

রোমের দম্ভ এবং বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিন শতাব্দী ধরে যে রোম

মুক্ত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্ত ছিল, তাকে সম্রাট অরেলিয়ান ২৭০-২৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত করলেন।

আদি রোম্যান সাম্রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবন

যে রোম্যান সাম্রাজ্য খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দী আগে সৃষ্টি হয়েছিল এবং অগস্টাস সীজারের সময় থেকে দুই শতাব্দী ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিল, সেই সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের কাহিনী বলার আগে এই বিরাট রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দিলে ভালই হবে। আমাদের ইতিহাস আমাদের সময়ের দুই হাজার বছরের মধ্যে এসে পড়েছে এবং রোম ও হান বংশের অধীনে সভ্য জাতির জীবন-যাত্রা ও তাদের বর্তমান সভ্য উত্তরাধিকারীদের জীবন-যাত্রার সাদৃশ্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আসছে।

পশ্চিম জগতে মুদ্রার ব্যবহার ব্যাপক হয়েছিল। পুরোহিত-জগতের বাইরে তখন এমন অনেক বিত্তশালী লোক ছিলেন যাঁরা রাজকর্মচারী কিংবা পুরোহিত নন। পূর্বের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে পারত এবং তাদের জন্য অনেক রাজপথ ও সরাইখানা ছিল। অতীতের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের পূর্বের তুলনায় জীবন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। তার আগে সভ্য মানুষ থাকত একটি জেলা বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এক সংস্কার ও ঐতিহ্যে আবদ্ধ, এবং বাস করত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে; যাযাবরেরাই শুধু বাণিজ্য ও ভ্রমণ করত।

কিন্তু কী রোম্যান শান্তি বা কী হান-বংশীয় শান্তি—তাদের শাসিত বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে কখনো সুসম সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। এক জেলা থেকে আর-এক জেলার সংস্কৃতি ও সভ্যতায় প্রচুর স্থানীয় পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য ও অসাম্য ছিল, ঠিক যেমন আজ বৃটিশ শান্তিতে ভারতবর্ষেও তা আছে।* এই বিরাট দেশে রোম্যান সৈন্যবাহিনী ও উপনিবেশ এপাশে-ওপাশে ছিটিয়ে ছিল; তারা রোম্যান দেবতার আরাধনা করত, ল্যাটিন ভাষায় কথা বলত; কিন্তু যেখানে রোম্যানদের আসার আগেই শহর বা নগর ছিল, সেখানকার অধিবাসীরা বশীভূত হলেও নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই দেখাশোনা করত এবং অন্তত কিছুদিন নিজেদের দেবতারই আরাধনা করত। গ্রীস, এশিয়া-মাইনর, মিশর ও গ্রীক-সভ্যতা-প্রাপ্ত প্রাচ্যে ল্যাটিন ভাষা প্রচলিত হয়নি। গ্রীক ভাষার প্রচলন সেখানে ছিল অব্যাহত। টার্সাসের সল, যিনি ভবিষ্যতে খৃষ্ট-শিষ্য পল (Apostle Paul) হয়েছিলেন, ইহুদী ও রোম্যান নাগরিক ছিলেন; কিন্তু তিনি কথা বলতেন ও লিখতেন গ্রীক ভাষায়, হিব্রুতে

*মূল পুস্তকের প্রকাশ-কাল নভেম্বর, ১৯২২—অনুবাদক

নয়। এমন কি ; যে পার্থিয়ান বংশ পারস্যে গ্রীক সেলিউসিডদের সিংহাসনচ্যুত করেছিল এবং স্পষ্টই রোমের রাজকীয় সীমান্তের বাইরে ছিল, তাদের রাজসভাতেও গ্রীকই ছিল মর্যাদাপূর্ণ ভাষা। কার্থেজ ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও স্পেনের কিছু অংশে এবং উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজিনিয়ান ভাষার বহুদিন প্রচলন ছিল। রোমের নাম শোনার অনেক, অনেক আগে সেভিল এক সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং কয়েক মাইল মাত্র দূরে ইটালিকাতে রোমের প্রবীণ সৈনিকদের এক উপনিবেশ থাকা সত্ত্বেও কয়েক পুরুষ ধরে তারা তাদের সেমেটিক দেবীর পূজা করত, কথা বলত সেমেটিক ভাষায়। সেপ্টিমিয়াস সেভারাস, যিনি ১৯৩ থেকে ২১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন, মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করতেন কার্থেজিনিয়ান। পরে বিদেশী ভাষা হিসাবে তিনি ল্যাটিন শেখেন এবং লিপিবদ্ধ আছে যে তাঁর ভগ্নী কোনদিন ল্যাটিন শেখেন নি এবং পিউনিক ভাষাতেই তাঁর রোম্যান-সংসার নির্বাহ করেছিলেন।

গল ও বৃটেনের মত দেশে এবং দাসিয়া (বর্তমানের মোটামুটি রুমানিয়া) ও পান্নোনিয়ার (দানিয়ুবের দক্ষিণের হাঙ্গারি) মত প্রদেশে, যেখানে আগে থেকে বড় বড় নগরী, মন্দির ও সভ্যতা ছিল না, সেসব দেশে অবশ্য রোম্যান সাম্রাজ্য "ল্যাটিনপন্থী" হয়েছিল। প্রথমবারের মতই রোম তাদের সভ্য করে। এসব দেশে শহর ও নগর সৃষ্টি হল, প্রথম থেকেই ল্যাটিন প্রধান ভাষা হিসাবে গণ্য হল, রোম্যান দেবদেবীর উপাসনা এবং রোম্যান আচার-ব্যবহার ও প্রথা প্রচলিত হল। রুমানিয়ান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষা—যা ল্যাটিন ভাষারই রূপান্তর ও ব্যতিক্রম—আমাদের ল্যাটিন ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিস্তারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশই ল্যাটিন-ভাষী হয়। মিশর, গ্রীস ও অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল কিন্তু কখনও ল্যাটিন-পন্থী হয় নি। সভ্যতায় ও মনে-প্রাণে তারা মিশরীয় কিংবা গ্রীক রয়ে গেল। এমন কি রোমেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভদ্রলোকের ভাষা হিসাবে গ্রীক শিখতে হত এবং গ্রীক সাহিত্য ও জ্ঞান ল্যাটিনের চেয়ে যথার্থভাবেই বেশি সমাদৃত হত।

বিবিধ দেশের সমষ্টি এই সাম্রাজ্যে কাজ ও ব্যবসার প্রকৃতিও স্বভাবতই ছিল বিভিন্ন ধরনের। স্থিতিশীল জগতের প্রধান শিল্প তখনও ছিল কৃষি। যে মুক্ত কর্মঠ চাষীরা আদি রোম্যান সাম্রাজ্যের প্রাণস্বরূপ ছিল, পিউনিক যুদ্ধের পর ইটালিতে ক্রীতদাস দিয়ে কৃষিকার্য করানোর ফলে তারা কী ভাবে সরে গেল—তা আমরা বলেছি। গ্রীক জগতে চাষ-বাসের ভিন্ন প্রথা ছিল ; আর্কাডিয়ান

প্রথানুযায়ী প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিককে নিজের হাতে ফসল ফলাতে হত, স্পার্টানদের প্রথানুযায়ী কাজ করা ছিল অবমাননাকর, এবং কৃষিকার্য করত হেলট নামে এক বিশেষ দাস-শ্রেণী। কিন্তু তখন তা অতীত ইতিহাস; এবং যবন-জগতের অধিকাংশ দেশেই জমিদারী-রীতি ও ক্রীতদাস-প্রথা ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি-কার্যের ক্রীতদাসেরা ছিল বন্দী, নানা ভাষায় তারা কথা বলত বলে পরস্পরের কথা তারা বুঝতে পারত না, কিংবা তারা জন্ম-দাস ছিল; অত্যাচার প্রতিরোধ করার মত সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না, অধিকারের ঐতিহ্য তাদের ছিল না, এবং লেখাপড়া জানত না বলে কোন জ্ঞানও ছিল না। পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়েও তারা কোনদিন সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ করে নি। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্পার্টা-কাসের বিদ্রোহ ছিল এক বিশেষ শ্রেণীর দাসদের বিদ্রোহ; তারা ছিল গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত। সাধারণতন্ত্রের শেষভাগে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিকে ইটালিতে কৃষি-দাসদের ভয়ানক অপমান সহ্য করতে হত, যাতে পালাতে না পারে তার জন্য রাত্রে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, মাথার অর্ধেক কামিয়ে পালানো আরো কঠিন করে দেওয়া হত। তাদের নিজেদের স্ত্রী ছিল না; তাদের উপর বল প্রয়োগ করা যেত, তাদের অঙ্গহীন করা যেত এবং প্রভুরা খুশিমত তাদের হত্যা করতেও পারতেন। প্রভু তাঁর ক্রীতদাসকে বন্য পশুর সঙ্গে মল্লভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য বিক্রি করতে পারতেন। যদি কোন ক্রীতদাস তার প্রভুকে হত্যা করত, তবে শুধু হত্যাকারীকে নয়, সংসারের সমস্ত ক্রীতদাসকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করা হত। গ্রীসের কতকাংশে, বিশেষ করে এথেন্সে, ক্রীতদাসদের অবস্থা এতটা বিভীষিকাময় না হলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। যে বর্বর জাতি সৈন্যব্যূহ ভেদ করে এই সব দেশ আক্রমণ করত, এই অধিবাসীদের কাছে তারা আসত শত্রুর মত নয়, মুক্তি-দূতের মত।

প্রায় প্রত্যেক শিল্পে এবং যে যে কাজে এক দল লোকের প্রয়োজন হয়, সেই সব কাজে ক্রীতদাসের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। খনি এবং ধাতব কাজে, মাল-নৌকো চালানো, পথ-ঘাট ও বাড়ি নির্মাণ, ছিল প্রায় অধিকাংশ ক্রীতদাসেরই বৃত্তি এবং ঘর-সংসারের সমস্ত কাজই করত ক্রীতদাসেরা। মুক্ত এবং মুক্তি-প্রাপ্ত দরিদ্র লোক শহর এবং শহরতলীতে ছিল; তারা নিজেদের কাজ করত এবং দৈনিক মজুরিতেও কাজ করতে যেত। তারা হল কারিগর বা তদারককারী প্রভৃতি—এক নতুন মজুর-শ্রেণী—যাদের ক্রীতদাসদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কাজ করতে হত; কিন্তু সাধারণ লোক-সংখ্যার তারা কত অংশ ছিল, তা আমরা জানি না। মনে হয়, এই অনুপাত বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত হত। ক্রীতদাসত্বেরও

নানা ব্যতিক্রম ছিল, রাত্রে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে সকালে চাবুক মেরে ক্ষেতে বা খনিতে কাজ করানোও হত যেমন ক্রীতদাসদের, সেইরকম প্রভুর কাজ সুসম্পন্ন করতে পারলে অনেক ক্রীতদাস স্বাধীনভাবে প্রভুর জমিতে চাষ বা কোন শিল্পে কাজ করতে পারত, এবং স্বাধীন লোকের মত নিজের স্ত্রীর অধিকারীও হতে পারত।

সশস্ত্র ক্রীতদাসও ছিল। ২৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে পিউনিক যুদ্ধের প্রথম পর্বে ক্রীতদাসদের জীবন নিয়ে অস্ত্র-ক্রীড়া আবার রোমে প্রচলিত হয়। এই খেলা অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের উচ্চস্তরে সৌখিন হয়ে ওঠে; এবং শীঘ্রই প্রত্যেক ধনী রোম্যান একদল গ্ল্যাডিয়েটর পুষতে থাকেন, যারা মাঝে-মাঝে মল্লভূমিতে লড়াই করত, কিন্তু যাদের প্রকৃত কাজ ছিল প্রভুর দেহরক্ষীর কাজ। বিদ্বান ক্রীতদাসও ছিল। রোম সাধারণতন্ত্রের শেষের দিকে বিজিত দেশ ছিল গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরের সুসভ্য নগরীমণ্ডলী এবং তারা অনেক সুশিক্ষিত বন্দী দেশে নিয়ে আসত। অভিজাত রোম্যান পরিবারের ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষক হত এক-একজন ক্রীতদাস। ধনী লোকেরা লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারির কাজে শিক্ষিত গ্রীক ক্রীতদাসদের রাখতেন। ক্রীড়াকুশল কুকুর রাখার মতই কবিও তাঁরা রাখতেন। এই দাসত্বের আবহাওয়াতেই সূক্ষ্মধর্মী, ভীরু ও কলহপরায়ণ সাহিত্যিক জ্ঞান ও সমালোচনার বর্তমান ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয়। অনেকে বিশেষ পরিশ্রম করে বুদ্ধিমান শিশু-দাস নিয়ে আসতেন এবং সুশিক্ষিত করে বিক্রি করতেন। দাসদের পুস্তক নকল, অলঙ্কার নির্মাণ এবং অসংখ্য কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত।

ধনী লোকের সাধারণতন্ত্র রাজ্যের বিজয়-অভিযানের দিন থেকে নিদারুণ মহামারীর পর বিশৃঙ্খলার দিন পর্যন্ত এই চারশো বছরে ক্রীতদাসদের অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বন্দীর সংখ্যা ছিল অনেক, তাদের প্রতি ব্যবহার কর্কশ ও নিষ্ঠুর; ক্রীতদাসদের কোন অধিকার ছিল না এবং পাঠকেরা এমন কোনও নিষ্ঠুর অত্যাচার কল্পনা করতে পারবেন না যা তাদের উপর তখন প্রয়োগ করা হত না। কিন্তু খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতে ক্রীতদাসত্বের প্রতি রোম্যান সভ্যতার ব্যবহারে অনেক উন্নতি দেখা গেছিল। বন্দীর সংখ্যাও আগের মত প্রচুর ছিল না, এবং ক্রীতদাসের মূল্যও বেশি ছিল। ক্রীতদাসদের মালিকেরা হৃদয়ঙ্গম করতে আরম্ভ করলেন যে, যে লাভ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা ক্রীতদাসদের কাছ থেকে লাভ করেন, তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় যদি ওই হতভাগ্যদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত না দেওয়া যায়। সেইসঙ্গে সমাজের নৈতিক চরিত্রেরও উন্নতি হচ্ছিল

এবং ন্যায় ও নিষ্ঠার প্রতি আগ্রহও গড়ে উঠছিল। প্রাচীন রোম্যান কর্কশতা গ্রীকদের উচ্চতর মানসিক বিকাশের সংস্পর্শে মসৃণ হয়ে আসছিল। নিষ্ঠুরতার উপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ হল, পশুদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কোন প্রভু আর তার ক্রীতদাসকে বিক্রি করতে পারত না, ক্রীতদাসকে তার সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হল, কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ক্রীতদাসদের মজুরি দেওয়া হত এবং ক্রীতদাস-দাসীর বিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল। অনেক রকম চাষ-বাসেই মাত্র কয়েক ঋতু ছাড়া প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয় না। তাই ক্রীতদাস ফসলের মালিকের অংশ দিয়ে কিংবা মাত্র কয়েক ঋতু পরিশ্রম করে শীঘ্রই ভাগ-চাষীতে পরিণত হল।

যখনই আমরা চিন্তা করে দেখি যে খৃষ্টোত্তর প্রথম দুই শতাব্দীর এই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা-ভাষী বিরাট রোম্যান সাম্রাজ্যে কতখানি দাস-রাজ্য ছিল এবং কত অল্পসংখ্যক লোকের আত্মমর্যাদা বা স্বাধীনতা ছিল, তখনই আমরা এই সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতনের কারণের সন্ধান পেয়ে যাই। পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায় তা প্রায় ছিলই না। পরিমিত জীবনযাত্রা, সক্রিয় মননশীলতা ও জ্ঞানার্জনও ছিল না; স্কুল এবং কলেজ ছিল না বললেই চলে। স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন চিন্তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। যে বিরাট রাজপথ, বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, নীতি ও শক্তির ঐতিহ্য উত্তর-পুরুষদের বিস্ময় উদ্রেক করে, তা যেন আমাদের কাছে এইটুকু ঢেকে না রাখে যে তার বাইরের দ্যুতি গড়ে উঠেছিল প্রতিহত ইচ্ছা, নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি এবং পঙ্গু ও বিকৃত কামনার উপর। এমন কি যে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দল এই দাসত্ব ও সংযমের উপর নবাব করত তারাও মনে মনে অত্যন্ত অস্থির ও অসুখী ছিল; শিল্প এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন,—যা স্বাধীন ও খুশি মনের ফল, তা এই আবহাওয়ায় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। প্রচুর নকল ও অনুসরণের সৃষ্টি হল, নীচাশয় পণ্ডিত লোকদের ছিল অত্যন্ত অহমিকা; কিন্তু তুলনায় অনেক ছোট, এথেন্সে এক শতাব্দীর গরিমায় যে সুস্পষ্ট মহৎ প্রতিভান্বিত সৃষ্টির স্ফুরণ হয়েছিল, চার শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র রোম্যান সাম্রাজ্যে তার একাংশও বিকশিত হয় নি। রোমের রাজদণ্ডের প্রভাবে এথেন্সের ক্ষয় হতে শুরু করে। আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞানেরও ক্ষয় হয়। সেই যুগে মানুষের আত্মারও যেন ক্ষয় হচ্ছিল।

রোম্যান সাম্রাজ্যে ধর্মের বিকাশ

খৃষ্টোত্তর প্রথম দুই শতাব্দীতে ল্যাটিন ও গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনে মানুষের মন ছিল অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ব্যর্থ। স্বেচ্ছাচার এবং নিষ্ঠুরতার ছিল অবাধ

রাজত্ব ; অহঙ্কার ও আড়ম্বর ছিল প্রচুর, কিন্তু সম্মান খুব কম ; শান্তি বা নিরবচ্ছিন্ন সুখও ছিল না। হতভাগ্য জন-সাধারণ ছিল ঘৃণিত ও দুর্দশাগ্রস্ত, ভাগ্যবানেরা ছিল শঙ্কাকুল ও অত্যন্ত লোভী। বেশির ভাগ নগরীতে মল্লভূমির রক্তোন্মত্ত উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে জীবন ঘুরত; মানুষ আর পশুতে হত যুদ্ধ, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে তারা পতিত হত। রোম্যান ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল অ্যাম্ফিথিয়েটার। জীবন বয়ে যেত ওই পথে। মানুষের হৃদয়ের এই চঞ্চলতা ধর্মজীবনের গভীর অস্থিরতাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে।

যেদিন আর্য জাতি প্রথম আদিম সভ্যতার উপর আঘাত হানল, সেইদিন এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে মন্দির এবং পুরোহিত-প্রথার পুরাতন দেবতা হয় বহু পরিবর্তনের পর গ্রহণযোগ্য হবে, না-হয় নিশ্চিহ্ন হবে। কৃষ্ণবর্ণ জাতির সভ্যতায় কৃষক-সম্প্রদায় শত শত পুরুষ ধরে মন্দিরকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন ও চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিল। পূজানুষ্ঠান ও বিম্বিত নিত্যকর্মের ভয়, বলিদান ও ধর্ম-রহস্য তাদের মন অধিকার করে রেখেছিল। আমরা আর্য-পৃথিবীর লোক বলে আমাদের আধুনিক বিচার-বুদ্ধিতে তাদের দেবতাদের ভয়ঙ্কর ও অবাস্তব বলে মনে হয় ; কিন্তু এই পুরাতন যুগের লোকদের ধারণা ছিল, সুগভীর স্বপ্নে-দেখা ছবির স্পষ্ট এবং জাগ্রত প্রতিচ্ছবি এই মূর্তিগুলি। সুমেরিয়া বা আদি মিশরের একটি নগরীর আর-একটি নগরী-বিজয়ের অর্থ ছিল দেব-দেবী বা তাঁদের নামের পরিবর্তন ; কিন্তু উপাসনার অঙ্গ ও প্রকৃতি একই থাকত। সাধারণ বিধি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হত না। স্বপ্নে-দেখা ছবি বদলাত, কিন্তু স্বপ্ন দেখা চলত এবং তা হত ঠিক আগেকার মতই এক স্বপ্ন। আদি সেমেটিক বিজেতারা সুমেরীয়দের সঙ্গে প্রকৃতিতে প্রায় একই ধরনের ছিল, তাই, যে-মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাকে তারা পদানত করেছিল তাদের ধর্মভাবকে বিশেষ পরিবর্তন না করে মেনে নিতে পেরেছিল। ধর্ম-বিপ্লব সৃষ্টি করার মত মিশর কখনো পদানত হয় নি। টলেমি এবং সীজারদের অধীনে তার মন্দির, বেদী, পৌরোহিত্য সবই মিশরীয়ই ছিল।

যতদিন বিজয়-পর্ব অনুরূপ সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন দুই দেশের মন্দির ও দেবতার মধ্যে সংঘর্ষ, সংমিশ্রণ বা ভাগাভাগি করে এড়ানো সম্ভব ছিল। যদি দুই দেবতার চরিত্র একই রকমের হত, তাঁরা একই দেবতা হয়ে দুই নামে পরিচিত হতেন। পুরোহিতেরা এবং জনসাধারণ বলত, একই দেবতা শুধু অন্য নামে পরিচিত। দেবতাদের এই মিলনকে বলা হয় থিওক্রেশিয়া (Theocrasia) এবং খৃষ্টপূর্ব সহস্র বৎসরের বিরাট বিজয়ের যুগ ছিল থিওক্রেশিয়ার যুগ। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সে-দেশের দেবতাদের একত্র করে এক

সাধারণ দেবতায় রূপান্তরিত করা হত। সুতরাং যখন ব্যাবিলনের হিব্রু ধর্মযাজকেরা সমস্ত পৃথিবীতে পূত পবিত্র এক দেবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন, সেই আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য মানুষের মন রীতিমত তৈরি হয়ে ছিল।

কিন্তু প্রায়ই এই ধরনের সংমিশ্রণের জন্য দেবতারা একেবারে বিপরীত ও বিসদৃশ হতেন, তখন তাঁদের মধ্যে সম্ভবমত এক সম্বন্ধ দাঁড় করিয়ে একটি দলে পরিণত করা হত। গ্রীকদের আগমনের পূর্বে ঈজিয়ানদের মধ্যে দেবী-মাতারই বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এইরকম দেবীকে কোন এক দেবতার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত, এবং পশু-দেবতা কিংবা তারকা-দেবতাকে মানুষের রূপ দেওয়া হত; এবং এই পশু কিংবা জ্যোতিষ্ক, সাপ কিংবা সূর্য কিংবা তারাকে কোন অলঙ্কার বা প্রতীক করা হত। কিংবা পরাভূত লোকদের দেবতাকে করা হত বিজয়ী রাজ্যের দেবতার মারাত্মক শত্রু। পরমার্থ-তত্ত্বের ইতিহাস স্থানীয় দেবতাদের এই ধরনের বহু প্রয়োজনমত পরিবর্তন, পরিসাধন, আপোষ ও যুক্তিযুক্ত করার ঘটনায় পূর্ণ।

নগরী-রাজ্যের থেকে মিশর যতই এক সংযুক্ত সাম্রাজ্যে পরিণত হচ্ছিল, ততই এই থিওক্রেশিয়া দেখা যাচ্ছিল। প্রধান দেবতা ছিলেন ওসিরিস (Osiris), ফসলের দেবতা, ফারাওকে যাঁর পার্থিব দেহধারী বলে মনে করা হত। ওসিরিসকে মনে করা হত যে, তিনি বার বার অস্ত যান এবং উদয় হন; তিনি শুধু বীজ ও ফসলই ছিলেন না, স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে প্রসারিত করলে তিনি ছিলেন মানুষের অমরত্বের প্রতিমূর্তি। তাঁর প্রতীকের মধ্যে ছিল এক জাতের বিরাট-ডানার মৌমাছি যে ডিমকে মাটিতে পুঁতত নতুন করে জাগবে বলে, এবং দীপ্যময় সূর্য, যে নবোদয়ের জন্য অস্ত যায়। ভবিষ্যতে তাঁকেই ধর্ম-বৃষ, এপিসএর সঙ্গে এক বলে পরিচিত করা হত। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেবী আইসিস (Isis)। আইসিসও আবার ছিলেন এক গো-দেবী, হাথোর (Hathor), অর্ধচন্দ্র ও সমুদ্রের তারা এবং হোরাস নামে এক শিশুর জন্ম দিয়ে আইসিস পরলোক গমন করেন। হোরাস আবার একজন শ্যেন-দেবতা এবং ঊষা, এবং তিনিই আবার বড় হয়ে ওসিরিস হন। আইসিসের প্রতিমূর্তিতে তাকে শিশু-হোরাস কোলে চন্দ্রকলার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হয়ত এসব যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক নয়, কিন্তু দৃঢ় ও সুব্যবস্থিত চিন্তাধারার বিকাশের বহু পূর্বে মানুষের উদ্ভাবনী মনের পরিচয় এরা, এবং এক সুন্দর স্বপ্নের মত এরা সুসমন্বিত। এ ছাড়া অন্যান্য এবং নিম্ন-মর্যাদার মিশরীয় দেবতা ছিলেন, আরো ছিল খারাপ দেবতা, কুকুর-মাথা-বিশিষ্ট আনুবি (Anubi), অন্ধকার রাত্রি প্রভৃতি, ভক্ষক, প্রলোভক, দেবতা ও মানুষের শত্রু।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মার চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মীয় রীতি মিলে যায়, এবং এই অযৌক্তিক, এমনকি কুৎসিত প্রতীকের মধ্য দিয়েও যে মিশরীয়েরা সত্যকার ভক্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিশরীয়দের মনে অমরত্বের বাসনা ছিল প্রবল, এবং মিশরের ধর্ম-জীবন সেই অমরত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। ইতিপূর্বে আর কোন ধর্ম যা হয় নি, মিশরীয় ধর্ম ছিল তা-ই—অমরত্বের ধর্ম। যখন মিশর বিদেশীদের পদানত হল এবং মিশরীয় দেবতাদের যখন রাজনৈতিক প্রতীকের কোন সন্তোষজনক অর্থও পরিস্ফুট হল না, তখন এই ক্ষতিপূরক জীবনের বাসনা আরও গভীর হয়ে উঠেছিল।

গ্রীক বিজয়ের পর নতুন অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া নগরী শুধু যে মিশরীয় ধর্ম-জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয় তা নয়, সমগ্র যবন-জগতের ধর্ম-জীবনের কেন্দ্র-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। প্রথম টলেমি সেরাপিউম নামে এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ত্রিমূর্তির মত এক দেবতার উপাসনা হত। তাঁরা ছিলেন সেরাপিস (ওসিরিস-এপিসের নতুন নামান্তর), আইসিস ও হোরাস। তাঁদের তিনজনকে পৃথক দেবতা বলে না মনে করে একই দেবতার তিন রূপ বলা হত এবং সেরাপিসকে পরিচিত করা হত গ্রীক দেবতা জিউস, রোম্যান দেবতা জুপিটার এবং পারসীক সূর্য-দেবতা বলে। যেখানেই যবন প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি উত্তর ভারত এবং পশ্চিম চীনেও, এই উপাসনার প্রচলন হয়। সাধারণ জীবন যেখানে ক্লিষ্ট, দুর্দশাগ্রস্ত ও অবহেলিত, সেই জগৎ এই অমর জীবনের বাণী—আশা ও সান্ত্বনার অমরত্ব—অধীর আগ্রহে গ্রহণ করল। সেরাপিসকে বলা হত 'আত্মার মুক্তিদাতা'। সে-সময়ের মন্ত্র বলত, 'মৃত্যুর পরেও আমরা তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হব।' আইসিসের ভক্তের সংখ্যা ছিল বেশি। মন্দিরের মধ্যে হোরাসকে কোলে নিয়ে স্বর্গের রানীর মত তাঁর মূর্তি গড়া হত। তাঁর দেব-মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালা হত, মানসিক নৈবেদ্য অর্পণ করা হত ; মুণ্ডিত-মস্তক ব্রহ্মচারীরা তাঁর উপাসনা করতেন।

রোম্যান সাম্রাজ্যের জাগরণের ফলে পশ্চিম ইউরোপীয় জগৎ এই পূজানুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হল। সেরাপিস-আইসিসের মন্দির, পুরোহিতদের মন্ত্র-পাঠ এবং অমর জীবনের আশা রোম্যানদের পতাকাশ্রয়ে স্কটল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে বাসা বাঁধল। কিন্তু এই সেরাপিস-আইসিসের ধর্মেরও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। 'মিথরাইজম' ছিল এদের মধ্যে প্রধান। পারসীক উৎসের এই ধর্ম মিথরাসের কোন এক পবিত্র এবং পরহিতৈষী বৃষের বলিদান সম্বন্ধে বর্তমান-বিস্মৃত অলৌকিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। জটিল ও বিকৃত সেরাপিস-আইসিস ধর্ম-বিশ্বাসের চেয়ে এই ধর্মে আমরা কিছুটা বেশি আদিমত্বের সন্ধান পাই।

মানবিক সভ্যতার হেলিওলিথিক যুগের বলিদান প্রথাব মধ্যে যেন চলে যাই। মিথরাইক স্মৃতিস্তম্ভের উপরের বৃষটির দেহের পাশ থেকে সব সময় রক্তক্ষরণ হয় এবং সেই রক্ত থেকে নতুন জীবনের উন্মেষ হয়। মিথরাইজম ধর্মের উপাসক সত্য-সত্যই বলির বৃষের রক্তে স্নান করত। তার দীক্ষার সময় সে বাস্তবিকই বলির বৃষের হাড়ি-কাঠের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত, যাতে বৃষের রক্তধারা সত্য-সত্যই তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

এই দুই ধর্ম এবং প্রথম যুগের রোম্যান সম্রাটদের রাজত্বের কালে এই ধরনের যে অসংখ্য ধর্ম-বিশ্বাস ক্রীতদাস ও নাগরিকদের অনুরাগ কামনা করত, সে সবই ছিল ব্যক্তিগত ধর্ম। তাদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ ও ব্যক্তিগত অমরত্ব। পুরাতন ধর্মগুলি এ-ধরনের ব্যক্তিগত ছিল না; তারা ছিল সমাজগত। পুরাতন প্রথায় দেবত্ব বলতে বোঝাত রাজ্য কিংবা নগরীর দেব বা দেবীই প্রথম ও মুখ্য, এবং ব্যক্তিগত দেব বা দেবী গৌণ। বলি ও পূজার্চনা ছিল সামাজিক অনুষ্ঠান, কারও ব্যক্তিগত নয়। যে পৃথিবীতে আমরা সকলে বাস করি, তার সমষ্টিগত ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছিল তাদের স্বার্থ। কিন্তু প্রথম গ্রীকরা এবং তারপর এখন রোম্যানরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করে দিল। মিশরীয় ঐতিহ্যের পথ-নির্দেশে ধর্ম অন্য জগতে সরে গেল।

এই নতুন ব্যক্তিগত অমরত্বের ধর্ম পূর্বতন সরকারী ধর্মকে পঙ্গু করা সত্ত্বেও একেবারে তাদের নিশ্চিহ্ন কবতে পারে নি। আদি যুগের রোম্যান সম্রাটের অধীনে যে-কোন একটি নগরীতে প্রায় প্রত্যেক দেব-দেবীরই মন্দির থাকত। রোমের প্রধান দেবতা জুপিটারের একটি মন্দির হয়ত থাকত, আরও হয়ত থাকত তদানীন্তন সম্রাট সীজারের একটি মন্দির। কারণ, সীজারেরা ফারাওদের কাছ থেকে দেবতা হওয়ার সম্ভাবনা জানতে পেরেছিলেন। এ-ধরনের মন্দিরে নিষ্প্রাণ জমকালো রাজনৈতিক পূজা চলত; কেউ গিয়ে কিছু অর্ঘ্য দিতেন এবং তাঁর রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য একটু ধূপ জ্বালাতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশা ক্লেশের ভার নামাতে সকলে যেত সর্বারাধ্যা স্বর্গের দেবী আইসিসের মন্দিরে।

হয়ত কোথাও স্থানীয় বা উদ্ভট দেবতা থাকতেন। যেমন, আদি কার্থে-জিনিয়ানদের ভেনাসের আরাধনায় সেভিল বহুদিন বাদ সেধেছেন। কোন গুহায় কিংবা কোন ভূমিগর্ভের মন্দিরে ক্রীতদাস ও সৈন্যদল পরিবেষ্টিত মিথরাসের পূজার বেদী নিশ্চয়ই থাকবে। এবং সম্ভবত ইহুদীদের এক ধর্ম-মন্দির থাকবে, যেখানে তারা একত্রিত হয়ে তাদের বাইবেল পড়বে এবং সমগ্র পৃথিবীর অদৃশ্য দেবতার প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত করবে। সরকারী ধর্মের রাজনৈতিক

দিক নিয়ে মাঝে মাঝে ইহুদীদের সঙ্গে গোলমাল বাধত। তাদের মতবাদ ছিল এই যে তাদের দেবতা পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর এবং অনুদার; এবং তারা সীজারের কাছে সামাজিক অর্ঘ্য প্রদান করতে সম্মত হত না। পৌত্তলিকতার ভয়ে তারা রোম্যান পতাকাকেও অভিবাদন করত না।

বুদ্ধের সময়ের অনেক অনেক আগে প্রাচ্যে তপশ্চারী ছিলেন। এই নর-নারীরা জীবনের সর্ব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে, বিবাহ্ ও সম্পত্তি পরিহার করে সংযম, ক্লেশ ও নির্জনতার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও মর-জগতের দুঃখ-দুর্দশা ও বিনাশের থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতেন। বুদ্ধ নিজে এই সন্ন্যাসীদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ছিলেন; কিন্তু তাঁর অধিকাংশ শিষ্য অত্যন্ত কঠিন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। অজ্ঞাত গ্রীক পূজানুষ্ঠানপদ্ধতিতেও এই ধরনের নিয়ম ছিল, এমন কি কেউ-কেউ স্বেচ্ছায় অঙ্গচ্ছেদন করত। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে জুডিয়া ও অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সন্ন্যাসব্রত দেখা দিয়েছিল। দলে দলে লোক মর-জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে সন্ন্যাস ও আধ্যাত্ম্য সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল। এরা ছিল এসেনিস (Essenes) ধর্ম-সম্প্রদায়। খৃষ্টোত্তর প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দী জুড়ে বিশ্বব্যাপী মর-জীবনে বীতস্পৃহা ও মোক্ষের সন্ধান চলছিল। প্রতিষ্ঠিত ধারার আদিম অর্থ, পুরোহিত ও মন্দির, আইন ও আচারের উপর আদিম বিশ্বাসও তিরোহিত হয়েছিল। প্রচলিত দাসত্ব, নিষ্ঠুরতা, ভয়, উদ্বেগ, অপচয়, আড়ম্বর ও সর্বক্ষয়ী আত্মতুষ্টির মধ্যে চলেছিল আত্ম-ধিক্কার ও মানসিক আশঙ্কার মহামারী, এবং সর্বস্ব-ত্যাগ ও স্বেচ্ছাকৃত ক্লেশের মূল্যেও শান্তি-লাভের আপ্রাণ আকূতি। এর ফলে সেরাপিয়ামরা অত্যন্ত ব্যথিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিথরাসের বিষণ্ণ ও রক্তজমাট গুহায় আশ্রয় নিতে আসত।

যিশুর অনুশাসন

প্রথম রোম্যান সম্রাট অগস্টাস সীজারের রোমে রাজত্বকালে খৃষ্টধর্মের যিনি খৃষ্ট, সেই যিশুর জুডিয়াতে জন্ম হয়। তাঁরই নামে পরবর্তী যুগে এক ধর্মের সৃষ্টি হল, যা সমগ্র রোম্যান সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসাবে পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়ে ছিল।

এখন, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বকে পৃথক রাখা মোটামুটি অনেক সুবিধাজনক। খৃষ্ট-জগতের এক বৃহদংশ বিশ্বাস করে যে, যিশু সমগ্র পৃথিবীর দেবতার অবতার, তাঁকে ইহুদীরা প্রথম স্বীকার করে নেন। ঐতিহাসিককে যদি ঐতিহাসিকই থাকতে হয়, তবে তিনি এই ব্যাখ্যা গ্রহণও করতে পারেন না, অস্বীকারও করতে

পারেন না। প্রকৃতপক্ষে যিশু মানুষের সাদৃশ্যে আবির্ভাব হন এবং তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মানুষের মতই আলোচনা করবেন।

টাইবেরিয়াস সীজারের রাজত্বকালে তাঁর জুডিয়াতে আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন এক ধর্মযাজক। পূর্বতন ইহুদী ধর্মযাজকদের ধারায় তিনি ধর্ম-প্রচার করতেন। তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ এবং ধর্ম-প্রচারের পূর্বেকার তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ।

যিশুর জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র সুস্পষ্ট উৎস হল চারটি গস্‌পেল (Gospel)। এই চারটি গস্‌পেল এক বিশেষ ব্যক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় আমাদের দেয়। সকলে বলতে বাধ্য হয় : এই এক মানুষ। এঁকে কখনো কাল্পনিক বলা চলে না।

কিন্তু ঠিক যেমন গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব তাঁর ঋজু পদ্মাসনোপবিষ্ট মূর্তিতে বিকৃত ও আবৃত হয়ে গেছে, সেই রকম সকলের এই মনে হয় যে, যিশুর শীর্ণ ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বকে আধুনিক খৃষ্টীয় শিল্পকলার অপ্রকৃত শ্রদ্ধারোপের অবাস্তবতা ও সনাতন রীতি অনেকখানি নষ্ট করেছে। যিশু ছিলেন কপর্দকহীন যাজক, কেবলমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল করে রৌদ্রতপ্ত ধূলিময় জুডিয়ায় ঘুরে বেড়াতেন ; কিন্তু তাঁকে সর্বদা দেখানো হয় পরিষ্কার, কেশসজ্জা সুবিন্যস্ত এবং কোমল, পরিচ্ছন্ন বেশবাস ও ঋজু এবং গতিহীন এমন কিছু, যেন তিনি বাতাসে ভেসে রয়েছেন। নির্বোধ ভক্তের অতিরঞ্জিত ও অবিবেচিত সংযোজনা থেকে প্রকৃত কাহিনী গ্রহণ করতে পারে না বলে অনেকের কাছে এই ব্যাপারই একমাত্র তাঁকে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য করে দিয়েছে।

এই নথিপত্র থেকে এইসব দুর্বোধ্য অনুষঙ্গ যদি আমরা একে একে খুলে নিই, তবে আমরা পাই এক মনুষ্য-মূর্তি,—অত্যন্ত মানবিক, অত্যন্ত অনুরাগী, একাগ্র ও বদরাগী এবং নতুন, সরল ও গভীর ধর্মোপদেষ্টার এক ছবি—ঈশ্বরের পিতৃত্বের সার্বভৌমিক প্রেম ও স্বর্গ-রাজ্যের আগমনের এই ধর্ম। অত্যন্ত চলিত কথায়, তিনি গভীর আকর্ষণী-শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর অনুচরদের আকৃষ্ট করতেন এবং প্রেম ও সাহস দিয়ে তাদের হৃদয় পূর্ণ করতেন। দুর্বল ও অসুস্থ লোক তাঁর উপস্থিতিতে আশান্বিত ও সুস্থ হত। ক্রুশ-বিদ্ধের যন্ত্রণায় এত শীঘ্র তাঁর মৃত্যু হয় যে মনে হয়, তিনি হয়ত অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। একটি কাহিনী আছে যে নিয়মমত যখন বধ্যভূমিতে তাঁকে তাঁর নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তিন বছর ধরে তিনি সমগ্র দেশে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে শেষে জেরুজালেমে এসে উপস্থিত হন এবং

জুডিয়াতে এক অদ্ভুত রাজ্য-প্রতিষ্ঠা চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হন; এই অপরাধে তাঁর বিচার হয় এবং আরও দুই তস্করের সঙ্গে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। এই দুই-জনের মৃত্যুর বহু পূর্বেই তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছিল।

মানুষের চিন্তাধারাকে যে-সব বিপ্লবাত্মক মতবাদ সবচেয়ে বেশি আলোড়িত ও পরিবর্তিত করেছে, যিশুর প্রধান অনুশাসন, স্বর্গরাজ্যবাদ, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে অন্যতম। সে-যুগের পৃথিবী যে তার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে মানুষের প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও প্রচলিত বিধির ভয়ঙ্কর প্রতিবাদের মাত্র অর্ধ-উপলব্ধিতে শঙ্কায় সঙ্কুচিত হবে, তা মোটেই আশ্চর্যের নয়। যিশু যেভাবে প্রচার করেছিলেন বলে মনে হয়, তাতে স্বর্গরাজ্যবাদ ছিল আমাদের সংগ্রামী মানবজাতির জীবনধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও শুদ্ধীকরণ, অন্তর ও বাহিরের সম্পূর্ণ শুদ্ধীকরণের জন্য নির্ভয় ও সনির্বন্ধ দাবি। এই সমস্ত সংরক্ষিত অনুশাসনের জন্য পাঠকেরা গস্‌পেল পড়বেন; প্রতিষ্ঠিত মতবাদের উপর তার আঘাতের আলোড়নের ফলাফলের সঙ্গেই আমাদের একমাত্র সম্বন্ধ।

ইহুদী প্রতীতি ছিল এই যে, সমগ্র পৃথিবীর একেশ্বর তাদের ঈশ্বর ছিলেন সত্যশীল কিন্তু তারা তাঁকে বণিক-দেবতা বলেও কল্পনা করত; তিনি তাদের জগতে শীর্ষস্থানে আনবার জন্য তাদের সম্বন্ধে পিতা অ্যাব্রাহামের সঙ্গে এক অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায়িক চুক্তি করেন। শঙ্কা ও ক্রোধের সঙ্গে তারা দেখল যে যিশু তাদের এই মহার্ঘ সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলতেন যে ঈশ্বর বণিক নন; তাঁর কাছে বাঞ্ছিত লোক বলে কেউ নেই এবং স্বর্গরাজ্যে পক্ষপাতিত্বও নেই। ঈশ্বর সমগ্র মানব-জাতির পিতা, সার্বভৌম সূর্যের মত কারো উপর পক্ষপাত দেখাতে পারেন না। পাপী-তাপী সমস্ত মানুষই পরস্পরের ভাই এবং সকলেই এই ঐশ পিতার প্রিয় সন্তান। সৎ সামারিটান (Good Samaritan) নীতিকথায় আমাদের নিজেদের লোককে গৌরবান্বিত করা ও অন্য আদর্শ ও জাতিকে হেয় করার যে সহজাত প্রবৃত্তি, তাতে যিশু অত্যন্ত ঘৃণা দেখিয়েছেন। শ্রমিকদের নীতিকথায় তিনি ঈশ্বরের উপর ইহুদীদের বিশেষ দাবি ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, যাদের ঈশ্বর স্বরাজ্যে গ্রহণ করেন তাদের সমচক্ষে দেখেন, তাঁর অসীম বদান্যতা-বলেই তাঁর কাছে কোন ইতর-বিশেষ নেই। সুপ্ত প্রতিভার নীতিকথায় কিংবা বিধবার সামান্য ধনের ঘটনায় পাওয়া যায় এই যে, তিনি সকলের কাছ থেকে তাদের সাধ্যমত দাবি করেন। স্বর্গরাজ্যে কোন বিশেষ অধিকার, দস্তুরি বা ওজর নেই।

যিশু যে শুধু ইহুদীদের প্রচণ্ড ধর্ম-বিশ্বাসেই আঘাত হেনেছিলেন, তা নয়।

তারা পারিবারিক বন্ধনের অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং ঈশ্বর-প্রেমের দুর্দম বন্যায় তাদের সমস্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমিত পরিবারানুরাগ তিনি ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। সমগ্র স্বর্গরাজ্যই তাঁর অনুচরবর্গের সংসার হওয়ার কথা ছিল। আমরা জানি যে, 'দেখ, যখন তিনি লোকদের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে উৎসুক ছিলেন। তখন একজন তাঁহাকে বলিল, দেখুন, আপনার মাতা ও ভ্রাতৃবৃন্দ আপনার সহিত কথা বলিতে উৎসুক হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন এবং যে তাঁহাকে বলিয়াছিল তাহাকে বলিলেন, কে আমার মাতা? এবং কাহারা আমার ভ্রাতৃবৃন্দ? এবং তাঁহার হস্ত তাঁহার শিষ্যবৃন্দের প্রতি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, আমার মাতা এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখ। কারণ যে-কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছামত কার্য করিবে, সে-ই আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নী এবং মাতা হইবে।'*

ঈশ্বরের সার্বভৌম পিতৃত্ব এবং সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের নামে যিশু শুধু পারিবারিক অনুরাগের বন্ধন ও আস্থার মূলেই আঘাত হানেন নি; এ কথা অত্যন্ত রকমের সত্য যে তাঁর অনুশাসনে অর্থনৈতিক কাঠামোর সমস্ত স্তর, সমস্ত ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য এবং সুবিধাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। সমস্ত মানুষ সেই রাজ্যের অন্তর্গত, সমস্ত সম্পত্তিও সেই রাজ্যের অধিকারে; আমাদের যা ছিল বা আমরা যা ছিলাম, তাই নিয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করাই হল সমস্ত মানুষের সত্যসন্ধ জীবন, যা একমাত্র পবিত্র জীবন। বারবার তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনকে ধিক্কার দিয়েছেন—

'এবং যখন তিনি পথিমধ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন একজন তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসিল এবং তাঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহান প্রভু, আমি কী করিলে অমর জীবনের উত্তরাধিকারী হইব? এবং যিশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে মহান বলিয়া সম্বোধন করিলে কেন? একজন ব্যতীত আর কেহই মহান নহেন, তিনি ঈশ্বর। তুমি অনুজ্ঞাগুলি জান; ব্যাভিচার করিও না, প্রবঞ্চনা করিও না; তোমার পিতা ও মাতাকে শ্রদ্ধা করিও। এবং সে উত্তর করিল ও তাঁহাকে বলিল, প্রভু, আমার যৌবন হইতে ঐগুলি পালন করিয়া আসিতেছি। তখন যীশু তাহাকে অবলোকন করিয়া প্রেম করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, একটি জিনিসের তোমার অভাব আছে; তুমি ফিরিয়া যাও, যাহা তোমার আছে বিক্রয় কর † এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, স্বর্গে তুমি ঐশ্বর্য লাভ

* ম্যাথু ১২; ৪৬–৫০

† মার্ক ১০; ১৭–২৫

করিবে; তাহার পর আইস, ক্রুশ লইয়া আমাকে অনুসরণ কর। এই কথায় সে দুঃখিত হইল এবং দুঃখিত চিত্তে চলিয়া গেল, কারণ তাহার প্রচুর সম্পদ ছিল।

'এবং যিশু তাঁহার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি কহিলেন, যাহারা ধনী তাহারা কদাচিৎ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিবে! তাঁহার বাক্যে শিষ্যগণ বিস্মিত হইল। কিন্তু যিশু পুনরায় উত্তর করিলেন এবং তাহাদের বলিলেন, যাহারা সম্পদে বিশ্বাস রাখে তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কিরূপ কঠিন! এক ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা একটি উষ্ট্রের সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়া গমন করা অধিকতর সহজ।'

তা ছাড়া, যে রাজ্যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এক হয়ে যাবে, সেই রাজ্যের সম্বন্ধে তাঁর চরম ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহারিক ধর্মের চুক্তিগত সত্যশীলতার সম্বন্ধে একেবারেই তিতিক্ষা ছিল না। তাঁর সংগৃহীত বক্তব্যের আর-এক অংশ ধর্মাচরণের সযত্ন-পালিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে উদ্যত। 'তাহার পর ফারিসিগণ† ও অনুলেখকগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, গুরুজন-প্রদর্শিত পথে কেন আপনার শিষ্যগণকে লইয়া চলেন না, এবং অধৌত হস্ত দ্বারা আপনার রুটি কেন আহার করেন? তিনি উত্তর করিলেন এবং তাহাদের প্রতি বলিলেন, আইজায়া তোমাদের ন্যায় কপট ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন, যেরূপ ইহা লিখিত আছে,

'এই ব্যক্তিগণ আমাকে তাহাদের অধর দ্বারাই মান্য করে,

'কিন্তু তাহাদের হৃদয় আমা হইতে অনেক দূরে।

'কিরূপ ব্যর্থতার সহিত তাহারা আমার উপাসনা করে,

'মনুষ্যের প্রতি অনুজ্ঞাগুলির উপদেশ শিক্ষা করে,

'কারণ ঈশ্বরের অনুজ্ঞাগুলিকে দূরে সরাইয়া তোমরা পাত্র এবং বাটী ধৌত করা এবং এইরূপ অনেক কর্ম প্রভৃতি মনুষ্যের সংস্কার ধরিয়া রাখিয়াছ। এবং তিনি তাহাদের বলিলেন, তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুজ্ঞাগুলি প্রত্যাখ্যান কর, যাহাতে তোমরা তোমাদের স্বীয় সংস্কার রক্ষা করিতে পার।'*

যিশু শুধু নৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবই ঘোষণা করেন নি, বহু লক্ষণে এ কথা পরিস্ফুট যে তাঁর ঘোষণার মধ্যে এক রকমের অত্যন্ত সরল রাজনৈতিক ঝোঁকও ছিল। এ কথা সত্য যে তিনি বলতেন তাঁর রাজ্য এই জগতের নয়, মানুষের হৃদয়েই তার বাস, সিংহাসনের উপর নয়; কিন্তু এ কথাও অনুরূপ স্পষ্ট যে

† Pharisee—উৎকট নিষ্ঠাবান ইহুদী

* মার্ক ৭; ৫—৯

যেখানে এবং যে-পরিমাণেই তাঁর রাজ্য মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানকার বহির্জগৎ সেই পরিমাণে বিপ্লব-যুক্ত ও নতুন করে সৃষ্টি হবে।

তাঁর শ্রোতারা তাদের বধিরতা বা অন্ধত্বের জন্য তাঁর বক্তব্যের যা-ই অনুধাবন করতে না পারুক, এ কথা স্পষ্ট যে পৃথিবীতে নব বিপ্লব আনার তাঁর সঙ্কল্প তারা ঠিক বুঝেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূলতার ভয়ানক ধরন, এবং তাঁর বিচার ও হত্যার ঘটনাবলী থেকে এটুকু স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সমসাময়িকদের কাছে তিনি সমস্ত মানব-জীবনকে পরিবর্তিত, একত্রিত ও প্রসারিত করার কল্পনার কথা সোজাসুজিভাবেই বলেছিলেন।

তাঁর এই স্পষ্ট ভাষণে এটা কি খুব আশ্চর্যের যে ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত বিভীষিকার ছবি দেখবে, তাঁর উপদেশে তাদের পৃথিবী তাদের চোখের সামনে ঘুরতে থাকবে ; সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে আহরিত তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত সঞ্চয় তিনি সার্বভৌম ধর্মজীবনের আলোয় টেনে আনছিলেন। তিনি যেন এক ভয়ঙ্কর নৈতিক শিকারী, মনুষ্যজাতিকে তাদের এতদিনকার আবাসের অন্ধকার গর্তের থেকে বাইরে বার করে আনছেন। তাঁর রাজ্যের উজ্জ্বল প্রভায় কোন সম্পত্তি, কোন সুবিধা, কোন অহঙ্কার, কোন পূর্ববর্তিতা থাকবে না এবং প্রেম ছাড়া কোন অভিপ্রায় বা পুরস্কার থাকবে না। মানুষের চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তারা যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে—তা কি খুব আশ্চর্যের ? তাঁর কাছ থেকে আলো না পেয়ে তাঁর শিষ্যরাও প্রতিবাদ করেছে। এই যে পুরোহিতেরা বুঝতে পেরেছিল যে এই এক ব্যক্তি এবং তাদের মধ্যে হয় তাঁর অথবা পৌরোহিত্যের বিনাশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই, এ কি খুব আশ্চর্যের ? এটাও কি খুব আশ্চর্যের যে তাদের বুদ্ধির অগম্য ব্যাপারে আশ্চর্য ও নিয়মানু-বর্তিতাহানিতে শঙ্কিত হয়ে রোম্যান সৈন্যরা উন্মত্ত হাসির আশ্রয় নিয়ে তাঁর মস্তকে কণ্টক-মুকুট ও দেহে রক্তপোশাক পরিয়ে তাঁকে নিয়ে নকল সীজারের খেলা খেলবে ? তাঁকে গভীরভাবে গ্রহণ করার অর্থই হল এক বিচিত্র ও ভীতিকর জীবনে প্রবেশ, বদ-অভ্যাস ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার সংযম ও এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় জীবন রচনা করা।···

ঔপদেশিক খৃষ্টধর্মের বিকাশ

চারটি গসপেলে আমরা যিশুর ব্যক্তিত্ব ও অনুশাসনের পরিচয় পাই, কিন্তু খৃষ্টান গীর্জার বিধি-ব্যবস্থার কোন সন্ধান পাই না। যিশুর ঠিক পরবর্তী শিষ্যদের লিপি বা এপিসলে (epistle) খৃষ্টধর্মের বিশ্বাসের মূলসূত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে।

খৃষ্টধর্মের উপদেশ-রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান হলেন সেন্ট পল। তিনি কোনদিন যিশুকে দেখেন নি, তাঁকে উপদেশ দিতে শোনেনও নি। পলের প্রকৃত নাম ছিল সল এবং যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হবার পর তাঁর শিষ্যদের ছোট দলের উপর প্রবল অত্যাচার করে তিনি সকলের দৃষ্টিতে পড়েন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও নাম পরিবর্তন করে পল রাখেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত ছিলেন এবং সে-যুগের ধর্ম-বিপ্লবে তাঁর গভীর অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। জুডাইজম, মিথরাইজম এবং সে সময়ে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। তাদের অনেক ধারণা এবং প্রকাশের ধারা তিনি খৃষ্টধর্মে প্রয়োগ করেন। যিশুর প্রকৃত মৌলিক অনুশাসন, স্বর্গরাজ্য লাভের আকর্ষণ বৃদ্ধি বা প্রসারের জন্য তিনি বিশেষ কিছু করেন নি। কিন্তু যিশু যে ইহুদীদের স্বীকৃত নেতা, পূর্ব-অঙ্গীকৃত খৃষ্ট তা নয়,—আদিম সভ্যতার মহান বলির মত তাঁর মৃত্যুও সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রায়শ্চিত্তের জন্য আর-এক বলি—এ কথা তিনি শিখিয়েছিলেন।

যখন একাধিক ধর্ম পাশাপাশি বিরাজ করে, তখন তারা পরস্পরের আনুষ্ঠানিক এবং অন্যান্য বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা গ্রহণ করে। যেমন, চীনের বৌদ্ধ মন্দির বা পুরোহিতের সঙ্গে তাও ইজমের ব্যবহারে মিল সত্ত্বেও লাওৎসের উপদেশাবলী-অনুসৃত বৌদ্ধধর্ম ও তাওইজমের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। খৃষ্টধর্ম অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া ও মিথরাইক ধর্মের থেকে যে শুধু মুণ্ডিতশ্মশ্রু পুরোহিত, মানসিক নৈবেদ্য, বেদী, বাতি, স্তোত্রপাঠ ও মূর্তি নিয়েছিল তা নয়, তাদের উপাসনার ভাষা ও ধর্ম-তত্ত্বের ধারণাও গ্রহণ করেছিল—তাতে খৃষ্টধর্মের মহিমা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নি। একটু-কম জনপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির সঙ্গে পাশাপাশি এইসব ধর্ম প্রসার লাভ করছিল। প্রত্যেকটি ধর্মই তাঁর অনুরাগী জনের সন্ধান করছিল এবং এই ধর্মগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ধর্মাবলম্বীর ধর্ম-গ্রহণ ও পরিত্যাগ অবাধে চলছিল। কোন সময় একটি এবং অন্য সময় আর-একটি সরকারের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠত। কিন্তু তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে খৃষ্টধর্মকে অনেক বেশি সন্দেহের চোখে দেখা হত, কারণ ইহুদীদের মত খৃষ্টানরা দেবতা সীজারের পূজানুষ্ঠান করত না। স্বয়ং যিশুর বিপ্লবধর্মী অনুশাসন ছাড়াও শুধু এইজন্যই এই ধর্ম রাজ-বিদ্রোহী রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

সেণ্ট পল তাঁর শিষ্যদের অন্তরে এই ধারণাই এনে দিয়েছিলেন যে ওসিরিসের মত যিশুও ছিলেন এক দেবতা, যিনি নবজন্মের জন্য মৃত্যু বরণ করেন এবং মানুষকে অমরত্ব এনে দেন; এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেবতা-যিশুর সঙ্গে মনুষ্য-জাতির পিতা ঈশ্বরের সম্বন্ধের জটিল ধর্মতত্ত্বীয় বিবাদ-বিতণ্ডায় বিস্তারশীল

খৃষ্টান সমাজ বহুধা হয়ে গেল। আরিয়ানরা বলতেন যে যিশু স্বর্গীয়, কিন্তু পরম পিতার চেয়ে ছোট এবং একেবারে স্বতন্ত্র। স্যাবেলিয়ানেরা বলতেন যিশু পরম পিতার অপর এক রূপ মাত্র এবং ঈশ্বর একই সঙ্গে পরম পিতা ও যিশু, যেমন একজন লোক একই সঙ্গে পিতা ও শিল্পকার হতে পারে: এবং ট্রিনিটারিয়ানরা আর-একটু বেশি সূক্ষ্ম উপদেশ দিতেন এই যে, ঈশ্বর একসঙ্গে এক এবং তিন: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা (Father, Son and Holy Spirit)। এক সময় মনে হত যে আরিয়ান মতবাদই অন্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর আধিপত্য করবে, কিন্তু তারপর অনেক বিবাদ হিংসা এবং যুদ্ধের পর ট্রিনিটারিয়ান মতবাদই সমগ্র খৃষ্ট-জগতে গৃহীত হয়। এথেনেসিয়ান ক্রীডে এই মতবাদের সুসম্পূর্ণতম উক্তি পাওয়া যায়।

এই সব তর্ক-বিতর্কের আমরা এখানে কোন সমালোচনা করব না। যিশুর ব্যক্তিগত উপদেশ যেভাবে ইতিহাসকে ঘুরিয়ে দেয়, এই বাদ-বিসংবাদ তেমন কিছু করে না। আমাদের জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যিশুর ব্যক্তিগত অনুশাসন এক নতুন যুগের সূচনা সৃষ্টি করে বলে মনে হয়। ঈশ্বরের সার্বভৌম পিতৃত্বের উপর এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত লোকের সার্বভৌম ভ্রাতৃত্বের উপর এর জেদ, প্রত্যেকটি মানুষকে ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির মনে করে তার আত্মার পবিত্রতার উপর তার জেদ পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গভীরতম ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়। খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সঙ্গে, যিশুর উপদেশাবলীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের এক নতুন শ্রদ্ধা দেখা যায়। খৃষ্টধর্মের বিরূপ সমালোচকদের এ কথা সত্য হতে পারে যে, সেণ্ট পল ক্রীতদাসদের কাছে আনুগত্য প্রচার করেছিলেন, কিন্তু একথাও সমভাবে সত্য যে গস্‌পেলগুলিতে সংরক্ষিত যিশুর সমস্ত অনুশাসনের মূল তাৎপর্য মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এবং মল্লভূমিতে মানুষে মানুষে অস্ত্র-দ্বন্দ্ব ক্রীড়ার (gladiatorial combat) মত মানুষের অমর্যাদাকর দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্ম আরো বেশি সক্রিয় ছিল।

খৃষ্টোত্তর প্রথম দুই শতাব্দী ধরে খৃষ্টধর্ম ক্রমবর্ধমান শিষ্য-সংখ্যাকে এক নতুন আদর্শ ও সংস্কারের সমাজে দৃঢ়বদ্ধ করে সমগ্র রোম্যান সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করছিল। সম্রাটরা কখনো তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতেন, কখনো বা প্রশ্রয় দান করতেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে এই নতুন ধর্মকে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল; এবং শেষ পর্যন্ত ৩০৩ খৃষ্টাব্দ ও পরবর্তী কয়েক বছরে সম্রাট ডায়োক্লে-শিয়ানের আদেশে অনির্বচনীয় অত্যাচার শুরু হয়। গীর্জাগুলির সঞ্চিত প্রচুর ধন-সম্পত্তি ক্রোক করা হয়, সমস্ত বাইবেল ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় রচনা বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করা হয়, খৃষ্টানদের আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং অনেককে হত্যা করা

হয়। বই ধ্বংস করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন ধর্মকে একত্র ধরে রাখার জন্য লিখিত ভাষার শক্তিকে উপরওয়ালারা কতখানি ভয় করতেন, এ থেকে তা বোঝা যায়। খৃষ্টধর্ম এবং জুডাইজম এই দুই কিতাবী ধর্ম ছিল যা শিক্ষা দিত। এই উপদেশাবলী পড়া ও তার ভাবাদর্শ বুঝতে পারা যেত বলেই তাদের অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব সম্ভব হয়েছিল। পুরাতন ধর্মগুলি মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধির কাছে এভাবে কখনো ধরা দেয় নি। পশ্চিম ইউরোপে বর্বরদের বিশৃঙ্খলার যুগে খৃষ্টীয় গির্জাগুলিই একমাত্র বিদ্যাশিক্ষার ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত রাখার মূল উৎস ছিল।

ক্রমবর্ধমান খৃষ্টান সমাজকে ডায়োক্লেশিয়ানের নিগ্রহ কোনমতেই দমন করতে পারল না। অনেক দেশেই জনগণের অধিকাংশ এবং অনেক রাজকর্মচারী খৃষ্টান হওয়ায় এই নিগ্রহ বিশেষ কার্যকরী হতে পারেনি। ৩১৭ খৃষ্টাব্দে সহযোগী সম্রাট গ্যালেরিয়াস এই ধর্মের প্রতি ঔদার্যসূচক এক রাজাজ্ঞা ঘোষণা করেন; এবং ৩২৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মের মিত্র ও মৃত্যুশয্যায় শায়িত, উক্ত ধর্মে দীক্ষিত কনস্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেট রোম্যান জগতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হন। তিনি সমস্ত দেবত্বের অধিকার ত্যাগ করে সেনাবাহিনীর ঢাল ও নিশানে খৃষ্টধর্মের প্রতীক প্রতিষ্ঠা করেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম রাজধর্ম হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মগুলি আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয় কিংবা একেবারে তিরোহিত হয়, এবং ৩৯০ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোসিয়াস দি গ্রেট অ্যালেকজাণ্ড্রিয়ার জুপিটার সেরাপিসের বিরাট মর্মর মূর্তিটি ধ্বংস করে ফেলেন। পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকেই রোম্যান সাম্রাজ্যে পুরোহিত ও ধর্মমঠ বলতে শুধু-মাত্র খৃষ্টান পুরোহিত ও ধর্মমঠই অবশিষ্ট ছিল।

বর্বর আক্রমণে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত সাম্রাজ্য

সমগ্র তৃতীয় শতাব্দী ধরে ভাঙন-ধরা নীতিবোধ ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজ নিয়ে রোম্যান সাম্রাজ্য বর্বরদের আক্রমণ সহ্য করেছিল। এ যুগের সম্রাটরা সামরিক স্বৈরাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের সামরিক নীতির প্রয়োজনানু-সারে সাম্রাজ্যের রাজধানীও স্থানান্তরিত হত। এখন হয়ত রাজকীয় প্রধান কার্যালয় উত্তর ইটালির মিলানএ, কিছুদিন পরে বর্তমান সার্বিয়ার সিমিয়াম বা নিশএ, আবার হয়ত এশিয়া মাইনরের নিকোডেমিয়ায়। ইটালির মধ্যবর্তী রোম সুবিধাজনক রাজকীয় কার্যালয় হবার পক্ষে সামরিক কৌতূহলের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। রোম তখন ক্ষয়িষ্ণু নগরী। সাম্রাজ্যের অধিকাংশই তখন শান্তিতে ছিল এবং লোকেরা নিরস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াত। সৈন্যবাহিনী তখন পর্যন্ত শক্তির একমাত্র

ভাণ্ডার ছিল এবং এদের সহায়তায় সম্রাটরা অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের কাছে দিন দিন আরো বেশি স্বেরাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং তাঁদের রাজ্যও দিন দিন পারসীক বা প্রাচ্যের সম্রাটদের মত হতে লাগল। ডায়োক্লেশিয়ান রাজমুকুট এবং প্রাচ্যের রাজপোশাক ধারণ করেন।

রাইন এবং দানিয়ুবের তীর ধরে সমগ্র রাজ্য-সীমান্ত জুড়ে শত্রুরা আক্রমণ শুরু করেছিল। ফ্র্যাঙ্ক এবং অন্যান্য জার্মান উপজাতিরা রাইন নদী পর্যন্ত এসে গেছে। উত্তর হাঙ্গারিতে এসেছে ভ্যাণ্ডালরা; পূর্বতন ডাসিয়া এবং বর্তমান রুমানিয়াতে এসেছে ভিসিগথ বা পশ্চিমী গথরা। এদের পিছনে দক্ষিণ রাশিয়ায় পূর্ব গথ বা অস্ট্রোগথরা এসে গেছে এবং আবার এদের পিছনে ভলগা এলাকায় অ্যালানরা। তার উপর মঙ্গোলীয়রা ইউরোপের দিকে তাদের অভিযান চালিয়েছে। হুনরা এলান এবং অস্ট্রোগথদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেছে এবং তাদের পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

এশিয়ায় পুনরুজ্জীবিত পারস্যের চাপে রোম-সীমান্ত ভেঙে পড়ছিল। এই নতুন পারস্য, স্যাসানিড রাজাদের পারস্য, শেষ পর্যন্ত পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে রোম্যান সাম্রাজ্যের এক দুর্দম এবং সফল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

ইউরোপের মানচিত্রে দৃষ্টি দিলেই পাঠকরা রোম্যান সাম্রাজ্যের অদ্ভুত দুর্বলতা লক্ষ্য করবেন। দানিয়ুব নদী বর্তমানের বোসনিয়া ও সার্বিয়া অঞ্চলে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের দুশো মাইলের মধ্যে এসে গেছে। এখানে এই নদী চতুষ্কোণ হয়ে আবার ভিতরে প্রবেশ করেছে। রোম্যানরা কোনদিনই তাদের সমুদ্রের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভালভাবে রাখে নি এবং এই দুশো মাইলের একফালি জায়গাই

ছিল তাদের সাম্রাজ্যের পশ্চিমের ল্যাটিনভাষী ও পূর্বের গ্রীকভাষী অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের পথ। দানিয়ুবের এই চতুষ্কোণের মধ্যেই বর্বরদের আক্রমণের চাপ ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা যখন এই জায়গা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল, সাম্রাজ্য যে দুই অংশে বিভক্ত হবে, তখন আর তা বিচিত্র কী!

আর-একটু বীর্যশালী কোন সাম্রাজ্যের পক্ষে অগ্রসর হয়ে ডাসিয়া পুনরধিকার করা হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু রোম্যান সাম্রাজ্যের সেই বীর্যের অভাব ছিল। কনস্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেট অবশ্য অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। ঠিক এই অত্যাবশ্যক জায়গা থেকেই তিনি গথদের এক আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু দানিয়ুবের অপর তীরে তাঁর সীমান্তকে প্রসারিত করবার মত তাঁর সৈন্যশক্তি ছিল না। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিয়ে তিনি অত্যন্ত জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি খৃষ্টধর্মের সমস্বার্থতা ও নৈতিক শক্তিকে আবাহন করলেন এবং হেলেসপণ্টের উপর বাইজাণ্টিয়ামে এক নতুন স্থায়ী রাজধানী গঠনের সিদ্ধান্ত করলেন। নব-গঠিত বাইজাণ্টিয়াম, যা পরে তাঁর সম্মানার্থে কনস্ট্যাণ্টিনোপল নামে অভিহিত হয়, তাঁর মৃত্যুর সময়েও সম্পূর্ণ হয় নি। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে এক অপূর্ব ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়েছিল। গথদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ভ্যাণ্ডালরা রোম্যান সাম্রাজ্যের প্রজা হবার জন্য আবেদন জানাল। দানিয়ুবের পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমানের হাঙ্গারি এবং তখনকার পান্নোনিয়াতে তাদের বাসের জায়গা দেওয়া হল এবং তাদের সমর-কুশল লোকরা সাম্রাজ্যের নামমাত্র সৈন্য হলেও এই নতুন সৈন্যবাহিনী তাদের নিজেদের সেনাধ্যক্ষের অধীনেই রইল। রোম তাদের আপন করে নিতে পারে নি।

তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যকে সুসম্বদ্ধ করতে করতেই কনস্ট্যাণ্টাইন মারা যান এবং শীঘ্রই সীমান্তে আবার ভাঙন ধরে। ভিসিগথরা একেবারে প্রায় কনস্ট্যাণ্টিনোপল পর্যন্ত এসে পড়েছিল। সম্রাট ভ্যালেন্সকে অ্যাড্রিয়ানোপোলে পরাজিত করে পান্নোনিয়ার ভ্যাণ্ডালদের মত তারাও বর্তমান বুলগারিয়াতে এক উপনিবেশ স্থাপন করল। তারা নামেমাত্র সম্রাটের প্রজা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিল বিজেতা।

৩৭৯ হতে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট থিয়োডোসিয়াস দি গ্রেট রাজত্ব করেন এবং তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্য কার্যত অটুট ছিল। ইটালি ও পান্নোনিয়ার সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন স্টিলিকো নামে এক ভ্যাণ্ডাল এবং বলকান উপদ্বীপের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন অ্যালারিক নামে এক গথ। চতুর্থ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে থিওডোসিয়াস মৃত্যুর সময় দুই পুত্র রেখে গেছিলেন। তাদের একজন, আর্কাডিয়াসকে,

কনস্ট্যান্টিনোপল থেকেসমর্থন করলেন অ্যালারিক, আর অপর পুত্র অনোরিয়াসকে ইটালি থেকে সমর্থন করলেন স্টিলিকো। অর্থাৎ রাজকুমারদের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে অ্যালারিক ও স্টিলিকো সাম্রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন। এই যুদ্ধের ফলে অ্যালারিক সসৈন্যে ইটালিতে উপস্থিত হলেন এবং মাত্র কয়েকদিন অবরোধের পর রোম অধিকার করলেন (৪১০ খৃঃ)।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমগ্র রোম্যান সাম্রাজ্য বর্বরদের দস্যু-সৈন্যদলের শিকার হয়ে উঠেছিল। সে-সময়ের পৃথিবীর অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি ও বল্কান উপদ্বীপে আদি সাম্রাজ্যের শ্রীমণ্ডিত নগরীগুলি তখন পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করছিল, যদিও তারা তখন কিছুটা শ্রীহীন, জনশূন্য ও ক্ষীয়মান। ওখানকার জীবন নিশ্চয়ই ছিল ক্ষুদ্র ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। দেশীয় রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত দূরবর্তী এবং অনধিগম্য সম্রাটের নামে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষা করছিলেন এবং নিজেদের বিবেকবুদ্ধিতে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। গির্জার কাজও চলছিল প্রায়-অশিক্ষিত যাজকদের দিয়ে। শিক্ষা-দীক্ষা ছিল অতি অল্প, কিন্তু কুসংস্কার ও ভয় ছিল প্রচুর। দস্যুরা যেসব দেশ ধ্বংস করে নি, সে-সব দেশ ছাড়া আর সর্বত্রই বই, ছবি, ভাস্কর্য এবং এ-ধরনের শিল্পকলা তখন পর্যন্তও পাওয়া যেত।

গ্রাম্য জীবনও কলুষিত হয়েছিল। রোম্যান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কলহ ও নোংরামি ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন-কোন অঞ্চলে যুদ্ধ ও মহামারী দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। পথঘাট ও বনজঙ্গল ছিল দস্যু-দলের লীলাভূমি। এই সব অঞ্চলে সামান্য অথবা কোন প্রতিকূলতা না পেয়েই বর্বররা এসে নিজেদের নেতাদের শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করত এবং তারা প্রায়ই রোম্যানদের রাজ-উপাধি গ্রহণ.করত। অর্ধ-শিক্ষিত বর্বররা বিজিত দেশকে সহনীয় সর্ত দিত, তারা অন্তর্বিবাহ এবং একত্রে বসবাস করত এবং একটু বিশেষ জোর দিয়ে ল্যাটিন ভাষায় কথাও বলত; কিন্তু যে জুট, অ্যাঙ্গল বা স্যাক্সনরা বৃটেন অধিকার করেছিল, তারা ছিল কৃষিজীবী। সুতরাং তাদের শহরে প্রয়োজন ছিল না। দক্ষিণ বৃটেন থেকে রোম্যান জনসাধারণকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে তারা নিজেদের টিউটনিক ভাষা সেখানে চালু করল। এই ভাষাই শেষ পর্যন্ত ইংরিজি ভাষায় পরিণত হয়।

বিভিন্ন জার্মান ও স্লাভ উপজাতির এই বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে লুণ্ঠন ও সুন্দর বাসস্থানের সন্ধানে এদিক-ওদিক অভিযানের কাহিনী এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া একরকম অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে ভ্যাণ্ডালদের কথা ধরা যাক। ইতিহাসে যখন তাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তখন তারা পূর্ব-জার্মানিতে। আমরা

আগেই বলেছি যে তারা পান্নোনিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ৪২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তারা সেখান থেকে উঠে মধ্যবর্তী প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে পৌছে তারা দেখল যে দক্ষিণ রাশিয়ার ভিসিগথ এবং অন্যান্য জার্মান উপজাতিরা রাজা ডিউক প্রভৃতি দাঁড় করিয়েছে। জেন্সেরিকের অধীনে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন থেকে উত্তর আফ্রিকায় যাত্রা করল (৪২৯ খৃঃ) ও কার্থেজ অধিকার করে (৪৩৯ খৃঃ) এক নৌবাহিনী গঠন করল। সমুদ্রের প্রভুত্ব অধিকার করে তারা রোম অধিকার ও ধ্বংস করল (৪৫৫ খৃঃ)। অর্ধ শতাব্দী আগে অ্যালারিকের অধিকার ও লুণ্ঠন থেকে রোম ততদিনেও তার হৃতশক্তি ঠিকমত পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। তারপর ভ্যাণ্ডালরা সিসিলি, কর্সিকা, সার্দিনিয়া ও অন্যান্য পশ্চিম ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করল। প্রায় সাতশো বছর আগে কার্থেজ যেমন এক বিরাট সমুদ্র-সাম্রাজ্য গঠন করেছিল, তারাও প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাই গড়ে তুলল। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তারা তাদের শক্তির চরম শীর্ষে উঠেছিল। এই সব দেশ অধিকারে রেখেছিল তাদের কয়েকজন মাত্র বীর যোদ্ধা। পরবর্তী শতাব্দীতে প্রথম জাস্টিনিয়ানের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপল সাম্রাজ্য এক সাময়িক উজ্জীবিত শক্তির যুগে তাদের প্রায় সমস্ত রাজ্যই পুনরধিকার করে নিয়েছিল।

ভ্যাণ্ডালদের কাহিনী হল বিভিন্ন উপজাতির অনুরূপ অভিযান-কাহিনীর অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু তখন ইউরোপের জগতে আসছিল এই সমস্ত লুণ্ঠন-কারীদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং দুর্ধর্ষ—এক পীতজাতি, মঙ্গোলীয় হুন বা তাতার—পশ্চিম জগৎ এ ধরনের সবল ও কর্মঠ, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর জাতির সামনা-সামনি আর কখনো হয় নি।

হুন ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতন

ইউরোপে এক বিজয়ী মঙ্গোলীয় জাতির এই আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। খৃষ্টপূর্ব শেষ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি পর্যন্ত মঙ্গোল ও নর্দিক জাতের মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র ছিল না। উত্তরের অরণ্যভূমি ছাড়িয়ে, বহু-দূরবর্তী তুষার-শীতল দেশ থেকে ল্যাপ নামে এক মঙ্গোল জাতি পশ্চিম দিকে ল্যাপল্যাণ্ড পর্যন্ত সরে এসেছিল; কিন্তু ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলীতে তারা কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নি। হাজার হাজার বছর ধরে (একমাত্র হয়ত ইথিওপীয়দের মিশর-অভিযান ব্যতীত) দক্ষিণের কৃষ্ণ জাতি বা দূর প্রাচ্যের মঙ্গোলীয় জগৎ থেকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই

পশ্চিম জগৎ আর্য, সেমিটিক ও আদি কৃষ্ণ জাতিরা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই যাযাবর মঙ্গোলদের পশ্চিমমুখী অভিযানের হয়ত দুটি প্রধান কারণ ছিল। এক হল বিরাট চীন সাম্রাজ্যের সুসংহতি, উত্তর দিকে তার সীমান্তের বিস্তৃতি এবং হান বংশের সমৃদ্ধির যুগে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। অপরটি হল জলবায়ু পরিবর্তনের কোন এক প্রক্রিয়া, হয়ত অনাবৃষ্টির ফলে জলাভূমি ও অরণ্যভূমির নিশ্চিহ্নতা, কিংবা অতিবৃষ্টির জন্য মরুভূমিরও গোচারণভূমিতে রূপান্তরিত হওয়া ; কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে এই দুই প্রক্রিয়ার এমনভাবে অবস্থান, যার ফলে এদের পশ্চিমমুখী অভিযান সহজ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য তাকে আরো সাহায্য করেছিল রোম্যান সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার চরম অবনতি, আভ্যন্তরীণ ক্ষয় ও জনসংখ্যা-হ্রাস। শেষ যুগের রোম্যান সাধারণতন্ত্র-রাজ্যের ধনী লোকেরা এবং তাদের পর সামরিক সম্রাটদের কর-সংগ্রাহকেরা এই সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। এইভাবেই আমরা বর্বরদের অনুপ্রবেশ, তার সম্ভাবনা এবং সুযোগের কারণ খুঁজে পাই—পুব থেকে চাপ, পশ্চিমে সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং একটি খোলা পথ।

খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতেই হূনরা ইউরোপীয় রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তে এসেছিল, কিন্তু খৃষ্টোত্তর চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী না আসা পর্যন্ত এই অশ্বারোহীদল স্টেপস অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে নি। পঞ্চম শতাব্দী ছিল হূনদের শতাব্দী। যে-হূনরা প্রথম ইটালিতে এল তারা হল অনোরিয়াসের প্রভু, ভ্যাণ্ডাল-নেতা স্টিলিকোর বেতনভুক্ত সৈন্যদল। অল্পদিনের মধ্যেই তারা ভ্যাণ্ডালদের শূন্য দেশ পান্নোনিয়াকে নিজেদের অধীনে আনল।

পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশে অ্যাটিলা নামে হূনদের মধ্যে এক বিরাট সামরিক নেতার অভ্যুত্থান হয়। তাঁর শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অবিশ্বাস্য। তিনি যে শুধু হূনদের উপর প্রভুত্ব করতেন তা নয়, বহু জার্মান জাতিরও তিনি অধীশ্বর ছিলেন ; তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল রাইন নদীর তীর থেকে শুরু হয়ে মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি পর্যন্ত। চীনের সঙ্গে তিনি রাজদূত বিনিময় করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিবির ছিল হাঙ্গারিতে, দানিয়ুবের পুবে। সেখানে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রিসকাস নামে এক রাজদূত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, এবং তিনি তাঁর দেশের অবস্থার এক বিবরণ রেখে গেছেন। মঙ্গোলদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ছিল একেবারে আদি আর্যদের মতই। সাধারণ লোকে বাস করত কুটির বা তাঁবুতে, দলপতিরা থাকতেন বিরাট কাষ্ঠ-বেষ্টনীর মধ্যে বড় বড় কাঠের বাড়িতে। পান, ভোজন ও চারণদের গান নিয়মিত ছিল।

কনস্ট্যান্টিনোপলের তদানীন্তন সম্রাট আর্কাডিয়াসের পুত্র দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসের অনুশীলিত ও ধ্বংসকবলিত রাজসভার চেয়ে অ্যাটিলার শিবির-রাজধানীতে হোমারের কাব্যের নায়কেরা এবং এমন কি অ্যালেকজাণ্ডারের ম্যাসিডনীয় সঙ্গীরা অনেক বেশি সহজভাবে থাকতে পারতেন বলে মনে হয়।

এক সময় এই মনে হয়েছিল যে বহুদিন আগে বর্বর গ্রীকরা ঈজিয়ান সভ্যতার কাছে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, অ্যাটিলা এবং হূনদের নেতৃত্বে যাযাবরেরাও ভূমধ্যসাগরীয় দেশের গ্রীক-রোম্যান সভ্যতার কাছে সেই ভূমিকাই গ্রহণ করবে। বৃহৎভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু আদি গ্রীকদের চেয়ে হূনরা অনেক বেশি যাযাবরপন্থী ছিল। গ্রীকরা সত্যকার যাযাবরের পরিবর্তে ছিল সঞ্চরণশীল গোপালক কৃষকসম্প্রদায়। হূনরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছে কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করে নি।

কয়েক বছর ধরে অ্যাটিলা থিওডোসিয়াসকে তাঁর ইচ্ছামত ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী একেবারে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত সমস্ত দেশ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছে। গিবন বলেন যে, তিনি বল্কান উপদ্বীপের সত্তরটিরও অধিক নগরী একেবারে ধ্বংস করেন এবং থিওডোসিয়াস তাঁকে কর দিয়ে শান্ত করেন এবং তাঁর হাত থেকে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতিলাভের আশায় তাঁকে হত্যা করতে গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করেন। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে অ্যাটিলা তাঁর দৃষ্টি রোম্যান সাম্রাজ্যের ল্যাটিনভাষী অংশের দিকে দিলেন এবং গল আক্রমণ করলেন। উত্তর গলের প্রায় প্রত্যেকটি শহর তিনি লুণ্ঠন করেন। ফ্র্যাঙ্ক, ভিসিগথ ও রাজসৈন্য একত্রে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং ট্রয়েসের এক নিদারুণ বিধ্বংসী যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং দেড় লক্ষ থেকে তিন লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধ তাঁর গল-অভিযান প্রতিহত করে কিন্তু তাঁর বিরাট সামরিক সম্বল নিঃশেষ করতে পারে নি। পরের বছর তিনি ভিনিসিয়া দিয়ে ইটালিতে আসেন এবং অ্যাকুইলিয়া ও পাদুয়া ভস্ম ও মিলান লুঠ করেন।

উত্তর ইটালির এই শহরগুলির এবং বিশেষ করে পাদুয়ার বাস্তত্যাগী পলাতক নাগরিকরা অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপহ্রদের দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে ভেনিস নগরীরাজ্যের পত্তন করে। এই ভেনিস মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

৪৫৩ খৃষ্টাব্দে এক যুবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের বিরাট ভোজনানুষ্ঠানের ঠিক পরেই অ্যাটিলা মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুণ্ঠিত রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। চতুর্দিকের সংখ্যাধিক অন্যান্য আর্যভাষী জাতিদের

সঙ্গে এক হয়ে প্রকৃত হুনরা ইতিহাস থেকে মুছে গেল। কিন্তু এইসব বিরাট হুন-অভিযান কার্যত ল্যাটিন রোম্যান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি সুসম্পূর্ণ করে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ভ্যাণ্ডাল ও অন্যান্য বেতন-ভোগী সৈন্যবাহিনীর কৃপায় বিশ বছরে দশজন পৃথক সম্রাট রোমে রাজত্ব করেন। কার্থেজের ভ্যাণ্ডালরা ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে রোম অধিকার করে লুণ্ঠন করে। এক পান্নোনিয়ান, রমুলাস অগস্টলাস এই জমাটি নাম নিয়ে সম্রাট সেজে বসেছিলেন। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্বর সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ওডোয়াকার তাঁকে পদচ্যুত করে কনস্ট্যান্টিনোপলের রাজসভায় জানিয়ে দিলেন যে, পশ্চিমে আর কোন সম্রাট নেই। সুতরাং অত্যন্ত অগৌরবের মধ্যে ল্যাটিন রোম্যান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি হল। ৪৯৩ খৃষ্টাব্দে থিওডোরিক দি গথ রোমের রাজা হলেন।

পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সর্বত্রই বর্বর দলপতিরা রাজা ডিউক বা অন্য কোন নামে রাজত্ব করছিলেন; কার্যত তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই সম্রাটের নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করতেন। শত শত এবং হয়ত হাজার হাজার এরকম স্বাধীন লুণ্ঠনকারী শাসক ছিল। গল, স্পেন, ইটালি এবং ডাসিয়াতে দেশজ-বিকৃত ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল, কিন্তু বৃটেন কিংবা রাইন নদীর পুবে জার্মান দলের ভাষা (অথবা বোহেমিয়ায় চেক নামে এক স্লাভনিক ভাষা) ছিল সাধারণ প্রচলিত ভাষা। উচ্চশ্রেণীর ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু ল্যাটিন ভাষায় লিখতেন ও পড়তেন। সর্বত্রই জীবন ছিল অরক্ষিত এবং বাহুবলেই ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হত। দুর্গের সংখ্যা বাড়তে লাগল, পথঘাট নষ্ট হয়ে গেল। ষষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভকাল ছিল পাশ্চাত্য জগতের ভাগাভাগি ও প্রতিভার অবসানের যুগ। সন্ন্যাসী ও খৃষ্টান ধর্মযাজক না থাকলে ল্যাটিন শিক্ষা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যেত।

রোম্যান সাম্রাজ্য কেন এত বড় হয়েছিল, এবং কেনই বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল? তার বৃদ্ধির কারণ এই যে, প্রথমটা নাগরিকত্বের ধারণা সকলকে একত্রে ধরে রেখেছিল। ক্রমবর্ধমান সাধারণতন্ত্র রাজ্যের যুগে, এবং এমনকি আদি সাম্রাজ্যের কালেও, অনেক লোকেরই রোম্যান নাগরিকত্বের ধারণা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ছিল: রোমের নাগরিক হওয়া ছিল তাদের কাছে এক বিশেষ অধিকার ও অনুগ্রহ, রোম্যান আইনের চোখে তাদের স্বত্ব সম্বন্ধে তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং রোমের নামে তারা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারত। ন্যায্য, মহৎ এবং আইনাশ্রয়ী হিসাবে রোমের মর্যাদা রোম সীমান্তেরও বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে নাগরিকত্বের মর্যাদা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য ও দাসত্বের জন্য

ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করল। নাগরিকত্বের ঠিকই বিস্তার হল, নাগরিকত্বের ধারণার বিস্তার আর হল না।

প্রকৃতপক্ষে রোম্যান সাম্রাজ্য ছিল এক আদিম প্রতিষ্ঠান; কোনদিন কাউকে শিক্ষা দেয় নি, ক্রমবর্ধমান নাগরিকদের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে নি, কোন সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করে নি। পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের জন্য চতুর্দিকে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল না, সঙ্ঘবদ্ধ কার্যের সংহতির জন্য সংবাদ আদানপ্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মারিয়ুস ও সুল্লার সময় থেকে আরম্ভ করে যে-সব বীরেরা ক্ষমতালাভের জন্য সংগ্রাম করেছেন, রাজকীয় ব্যাপারে জনসাধারণের মতামতের প্রস্তুতি বা আহ্বানের কোন চেষ্টাই তাঁদের ছিল না। নাগরিকত্বের আত্মা বুভুক্ষায় বিনষ্ট হল এবং কেউ তার মৃত্যু লক্ষ্য করল না। সমস্ত সাম্রাজ্য, সমস্ত রাজ্য এবং মানব-সমাজের সমস্ত সঙ্ঘ মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে রোম্যান সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কোন ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল না, তাই তার বিনাশ হল।

কিন্তু যদিও ল্যাটিনভাষী রোম্যান সাম্রাজ্যের পঞ্চম শতাব্দীতে পতন হয়, তবুও তারই মাঝে এমন একটি জিনিসের জন্ম হয়েছিল যা প্রচুর মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের অধিকারী হয়। এটি হল ক্যাথলিক গির্জার ল্যাটিনভাষী অংশ। সাম্রাজ্যের মৃত্যু সত্ত্বেও তারা বেঁচে রইল এইজন্য যে, তারা মানুষের হৃদয় ও ইচ্ছাকে আন্দোলিত করতে পেরেছে: কারণ যে-কোন আইন-কানুন, সৈন্য-বাহিনীর চেয়ে যা অনেক বেশি শক্তিশালী—বই, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং সেবাব্রতী—তা তাদের ছিল এবং এরাই সকলকে একত্র করে রাখতে পেরেছে। খৃষ্টোত্তর চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হয়ে উঠেছে, তখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে চলেছিল। এই খৃষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের বিজেতা বর্বরদেরও জয় করল। যখন অ্যাটিলা রোম আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন, তখন রোমের মহাধর্মাধ্যক্ষ তাঁকে বাধা দিলেন এবং যা কোন সৈন্যবাহিনী করতে সক্ষম হয় নি, তিনি তা-ই করলেন; নৈতিক শক্তির বলে তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন।

রোমের মহাধর্মাধ্যক্ষ (Patriarch) বা পোপ সমগ্র খৃষ্টান গির্জার প্রধান বলে দাবি করেন। তখন আর কোন সম্রাট ছিলেন না বলে তিনি রাজকীয় উপাধি এবং প্রাপ্য গ্রহণ করতে শুরু করলেন। সম্রাটরা সবচেয়ে পুরাতন যে উপাধিতে ভূষিত হতেন সেই pontifex maximus বা রোম্যান রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের উপাধি তিনি গ্রহণ করলেন।

বাইজাণ্টাইন এবং স্যাসানিড সাম্রাজ্য

রোম্যান সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্ধের চেয়ে গ্রীক-ভাষী পূর্বার্ধের অনেক বেশি রাজনৈতিক দৃঢ়তা ছিল। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীর যে বিপর্যয়ে আদিম ল্যাটিন রোম্যান শক্তির সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত ভাঙন হয়েছিল, পূর্বার্ধ তা থেকে কোনরকমে আত্মরক্ষা করে। অ্যাটিলা সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসকে ভীতি-প্রদর্শন এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেছেন, কিন্তু এই নগরী অস্পৃষ্টই ছিল। ভ্যাণ্ডালরা নীল নদ ধরে এসে উত্তর মিশর লুণ্ঠন করে, কিন্তু দক্ষিণ মিশর ও অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া তখনও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। স্যাসানিড বংশের পারসীকদের হাত থেকে এশিয়া মাইনরের অধিকাংশই রক্ষা পায়।

পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে গভীর অন্ধকারময় যে যুগ, সেই ষষ্ঠ শতাব্দীতেই গ্রীক শক্তির যথেষ্ট উত্থান হয়েছিল। প্রথম জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও শক্তিশালী এবং তাঁরই সর্ববিষয়ে সমকক্ষা এক প্রাক্তন অভিনেত্রী সম্রাজ্ঞী থিওডোরাকে তিনি বিবাহ করেন। জাস্টিনিয়ান ভ্যাণ্ডালদের কাছ থেকে ইটালির অধিকাংশ পুনরধিকার করেন; এমন কি দক্ষিণ স্পেনও তিনি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি তাঁর শক্তি নৌ বা সামরিক প্রচেষ্টায় সীমিত রাখেন নি। তিনি এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কনস্ট্যান্টিনোপলে সেণ্ট সোফিয়ার বিরাট গির্জা নির্মাণ করেন এবং রোম্যান আইন লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি এথেন্সের দর্শনের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেন। এই বিদ্যালয়গুলি প্রায় হাজার বছর ধরে প্লেটোর সময় থেকে অখণ্ড নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে চলে আসছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকেই পারস্য সাম্রাজ্য বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের স্থিরবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই দুই সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশরকে চিরকাল অশান্তি ও অপচয়ের মধ্যে রেখেছিল। খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতে এই দেশগুলি সুসভ্য, ঐশ্বর্যশালী ও জনবহুল ছিল; কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অবিচ্ছিন্ন যাতায়াত, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও সামরিক রাজস্ব আদায় ধীরে ধীরে তাদের ক্ষয় করে ফেলছিল এবং শেষ পর্যন্ত কতকগুলি বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট নগর এবং গ্রামাঞ্চলে ইতস্তত-ছড়ানো কৃষক-সম্প্রদায় অবশিষ্ট রইল। এই দুঃখকর, নিঃস্ব ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দক্ষিণ মিশর হয়ত পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের চেয়ে একটু ভাল ছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের মত অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোনগতিকে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই দুই যুধ্যমান ও ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যে বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক দর্শন তখন অবলুপ্ত

হয়। এথেন্সের শেষ দার্শনিকেরা দমন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব-যুগের মহৎ সাহিত্য-গুলিকে অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু এইসব রচনার নিহিত বিবরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহ্যকে আপন স্বাধীন ও অনুপ্রেরিত চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করার মত পৃথিবীতে আর কোন শ্রেণীর লোক, কোন স্বাধীন ভদ্রলোক ছিল না। সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এই শ্রেণীর লোকদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার এক প্রধান কারণ, কিন্তু এই যুগে মানুষের অস্থিরতা ও বন্ধ্যা বুদ্ধির আর-একটি কারণও ছিল। পারস্য ও বাইজান্টিয়াম দুই দেশেই এটি ছিল অ-তিতিক্ষার যুগ। উভয় সাম্রাজ্যই ছিল এক নতুন ধরনের ধর্মরাজ্য, সে ধারায় মানুষের মননশক্তি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পদে পদে বাধা পেত।

অবশ্য পৃথিবীর সর্বপুরাতন সাম্রাজ্যগুলি সবই ছিল ধর্ম-সাম্রাজ্য, কোন দেব বা দেবীর উপাসনাকে কেন্দ্র করে তারা গড়ে উঠেছিল। অ্যালেকজাণ্ডারকে দৈব-পুরুষ বলে মনে করা হত এবং সীজাররা ছিলেন দেবতা—তাঁদের জন্য ছিল মন্দির ও বেদী এবং রোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের এক নিদর্শন ছিল সেই মন্দিরে ধূপার্ঘ্য প্রদান। কিন্তু এই পুরাতন ধর্মগুলি প্রকৃতপক্ষে কাজ ও ঘটনার মধ্যেই বাঁধা ছিল। তারা মানুষের মনকে স্পর্শ করত না। কেউ কোন অর্ঘ্য দিয়ে দেবতাকে প্রণাম করলে যে সে যা-খুশি তাই চিন্তা করিতেই পারত তা নয়, সে-ঘটনা সম্বন্ধে যা ইচ্ছা তাই বলতেও পারত। কিন্তু পৃথিবীতে এই যে নতুন ধরনের ধর্মগুলির আবির্ভাব হল, এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্ম, তা হৃদয়কে স্পর্শ করত। এই নতুন ধর্মগুলি শুধু যে আনুগত্যই দাবি করত তা নয়, ধর্মবিশ্বাসে উপলব্ধিও চাইত ; সুতরাং বিশ্বাস্য জিনিসের সঠিক অর্থের জন্য তুমুল বাদ-বিতণ্ডা শুরু হত। পৃথিবী তখন একটি নতুন কথা, 'আস্তিকতা'র সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে এবং শুধু কার্যই নয়, কথা এবং ব্যক্তিগত চিন্তাকেও এক সাজানো অনুশাসনের মধ্যে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। কারণ, কোন এক মত পোষণ করা, এবং যা তার চেয়েও বেশি, সেই ভুল মত পরের কাছে ব্যক্ত করা তখন শুধু বুদ্ধিভ্রংশতা বলেই মনে করা হত না, মনে করা হত এক নৈতিক অপরাধ, যা আত্মাকে চিরস্থায়ী ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতে পারে।

খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীতে স্যাসানিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আর্দাশির এবং চতুর্থ শতাব্দীতে রোম্যান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবক কনস্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেট দুজনেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়েই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও ব্যবহার করার এক নতুন পথ তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর সমাপ্তির আগে উভয় সাম্রাজ্যই স্বাধীন

ধর্মালোচনা ও নব নব ধর্ম-প্রবর্তনকে উৎপীড়ন করতে শুরু করেছিল। পারস্যে আর্দাশির মন্দির, পুরোহিত এবং বেদীর উপর প্রজ্জ্বলিত পূতাগ্নি সমেত জোরোয়াস্টার (বা জরথুস্ত্র) নামে প্রাচীন পারসীক ধর্মকে তাঁর প্রয়োজনানুগ রাজধর্ম হিসাবে পেলেন। তৃতীয় শতাব্দীর সমাপ্তির আগেই জোরোয়াস্টার ধর্ম খৃষ্টধর্মের উপর নিগ্রহ চালাতে শুরু করে এবং ম্যানিসিয়ান (Manichaean) নামে এক নব ধর্মের প্রবর্তক, ম্যানিকে ২৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর দেহ থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়। কনস্ট্যান্টিনোপলেও তখন খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের খুঁজে বার করা চলছিল। খৃষ্টধর্মের মধ্যে ম্যানিসিয়ান ধারণা অনুপ্রবেশ করছিল, সেইজন্য তার প্রতিরোধের জন্য ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রযোজিত হচ্ছিল এবং তার পাল্টা খৃষ্টধর্মের ধারণা জেরোয়াস্ট্রিয়ান অনুশাসনের পবিত্রতা নষ্ট করছিল। প্রত্যেকটি ধারণাকেই সন্দেহের চোখে দেখা হত। বিজ্ঞান, যা সুস্থির মনের চিন্তার ফল, তা এই অসহিষ্ণুতার যুগে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধ, তিক্ততম ধর্মতত্ত্ব ও মানুষের সাধারণ অনাচার—এই ছিল এ-যুগের বাইজান্টাইন জীবন। রোম্যান্টিক ও আড়ম্বরময় হলেও কোন উজ্জ্বলতা বা কোমলতার আভাস ছিল না। যখন বাইজান্টিয়াম বা পারস্য উত্তর দেশের বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত না, তখন তারা এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ায় বীভৎস ধ্বংসলীলা শুরু করত। এই দুই সাম্রাজ্য মিত্রভাবাপন্ন হলেও একত্রে বর্বরদের পরাজিত করে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তুর্কী এবং তাতাররা ইতিহাসে প্রবেশ করে প্রথমে এক শক্তি এবং পরে অন্য শক্তির মিত্র হয়ে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ ছিলেন জাস্টিনিয়ান ও প্রথম কোসরোস; সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে সম্রাট হেরাক্লিয়াস দ্বিতীয় কোসরোসের প্রতিপক্ষ ছিলেন (৫৮০)।

প্রথম প্রথম, এবং যতদিন না হেরাক্লিয়াস সম্রাট হন (৬১০), দ্বিতীয় কোসরোস সর্বেসর্বা হয়ে ছিলেন। তিনি অ্যান্টিয়োক, দামাস্কাস ও জেরুজালেম অধিকার করেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনাসামনি এশিয়া মাইনরের ক্যালসেডোনে এসে উপস্থিত হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশর জয় করেন। তারপর হেরাক্লিয়াস তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে নিনেভেতে এক পারসীক সৈন্য-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন (৬২৭), যদিও তখনও ক্যালসেডোনে কিছু পারসীক সৈন্য ছিল। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র কাবাধ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেন এবং এই দুই ক্লান্ত সাম্রাজ্যে এক অমীমাংসিত শান্তি স্থাপিত হয়।

বাইজান্টিয়াম ও পারস্য তাদের মধ্যে শেষ যুদ্ধ লড়ে নিয়েছিল। কিন্তু খুব কম

লোকেই তখন মরুভূমির মধ্যে বর্ধমান এমন এক ঝটিকার কথা কল্পনা করতেও পারে নি যা শেষ পর্যন্ত এই অনির্দেশ্য চিরস্থায়ী সংগ্রামকে শেষ করে দেবে।

যখন হেরাক্লিয়াস সিরিয়ায় শান্তি পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত, তখন একটি সংবাদ তিনি পেলেন। দামাস্কাসের দক্ষিণে বোস্ত্রার রাজ-শিবিরে এই সংবাদ এল, এক দুর্বোধ্য সেমিটিক মরুভূমির ভাষা আরবীতে তা লেখা, এবং যদি সম্রাটের কাছে সত্য-সত্যই তা পৌঁছে থাকে তো সেটি একজন দো-ভাষী তাঁকে পড়ে শোনায়। সংবাদটি এসেছিল এমন একজনের কাছ থেকে যিনি নিজেকে বলতেন 'মহম্মদ; ঈশ্বরের ধর্মোপদেশক।' এই সংবাদে নির্দেশ ছিল, সম্রাট যেন 'এক ও সত্য ঈশ্বর'কে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর সেবা করেন। সম্রাট কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা লিপিবদ্ধ নেই।

স্টেসিফোনে কাবাধের কাছেও অনুরূপ এক সমাচার এল। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন এবং দূতকে চলে যেতে আদেশ দিলেন।

প্রকাশ হল, এই মহম্মদ একজন বেদুইন নেতা এবং তাঁর প্রধান আবাসস্থল মদিনা নামে ছোট এক মরুভূমি-শহর। 'এক সত্য ঈশ্বর' এই বিশ্বাসের তিনি এক নতুন ধর্ম প্রচার করছিলেন।

'তা হলে, হে আল্লা', তিনি বললেন, 'কাবাধের কাছ থেকে তার রাজ্য ছিন্ন করে আন।'

চীনে সুই ও তাঙ বংশ

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী ধরে মঙ্গোলীয়দের পশ্চিমমুখী অপসরণ অনবরতই চলছিল। অ্যাটিলার হুনরা তারই অগ্রদূত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা ফিনল্যাণ্ড, এসথোনিয়া ও হাঙ্গারিতে বসতি স্থাপন করে এবং আজ পর্যন্ত তাদের বংশধরেরা সেখানে আছে। তাদের ভাষা প্রায় তুর্কীর মত। বুলগারিয়ানরাও তুর্কী জাতের লোক, কিন্তু তারা এক আর্য ভাষা গ্রহণ করে। বহু শতাব্দী পূর্বে ঈজিয়ান ও সেমিটিক সভ্যতার কাছে আর্যরা যে ভূমিকায় অভিনয় করে, মঙ্গোলীয়রাও ইউরোপ, পারস্য এবং ভারতের আর্য-সভ্যতার সঙ্গে অনুরূপ ভূমিকায় অভিনয় করছিল।

মধ্য এশিয়ার বর্তমান পশ্চিম তুর্কীস্থানে তুর্কীরা তাদের বসতি স্থাপন করে এবং পারসীকরা ততদিনে বহু তুর্কী কর্মচারী ও বেতনভোগী সৈন্যকে কার্যে নিযুক্ত করে। পার্থিয়ানরা ইতিহাস থেকে মুছে গিয়ে পারস্যের জন-সাধারণের সঙ্গে এক হয়ে যায়। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে আর কোন আর্য যাযাবর ছিল না;

মঙ্গোলীয়রা তাদের স্থান অধিকার করেছিল। তুর্কীরা চীন থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় প্রভুত্ব করত।

খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীর যে বিরাট মহামারী রোম্যান সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করে, সেই মহামারী চীনে হান বংশের পতনও সঙ্ঘটিত করে। তারপর এল ভাগাভাগি ও হুন-অধিকারের এক যুগ, যার থেকে ইউরোপের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক ভালভাবে চীনের পুনরুজ্জীবন হয়। ষষ্ঠ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সুই বংশের নেতৃত্বে পুনর্মিলিত চীনের জাগরণ হয় এবং হেরাক্লিয়াসের রাজত্বের সময় সুই বংশের জায়গায় তাঙ বংশ রাজত্ব করছিল। এবং এই তাঙ বংশের রাজত্বকালে চীনে আর একবার বিরাট সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চীন ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত ও সভ্য দেশ। হান বংশ চীনের সীমান্ত উত্তরে বিস্তৃত করেছিল, সুই এবং তাঙ বংশ দক্ষিণে তার সভ্যতা বিস্তার করল; এবং চীনের বর্তমান বিস্তৃতি এইভাবে শুরু হয়। মধ্য এশিয়ায় তার সীমান্ত আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তুর্কী উপজাতির কয়েকটি শাখাকে পরাজিত করে পারস্য এবং কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়।

এই নবজাগ্রত চীন পুরাতন হান-বংশীয় চীনের থেকে একেবারে ভিন্ন ছিল। এক নতুন এবং শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং কাব্যের অভ্যুদয় হয়; বৌদ্ধধর্ম দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদকে বৈপ্লবিক করে তোলে। শিল্পকার্যে, যান্ত্রিক পারদর্শিতায় এবং জীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে প্রচুর উন্নতি দেখা যায়। চা-পান, কাগজ তৈরি এবং কাঠের অক্ষরে ছাপা প্রথম প্রচলিত হয়। যখন ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার লোকেরা কুটিরে, নিম্ন-প্রাচীর-বেষ্টিত শহরে কিংবা দস্যুদের ভয়ঙ্কর দুর্গে বাস করত, তখন চীনের লক্ষ লক্ষ লোক শান্ত সংযত এবং সুখী জীবন যাপন করত। যখন পাশ্চাত্য জগতের মন ধর্মতত্ত্বীয় আবেশে গহন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন চীনের মন খোলা, সহিষ্ণু এবং অনুসন্ধিৎসু।

তাঙ বংশের প্রথম সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাই-ৎসুঙ; তাঁর রাজত্ব শুরু হয় ৬২৭ সালে, যে-বছর হেরাক্লিয়াস নিনেভে জয়লাভ করেন। হেরাক্লিয়াসের কাছ থেকে এক দূত তাঁর কাছে আসে—হয়ত হেরাক্লিয়াস পারস্যের পিছনে এক মিত্রের অনুসন্ধান করছিলেন। পারস্য থেকেও এক খৃষ্টান ধর্মযাজক দল চীনে উপস্থিত হল (৬৩৫)। তাঁদের ধর্মমত তাই-ৎসুঙকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয় এবং চীন ভাষায় অনূদিত তাঁদের ধর্মশাস্ত্র তিনি পাঠ

করেও দেখেন। এই অদ্ভুত ধর্ম গ্রহণযোগ্য বলে তিনি ঘোষণা করেন এবং একটি গির্জা ও ধর্মযাজকদের এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন।

এই সম্রাটের কাছে মহম্মদের দূতও এসেছিল (৬২৮ খৃঃ)। এক বাণিজ্য-তরণীতে করে তারা ক্যাণ্টনে এসে উপস্থিত হয়। আরব থেকে ভারতের উপকূল ধরে সমস্ত পথ তারা সমুদ্রপথে আসে। হেরাক্লিয়াস ও কাবাধের মত আচরণ না করে তাই-ৎসুং এই দূতদের কথা অত্যন্ত ভদ্রভাবে শোনেন। তাদের ধর্মতত্ত্বে আগ্রহ প্রকাশ করে ক্যাণ্টনে একটি মসজিদ নির্মাণে তিনি তাদের সাহায্য করেন। এই মসজিদ আজও টিকে আছে এবং এইটিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ।

মহম্মদ ও ইসলাম

ইতিহাসের এক সৌখিন ভবিষ্যদ্বক্তা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভিক জগতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে যথার্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে এই উপসংহারে আসতে পারেন যে, সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মঙ্গোলীয় প্রভুত্বের মধ্যে এসে পড়বে। পশ্চিম ইউরোপে শান্তি বা একতার কোন লক্ষণই ছিল না এবং বাইজাণ্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যদুটি পারস্পরিক ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষও বিভক্ত এবং নির্বীর্য ছিল। ওদিকে চীন ছিল এক ক্রম-বর্ধমান সাম্রাজ্য এবং তার জনসংখ্যা হয়ত সমগ্র ইউরোপের চেয়েও বেশি ছিল : মধ্য এশিয়ার যে তুর্কীরা শক্তিমান হয়ে উঠেছিল, তারাও চীনের কথামত চলত। সুতরাং এ-ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে নিরর্থক নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একটা সময় আসা উচিত ছিল, যখন একজন মঙ্গোলীয় সম্রাট দানিয়ুব থেকে প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত রাজত্ব করবেন এবং তুর্কী বংশ সমগ্র বাইজাণ্টাইন, পারস্য সাম্রাজ্য, মিশর এবং ভারতের অধিকাংশের অধিপতি হবেন।

আমাদের ভবিষ্যদ্বক্তা যেখানে সবচেয়ে বেশি ভুল করবেন তা হল ইউরোপে ল্যাটিন অঞ্চলের পুনঃশক্তি-অর্জনের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা এবং আরব মরুভূমির নিহিত শক্তিকে অবজ্ঞা করা। স্মরণাতীত যুগ থেকে যা ছিল, আরবকে তাই মনে হবে—ছোট ছোট বিবদমান যাযাবরী উপজাতিদের আশ্রয়স্থল। কোন সেমিটিক জাত তখন পর্যন্ত হাজার বছরের বেশি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

তারপর হঠাৎ বেদুইনরা মাত্র এক শতাব্দীর গৌরব-ছটায় উদ্ভাসিত হল। স্পেন থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত তারা তাদের রাজত্ব ও ভাষা বিস্তার করল। তারা পৃথিবীকে এক নূতন সভ্যতা এনে দিল। তারা এক ধর্ম সৃষ্টি করল, যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে আছে।

আরব শক্তির প্রজ্জালক মানুষ মহম্মদকে প্রথমে ইতিহাসে পাওয়া যায় মক্কা শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর বিধবার যুবক স্বামী হিসাবে। চল্লিশ বছরের পূর্ব পর্যন্ত জগতের সমক্ষে নিজেকে উল্লেখযোগ্য করার মত কিছু করেন নি। মনে হয় তিনি ধর্মীয় আলোচনায় অত্যন্ত বেশি আগ্রহান্বিত ছিলেন। সে সময় মক্কা এক পৌত্তলিক নগর ছিল, বিশেষ করে সমগ্র আরব-খ্যাত কাবা নামে এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের তারা উপাসনা করত এবং এটি একটি তীর্থস্থানের কেন্দ্র ছিল; কিন্তু সে দেশে অনেক ইহুদীও বাস করত—সত্য কথা বলতে গেলে আরবের দক্ষিণাংশের সকলেই ইহুদী ছিল—এবং সিরিয়ায় খৃষ্টান গির্জাও ছিল।

তাঁর বারশো বছর আগে হিব্রু ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের মত প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে মহম্মদের পয়গম্বরের লক্ষণ সূচিত হতে শুরু করে। প্রথমে তাঁর স্ত্রীর কাছেই তিনি 'এক সত্য ঈশ্বর' এবং পাপ ও পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বলেন। তাঁর চিন্তাধারা যে ইহুদী ও খৃষ্টান ধারণায় অত্যন্ত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর চারপাশে একটি ছোট ভক্তের দল গড়ে তুলে তিনি প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সেই শহরে ধর্মোপদেশ দিতে শুরু করলেন। মক্কার সমৃদ্ধির মূলে ছিল কাবায় তীর্থযাত্রা; ফলে তিনি শহরবাসীর কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েন। তিনি ধর্মোপদেশ দানে আরো সাহসী এবং স্থিরলক্ষ্য হন এবং ধর্মকে নির্দোষ ও সুসম্পূর্ণ করার ব্রত গ্রহণকারী আল্লার নির্বাচিত শেষ পয়গম্বর বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অ্যাব্রাহাম এবং যিশুখৃষ্ট তাঁর পূর্বসূরী। আল্লার প্রত্যাদেশকে সুসম্পূর্ণ এবং নির্দোষ করার জন্যই তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

তিনি কয়েকটি শ্লোক দেখিয়ে জানান যে তাঁকে এক দেবদূত ওগুলি দিয়ে গেছে এবং অদ্ভুত স্বপ্নাবেশে তিনি স্বর্গে আল্লার কাছে যান এবং তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য উপদেশ লাভ করেন।

তাঁর ধর্ম-প্রচারের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরবাসীর শত্রুতাও বৃদ্ধি পেল। অবশেষে তাঁকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হল; কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও শিষ্য আবু বকরকে নিয়ে বন্ধুভাবাপন্ন মদিনা শহরে পলায়ন করলেন। এই মদিনা শহর তাঁর ধর্মমত মেনে নিল। মক্কা ও মদিনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধল এবং শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে সন্ধিও স্থাপিত হল: 'এক সত্য ঈশ্বর' মক্কা এই বাণী গ্রহণ করবে এবং মহম্মদকে তাঁর পয়গম্বর বলে স্বীকার করবে; কিন্তু মক্কা পৌত্তলিক থাকার সময় যেমন, এখনও তেমনি এই নতুন ধর্মাবলম্বীদের মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে। তীর্থযাত্রার বাণিজ্যে ক্ষতি না করে মহম্মদ এইভাবে মক্কায় 'এক সত্য ঈশ্বর' প্রতিষ্ঠা করলেন।

হেরাক্লিয়াস, তাই-ৎসুঙ, কাবাধ এবং পৃথিবীর অন্যান্য নরপতিদের কাছে দূত প্রেরণের এক বছর পরে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কায় তার প্রভু হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তারপর আরো চার বছর ধরে, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, মহম্মদ তাঁর শক্তি আরবের অবশিষ্টাংশে বিস্তার করলেন। শেষের দিকে তিনি অনেকবার দার-পরিগ্রহ করেন। মনে হয় তিনি অত্যন্ত আন্তরিক এক ধর্মানুরাগী ছিলেন। কোরান নামে বিধি-নিষেধ ও তার ব্যাখ্যার এক পুস্তক তিনি নির্দেশ করেছিলেন, যা আল্লার কাছ থেকে পাওয়া বলে তিনি ঘোষণা করেন।

তবুও মহম্মদের জীবন ও লেখার সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি বাদ দিলে, আরবদের উপর তাঁর আরোপিত ইসলাম ধর্মের মধ্যে অনেক শক্তি ও অনুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি বৈশিষ্ট্য হল তার মীমাংসা-পরাঙ্মুখ একেশ্বরবাদ; আল্লার পিতৃত্ব ও শাসনে তার সরল প্রযাত্মিক বিশ্বাস এবং তার ধর্মতত্ত্বীয় জটিলতা থেকে মুক্তি। আর এক বৈশিষ্ট্য হল তার যজ্ঞীয় পুরোহিত ও মন্দির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। এটি সম্পূর্ণরূপে এক অবতারিক ধর্ম; বলিদান প্রথার প্রত্যাবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সিদ্ধ। মক্কায় তীর্থযাত্রায় সীমিত উৎসবের বিধি কোরানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপর যাতে দেবত্ব আরোপ না করা হয় তার জন্য মহম্মদ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এবং তাঁর শক্তির তৃতীয় উৎস ছিল, জাতি বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সমস্ত ভক্তের আল্লার কাছে সম-ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য; ইসলাম-ধর্মে এর উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে।

এই সব কারণেই মানুষের জীবনে ইসলাম এক অপরিমেয় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। কথিত আছে যে ইসলাম-সাম্রাজ্যের সত্যকার প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ যত না ছিলেন তার চেয়েও বেশি ছিলেন তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী আবু বকর। মহম্মদ যদি আদি ইসলাম ধর্মের মন ও কল্পনাশক্তি হন তো আবু বকর ছিলেন তার বিবেক ও প্রাণশক্তি। মহম্মদ যখনই দ্বিধান্বিত হতেন, আবু বকর তাঁকে সামলাতেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর হলেন খালিফ বা উত্তরাধিকারী এবং যে বিশ্বাসে পাহাড়ও টলে, তার জোরে মাত্র ৩০০০ থেকে ৪০০০ আরব নিয়ে মদিনা থেকে এই পয়গম্বর ৬২৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটকে যে পত্র লিখেছিলেন তারই অনুসারে সহজভাবে ও বিবেচনার সঙ্গে সমস্ত জগৎকে আল্লার অধীন করার মানসে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

আরবদের গৌরবোজ্জ্বল যুগ

এর পরে আসে আমাদের জাতির সমগ্র ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিজয়-কাহিনী। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে য়ারমুকের যুদ্ধে (জর্ডানের একটি শাখা) বাইজান্টাইন বাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং শোথ রোগে পঙ্গু এবং পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে হৃতবল সম্রাট হেরাক্লিয়াস চুপ করে বসে দেখলেন যে সিরিয়া, দামাস্কাস, অ্যান্টিয়োক, পামিরা, জেরুজালেম এবং অবশিষ্ট তাঁর সমস্ত বিজিত দেশ মুসলমানদের হাতে বিনা প্রতিরোধে চলে যাচ্ছে। জনগণের অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তারপর মুসলমানরা পুব দিকে দৃষ্টি দিল। রুস্তম নামে পারসীকদের এক অতি যোগ্য সেনাপতি ছিল এবং তাদের ছিল এক হস্তী-বাহিনী সমেত বিরাট সৈন্য-বাহিনী। কাদেসিয়ায় তিন দিন ধরে তারা আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে (৬৩৭) একেবারে বিধ্বস্ত হল।
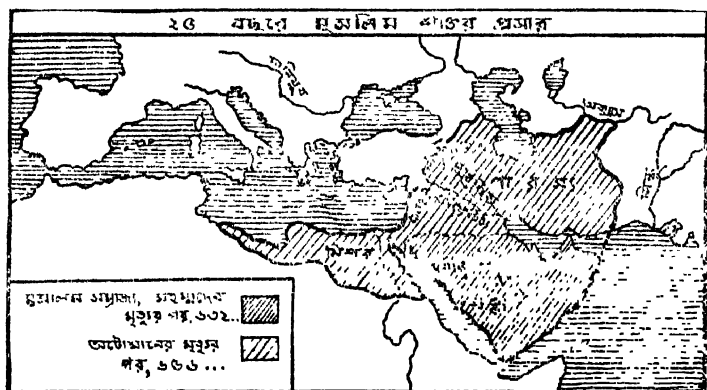
এর পর হল সমস্ত পারস্য বিজয়, এবং মুসলমান সাম্রাজ্য পশ্চিম তুর্কীস্থান ও আরো পুবে চীন পর্যন্ত অগ্রসর হল। একেবারে বিনা বাধায় মিশর নতুন বিজেতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং কোরানই স্বয়ং-সম্পূর্ণ—এই ধর্মোন্মত্ত বিশ্বাসে এই বিজেতারা অ্যালেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির পুস্তক-নকল শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এই বিজয়-অভিযান আফ্রিকার উত্তর তীর ধরে জিব্রাল্টার প্রণালী ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৭১০ খৃষ্টাব্দে স্পেন আক্রান্ত হয় এবং ৭২০ খৃষ্টাব্দে তারা পাইরিনীজ পর্বতশ্রেণীতে এসে পৌছয়। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আরব-অভিযান মধ্য-ফ্রান্সে আসে এবং পয়টিয়ার্সের যুদ্ধে বাধা পেয়ে চিরকালের জন্য আবার পাইরিনীজ পর্বতশ্রেণীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মিশর-বিজয়ের ফলে মুসলমানরা অনেক

যুদ্ধ-জাহাজ লাভ করে এবং এক সময়ে মনে হয়েছিল যে তারা হয়ত কনস্ট্যান্টি-নোপল দখল করবে। ৬৭২ থেকে ৭১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা বার বার সাগর-পথে আক্রমণ করেছে, কিন্তু এই শক্তিশালী নগরী তা প্রতিবারই প্রতিহত করেছে।

আরবরা রাজনীতি-প্রবণ ছিল না এবং তাদের কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না; সুতরাং স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট সাম্রাজ্যে, যার রাজধানী তখন দামাস্কাস, অতি শীঘ্রই ভাঙন ধরতে বাধ্য। প্রথম থেকেই মতবিরোধ তাদের ঐক্যকে শিথিল করে তুলেছে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ভাঙনের কাহিনীতে আমাদের ততটা কৌতূহল নেই, যতটা আছে মানুষের মনে ও আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর তার প্রতিক্রিয়ায়। হাজার বছর আগের গ্রীকদের চেয়েও আরবদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনেক তাড়াতাড়ি অনেক নাটকীয়ভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের পশ্চিমের সমগ্র পৃথিবীর মননশক্তির উজ্জীবন, ও পুরাতন ধারণার পবিবর্তে নতুন চিন্তাধারার বিকাশের প্রচুর স্ফূরণ হয়েছিল।
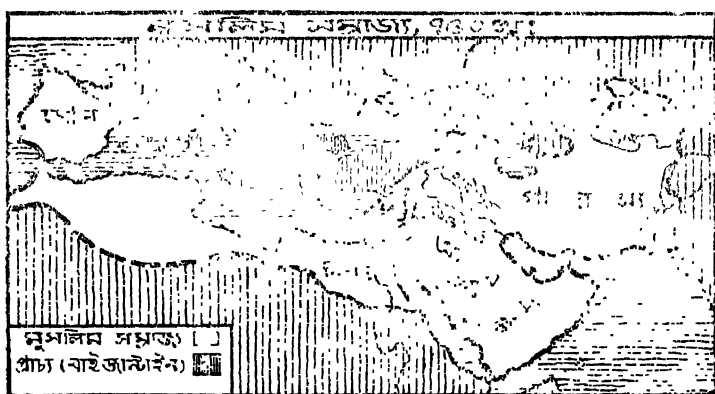
এই সজীব উৎসাহী মন শুধু যে ম্যানিসিয়ান, জোরোয়াস্ট্রিয়ান বা খৃষ্টান মতবাদ সঙ্গে নিয়ে পারস্যে আরবদের সংস্পর্শে এল তা নয়, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রীক সাহিত্য ও সিরিয়ান ভাষায় তার অনুবাদ নিয়েও তারা এল। মিশরেও তারা গ্রীক শিক্ষাধারার পরিচয় পেল। সর্বত্র এবং বিশেষ করে স্পেনে তারা পরি-কল্পনা ও আলোচনার ইহুদী ঐতিহ্যের সন্ধান পেল। মধ্য এশিয়ায় পেল তারা বৌদ্ধধর্ম এবং চীন-সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক ঐতিহ্য। চীনাদের কাছ থেকে তারা কাগজ তৈরি শিখল এবং তার ফলে বই ছাপাও সম্ভব হল। অবশেষে তারা ভারতবর্ষের গণিত-বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হল।

কোরান স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সম্ভাব্য একমাত্র পুস্তক, এই আদি অসহিষ্ণু বিশ্বাস

খুব অল্পদিনের মধ্যেই পরিত্যক্ত হল। আরব বিজেতাদের পথ ধরে সর্বত্রই শিক্ষার জাগরণ হতে লাগল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র আরব জগতে এক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। নবম শতাব্দীতে স্পেনের করডোবা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা কায়রো, বোখারা ও সমরখন্দের পণ্ডিতদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ইহুদী চিন্তাধারা আরবদের সঙ্গে সহজেই সংমিশ্রিত হয় এবং কিছুকাল এই দুই সেমিটিক জাতি একত্রে আরবী ভাষার মাধ্যমে কাজ করে। আরবদের রাজনৈতিক ভাঙন ও বলহীনতার পরও বহুদিন পর্যন্ত আরবী-ভাষী জগতে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও তারা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা করছিল।

এইভাবে গ্রীক-আরব্ধ নিয়মিত জ্ঞান আহরণ ও সমালোচনা সেমিটিক জগতের আশ্চর্য অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃপ্রবর্তিত হল। এতদিনকার অবহেলিত ও নিশ্চেষ্ট অ্যারিস্টটলের প্রারব্ধ কাজ ও অ্যালেকজান্ড্রিয়ার মিউজিয়াম পুনরুদ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলল। গণিত, চিকিৎসা ও পদার্থ-বিদ্যায় প্রচুর গবেষণা-মূলক কাজ হল। কঠিন রোম্যান সংখ্যার পরিবর্তে আজকের ব্যবহৃত আরবী সংখ্যার প্রচলন এবং 'শূন্য' চিহ্নটিরও প্রথম প্রবর্তন হল। অ্যালজেব্রা নামটিই আরবী। কেমিস্ট্রি কথাটিও তাই। আলগল, অলদেবারান ও বুটস্ প্রভৃতি তারাদের নামও মহাকাশে আরব-বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফ্রান্স, ইটালি ও সমগ্র খৃষ্ট-জগতের মধ্যযুগীয় দর্শনকে তাদের দর্শন পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।

আরবে পরীক্ষামূলক রাসায়নিকদের অ্যালকেমিস্ট বলা হত এবং তারা তাদের পরীক্ষার প্রক্রিয়া ফলাফল,যথাসম্ভব গোপন রাখার প্রয়াসে তখনো অত্যন্ত বর্বরোচিত ছিল। প্রথম থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সম্ভাব্য আবিষ্কার তাদের কী পরিমাণ প্রাধান্য ও সুযোগ দেবে এবং তা মানুষের জীবনে কী রকম সুদূরপ্রসারী হবে। তারা বহু মূল্যবান ধাতুবিদ্যার নানা প্রক্রিয়ার সন্ধান পায়; সঙ্কর ধাতু ও রঞ্জক, পাতন, সুরাসার ও নির্যাস, লেন্স প্রভৃতি আবিষ্কার করে; কিন্তু যে দুটি জিনিসের তারা সবচেয়ে বেশি সন্ধান করছিল, তার সন্ধান তারা কোনদিন পায় নি। একটি হল স্পর্শমণি, যা দিয়ে একটি ধাতুকে অপর ধাতুতে পরিবর্তিত করা যায় এবং এইভাবে কৃত্রিম স্বর্ণের উপর কর্তৃত্ব লাভ; অপরটি মৃতসঞ্জীবনী সুধা, যা জরা বার্ধক্য দূর করে জীবনকে বহুদিনব্যাপী দীর্ঘ করে রাখবে। আরব অ্যালকেমিস্টদের এই ধীর-স্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষার হাওয়া খৃষ্টান জগতেও গিয়ে লাগল। তাদের অনুসন্ধানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে এই অ্যালকেমিস্টদের কার্যাবলী

সামাজিক ও পরস্পর-সহযোগী হয়ে উঠল। তাদের ফলাফল পরস্পরকে জানানোর ফল তাদের কাছে লাভবান বলে মনে হল। অজান্তেই শেষ অ্যালকেমিস্টরা প্রথম পরীক্ষা-মূলক দার্শনিকে রূপান্তরিত হলেন।

পুরাতন অ্যালকেমিস্টরা চেয়েছিলেন হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার জন্য স্পর্শমণি ও মৃতসঞ্জীবনী সুধা; তাঁরাই আধুনিক পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্য ও এই পৃথিবীর উপর অসীম ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি লাভ করে।

ল্যাটিন খৃষ্টীয় সমাজের বিকাশ

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আর্যদের কর্তৃত্বাধীনে পৃথিবীর অত্যন্ত সঙ্কুচিত সীমা বিশেষ লক্ষনীয়। হাজার বছর আগে চীনের পশ্চিমের সমগ্র পৃথিবীতে আর্যভাষী জাতিরা প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল। এখন মঙ্গোলরা হাঙ্গারি পর্যন্ত আধিপত্য করছে, এশিয়া মাইনরের বাইজান্টাইন রাজত্ব ছাড়া এশিয়ার আর কোথাও আর্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই, সমগ্র আফ্রিকা এবং স্পেনের অধিকাংশও তাদের কর্তৃত্বের বাইরে। বাণিজ্য-নগরী কনস্ট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে মাত্র কয়েকটি ছিটমহলেই অতীতের বিরাট যবন জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল এবং পাশ্চাত্যের খৃষ্টান ধর্মযাজকরাই শুধু রোম্যান জগতের স্মৃতি জাগরিত রেখেছিলেন। এই অবনতির কাহিনীর একেবারে বিপরীতভাবে হাজার বছরের অবলুপ্তি ও অধীনতার তমিস্রা থেকে সেমিটিক সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

তবুও নর্দিক জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয় নি। মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে সীমিত সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের জটিলতায় বিভ্রান্ত হয়েও তারা ধীরে ধীরে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলছিল এবং অজ্ঞাতসারে পূর্বার্জিত শক্তির চেয়েও অনেক বেশি শক্তিমান হয়ে উঠছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীয় কোন রাজশক্তি ছিল না। ঐ জগৎ বিভিন্ন ছোট-ছোট রাজ্যে টুকরো হয়ে দেশীয় শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হত। এই রকম অবস্থা বেশিদিন থাকতে পারে না; এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সহযোগিতায় ও সঙ্ঘবদ্ধতায় এক নতুন প্রথার উন্মেষ হল—সামন্ত প্রথা—আজ পর্যন্ত ইউরোপের বুকে যার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এই সামন্তিকতা ছিল ক্ষমতার ব্যাপারে এক রকম সামাজিক কেলাসন (Crystallization)। সর্বত্রই লোকে নিজেকে অরক্ষিত মনে করত এবং সাহায্য ও রক্ষার বিনিময়ে নিজেদের কিছুটা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। এক শক্তিশালী

ব্যক্তিকে তারা তাদের প্রভু ও রক্ষক হিসাবে কামনা করত; তারা তাঁর সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করত, খাজনা দিত এবং পরিবর্তে সে তার নিজের সম্পত্তিতে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকত। তাদের প্রভু আবার তাঁর চেয়েও শক্তিশালী এক প্রভুর প্রজা হয়ে নিরাপদে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। নগরীগুলিও সামন্ত রক্ষকের অধীনে থাকাই সুবিধাজনক মনে করত এবং খৃষ্টান মঠ বা গির্জার সম্পত্তিগুলিও পরস্পরের মধ্যে অনুরূপ বন্ধনে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য বশ্যতা স্বীকার করার পূর্বেই তা দাবি করা হত; এই প্রথার অপকর্ষতা ও উৎকর্ষতা এক সঙ্গেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এইভাবে পিরামিডের মত এক প্রথা গড়ে ওঠে, বিভিন্ন দেশে যার পার্থক্য বিরাট, প্রথমে যার শুরু অনাচার ও বল-প্রয়োগে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যার পরিণতি এক নতুন আইনানুগ সুব্যবস্থিত রাজত্বে। এইভাবে এই পিরামিডগুলো বাড়তে লাগল এবং ক্রমে তাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য বলে পরিচিত হল। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়াতেই বর্তমানের ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডে ক্লোভিস এক ফ্র্যাঙ্ক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ভিসিগথ, লোম্বার্ড ও গথদের রাজ্যও দেখা যায়।

৭২০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা পাইরিনীজ অতিক্রম করে ক্লোভিসের এক দূর-সম্পর্কের বংশধর চার্লস মার্টেলের অধীনে এই ফ্র্যাঙ্ক রাজ্য দেখতে পায় এবং তাঁর হাতে পয়টিয়ার্সের যুদ্ধে (৭৩২) চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এই চার্লস মার্টেল পাই-রিনীজ থেকে হাঙ্গারি পর্যন্ত আল্পস পর্বতশ্রেণীর উত্তরের সমগ্র ইউরোপের সর্বময় প্রভু ছিলেন এবং ফরাসী-ল্যাটিন, উত্তর ও দক্ষিণ জার্মান-ভাষী বহু সামন্তরাজ্যের উপর প্রভুত্ব করতেন। তাঁর পুত্র পেপিন ক্লোভিসের শেষ বংশধরকে নিশ্চিহ্ন করে নিজেই রাজ-মর্যাদা ও উপাধি গ্রহণ করেন। তার পৌত্র হলেন শার্লমেঁ, যাঁর রাজত্ব শুরু হয় ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। সে রাজত্ব এত বিরাট ছিল যে তিনি ল্যাটিন সম্রাটের উপাধি পুনর্গ্রহণ করার কথা চিন্তা করতেন। তিনি উত্তর ইটালি অধিকার করে রোমের প্রভু হন।

পৃথিবীর ইতিহাসের বিস্তৃততর দিগন্ত থেকে ইউরোপের কাহিনী লক্ষ্য করলে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের চেয়ে আমরা অনেক স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি, এই ল্যাটিন রোম্যান সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য কত সংরুদ্ধ, কত ভয়ঙ্কর ছিল। অলীক প্রাধান্যের জন্য এই সঙ্কীর্ণ অথচ তীব্র সংগ্রাম হাজার বছর ধরে ইউরোপের সমস্ত প্রাণবীর্য নিঃশেষ করে ফেলছিল। একটি কারণ ছিল শার্লমেঁর (চার্লস দি গ্রেট) অনুসরণে সকল শাসকদের সীজার হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বর্বরতার বিভিন্ন স্তরে কয়েকটি জার্মান সামন্ত-রাজ্য নিয়ে শার্লমেঁর রাজত্ব ল্যাটিন-ধর্মী বুলি বলতে

শিখেছিল, এবং এইসব বুলি শেষ পর্যন্ত ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। রাইন নদীর পুবে কিন্তু অনুরূপ জার্মান লোকেরা তাদের জার্মান ভাষা ত্যাগ করে নি। তার ফলে এই দুই দল বর্বর বিজেতাদের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সহজেই তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা গেল। শার্লমেঁর মৃত্যুর পর এই ফরাসী ভাষার ব্যবহার তাঁর ছেলেদের মধ্যে রাজ্য-ভাগাভাগি সহজ করিয়ে দেওয়ায় এই ভাঙন আরও ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। সুতরাং শার্লমেঁর পর থেকে ইউরোপের ইতিহাসের একদিক ছিল প্রথমে এক সম্রাট ও তাঁর বংশ এবং তারপর আর-এক সম্রাটের ইতিহাস—রাজা রাজপুত্র ডিউক বিশপ এবং ইউরোপের নগরী-রাজ্যের উপর কর্তৃত্বের কঠিন সংগ্রাম, যার ফলে জার্মান ও ফরাসী-ভাষী রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রত্যেক সম্রাটেরই নির্বাচনের বাহ্যিক অনুষ্ঠান হত এবং তাঁদের চরম উচ্চাভিলাষ ছিল সেই শ্রীহীন রাজধানী রোম অধিকার এবং সেখানে রাজ্যাভিষেকের জন্য সংগ্রাম।

ইউরোপের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আর-একটি কারণ ছিল রোমের গির্জার কোন পার্থিব রাজা নিয়োগ না করার সঙ্কল্প এবং রোমের পোপেরই কার্যত সম্রাট হওয়ার অভিপ্রায়। একদিক দিয়ে তিনি তখনই সর্বেসর্বা ছিলেন; সেই ক্ষয়িষ্ণু নগরীকে তিনিই করায়ত্ত করে রেখেছিলেন; তাঁর সৈন্যবাহিনী না থাকলেও সমস্ত ল্যাটিন পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টান পুরোহিতদের মাধ্যমে তাঁর বিরাট প্রচার-ব্যবস্থা ছিল। মানুষের দেহের উপর তাঁর ক্ষমতা না থাকলেও তাদের কল্পনার স্বর্গ ও নরকের চাবি ছিল তাঁর হাতে, তাই তাদের আত্মার উপর তিনি অত্যন্ত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। সুতরাং সমস্ত মধ্যযুগ ধরে এক রাজা প্রথমে আরেক রাজার সমান হতে, পরে তার উপর কর্তৃত্ব করতে এবং সবশেষে—কখনো বা শক্তি প্রয়োগে, কখনো বা ছলে এবং কখনো ভয়ে-ভয়ে—শ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার, রোমের পোপ হবার জন্য যুদ্ধ করতেন। কিন্তু এই পোপেরা, যাঁরা প্রায়ই বৃদ্ধ হতেন এবং যাঁদের রাজত্বকাল গড়ে দু-বছরের বেশি হত না, কৌশলে নিজেদের খৃষ্ট-জগতের অধিপতি বলে এই রাজাদের আনুগত্য গ্রহণ করাতেন।

কিন্তু এই রাজায় রাজায় বা সম্রাটে ও পোপের শত্রুতাতেই ইউরোপের বিশৃঙ্খলার কারণ শেষ হয় না। কনস্ট্যান্টিনোপলের গ্রীকভাষী সম্রাট তখনও সমস্ত ইউরোপের প্রভুত্ব দাবি করতেন। শার্লমেঁ শুধুমাত্র রোম-সাম্রাজ্যের ল্যাটিন দিককেই পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। সুতরাং ল্যাটিন সাম্রাজ্য ও গ্রীক সাম্রাজ্যের মধ্যে রেষারেষি থাকা স্বাভাবিক। তার চেয়েও বেশি রেষারেষি শুরু হয়েছিল পুরাতন গ্রীকভাষী খৃষ্টধর্ম এবং নতুন ল্যাটিন-ভাষী খৃষ্টধর্মের মধ্যে। খৃষ্টের

প্রেরিত শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং পৃথিবীর খৃষ্টসমাজের প্রধান সেণ্ট পিটারের উত্তরাধিকারী হিসাবে রোমের পোপ নিজেকে দাবি করলেন। কনস্ট্যাণ্টি-নোপলের সম্রাট কিংবা প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ তাঁর দাবি স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেন না। পবিত্র ত্রিনীতির একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরে বিতর্কের পর ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে দুই দলের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। তারপর থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক গির্জা স্বতন্ত্র এবং শত্রু হয়ে রইল। মধ্যযুগে ল্যাটিন খৃষ্টতন্ত্রের ক্ষতিকারী সংঘর্ষের মধ্যে এই বিরোধকেও আমাদের ধরে নিতে হবে।

এই বিভক্ত খৃষ্টসমাজের উপর তিনদল শত্রু হানা দিল। বাল্টিক এবং উত্তর সাগরের কাছাকাছি একদল নর্দিক উপজাতি বাস করত, তারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং অনিচ্ছার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের বলা হত নর্থমেন। তারা

চার্লস্ মার্টেলের সময় ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চল

সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে দস্যুতা করে বেড়াত এবং স্পেন পর্যন্ত সমস্ত খৃষ্ট-রাজ্যের সমুদ্র-উপকূল লুণ্ঠন করত। তারা রাশিয়ার নদীগুলি ধরে জনহীন মধ্য-প্রান্তর পর্যন্ত এসে আবার দক্ষিণমুখী নদীতে তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে এসেছিল। কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণ-সাগর পর্যন্ত তারা নৌ-দস্যু হয়েও এসেছিল। রাশিয়াতে তারা তাদের প্রতিনিধি দাঁড় করিয়েছিল এবং এরাই প্রথম জাতি যাদের রাশিয়ান বলা হয়। রাশিয়ান নর্থম্যানরা প্রায় কনস্ট্যাণ্টিনোপল অধিকার করে ফেলেছিল। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংল্যাণ্ড শার্লমেঁর শিষ্য ও আশ্রিত এগবার্ট নামে এক রাজার অধীনে খৃষ্টধর্মভুক্ত নিম্ন-জার্মান দেশের একাংশ ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী আলফ্রেড দি গ্রেটের হাত থেকে নর্থম্যানরা অর্ধেক দেশ ছাড়িয়ে নেয় (৮৮৬) এবং শেষে ক্যানিউটের অধীনে (১০১৬) সমস্ত দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। রলফ দি

গ্যাঙ্গারের অধীনে (৯১২) আর-একদল নর্থমেন উত্তর ফ্রান্স অধিকার করে ; এর নাম হয় নরম্যাণ্ডি।

ক্যানিউট শুধু ইংল্যাণ্ডেই রাজত্ব করেন নি, নরওয়ে এবং ডেনমার্কও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বর্বর জাতির চিরাচরিত রাজনৈতিক দুর্বলতার জন্য—রাজার ছেলেদের মধ্যে ভাগাভাগি—তাঁর এই অল্পদিনের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নর্থম্যানদের এই অস্থায়ী ঐক্য যদি একটু বেশিদিন স্থায়ী হওয়া সম্ভবপর হত, তবে ইতিহাসের পরিণতি কী হত—কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ জাগে। এই নর্থম্যানরা ছিল আশ্চর্য সাহসী ও শক্তিশালী জাত। তাদের পাল-তোলা জাহাজে করে তারা এমনকি আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত গেছিল। ইউরোপীয়দের মধ্যে তারাই প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা দেয়। ভবিষ্যতে এই নর্থম্যান বীরেরাই সারাসেনদের কাছ থেকে সিসিলি অধিকার করে এবং রোম লুণ্ঠন করে। ক্যানিউটের রাজত্বকে কেন্দ্র করে আমেরিকা থেকে রাশিয়া পর্যন্ত এই উত্তর দেশের লোকদের নিয়ে কী বিরাট এক নৌ-শক্তি গড়ে উঠতে পারত।

জার্মান এবং ল্যাটিনপন্থী ইউরোপীয়দের পূর্বে স্লাভ ও তুর্কীদের মিশ্রিত বহু জাতি ছিল। এদের মধ্যে নাম করা যায় মাগিয়ার বা হাঙ্গারিয়ানদের। অষ্টম এবং নবম শতাব্দী ধরে এরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শার্লমেঁ কিছুদিন তাদের প্রতিহত করে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আজ যেটা হাঙ্গারি সেখানে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং তাদের পূর্ববর্তী স্বজাতি হুনদের মতই প্রতি গ্রীষ্মে সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ইউরোপে অভিযান চালাতে শুরু করল। ৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তারা জার্মানির ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে গেল, সেখান থেকে আল্পস পর্বতশ্রেণী পার হয়ে উত্তর ইটালি এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে, আগুন জ্বালিয়ে দেশে ফিরে এল।

সব শেষে দক্ষিণ থেকে রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাল সারাসেনরা। সমুদ্রের বুকে তারা তাদের প্রচুর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ; জলের উপর তাদের একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নর্থম্যানরা—কৃষ্ণসাগর থেকে রাশিয়ান নর্থম্যান এবং পশ্চিম দেশের নর্থম্যান।

আরো দুর্ধর্ষ এবং আরো শক্তিশালী এই জাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং আভ্যন্তরীণ অবোধ্য কার্যকারণ ও অপরিমেয় বিপদে সন্ত্রস্ত হয়ে শার্লমেঁ এবং তাঁর পরে আরো কয়েকজন উচ্চাভিলাষী রাজা পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের নামে পশ্চিম সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রয়াস করেন। শার্লমেঁর সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক জীবন এই ধ্যান-ধারণায় আবিষ্ট হয়ে

পড়ে; ওদিকে পুবে রোম্যান শক্তির গ্রীক অংশ দিন দিন ক্ষয় হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—বাকি রইল শুধু ক্ষয়িষ্ণু বাণিজ্য-নগরী কনস্ট্যান্টিনোপল ও চারদিকের মাত্র কয়েক মাইল বিস্তৃত তার রাজত্ব। রাজনৈতিক দিক দিয়ে শার্লমেঁর সময় থেকে আরো হাজার বছর ইউরোপ মহাদেশ পুরাতনপন্থী ও সৃজনীশক্তিহীন রয়ে গেল।

ইউরোপের ইতিহাসে শার্লমেঁর নাম স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব খুব অস্পষ্টভাবেই জানা যায়। তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না, কিন্তু শিক্ষার উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ভোজনকালে তাঁকে পড়ে শোনান হত এবং ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর দুর্বলতা ছিল। আয়-লা-চ্যাপেল বা মেয়েন্সের শীতকালীন শিবিরে তিনি অসংখ্য পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আলোচনা-সভা বসাতেন এবং তাঁদের কথাবার্তা থেকে শিক্ষালাভ করতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি স্পেনীয় সারাসেন,
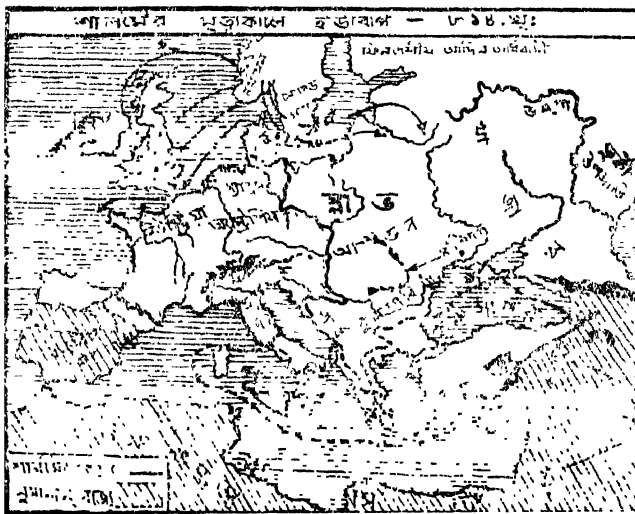
স্লাভ ও মাগিয়ার এবং অন্যান্য তখন-পর্যন্ত অখৃষ্টান জার্মান জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। উত্তর ইটালি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার আগে রোমুলাস অগস্টালাসের পর তাঁর সীজার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল কি না সন্দেহ, কিংবা এ-ও হতে পারে যে ল্যাটিন গির্জাকে কনস্ট্যান্টিনোপলের আওতার বাইরে রাখার জন্য উদ্বিগ্ন পোপ তৃতীয় লিও-ই তাঁর কাছে এই প্রস্তাব করেছিলেন।

পোপ তাঁকে রাজমুকুটে বিভূষিত করবেন কি করবেন না—এই ব্যাপার নিয়ে রোমে পোপ ও সম্ভাব্য সম্রাটের মধ্যে কিছুদিন অত্যন্ত কৌশলের খেলা চলে।

৮০০ খৃষ্টাব্দে বড়দিনে সেণ্ট পিটার গির্জায় পোপ হঠাৎ তাঁর দর্শনকামী ও বিজেতাকে রাজমুকুটে বিভূষিত করেন। তিনি একটি রাজমুকুট নিয়ে শার্লমেঁর মাথায় পরিয়ে তাঁকে সীজার এবং অগস্টাস বলে সম্ভাষণ করেন। সমগ্র জনতা হর্ষধ্বনি করে। কিন্তু যেভাবে এই অনুষ্ঠান হয় তাতে শার্লমেঁ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, এটা তাঁর পরাজয় বলে মনে হল; তিনি তাঁর পুত্রকে স্পষ্ট আদেশ দিয়ে গেলেন যে পোপ যেন তাকে সম্রাট বলে ঘোষণা না করে, সে যেন নিজের হাতে মুকুট নিয়ে মাথায় পরে। সুতরাং এই সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের সূচনা থেকেই আমরা সম্রাট ও পোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে যুগ-ব্যাপী লড়াই দেখতে পাই। কিন্তু শার্লেমেঁর পুত্র, লুই দি পায়াস (Pious) তাঁর পিতার আদেশ অমান্য করেন এবং পোপের একান্ত অনুগত হয়ে থাকেন।

লুই দি পায়াসের মৃত্যুর পর শার্লমেঁর সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে যায় এবং ফরাসী-ভাষী ও জার্মান-ভাষী ফ্র্যাঙ্কদের মধ্যে ভাঙন বেড়ে উঠে। হেনরি দি ফাউলার নামে কোন এক স্যাক্সনকে ৯১৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান রাজা ও ধর্মাধ্যক্ষদের এক সভা জার্মানির সম্রাট নির্বাচিত করেন। তাঁর পুত্র অটো এর পর সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট হিসাবে পরিগণিত হন। অটো রোম অধিকার করেন এবং ৯৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সম্মানে রাজ-মুকুটে বিভূষিত হন। এই স্যাক্সন বংশ একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই শেষ হয়ে যায় এবং তার জায়গায় অন্যান্য জার্মান রাজা দেখা দেন। শার্লমেঁর বংশধরদের দ্বারা রচিত কার্লোভিঙ্গিয়ান বংশের অবলুপ্তির পর পশ্চিমের বিভিন্ন ফরাসী-ভাষী রাজা ও জমিদাররা আর জার্মান-পদানত হয় নি এবং বৃটেনের কোন অংশও আর পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় নি। নর্মাণ্ডির ডিউক, ফ্রান্সের রাজা এবং আরো অনেক অল্প-শক্তিশালী শাসকরাও তার বাইরে থাকতে পেরেছিলেন।

৯৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স রাজ্য কার্লোভিঞ্জিয়ান বংশের হাতের থেকে হিউ কাপেটের হাতে চলে যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরাই ফ্রান্সে রাজত্ব করেন। হিউ কাপেটের সময় ফ্রান্সের রাজা প্যারিসের চারিপাশে সামান্য একটু জায়গার উপর রাজত্ব করতেন।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের নর্থম্যানদের রাজা হারল্ড হারড্রাদা ও ল্যাটিনপন্থী নর্থম্যানরা নর্ম্যাণ্ডির ডিউকের অধীনে প্রায় একই সঙ্গে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা হ্যারল্ড প্রথম জনকে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের যুদ্ধে পরাজিত করেন কিন্তু দ্বিতীয় জনের কাছে হেস্টিংসের যুদ্ধে পরাজিত হন। ইংল্যাণ্ড নরম্যানদের অধীনে চলে যায় এবং সেই থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, টিউটনিক ও রাশিয়ানদের থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে ফ্রান্সের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ও বিরোধ শুরু হয়। পরবর্তী চার শতাব্দী ইংরাজরা ফরাসী সামন্তদের অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এবং ফ্রান্সের রণক্ষেত্রেই তারা প্রাণ দেয়।

ক্রুসেড এবং পোপ-রাজত্বের যুগ

একথা মনে রাখবার মত যে শার্লমেঁ খালিফ হারুন-অল-রসিদের সঙ্গে—আরব্য উপন্যাসের সেই হারুন অল রসিদ—পত্রালাপ করেছিলেন। দামাস্কাস থেকে মোসলেম সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন স্থানান্তরিত হয়েছে বাগদাদে। বাগদাদ থেকে হারুন-অল-রসিদ একটি চমৎকার তাঁবু, জল-ঘড়ি, সুন্দর এক হাতী এবং পবিত্র সমাধিস্থানের (Holy Sepulchre) চাবি দিয়ে যে এক দূত পাঠিয়েছিলেন—এ-কথাও লিখিত আছে। জেরুজালেমের খৃষ্টানদের কে প্রকৃত রক্ষাকর্তা—বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য, না পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্য—এই বিরোধটি পাকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত চাতুরীর সঙ্গে শেষ উপহারটি তিনি পাঠিয়েছিলেন।

এই উপহারগুলি আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, নবম শতাব্দীতে যখন যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সমগ্র ইউরোপে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, তখন মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় ইউরোপ যা কোনদিন দেখাতে পারে নি তার চেয়ে অনেক সুষ্ঠু ও সভ্য এক আরব সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের তখনও চর্চা ছিল; শিল্পকলার দিন দিন উন্নতি হচ্ছিল, নির্ভয় ও সংস্কারহীন মানুষের মন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিবিষ্ট হতে পারত। এমন কি স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা, যেখানে সারাসেন রাজত্বগুলি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত, সেখানে পর্যন্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা বইছিল। ইউরোপের এই তমসাচ্ছন্ন শতাব্দীগুলিতে ইহুদী এবং আরবরা অ্যারিস্টটল পড়ত এবং আলোচনা করত। বিজ্ঞান ও দর্শনের এই অবহেলিত বীজগুলি তারা সযত্নে রক্ষা করে চলেছিল।

খালিফের রাজ্যের উত্তর-পুবে অনেকগুলি তুর্কী উপজাতি ছিল। তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং দক্ষিণের শিক্ষিত আরব কিংবা পারসীকদের চেয়ে তারা এই বিশ্বাস অনেক সরল অথচ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অন্তরে গ্রহণ করেছিল। দশম শতাব্দীতে তুর্কীরা প্রবল এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং আরব শক্তি ছিল খণ্ড-খণ্ড এবং ক্ষয়িষ্ণু। খালিফের সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুর্কীদের সম্বন্ধ প্রায় চোদ্দ শতাব্দী আগে মীডদের সঙ্গে শেষ ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সম্বন্ধের অনুরূপ ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কী নামে একদল তুর্কী উপজাতি মেসোপটেমিয়ায় হানা দিয়ে খালিফকে তাদের নামেমাত্র

রাজা বলে স্বীকার করে নিলেও কার্যত তাদের বন্দী এবং হাতিয়ার করে রাখল। তারা আর্মেনিয়া জয় করল। তারপর তারা এশিয়া মাইনরের বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ অবশিষ্টের উপর আক্রমণ চালাল। ১০৭১ খৃষ্টাব্দে মেলাসগার্ডের যুদ্ধে বাইজাণ্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং তুর্কীরা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়ে এশিয়া থেকে বাইজাণ্টাইন রাজত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। কনস্ট্যাণ্টিনোপলের মুখোমুখি নিসিয়া দুর্গ অধিকার করে তারা সেই নগরী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

বাইজাণ্টাইন সম্রাট সপ্তম মাইকেল ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদল নরম্যান যোদ্ধা ডুরাজো অবরোধ করেছে এবং পেচেনেগ নামে আর-একদল দুর্ধর্ষ তুর্কী দানিয়ুব নদী পার হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে—সপ্তম মাইকেল এই দুই দলের সঙ্গে ইতিমধ্যে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্ভাবনার শেষ সীমান্তে এসে তিনি যেখানে সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেখানে সাহায্য প্রার্থনা করলেন, এবং একথা উল্লেখযোগ্য যে তিনি পশ্চিম দেশের সম্রাটদের কাছে সাহায্য না চেয়ে ল্যাটিন খৃষ্টরাজ্যের প্রধান হিসাবে রোমের পোপের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তিনি পোপ সপ্তম গ্রেগরিকে পত্র দিয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী আলেক্সিউস কমেনাস আরো ব্যাকুলভাবে দ্বিতীয় আর্বানকে পত্র লিখেছিলেন।

ল্যাটিন ও গ্রীক গির্জার ভাঙনের পর তখনও সিকি শতাব্দী অতিবাহিত হয় নি। সেই বিসংবাদ তখন পর্যন্ত মানুষের মনে জাগ্রত, এবং বাইজাণ্টিয়ামের এই দুর্দশাকে কেন্দ্র করে পোপ বিরুদ্ধবাদী গ্রীক গির্জার উপর ল্যাটিন গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ হারালেন না। এই ব্যাপারে পশ্চিম খৃষ্টসমাজের পক্ষে কষ্টদায়ক দুটি বিষয়ের সমাধানের সুযোগও পোপ দেখতে পেলেন। একটি হল সামাজিক জীবনকে বিশৃঙ্খল-করা 'ব্যক্তিগত যুদ্ধ' এবং অপরটি নিম্নদেশবাসী জার্মান ও খৃষ্ট-ধর্মান্বিত নর্থম্যান, বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক ও নরম্যানদের, যুদ্ধ করার সুপ্রচুর শক্তি। জেরুজালেম-অধিকারী তুর্কীদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত খৃষ্টজাতির মধ্যে যুদ্ধ-শান্তি ঘোষণা করে ক্রুসেড—ক্রসের যুদ্ধ—নামে এক ধর্মযুদ্ধ প্রচার করা হল (১০৯৫)। এই যুদ্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের অবিশ্বাসীদের হাত থেকে পবিত্র সমাধি-স্থান উদ্ধার করা। পিটার দি হার্মিট নামে একটি লোক গণতান্ত্রিক প্রথায় সমগ্র ফ্রান্স ও জার্মানিতে এই যুদ্ধের প্রচারকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মোটা কাপড়ের জামা পরে, নগ্ন পায়ে, গাধায় চড়ে, একটি বিরাট ক্রস কাঁধে নিয়ে তিনি পথে বাজারে ও গির্জায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর তুর্কীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং খৃষ্টান ব্যতীত অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের হাতে পবিত্র সমাধিভূমি

থাকার লজ্জাকর ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। বহু শতাব্দীর খৃষ্ট অনুশাসনের ফল দেখা গেল। সমস্ত পশ্চিম জগতে উৎসাহের এক বন্যা বয়ে গেল এবং খৃষ্ট ধর্মরাজ্য নিজেকে আবিষ্কার করল।

শুধুমাত্র একটি আদর্শের জন্য সুদূরবিস্তারী জনসাধারণের মধ্যে এরকম জাগরণ আমাদের জাতির ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। রোম্যান সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ বা চীনের ইতিপূর্বের ইতিহাসে এ ধরনের কোন ঘটনা সম্ভব হয় নি। একটু ছোট ভাবে অবশ্য ব্যাবিলনীয় অধিকার থেকে মুক্তির পর ইহুদীদের মধ্যে এবং পরে ইসলাম সর্বসাধারণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঠিক এ ধরনের ঘটনা সম্ভবপর হয়েছে। ধর্মমঠ-অনুশাসিত ধর্মগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে নব চেতনার সঞ্চার হয়েছে, তার সঙ্গে এই আন্দোলনগুলির যথেষ্ট সংযোগ ছিল। হিব্রু অবতারগণ, যিশু এবং তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়, ম্যানি, মহম্মদ প্রত্যেকেই মানুষের স্বতন্ত্র আত্মার উৎসাহক ছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত বিবেককে ঈশ্বরের মুখোমুখি আনতেন। তার আগে ধর্ম বিবেকের চেয়ে তুকতাক বা অপ-বিজ্ঞানের ব্যবসাই করত বেশি। পুরাতনপন্থী ধর্মের মন্দির, দীক্ষিত পুরোহিত ও অতীন্দ্রিয়ময় অর্ঘ্যদানের উপর ভিত্তি ছিল এবং সাধারণ লোককে ভয়-বিদ্ধ ক্রীতদাসের মত রাখত। নব্য ধর্ম তাদের মানুষের যোগ্যতা এনে দেয়।

প্রথম ক্রুসেডের জন্য প্রচারই ইউরোপের ইতিহাসে জনসাধারণের প্রথম চেতনা। একে আধুনিক গণতন্ত্রের সূচনা বললে বাড়িয়ে বলা হবে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে সে-সময়ের গণতন্ত্র আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আবার আমরা একে নড়ে উঠতে এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর সামাজিক ও ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্ন তুলতে দেখব।

এই প্রথম গণ-জাগরণের পরিণাম ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং করুণ। অসংখ্য সাধারণ লোক, সৈন্যবাহিনী না বলে জনতা বলা উচিত, ফ্রান্স, রাইনল্যাণ্ড ও মধ্য ইউরোপ থেকে কোন নেতা বা অস্ত্রশস্ত্রের অপেক্ষা না রেখেই পবিত্র সমাধি-ভূমি অধিকার করতে পুবমুখে অগ্রসর হয়। এটি হল 'জনগণের ক্রুসেড।' জনতার দুই বিরাট দল হাঙ্গারির মধ্যে ঢুকে পড়ে নতুন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত মাগিয়ারদের পৌত্তলিক বলে ভুল করে অত্যাচার শুরু করে এবং তারা নৃশংসভাবে নিহত হয়। তৃতীয় বিরাট জনতা ঠিক অনুরূপ ভুল করে রাইনল্যাণ্ডের ইহুদীদের উপর অত্যাচার করে পুব অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং হাঙ্গারিতে তারাও ধ্বংস হয়। স্বয়ং পিটার হার্মিটের অধীনে আরো দুটি বিরাট দল কনস্ট্যান্টিনোপলে আসে, বসফোরাস অতিক্রম করে এবং সেলজুক তুর্কীদের কাছে তারা ঠিক পরাজিত হয় না, সকলে

নির্মমভাবে নিহত হয়। ইউরোপের জনজাগরণের প্রথম আন্দোলন এইভাবে শুরু ও শেষ হয়।

পরের বছর (১০৯৭) প্রকৃত সেনাবাহিনী বসফোরাস অতিক্রম করে। নেতৃত্বে এবং পরাক্রমে তারা মূলত নরম্যান ছিল। তারা নিসিয়া বিধ্বস্ত করে এবং চোদ্দ শতাব্দী আগে অ্যালেকজাণ্ডার যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই পথ ধরে অ্যান্টিয়কের দিকে অগ্রসর হয়। অ্যান্টিয়ক অবরোধ চলে এক বছর এবং ১০৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তারা জেরুজালেম অবরোধ করে। এক মাস অবরোধের পর নগরীটিকে তারা বিধ্বস্ত করে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়। পথের রক্তে অশ্বারোহীদের সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। ১৫ই জুলাই সন্ধ্যাবেলা ক্রুসেডাররা পবিত্র সমাধি-স্থানের গির্জায় যাওয়ার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হল; রক্তাপ্লুত শ্রান্ত এবং 'অত্যধিক আনন্দে ক্রন্দমান' যোদ্ধবৃন্দ নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন এবং গ্রীকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে উঠল। ক্রুসেডাররা ছিল ল্যাটিন-চার্চের দাস; গ্রীক ধর্মাধ্যক্ষরা তুর্কীদের অধীনের চেয়েও বিজয়ী ল্যাটিনদের অধীনে নিজেদের অবস্থা আরো বেশি খারাপ দেখলেন। ক্রুসেডাররা দেখলেন যে তাঁরা বাইজাণ্টাইন ও তুর্কীদের মাঝখানে, এবং দু-দলের সঙ্গেই যুধ্যমান। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনরের অধিকাংশই পুনরধিকার করে নিল এবং তুর্কী ও গ্রীকদের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণ করে ল্যাটিন রাজারা জেরুজালেম এবং আরো কয়েকটি ছোটখাট রাজ্য নিয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন; এদের মধ্যে সিরিয়ায় এডেসা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এইসব ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর তাঁদের কর্তৃত্বও সফল ছিল না এবং ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে এডেসা মোসলেমদের করায়ত্ত হল— ফলে নিষ্ফল হল দ্বিতীয় ক্রুসেড, এডেসা পুনরধিকৃত হতে পারল না বটে কিন্তু অ্যান্টিয়ক অনুরূপ ভাগ্য-বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল।

সমগ্র মিশরে প্রভুত্ব বিস্তার করে সালাদিন নামে এক কুর্দিশ যোদ্ধা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ইসলাম শক্তি একত্র করে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম পুনরধিকার করেন। ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়। এই ক্রুসেড জেরুজালেম অধিকার করতে পারে নি। চতুর্থ ক্রুসেডে (১২০২-৪) ল্যাটিন গির্জা প্রকাশ্যেই গ্রীক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল; তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধের কোনও ভানও ছিল না। ভেনিস থেকেই এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১২০৪ খৃষ্টাব্দে কনস্ট্যাণ্টিনোপল বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তখনকার বিরাট বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য-নগরী ভেনিস এবং

ভেনিসিয়ানরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দ্বীপ ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী জায়গা দখল করে নেয়। কনস্ট্যান্টিনোপলে এক 'ল্যাটিন' সম্রাটকে (ফ্ল্যাণ্ডার্সের বল্ডউইন) অধিষ্ঠিত করা হয় এবং ল্যাটিন ও গ্রীক গির্জা একত্রিত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১২০৪ থেকে ১২৬১ পর্যন্ত ল্যাটিন সম্রাটরা কনস্ট্যান্টিনোপলে রাজত্ব করেন, তারপর গ্রীকরা আবার রোম্যান অধিকার থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়।

দশম শতাব্দী যেরকম নর্থম্যানদের আর একাদশ শতাব্দী সেলজুক তুর্কীদের অভ্যুত্থানের যুগ ছিল, সেইরকম দ্বাদশ শতাব্দী এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ছিল পোপের অভ্যুত্থানের যুগ। এর পূর্বে কিংবা পরে আর কখনো এক সংযুক্ত খৃষ্টরাজ্যের উপর রাজত্ব কার্যকরী হওয়ার মত সম্ভবপর হয় নি।

সেইসব শতাব্দীতে সরল খৃষ্ট-বিশ্বাস ইউরোপের বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল। রোম নিজেই অনেক তমসাচ্ছন্ন ও নিন্দনীয় সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে; খুব অল্পসংখ্যক লেখকই ক্ষমার চোখে দেখতে পেরেছেন দশম শতাব্দীর পোপ একাদশ ও দ্বাদশ জনের জীবন—তাঁরা ঘৃণ্য ছিলেন; কিন্তু ল্যাটিন খৃষ্টরাজ্যের হৃদয় ও দেহ ছিল সত্যাশ্রয়ী ও অনাড়ম্বর; সাধারণ ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীরা আদর্শ ও ধর্মানুরক্ত জীবন যাপন করতেন। এই সব বিশ্বাসের ঐশ্বর্যেই ছিল গির্জার শক্তি। অতীতের মহান পোপদের মধ্যে ছিলেন গ্রেগরি দি গ্রেট—প্রথম গ্রেগরি (৫৯০—৬০৪)—এবং তৃতীয় লিও (৭৯৫—৮১৬) যিনি শার্লমেঁকে সীজার হতে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজেকে বঞ্চিত করে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেন। একাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি হিল্ডেব্র্যাণ্ড নামে এক ধর্মযাজকীয় রাজনীতিবিদের আবির্ভাব হয় এবং তিনি তাঁর জীবন শেষ করেন পোপ সপ্তম গ্রেগরি হিসাবে (১০৭৩—৮৫)। তাঁর পরের পরের পোপ ছিলেন দ্বিতীয় আর্বান (১০৮৭—৯৯), প্রথম ক্রুসেডের পোপ। এঁরা দুজনেই ছিলেন পোপের শ্রেষ্ঠত্বের যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সময়ে পোপেরা সম্রাটের উপর প্রভুত্ব করতেন। বুলগারিয়া থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং নরওয়ে থেকে সিসিলি ও জেরুজালেম পর্যন্ত পোপই ছিলেন সর্বেশ্বর। পোপ সপ্তম গ্রেগরি সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে ক্যানোসায় তাঁর কাছে অনুতাপ করা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তিন দিন ও তিন রাত্রি তুষারপাতের মধ্যে চটের বস্ত্রে ও নগ্ন পায়ে দুর্গ-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করতে দিয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে সম্রাট ফ্রেডেরিক (ফ্রেডেরিক বারবারোসা) পোপ তৃতীয় অ্যালেকজাণ্ডারের কাছে নতজানু হয়ে তাঁর প্রভু-পরায়ণতার শপথ গ্রহণ করেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গির্জার বিরাট শক্তি নিহিত ছিল মানুষের ইচ্ছা এবং বিবেকের মধ্যে। যে নৈতিক সম্মানেই এর শক্তি নিহিত, এ তা ধরে রাখতে পারে নি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই দেখা গেল যে পোপের শক্তি লোপ পেয়েছে। কী সে কারণ, যার জন্য খৃষ্ট-জগতের সাধারণ লোক গির্জার উপর তাদের অকপট বিশ্বাস এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছিল যে আর সেই গির্জার ডাকে সাড়া দিত না বা তার উদ্দেশ্য সাধন করতে অগ্রসর হত না?

প্রথম উপদ্রব অবশ্য গির্জার ঐশ্বর্য সংগ্রহ। গির্জার কোনদিন মৃত্যু হয় না এবং প্রায়ই নিঃসন্তান লোকে গির্জাকে ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। অনুতপ্ত পাপীদেরও ভূ-সম্পত্তি দানে উৎসাহিত করা হত। এইভাবে ইউরোপের অনেক দেশে ভূ-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ গির্জার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। এই সম্পত্তি বাড়ানোর লোভও বৃদ্ধি পেল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্বত্রই সকলে এই কথা বলাবলি করত যে ধর্ম-যাজকেরা কেউ ভাল লোক নন; তাঁরা সকলেই অর্থ ও সম্পত্তির পিছনে ঘুরে বেড়ান।

এইভাবে সম্পত্তি-হস্তান্তর রাজা-রাজড়ারা খুব অপছন্দ করতেন। সামরিক সাহায্যদানে সমর্থ জমিদারদের বদলে তাঁরা দেখলেন এই ভূ-সম্পত্তি আজ গির্জা, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পোষণ করছে; এবং ভূ-সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে। এমন কি সপ্তম গ্রেগরির সময়ের পূর্বেও 'মালিকানার' প্রশ্ন নিয়ে রাজাদের সঙ্গে পোপের বিরোধ চলে আসছিল; প্রশ্নটি ছিল, কে বিশপ নিয়োগ করবেন। যদি সে ক্ষমতা রাজার না হয়ে পোপের হয়, তবে রাজা যে শুধু তাঁর প্রজাদের বিবেকের উপর দখলই হারালেন তা নয়, তাঁর রাজ্যের এক বৃহদংশও হারালেন। তার উপর ধর্ম-যাজকেরা রাজস্ব মাপের দাবি জানালেন। তাঁরা রোমে রাজস্ব দিতেন। শুধু তাই নয়, জনসাধারণ রাজাকে যে রাজস্ব দেয় গির্জা তার উপরও এক দশমাংশ কর আদায়ের দাবি জানাল।

একাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন খৃষ্টরাজ্যের প্রায় সমস্ত দেশের ইতিহাসেই এই একই ঘটনার কথা বলে: মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে সংগ্রাম, এবং সাধারণত প্রতি ক্ষেত্রেই পোপের জয়লাভ। সম্রাটকে ধর্মচ্যুত করা, তাঁর প্রজাদের রাজভক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া কিংবা উত্তরাধিকারী মেনে নেওয়ার দাবিও তিনি জানালেন। সমগ্র জাতিকে নিষিদ্ধ করার অধিকার তাঁর বলে তিনি দাবি করলেন এবং তারপর খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া, সমর্থন করা এবং প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন ধর্মযাজকীয় কাজ রইল না। ধর্মযাজকেরা সাধারণ প্রার্থনা-সভানুষ্ঠান, লোকের বিবাহ কিংবা কবরস্থ করার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারতেন

না। এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে দ্বাদশ শতাব্দীর পোপেরা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করতে কিংবা দুর্দম লোকদের ভয় দেখাতে পারতেন। এইগুলি ছিল অতি প্রবল ক্ষমতা ; এবং প্রয়োজন হত অসাধারণ পরিস্থিতিতে। অবশেষে পোপেরা এত ঘন ঘন এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন যে তার আর তেমন জোর রইল না। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা স্কটল্যাণ্ড ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডকে পর-পর নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে দেখি। এবং ক্রুসেডের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পোপেরাও বিরুদ্ধবাদী রাজাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি।

রোমের গির্জা শুধুমাত্র রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালু রাখলে সমস্ত খৃষ্টজগতের উপর তার চিরস্থায়ী রাজত্ব করা সম্ভব হত। কিন্তু পোপের সুউচ্চ দাবিগুলি সাধারণ ধর্মযাজকদের কাজে গোঁয়ার্তুমিতে প্রতিফলিত হত। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রোম্যান ধর্মযাজকেরা বিবাহ করতে পারতেন, যে জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা বাস করতেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও থাকত ; তাঁরা জনসাধারণেরই এক অংশ ছিলেন। সপ্তম গ্রেগরি তাঁদের ব্রহ্মচারী করলেন ; রোমের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ রাখতে তিনি ধর্মযাজকদের জনসাধারণের অন্তরঙ্গ হতে নিষেধ জানালেন, কিন্তু কার্যত জনসাধারণ ও গির্জার মধ্যে তিনিই এক ফাটলের সৃষ্টি করলেন। গির্জার নিজের আইন ও আদালত ছিল। শুধু যে ধর্মযাজকদের সংক্রান্ত মামলারই এখানে বিচার হত তা নয়, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, ছাত্র, ক্রুসেডার, বিধবা, মাতৃ-পিতৃহীন বালক-বালিকা এবং সহায়সম্বলহীনদের মামলারও এই আদালতেই বিচার হত—এমনকি উইল, বিবাহ, শপথ, প্রেত-বিদ্যা, ধর্মমতের বিরুদ্ধাচার ও ঈশ্বরনিন্দা প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলারও স্থান ছিল এই আদালতে। জনসাধারণের কারো যখন ধর্মযাজকের সঙ্গে বিরোধ হত, তখনও তাকে যেতে হত এই গির্জার আদালতে। জনসাধারণের কাঁধেই যুদ্ধ ও শান্তির সবকিছু দায় পড়ত এবং ধর্মযাজকেরা ছিলেন এসব ব্যাপারে একেবারে মুক্ত। খৃষ্টজগতে ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা বিন্দুমাত্রও আশ্চর্যের নয়।

এ-কথা রোম কখনো বুঝতে পারে নি যে তার শক্তি নিহিত আছে জনসাধারণের সমর্থনে। জনসাধারণের ধর্মোৎসাহের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ না করে রোম তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, এবং আন্তরিক সন্দেহ ও অস্পষ্ট মতবাদের উপর জোর করে অনুশাসনের গোঁড়ামি চাপিয়ে দিয়েছিল। যখন গির্জা মানুষের নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা গলাত, তখন জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ

করত ; কিন্তু ধর্মানুশাসনের ব্যাপারে কখনো তা পায় নি। যখন ওয়াল্ডো দক্ষিণ ফ্রান্সে যিশুর জীবন ও বিশ্বাসের সরলতায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, তখন পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট ওয়াল্ডোর শিষ্য-সম্প্রদায় ওয়াল্ডেনদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং তাদের দমন করার জন্ম আগুন, তরবারি, ধর্ষণ এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য অত্যাচার করতে অনুমতি দিলেন। আবার যখন আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস (১১৮১-১২২৬) খৃষ্টের অনুসরণ এবং দরিদ্র ও জনসেবাকর জীবনযাপন প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর অনুচরবৃন্দ কর্তৃক ফ্রান্সিস্কানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, কষাঘাত, কারাগারে নিক্ষেপ এবং ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল। অন্যদিকে সেণ্ট ডোমিনিক (১১৭০-১২২১) প্রতিষ্ঠিত ডোমিনিকান নামে অসহ্য ধর্ম-গোঁড়ামি তৃতীয় ইনোসেণ্ট বিশেষভাবে সমর্থন করেন এবং এই দলের সাহায্যে তিনি ইনকুইজিশন নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম-বিরুদ্ধতা ও স্বাধীন চিন্তার অপরাধে লোকদের ধরে শাসন করতেন।

সুতরাং গির্জাই তার অযৌক্তিক দাবি, অন্যায্য অধিকার এবং বিবেকহীন অসহিষ্ণুতা দিয়ে সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়, অথচ তা-ই ছিল তার শক্তির চরম উৎস। তার পতনের জন্য বাইরের কোন শত্রু দায়ী নয়, তার নিজের আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ই একমাত্র দায়ী।

বিরুদ্ধাচারী রাজা ও বিরাট ধর্ম-বিরোধ

সমস্ত খৃষ্টজগতের নেতৃত্ব-লাভের সংগ্রামে রোম্যান গির্জার একটি খুব বড় ত্রুটি ছিল তার পোপ-নির্বাচনের বিধি।

যদি বাস্তবিকই পোপ তাঁর সুস্পষ্ট উচ্চাভিলাষ লাভ এবং সমস্ত খৃষ্টজগতে এক শাসন এবং এক শান্তি-প্রতিষ্ঠা চাইতেন, তবে তার কঠিন সুদৃঢ় এবং অনবচ্ছিন্ন পরিচালনার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই স্বর্ণ সুযোগের দিনে সকলের আগে এই প্রয়োজন ছিল যে, যিনি পোপ হবেন যৌবনে তাঁকে পারদর্শী হতে হবে, প্রত্যেক পোপেরই ভাবী-উত্তরাধিকারী নির্বাচিত থাকবেন যাঁর সঙ্গে তিনি গির্জার শাসন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং পোপ-নির্বাচনের রীতি ও নীতি থাকবে সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এর কোনটিই কার্যকরী ছিল না। পোপের নির্বাচনে কে যে ভোট দিতে পারে কিংবা এই ব্যাপারে বাইজাণ্টাইন বা পবিত্র রোম-সম্রাটের কোনও মতাধিকার ছিল কি না—তাও কখনো পরিস্ফুট ছিল না। এই নির্বাচন বিধিবদ্ধ করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ হিল্ডেব্র্যাণ্ড (পোপ সপ্তম গ্রেগরি,

১০৭৩-৮৫) অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এই ভোট-প্রদানের ক্ষমতা তিনি রোম্যান কার্ডিন্যাল বা উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং সম্রাটের ক্ষমতাকে হ্রাস করে ধর্মযাজকদের নির্বাচনে সম্মতি-জ্ঞাপন পর্যন্তই মাত্র রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি ভাবী-উত্তরাধিকারীর কোন ব্যবস্থা করেন নি এবং কার্ডিন্যালদের মতদ্বৈধতা উপস্থিত হলে—কয়েক ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল—এক বা একাধিক বছর পোপের পদ শূন্য রাখার বিধি করে গেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পোপ-সাম্রাজ্যের সমগ্র ইতিহাসে সুস্পষ্ট সংজ্ঞার এই অভাবের পরিণতি আমরা দেখব। প্রায় একেবারে প্রথম থেকেই নির্বাচন-বিরোধ শুরু হয় এবং দুই বা ততোধিক লোক নিজেকে পোপ বলে দাবি করেন। এই বিবাদের মীমাংসার জন্য কোন সম্রাট বা বাইরের কোন বিচারকের শরণাপন্ন হওয়ার মত অপমানকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক বড় পোপের কার্যকাল শেষ হত এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর মুণ্ডহীন দেহের মত গির্জা অকার্যকরী হয়ে পড়ত, কিংবা হয়ত তাঁর এক পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এসে বসতেন শুধুমাত্র তাঁকে সর্বসমক্ষে নিন্দনীয় ও হেয় প্রতিপন্ন করতে বা তাঁর কাজকে নষ্ট করতে। কিংবা হয়ত মৃত্যুপথযাত্রী এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।

পোপের দপ্তরে এরকম অদ্ভুত দুর্বলতার ফলে এটা স্বাভাবিক যে,বিভিন্ন জার্মান ও ফরাসী রাজারা বা ইংল্যাণ্ডের নরম্যান ও ফরাসী অধিপতি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন বা তাঁরা এই নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবেন এবং নিজেদের স্বার্থের জন্য রোমের ল্যাটেরান প্রাসাদে নিজের মনোমত পোপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন। ইউরোপীয় ঘটনাবলীতে যখনই কোন পোপ বেশি শক্তিশালী বা প্রাধান্য লাভ করেছেন, তখনই এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে। ফলে পোপেরা যে দুর্বল এবং নগণ্য হবেন, তাতে আর এমন আশ্চর্য কী! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই খুব কৃতবিদ্য এবং সাহসী ছিলেন।

এই মহান যুগের পোপদের মধ্যে তৃতীয় ইনোসেণ্ট (১১৯৮-১২১৬) একজন খুব শক্তিমান ও বিশিষ্ট পোপ ছিলেন এবং ভাগ্যবলে আটত্রিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি পোপ হতে পেরেছিলেন। তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের আরো অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক এক ব্যক্তিত্ব, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে বলা হত Stupor mundi বা পৃথিবীর আশ্চর্য! রোমের বিরুদ্ধে এই সম্রাটের সংগ্রাম ইতিহাসের একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত রোম তাঁকে পরাজিত করে এবং তাঁর বংশ ধ্বংস করে; কিন্তু তিনি পোপ

ও তাঁর গির্জার মর্যাদায় এমন ঘা দেন যে সেই ঘা ক্রমে পচে উঠে পোপের মর্যাদা চিরকালের জন্য ধূলিসাৎ করে দেয়।

ফ্রেডেরিক ছিলেন সম্রাট ষষ্ঠ হেনরির পুত্র এবং তাঁর মা ছিলেন সিসিলির নর্ম্যান রাজা প্রথম রোজারের কন্যা। তাঁর মাত্র চার বছর বয়সে তিনি এই রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন। তৃতীয় ইনোসেণ্টকে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। সে সময় সিসিলি সবেমাত্র নরম্যানদের অধিকারভুক্ত হয়েছে; রাজ-দরবার ছিল অর্ধ-প্রাচ্য; এবং অনেক উচ্চশিক্ষিত আরব সেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে শিশু-রাজার শিক্ষার ভার পড়েছিল। তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কাছে পরিস্ফুট করা নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন ছিল। তিনি মুসলমান-চোখে খৃষ্টধর্ম এবং খৃষ্টান-চোখে ইসলাম ধর্মের মর্ম বুঝতে পেরে-ছিলেন, এবং এই দুই রীতির শিক্ষার মিশ্রণে সেই ধর্ম-বিশ্বাসের যুগে অস্বাভাবিক এক অপ্রীতিকর ধারণা তাঁর মনে জাগল যে, সমস্ত ধর্মই ভণ্ডামি। দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা তিনি সকলকে বলে বেড়াতেন এবং তাঁর ধর্ম-বিরুদ্ধতা ও ঈশ্বর-নিন্দার কথা লিপিবদ্ধ আছে।

বড় হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে তাঁর অভিভাবকের বিরোধ বেধে উঠল। তৃতীয় ইনোসেণ্ট ফ্রেডেরিকের কাছ থেকে অত্যন্ত বেশি রকমের কিছু আশা করেছিলেন। ফ্রেডেরিকের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণের সময় পোপ কয়েকটি সর্ত তুলে বাধা দিলেন। জানালেন, ফ্রেডেরিকের ধর্ম-বিরুদ্ধতা জার্মানিতে কঠিন হাতে দমন করতে হবে। তা ছাড়া তাঁকে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালির রাজত্ব ত্যাগ করতে হবে, কেন না নয়ত তিনি পোপের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়বেন। এবং জার্মান ধর্মযাজকেরা কোন রকম রাজস্ব দেবেন না। ফ্রেডেরিক সম্মত হলেন—কিন্তু এই সত্য পালনের কোন সদিচ্ছাই তাঁর ছিল না। পোপ ইতি-মধ্যেই ফ্রান্সের রাজাকে তাঁর নিজের প্রজা ওয়ালডেন্সদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর রক্তস্রাবী ক্রুসেডে লিপ্ত করেছিলেন; এখন তিনি ফ্রেডেরিকও যাতে জার্মানিতে তাই করেন তা তিনি চাইলেন। কিন্তু পোপের অনুগ্রহ-লাভে ধন্য অন্য রাজাদের চেয়ে ফ্রেডেরিক অনেক বেশি অধার্মিক ছিলেন বলে ধর্ম-যুদ্ধে তাঁর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না। আবার যখন পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করে জেরুজালেম অধিকার করার জন্য তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলেন বটে. কিন্তু কাজের দিকে একটুও অগ্রসর হলেন না।

রাজমুকুটে অভিষিক্ত হয়ে ফ্রেডেরিক সিসিলিতেই রয়ে গেলেন। তিনি বাসস্থান হিসাবে জার্মানির চেয়ে সিসিলিকেই বেশি পছন্দ করতেন এবং তৃতীয়

ইনোসেণ্টের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোন সত্য রক্ষা করতেই তাঁর উৎসাহ দেখা গেল না। ব্যর্থমনোরথ তৃতীয় ইনোসেণ্ট ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মারা গেলেন।

ইনোসেণ্টের পর তৃতীয় অনোরিয়স ফ্রেডেরিককে এঁটে উঠতে পারলেন না এবং নবম গ্রেগরি (১২২৭) পোপের সিংহাসনে আরূঢ় হলেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, যে করেই হোক এই যুবককে দেখে নিতে হবে। তিনি তাঁকে সমাজচ্যুত করলেন। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ধর্মের সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেন। সিসিলির অর্ধ-আরব রাজ-সভায় এই ব্যাপার তাঁর কোনরকম অসুবিধার কারণ হয় নি। পোপ আবার এই সম্রাটকে তাঁর সমস্ত পাপ (যা অনস্বীকার্য), তাঁর ধর্ম-বিমুখতা এবং তাঁর সাধারণ দুশ্চরিত্রতার কথা উল্লেখ করে এক খোলা চিঠি দেন। এর উত্তরে ফ্রেডেরিক অত্যন্ত নৃশংস তৎপরতার সঙ্গে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই চিঠি ইউরোপের সমস্ত রাজাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়,—পোপ ও রাজাদের মধ্যে বিরোধের কারণ সম্বন্ধে এইটিই হল প্রথম সুস্পষ্ট বিবরণী। সমগ্র ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার পোপের দুর্দম আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তীব্র কশাঘাত করলেন। পোপের এই অনধিকার-দখলের বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত রাজাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব জানান। রাজাদের দৃষ্টি তিনি বিশেষভাবে গির্জার ঐশ্বর্যের উপরে দিতে বললেন।

এই মৃত্যুবাণ ছেড়ে ফ্রেডেরিক তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্বের প্রতিজ্ঞা-মত ক্রুসেডে যেতে মনস্থ করলেন। এটি হল ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২২৮)। ক্রুসেড হিসাবে এটি ছিল কৌতুককর। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক মিশরে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই দুই ধর্ম-অবিশ্বাসী ভদ্রলোক বন্ধুত্বপূর্ণ মতের আদান-প্রদান ও পরস্পরের সুবিধাজনক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করলেন এবং মিশর-সম্রাট ফ্রেডেরিকের কাছে জেরুজালেম হস্তান্তর করতে সম্মত হলেন। এ বাস্তবিক এক নতুন ধরনের ধর্মযুদ্ধ, ব্যক্তিগত সন্ধি-স্থাপনের মধ্য দিয়ে ক্রুসেড। এই ক্রুসেডে রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিজয়ী বীরের প্রবেশ কিংবা অত্যধিক আনন্দে ক্রন্দন ছিল না। এই অত্যাশ্চর্য ক্রুসেড-বিজয়ী সমাজচ্যুত ছিলেন বলে স্বহস্তে বেদী থেকে রাজমুকুট স্বমস্তকে ধারণ করে জেরুজালেমের রাজা হিসাবে সম্পূর্ণ এক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—কারণ তিনি জানতেন যে কোন ধর্মযাজকই তাঁকে অভিষিক্ত করতে আসবে না। তারপর তিনি ইটালিতে ফিরে তাঁর রাজ্য-আক্রমণকারী পোপের সেনাবাহিনীকে তাড়া করে তাদের রাজ্যে হটিয়ে দিলেন এবং তাঁর সমাজচ্যুতির আজ্ঞা তুলে নিতে আদেশ করে পোপকে অনুগৃহীত করলেন। ত্রয়োদশ

শতাব্দীতে যে-কোন রাজা এই ভাবে পোপের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সামান্যতম ক্রোধ বা আন্দোলন হয় নি। সে দিন অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে নবম গ্রেগরি ফ্রেডেরিকের সঙ্গে আবার সংগ্রাম শুরু করলেন, দ্বিতীয়বার তাঁকে সমাজচ্যুত করলেন এবং যে প্রকাশ্য গালাগাল ও অপবাদের সংগ্রামে পোপ ইতিপূর্বে বিশ্রীভাবে হেরে গেছিলেন, তা-ই আবার চালাতে লাগলেন। নবম গ্রেগরির মৃত্যুর পর চতুর্থ ইনোসেন্ট পোপ হলে আবার এই বিরোধ উজ্জীবিত হয়, এবং আবার গির্জার বিরুদ্ধে ফ্রেডেরিক এক চরম বিধ্বংসী পত্র লেখেন, যা মানুষ চিরকালের জন্য মনে রাখতে বাধ্য। তিনি ধর্মযাজকদের অধর্ম এবং ঔদ্ধত্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করে জানালেন যে, সে-যুগের সমস্ত অন্যায় ও পাপের মূল তাদের অহঙ্কার ও ঐশ্বর্য। গির্জার মঙ্গলের জন্য গির্জার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য তিনি ইউরোপের সমস্ত রাজার কাছে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব পরবর্তী যুগে কোনদিন ইউরোপের রাজারা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

আমরা তাঁর শেষ জীবনের কাহিনী বলব না। সমগ্র দেশের সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা অকিঞ্চিৎকর। সিসিলিতে তাঁর রাজসভার খণ্ড খণ্ড ঘটনা গ্রথিত করে একটা কিছু দাঁড় করানো যায়। তিনি অত্যন্ত ভোগবিলাসী ও সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। তাঁকে উচ্ছৃঙ্খলও বলা হয়েছে। কিন্তু এটুকুও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি তাঁর রাজসভায় ইহুদী, মুসলমান ও খৃষ্টান দার্শনিক এনে রেখেছিলেন এবং ইটালিতে সারাসেনীয় প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে আরবী সংখ্যা ও বীজগণিত ইউরোপের শিক্ষিত-মহলে চালু হয় এবং তাঁর রাজসভায় দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মাইকেল স্কট ছিলেন। ইনি অ্যারিস্টটল ও তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী দার্শনিক কর্ডোবার অ্যাভেরোয়েসের সটীক সমালোচনা অনুবাদ করেন। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডেরিক নেপল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সালের্নো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মেডিক্যাল স্কুলকে আরো বড় এবং বিরাট করে তোলেন। তা ছাড়া তিনি একটি চিড়িয়াখানাও স্থাপন করেন। তিনি পাখি শিকার সম্বন্ধে এক বই লিখে যান,—পাখিদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিরাট জ্ঞানের পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যায়। ইতালীয়দের মধ্যে ইতালীয় ভাষায় প্রথম কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সত্য কথা বলতে গেলে, ইতালীয় কাব্য তাঁর রাজসভায় জন্মগ্রহণ করে। জনৈক সুদক্ষ ঐতিহাসিক

তাঁকে 'আধুনিকদের মধ্যে প্রথম' বলেছেন ; এই কথাটির মধ্য দিয়ে তাঁর মননশীলতার নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের রাজার ক্রমবর্ধমান শক্তির সম্মুখীন যখন পোপেরা হলেন, তখনই তাঁদের এতদিনকার সমস্ত শক্তির চরম ধ্বংস সূচিত হল। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের জীবদ্দশাতেই জার্মানি ঐক্যহীন হয়ে পড়ে, এবং হোহেনস্টাউফেন-বংশীয় রাজাদের সঙ্গে বিবদমান পোপদের রক্ষক সমর্থক ও প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় ফ্রান্সের রাজা অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। পর পর সমস্ত পোপই ফ্রান্সের রাজাদের সমর্থন করার নীতি তখন গ্রহণ করেন। রোমের সমর্থন ও মতানুসারে সিসিলি ও নেপল্‌সে ফরাসী রাজা প্রতিষ্ঠিত হন এবং ফরাসী রাজারা শার্লমেঁর সাম্রাজ্য পুনরধিকার ও শাসনের সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু হোহেনস্টাউফেন বংশের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুতে জার্মানিতে অরাজকতার পর হাবস্‌বুর্গের রুডল্‌ফ যখন প্রথম হাবস্‌বুর্গ বংশের সম্রাট নির্বাচিত হলেন (১২৭৩), তখন বিভিন্ন পোপের মতানুযায়ী পোপের সহানুভূতি একবার ফ্রান্স ও একবার জার্মান রাজার উপর বর্ষিত হতে লাগল। প্রাচ্যে ১২৬২ খৃষ্টাব্দে গ্রীকরা ল্যাটিন সম্রাটদের কাছ থেকে কনস্ট্যান্টিনোপল পুনরধিকার করে নিলেন এবং নতুন গ্রীক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল পালিওলোগাস বা অষ্টম মাইকেল পোপের সঙ্গে মীমাংসার অন্তঃসারহীন প্রচেষ্টা প্রদর্শনের পর একেবারে রোম্যান ধর্ম-সমাজ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, এবং তার সঙ্গে ও এশিয়ায় ল্যাটিন রাজত্ব অবসানে প্রাচ্যে পোপের সমস্ত প্রভুত্ব নিঃশেষিত হল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে বনিফেস পোপ হলেন। তিনি ছিলেন ইতালীয়, ফরাসী-বিদ্বেষী এবং রোমের বিরাট ঐতিহ্য ও আদর্শে বিশ্বাসী। কিছুদিন তিনি যথেচ্ছাচার চালালেন। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এক জুবিলি-উৎসব অনুষ্ঠিত করলেন এবং অসংখ্য তীর্থযাত্রী রোমে উপস্থিত হল। 'পোপের অর্থভাণ্ডারে এত বেশি অর্থের আমদানি হতে লাগল যে দুজন সহকারী সেণ্ট পিটারের সমাধিস্থান থেকে তীর্থযাত্রীদের অর্থার্ঘ্য-সংগ্রহে সব সময় ব্যস্ত ছিলেন।' * কিন্তু এই উৎসব ছিল ভ্রান্ত বিজয়োৎসব। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে বনিফেসের ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল এবং ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ফ্রান্সের সম্রাটকে সমাজচ্যুত করার ঘোষণা করতে যাবেন, সে সময় হঠাৎ অনাগ্নিতে তাঁর পৈতৃক প্রাসাদে গিলোম দ্য নগারেত হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাঁকে বন্দী করেন। ফ্রান্সের রাজার এই অনুচর জোর করে প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং ভীত পোপের শয়নকক্ষে উপস্থিত হন—পোপ তখন হাতে ক্রুশ

* জে. এইচ. রবিনসন

নিয়ে শয্যায় শায়িত ছিলেন। গিলোম তাঁকে ভীতি প্রদর্শন ও অপমান করেন। শহরের লোকেরা দু-একদিন বাদে পোপকে মুক্ত করে রোমে পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু সেখানেও আবার অর্সিনি-পরিবার তাঁকে বন্দী করে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যর্থ-মনোরথ ও অপমানাহত বৃদ্ধ বন্দীদশায় মারা যান।

অনাগ্নির অধিবাসীরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বনিফেসকে মুক্ত করার জন্য নগারেতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সত্য, কিন্তু অনাগ্নি ছিল পোপের জন্ম-শহর। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সের রাজা তাঁর দেশের সমস্ত লোকের অনুমতি নিয়েই খৃষ্টধর্ম-রাজ্যের প্রধানের সঙ্গে এই বিশ্রী ব্যবহার করেছেন; এইরকম চরম কাজে হাত দেওয়ার আগে তিনি ফ্রান্সের তিন দলের (জমিদার, গির্জা ও জনসাধারণ) সভা আহ্বান করে তাদের সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করেন। পোপকে এভাবে নিগৃহীত করায় ইটালি, জার্মানি কিংবা ইংলণ্ডের কোথাও সামান্যতম প্রতিবাদও হয় নি। সমস্ত লোকের মন থেকে খৃষ্ট ধর্মরাজ্যের ধারণা অন্তর্হিত হয়ে গেছিল।

সমগ্র চতুর্দশ শতাব্দী ধরে পোপেরা তাঁদের নৈতিক রাজত্ব পুনরধিকারের একটুও চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী পোপ পঞ্চম ক্লেমেণ্ট ছিলেন ফরাসী এবং ফ্রান্সের সম্রাট রাজা ফিলিপের নির্বাচিত। তিনি কোনদিন রোমে যান নি। তিনি তাঁর সভা আভিগ্নন শহরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শহরটি ফ্রান্সের অভ্যন্তরে অবস্থিত হলেও ফরাসী রাজার অধিকারে ছিল না, ছিল পোপের অধিকারে। তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখানে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন, তারপর পোপ একাদশ গ্রেগরি রোমে ভ্যাটিকান প্রাসাদে ফিরে যান। কিন্তু একাদশ গ্রেগরি তাঁর সঙ্গে সমস্ত ধর্মযাজকের সহানুভূতি নিয়ে যেতে পারেন নি। কার্ডিন্যালদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ফরাসী এবং তাঁদের আচার-ব্যবহার সব কিছুই আভিগ্ননের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে একাদশ গ্রেগরির মৃত্যুর পর যখন একজন ইতালীয়, ষষ্ঠ আর্বান পোপ নির্বাচিত হলেন তখন এই বিক্ষুব্ধ কার্ডিন্যালরা এই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে পোপ-বিদ্বেষী সপ্তম ক্লেমেণ্টকে আর-এক পোপ নির্বাচিত করলেন। এই ভাঙনকেই বলা হয় The Great Schism বা ধর্ম নিয়ে অবান্তর বিরাট মতভেদ। পোপেরা রোমেই রইলেন, এবং সমস্ত ফরাসী-বিদ্বেষী শক্তি—রোম-সম্রাট, ইংল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড ও উত্তর ইউরোপের রাজারা তাঁদের প্রতি অনুগত রইলেন। পোপ-বিদ্বেষীরা কিন্তু রইলেন আভিগ্ননে এবং তাঁদের সমর্থন করলেন ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল ও বিভিন্ন জার্মান রাজারা। প্রত্যেক পোপই তাঁর বিরোধী দলের প্রত্যেককে সমাজচ্যুত করতেন এবং অভিশাপ দিতেন (১৩৭৮—১৪১৭)।

ইউরোপের লোকদের পক্ষে কি তখন নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না করা আর সম্ভব ?

নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী এই গির্জাকে রক্ষা বা ধ্বংস করতে যে-সব নতুন শক্তির খৃষ্টরাজ্যে অভ্যুদয় হচ্ছিল, তাদের মধ্যে ফ্রান্সিস্কান ও ডোমিনিকানদের কথা আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলেছি। গির্জা এই দুই দলকে নিজের দলে নিয়ে আসতে পেরেছিল, যদিও প্রথমটির উপর সামান্য জুলুম করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য শক্তি ছিল আরও স্পষ্ট সমালোচক ও অবাধ্য। দেড় শতাব্দী পরে এলেন উইক্লিফ (১৩২০-৮৪)। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন সুপণ্ডিত ডাক্তার। তাঁর জীবনের প্রায় শেষভাগে তিনি ধর্মযাজকদের অসাধুতা ও গির্জার অজ্ঞানতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সমালোচনা করতে শুরু করেন। তিনি বেশ কয়েকজন দরিদ্র ধর্মযাজক একত্রিত করে (তাঁদের উইক্লিফাইট বলা হত) তাঁর আদর্শ সমগ্র ইংল্যাণ্ডে প্রচার করেন, এবং যাতে গির্জাকে ভাল করে লোকে চিনতে পারে তার জন্য বাইবেল ইংরিজিতে অনুবাদ করেন। তিনি সেণ্ট ফ্রান্সিস বা সেণ্ট ডোমিনিকের চেয়ে অনেক বেশি পণ্ডিত ছিলেন এবং সাধারণের মধ্যেও তাঁর অনেক শিষ্য ছিল; এবং যদিও রোম তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করতে আদেশ দেয়, তিনি মারা যান স্বাধীন নাগরিক হিসাবে। কিন্তু যে পুরাতন পাপ ক্যাথলিক গির্জাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাঁর অস্থিগুলিকে কবরে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অব কনস্ট্যান্সের আদেশে তাঁর অস্থি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই আদেশ দেন পোপ পঞ্চম মার্টিন এবং কার্যকরী করেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বিশপ ফ্লেমিং। এই অপবিত্র কাজ কোন এক উন্মাদের কীর্তি নয়; এটি ছিল রোম গির্জার সরকারী কীর্তি।

মঙ্গোল বিজয়

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপে খৃষ্ট ধর্মরাজ্যকে পোপের শাসনাধীনে একত্র করবার অদ্ভুত ব্যর্থ সংগ্রাম চলছিল, তখন এশিয়ার বিরাট পটভূমিতে আরও অনেক বড় ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। উত্তর চীনের এক দেশ থেকে একদল তাতার হঠাৎ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইতিহাসে অদ্বিতীয় বিজয়-সাফল্য অর্জন করে। এরা ছিল মঙ্গোল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এরা ছিল যাযাবর অশ্বারোহীর দল; পূর্ববর্তী হুনদের মতই তাদের জীবনযাত্রা ছিল, খেত মাংস আর ঘোড়ার দুধ এবং বাস করত চামড়ার তাঁবুতে। চীনের হাত থেকে

মুক্ত হয়ে তারা অন্যান্য কয়েকটি উপজাতির সঙ্গে সামরিক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। সাইবেরিয়ায় ওনন নদীর তীরে ছিল তাদের কেন্দ্রীয় শিবির।

এই সময় চীনে ভাঙন ধরেছে। দশম শতাব্দীতে মহান তাঙ বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধান্তে তিনটি প্রধান সাম্রাজ্য হয়েছে: উত্তরে কিন্ সাম্রাজ্য—পিকিং তার রাজধানী, দক্ষিণে সুঙ্ সাম্রাজ্য—রাজধানী নানকিং এবং মধ্যে হ্সিয়া সাম্রাজ্য। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে এই মঙ্গোলদের দলপতি জেঙ্গিস খাঁ কিন্ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পিকিং অধিকার করেন (১২১৪)। তারপর পশ্চিম দিকে ফিরে পশ্চিম তুর্কীস্থান, পারস্য, আর্মেনিয়া, লাহোর পর্যন্ত ভারত এবং হাঙ্গারি ও সাইলেসিয়া পর্যন্ত দক্ষিণ রাশিয়া জয় করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নীপার নদী পর্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রভু ছিলেন।
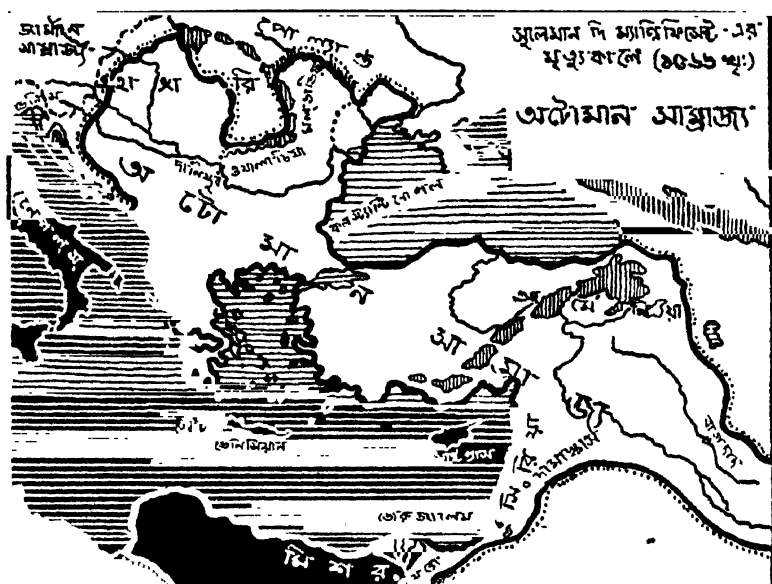
তাঁর উত্তরাধিকারী ওগদাই খাঁ মঙ্গোলিয়ার কারাকোরামে এক স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করে এই আশ্চর্য বিজয়-অভিযান চালিয়ে গেলেন। তাঁর সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিপুণ ছিল এবং তাদের কাছে ছিল চীনা-আবিষ্কার—বারুদ, এবং তারা তা গাদা-বন্দুকে ব্যবহার করত। তিনি কিন্ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করলেন এবং তারপর এক অচিন্তনীয় অভিযানে ঝড়ের গতিতে এশিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশ পদানত করলেন (১২৩৫)। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কিয়েভ ধ্বংস হয় এবং প্রায় সমস্ত রাশিয়া মঙ্গোলদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। পোল্যাণ্ড বিধ্বংস

হয় এবং পোল ও জার্মানদের এক মিশ্র বাহিনী ১২৪১ খৃষ্টাব্দে নিম্ন-সাইলেসিয়ার অন্তর্গত লীগনিৎসের যুদ্ধে একেবারে বিধ্বস্ত হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, মনে হয়, এই অভিযাত্রী দলকে বাধা দেবার কোনরকম চেষ্টা করেন নি।

গিবনের Decline and Fall of the Roman Empire-এর টীকায় ব্যারি বলেন, '১২৪১ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোল বাহিনীর পোল্যাণ্ড ধ্বংস এবং হাঙ্গারি-অধিকারের জন্য দায়ী ছিল তাদের চমকপ্রদ রণ-চাতুর্য, শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়—এ কথা খুব সম্প্রতি ইউরোপের ইতিহাস অনুধাবন করতে শিখেছে। কিন্তু এই ঘটনা সর্বসাধারণে আজও জানে না; আজও সকলের এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে অসভ্য ও বর্বর তাতাররা সর্বত্র জয়ী হয়েছিল শুধু তাদের অগণ্য সৈন্য-সংখ্যায় এবং সেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার ভারেই তারা সমস্ত বাধা সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিল।

মৃত্যুর সময় জেঙ্গিস্ খাঁর সাম্রাজ্য (১২২৭).

'নিম্ন ভিস্টুলা থেকে ট্রান্সিলভেনিয়া পর্যন্ত সমস্ত অভিযানের পরিকল্পনা কী সুন্দর সময়-নিষ্ঠা এবং ঈপ্সিত ফলদায়ী হিসাবে রচিত হয়েছিল, কল্পনা করতেও আশ্চর্য বোধ হয়। এরকম এক অভিযান সে-যুগের যে-কোন ইউরোপীয় সেনাপতির পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। সুবুতাইয়ের কাছে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক থেকে শুরু করে সমস্ত ইউরোপীয় সেনাপতি রণচাতুর্যে শিক্ষানবীশ ছিলেন। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে হাঙ্গারির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক

জ্ঞান সঞ্চয় করেই মঙ্গোলরা তাদের অভিযানে ব্রতী হয়—সমস্ত সংবাদ তারা আহরণ করে সুসংগঠিত এক গুপ্তচর-চক্রের মাধ্যমে ; অন্যদিকে শিশু-সুলভ বর্বরদের মত হাঙ্গারিয় কিংবা অন্যান্য খৃষ্টান শক্তি তাদের শত্রুদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানত না।'

কিন্তু মঙ্গোলরা লীগনিৎসে জয়ী হয়েও পশ্চিমমুখী অভিযান আর চালায় নি। তারা অরণ্য ও পার্বত্যভূমির মধ্যে এসে পড়েছিল, এরকম দেশে তাদের কৌশল খুব ফলপ্রদ ছিল না ; তাই তারা দক্ষিণ দিকে ফিরে হাঙ্গারিতে বসবাস করবার ব্যবস্থা করল। ম্যাগিয়াররা যেমন ইতিপূর্বে আভার ও হুনদের হত্যা এবং নিশ্চিহ্ন করে হাঙ্গারিতে তাদের বাসের পত্তন করে, মঙ্গোলরাও ম্যাগিয়ারদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করে। পঞ্চম শতাব্দীতে যেমন হুন, সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে আভার এবং নবম শতাব্দীতে হাঙ্গারীয়রা যেমন পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অভিযান চালায়, মঙ্গোলরাও তেমনি হাঙ্গারীয় সমতলভূমি থেকে সেইরকম অভিযান শুরু করল। কিন্তু ওগদাই হঠাৎ মারা গেলেন। উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় এই অপরাজিত মঙ্গোল দল হাঙ্গারি ও রুমানিয়া ছেড়ে পুব দিকে ফিরে যেতে লাগল।

এর পর মঙ্গোলরা তাদের বিজয়-অভিযান এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তারা সুঙ সাম্রাজ্য অধিকার করে। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মঙ্গু খাঁ ওগদাই খাঁর মৃত্যুতে প্রধান খাঁ নির্বাচিত হন এবং তাঁর ভাই কুবলাই খাঁ চীনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি য়ুয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ-বংশ ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করে। চীনে যখন সুঙ বংশের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল, তখন মঙ্গুর আর-এক ভাই, হলাগু, পারস্য ও সিরিয়া-বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় মঙ্গোলরা ইসলামের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিল। তারা যে বাগদাদ অধিকারের পর অধিবাসীদের হত্যা করেই শুধু ক্ষান্ত হয় তা নয়, যে অবিস্মরণীয় সেচ-প্রণালী মেসোপটেমিয়াকে সুমেরিয়ার আদি যুগ থেকে প্রচুর ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং জনবহুল করে তুলেছিল, তা ধ্বংসের কাজেও তারা লিপ্ত হল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়া ধ্বংসাবশেষের এক মরুভূমি, তার জনসংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। মিশরে মঙ্গোলরা অনুপ্রবেশ করতে পারে নি ; ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মিশরের সুলতান প্যালেস্টাইনে হলাগুর এক সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন।

এই বিপর্যয়ের পর মঙ্গোল-বিজয়ে ভাঁটা পড়ে। প্রধান খাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে অনেকগুলি পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়। চীনাদের মত প্রাচ্যের মঙ্গোলরা বৌদ্ধ হয়, পশ্চিমের মঙ্গোলরা হয় মুসলমান। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে চীনারা য়ুয়ান বংশের রাজত্ব

ধ্বংস করে দেশজ মিন বংশ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই বংশ ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করে। রাশিয়া দক্ষিণ-পূর্বের তৃণ-অঞ্চলের তাতারদের ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর দিত, কিন্তু মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক পরাধীনতা অস্বীকার করেন এবং বর্তমান রাশিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে জেঙ্গিস খাঁর এক বংশধর তাইমুরলেনের অধীনে অল্প সময়ের জন্য আবার মঙ্গোল শক্তির অভ্যুদয় হয়। তিনি পশ্চিম তুর্কীস্থানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে 'মহান খাঁ' উপাধি গ্রহণ করে সিরিয়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত অধিকার করেন। তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর আর টেকে নি। কিন্তু ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এই তাইমুরেরই এক বংশধর, বাবর নামে এক বীর যোদ্ধা বন্দুকধারী এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে ভারতের সমতলভূমি অধিকার করে নেন। তাঁর পৌত্র আকবর (১৫৫৬—১৬০৫) এই বিজয়-অভিযান সম্পূর্ণ করেন এবং এই মঙ্গোল (কিংবা আরবদের মতে 'মোগল') বংশ দিল্লীতে থেকে অধিকাংশ ভারতের উপর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল-বিজয়ের প্রথম কিস্তির অন্যতম পরিণাম হয় এই যে, আটোমান তুর্কী নামে এক তুর্কী উপজাতি তুর্কীস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারা শক্তি সঞ্চয় করে এশিয়া মাইনরে তাদের রাজত্ব প্রসার করতে লাগল, দার্দানেলস অতিক্রম করে ম্যাসিডোনিয়া, সার্বিয়া ও বুলগারিয়া আক্রমণ করল। শেষ পর্যন্ত আটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে দখল করে। এই ঘটনায় ইউরোপে প্রচুর উত্তেজনার সঞ্চার হয়, এবং ক্রুসেডের কথাও ওঠে; কিন্তু ক্রুসেডের যুগ তখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সুলতানেরা বাগদাদ, হাঙ্গারি, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ জয় করেন এবং নৌ-বলে তাঁরা ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাঁরা প্রায় ভিয়েনা অধিকার করে নেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে কর আদায় করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান সাম্রাজ্যের ভাঁটাকে ব্যাহত করে পুনরুজ্জীবনের জন্য দুটি বিষয় দায়ী। এক হল মস্কোর স্বাধীনতা (১৪৮০); অপরটি খৃষ্টানদের দ্বারা স্পেনের পুনরধিকার। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এই উপদ্বীপের শেষ মুসলমান রাজ্য গ্রানাডা আরাগনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁর রানী ক্যাস্টাইলের ইসাবেলার কাছে পরাজিত হয়।

কিন্তু ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের লেপান্টোর নৌ-যুদ্ধের আগে অটোমানদের অহঙ্কার চূর্ণ হয় নি এবং এই যুদ্ধই ভূমধ্যসাগরে খৃষ্টানদের আধিপত্য এনে দেয়।

ইউরোপীয় মনীষার পুনরুজ্জীবন

ইউরোপীয় প্রজ্ঞা যে তার সাহস ফিরে পাচ্ছিল এবং প্রথম গ্রীক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিংবা ইতালীয় লুক্রেশিয়াসের দর্শন-চর্চার চৈতন্যময় সাধনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সমগ্র দ্বাদশ শতাব্দী ধরে তার বহু লক্ষণ দেখা গেছে। এই পুনরুজ্জীবনের কারণ ছিল অনেক এবং জটিল। ঘরোয়া যুদ্ধের দমন, ক্রুসেডের পরবর্তী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চতর মান, এবং এইসব অভিযান-লব্ধ অভিজ্ঞতায় মানুষের মানসিক উদ্দীপনা নিঃসন্দেহে প্রথম ও অপরিহার্য কারণ ছিল। বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন হচ্ছিল, নগরীগুলি ফিরে পাচ্ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা; গির্জায় শিক্ষার মানের উন্নতিও হচ্ছিল এবং তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েও পড়ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী ছিল ক্রম-বর্ধমান স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন নগরীদের যুগ, যেমন ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, লিসবন, প্যারিস, ব্রুজেস, লণ্ডন, অ্যাণ্টওয়ার্প, হামবুর্গ, ন্যুরেমবুর্গ, নোভোগরদ, উইসবি ও বার্গেন। এরা ছিল প্রত্যেকটিই বাণিজ্য-নগরী ও এসব নগরীর প্রচুর লোক দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াত; এবং যে দেশের লোক বাণিজ্য ও ভ্রমণে রত তারা আলোচনা এবং চিন্তা করে। পোপ ও রাজাদের মধ্যে বিবাদ-বিতণ্ডা, ধর্মবিরোধীদের প্রতি অত্যাচারের সুস্পষ্ট বর্বরতা ও শয়তানি জনসাধারণকে গির্জার বৈধ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও আলোচনায় উৎসাহিত করত।

আমরা দেখেছি, আরবরা কেমন অ্যারিস্টটলকে ইউরোপে পুনঃপরিচিত করতে সাহায্য করেছিল এবং কেমন দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মত রাজার মাধ্যমে আরব্য দর্শন ও বিজ্ঞান পুনর্জাগর ইউরোপীয় চেতনাকে অভিভূত করেছিল। মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে প্রভাবান্বিত এর চেয়েও বেশি করেছিল ইহুদীরা। তাদের অস্তিত্বই ছিল গির্জার দাবির বিরুদ্ধে এক উদ্যত প্রশ্ন। এবং সবশেষে অ্যাল-কেমিস্টদের মনোমুগ্ধকর গোপন গবেষণা মানুষকে ফলিত-বিজ্ঞানের সাধনায় উৎসাহী করে তুলছিল।

মানুষের মনে এই ব্যাপক আলোড়ন এখন আর শুধু স্বাধীন ও সুশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানবজাতির এতদিনের অভিজ্ঞতায় এর আগে আর কোনদিন জনসাধারণের মন এত জাগ্রত হয় নি। ধর্মযাজক এবং তাদের অত্যাচার সত্ত্বেও খৃষ্টধর্মের অনুশাসন যেখানে যেখানে গেছে সেখানেই তা মানুষের মনকে মাতিয়ে তুলেছে। এই খৃষ্টধর্ম মানুষের বিবেক এবং সত্যশীল ঈশ্বরের মধ্যে এক স্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল, যার ফলে প্রয়োজন হলে রাজা ধর্মযাজক বা

যে-কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার নিজের বিচারবুদ্ধি প্রকাশে মানুষ সাহসী হয়ে উঠেছিল।

একাদশ শতাব্দীতেই ইউরোপে দর্শন-চর্চা পুনরায় শুরু হয় এবং প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোনা ও অন্যান্য কেন্দ্রে ক্রমবর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব জায়গায় পণ্ডিতেরা কথার মূল্য এবং অর্থ নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন তুলতেন এবং এইসব প্রশ্ন পরবর্তী বৈজ্ঞানিক যুগের পরিষ্কার চিন্তাধারার জন্য অপরিহার্য প্রাথমিক জ্ঞান বলে স্বীকৃত হয়। এদের মধ্যে অবিস্মরণীয় প্রতিভান্বিত অক্সফোর্ডের এক ফ্রান্সিস্কান, রোজার বেকন—আধুনিক ফলিত-বিজ্ঞানের জনক। আমাদের ইতিহাসে অ্যারিস্টটলের পরেই তাঁর নাম উল্লেখনীয়।

তাঁর রচনাবলী ছিল অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে উদ্যত এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। তিনি তাঁর যুগকে জানিয়েছিলেন যে তারা অজ্ঞান—সে-যুগের পক্ষে এক অচিন্তনীয় দুঃসাহসিক কাজ। আজকের দিনে যে-কেউ দৈহিক বিপন্মুক্ত হয়ে বলতে পারে যে সমগ্র বিশ্ব বোকা বা অবাস্তব, তার সমস্ত কাজকর্ম শিশুসুলভ বা কুৎসিত, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত ছেলেমানুষি অনুমান মাত্র; কিন্তু মধ্যযুগের লোকেরা খুন না হলে, অনাহারে না থাকলে কিংবা মড়কে না মরলে তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করত; তাদের বিশ্বাস এবং ধারণাই ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ এবং শেষ; এবং কেউ তার উপর কটাক্ষ করলে তারা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করত। রোজার বেকনের রচনাবলী ছিল গহন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত। তাঁর যুগের অজ্ঞানতাকে তিনি আক্রমণ করতেন জ্ঞান-বৃদ্ধির নানাবিধ প্রস্তাবের ঐশ্বর্য-সম্ভার দিয়ে। গবেষণা ও জ্ঞান-আহরণের প্রয়োজনীয়তার উপর তাঁর সুতীব্র জেদের মধ্য দিয়ে অ্যারিস্টটলের আত্মা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। 'গবেষণা, গবেষণা'—এই এক ধুয়া ছিল রোজার বেকনের।

কিন্তু অ্যারিস্টটলকে নিয়েই রোজার বেকনের বিবাদ শুরু হল। তাঁর বিবাদের কারণ হল এই যে, লোকেরা সাহসের সঙ্গে কোন কাজ না করে ঘরে বসে সেযুগে এই মহর্ষির যে বাজে ল্যাটিন অনুবাদ-গ্রন্থ বেরিয়েছিল তা-ই বসে পড়ত। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছিলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে অ্যারিস্টটলের সমস্ত বই আমি পুড়িয়ে ফেলতাম, কেননা এইসব বই পড়লে বাজে সময় নষ্ট হয়, ভুল সৃষ্টি হয় ও অজ্ঞানতা বাড়ে। তখন যদি অ্যারিস্টটল পৃথিবীতে ফিরে আসতেন তিনিও সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করতেন: তাঁর বই যেরকম পূজিত হত সেরকম পড়া হত না—এবং এই ব্যাপারটা রোজার বেকন জঘন্য অনুবাদগুলির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন।

জেল বা তারও চেয়ে কিছু ভয়ঙ্কর অনিষ্টের ভয়ে গোঁড়া মতবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবার ভান করেও রোজার বেকন তাঁর সমস্ত বইয়ে মনুষ্যজাতিকে আহ্বান করেছেন, 'দলিল বা সিদ্ধান্তের শাসন বন্ধ কর; বিশ্বের দিকে তাকাও।' মূর্খতার প্রধান চার উৎসকে তিনি নিন্দা করেছিলেন: দলিলকে ভয়, সংস্কারকে শ্রদ্ধা, মূর্খ জনমত ও আমাদের অন্তঃসারহীন বিধিব্যবস্থার শিক্ষাবিমুখ দম্ভ। এইগুলি জয় করলেই মানব-সমাজের এক বিরাট শক্তির জগৎ খুলে যাবে—

'দাঁড় ও দাঁড়ি ছাড়া তরণী চালানোর যন্ত্র সম্ভব; ফলে সমুদ্র ও নদীর উপযোগী বড়-বড় জাহাজ একজন মানুষের পরিচালনায় এত জোরে যেতে পারে যা তরণী-বোঝাই দাঁড়ি নিয়েও সম্ভব হবে না। ঠিক সেইমত পশু-টানা গাড়ির পরিবর্তে যন্ত্রচালিত গাড়ি করাও যেতে পারে; এবং আকাশে ওড়ার যন্ত্রও সম্ভব, যাতে একজন লোক তার মাঝে বসে কোন-এক যন্ত্র ঘোরালে তার নকল ডানা পাখির ডানার মত বাতাস কেটে যেতে পারবে।'

এই কথা রোজার বেকন লিখেছিলেন, কিন্তু সে-যুগের নীরস মানব-সমাজের মধ্যে থেকেও যে গুপ্ত শক্তি ও কৌতূহলের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন, তিন শতাব্দী পরে তারই সম্বন্ধে মানুষ নিয়মিত গবেষণা ও চর্চা শুরু করে।

কিন্তু সারাসেনিক জগৎ খৃষ্টজগৎকে যে শুধু দার্শনিক বা অ্যালকেমিস্ট দিয়েছিল তা নয়, কাগজও দিয়েছিল। কাগজ যে ইউরোপের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভব করেছিল—একথা বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। কাগজের উৎস হল চীন, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওখানে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে চীনারা সমরখন্দে মুসলমান আরবদের আক্রমণ করে: তারা প্রতিহত হয় এবং বন্দী চীনাদের মধ্যে কয়েকজন কুশলী কাগজ-নির্মাতা ছিল, তাদের কাছ থেকেই এই শিল্প সকলে জানতে পারে। নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি পুস্তক আজও পাওয়া যায়। হয় গ্রীসের কাছ থেকে, নয় খৃষ্টজগৎ কর্তৃক স্পেন পুনর্জয়ের সময় মুরীয় কাগজের কল অধিকার করায় খৃষ্টজগৎ কাগজ তৈরি শিখতে পারে। কিন্তু খৃষ্টান স্প্যানিশদের আমলে কাগজের উৎপাদন অত্যন্ত খেলো হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে খৃষ্ট-ইউরোপে ভাল কাগজ তৈরি কখনও হয় নি; এবং ইটালি কাগজ তৈরিতে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাত্র জার্মানিতে কাগজ তৈরি শুরু হয় এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগের আগে কার্যকরী ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে বই ছাপানোর মত কাগজ প্রচুর পরিমাণে কিংবা শস্তায় উৎপাদিত হয় নি। স্বভাবতই এর পরে আসবে ছাপাখানা; কাগজের জন্য ছাপাখানাই হল একমাত্র আবিষ্কার এবং বিশ্বের চৈতন্যময় জগৎ এক নতুন

ও অনেক শক্তিশালী যুগে প্রবেশ করল। একজনের মন থেকে আর-একজনের মনে মাত্র ছিটেফোঁটা গড়িয়ে পড়া আর নয়; শুরু হল প্রবল বন্যা, যে বন্যায় হাজার হাজার এবং পরে কোটি-কোটি মন যোগ দিল।

ছাপাখানার আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল হল সমস্ত জগতে প্রচুর বাইবেলের আমদানি। আর একটি, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সুলভ হওয়া। পাঠজ্ঞান খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। জগতে যে প্রচুর বই ছাপা হতে লাগল তা নয়, এখন যে-সব বই ছাপা হতে লাগল তা পড়তে সরল এবং তাই বুঝতেও সহজ হয়ে উঠল। কটোমটো পাঠ্য নিয়ে ধস্তাধস্তি করা ও তার অর্থ চিন্তা করার পরিবর্তে পাঠকরা এখন পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা করতে পারত। পড়ার সুবিধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এতদিন যে খুব সাজানো খেলনা কিংবা পণ্ডিতের রহস্যমাত্র ছিল, তা থেকে বই মুক্তিলাভ করল। সাধারণে যাতে বই পড়ে এবং দেখে তার জন্য লোকে বই লিখতে লাগল। ল্যাটিন ছেড়ে এখন সাধারণ ভাষাতেই বই লেখা হতে লাগল। চতুর্দশ শতাব্দীতেই ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়।

এতক্ষণ আমরা ইউরোপের পুনরুজ্জীবনে সারাসেনদের প্রভাব নিয়েই আলোচনা করেছি। এখন মঙ্গোল-বিজয়ের প্রভাবের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তারা ইউরোপের ভৌগোলিক কল্পনাকে প্রচুর শক্তিশালী করে তুলেছিল। মহান খাঁদের অধীনে কিছুদিন সমস্ত এশিয়া ও ইউরোপে অবাধ যাতায়াত ছিল; সাময়িকভাবে সমস্ত রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং সমস্ত জাতির এক-একজন প্রতিভূ কারাকোরামের রাজ-দরবারে থাকতেন। খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সংগ্রামের জন্য এশিয়া ও ইউরোপের বিরোধের প্রাচীর ছোট করে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গোলদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার খুব বেশি আশা পোপেরা মনে মনে পোষণ করতেন। এ পর্যন্ত তাদের একমাত্র ধর্ম ছিল শামানিজম (Shamanism) নামে এক আদিম পৌত্তলিক ধর্ম। মঙ্গোল রাজদরবারে পোপের দূত, ভারতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত, প্যারিসীয় ইতালীয় ও চীনা শিল্পকার, বাইজাণ্টাইন ও আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীরা, আরব রাজকর্মচারী, পারসী, ও ভারতীয় জ্যোতিবিদ বা গণিতবিদদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। আমরা ইতিহাসে মঙ্গোলদের অভিযান ও হত্যা-কাণ্ডের কথাই বেশি শুনতে পাই, কিন্তু তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কৌতূহল বা সদিচ্ছা সম্বন্ধে কিছুই প্রায় শুনি নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এদের প্রভাব তত বেশি মৌলিক আলোচনার জন্য না হলেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ও প্রচারের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। জেঙ্গিস কিংবা কুবলাইয়ের অস্পষ্ট

ও বিচিত্র কাহিনী থেকে এইটুকু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা সম্রাট হিসাবে অ্যালেকজাণ্ডার দি গ্রেটের মত আড়ম্বরপ্রিয় ও আত্মাভিমানী কিংবা রাজনৈতিক ভূত-স্রষ্টা, শক্তিমান অথচ অশিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদ শার্লমেঁর সমকক্ষ বোদ্ধা এবং স্রষ্টা ছিলেন।

মঙ্গোল রাজদরবারের আগন্তুকদের মধ্যে মার্কো পোলো নামে এক ভেনিসের লোকও ছিলেন। তিনি পরে তাঁর কাহিনী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। আনুমানিক ১২৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে চীনে গেছিলেন; এঁরা দুজন ইতিপূর্বেই সে-দেশ একবার ঘুরে এসেছিলেন: এবং এই দুজন বয়স্ক পোলোদের ব্যবহারে মহান খাঁ অভিভূত হয়েছিলেন। 'ল্যাটিন' লোকদের মধ্যে এঁদেরই তিনি প্রথম দেখেন; এবং তাঁকে খৃষ্টধর্ম কিংবা বহু ইউরোপীয় ব্যাপার যা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করেছে তা বোঝাতে সক্ষম গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধানে তিনি তাঁদের ফেরৎ পাঠালেন। মার্কোকে নিয়ে তাঁদের আগমন হল দ্বিতীয়বারের কথা।

পূর্বের অভিযানের মত ক্রিমিয়া দিয়ে না গিয়ে এই তিন পোলো প্যালেস্টাইনের পথ ধরলেন। মহান খাঁর দেওয়া একটি স্বর্ণপাত্র ও নানাবিধ স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের এই যাত্রাকে সহজ করে দিয়েছিল। জেরুজালেমের পবিত্র সমাধি-মন্দিরে যে প্রদীপের আলো জ্বলে তার কিছু তেল মহান খাঁ চেয়েছিলেন; সুতরাং সেই দিকে তাঁরা প্রথম গেলেন, তারপর সিলিসিয়া দিয়ে আর্মেনিয়া। উত্তরে তাঁরা এই পর্যন্তই গেছিলেন, কারণ সে সময় মিশরের সুলতান মঙ্গোল রাজ্য আক্রমণ করেছেন। মনে হয় সাগর-যাত্রার ইচ্ছা নিয়েই তাঁরা মেসোপটেমিয়া হয়ে পারস্য উপসাগর-স্থিত ওরমুজে এসে উপস্থিত হন। ওরমুজে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় একদল ভারতীয় বণিকের সঙ্গে। যে-কোন কারণেই হোক তাঁরা জাহাজ না ধরে পারস্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে উত্তরমুখো যাত্রা করলেন এবং বাল্থ্ হয়ে পামিরের উপর দিয়ে কাস্গর, এবং কোটান ও লব্ নর হয়ে হোয়াং-হো উপত্যকায় এবং পিকিংএ এসে উপস্থিত হলেন। তখন পিকিংএ মহান খাঁ ছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রচুর সমাদর করলেন।

কুবলাইকে মার্কো খুশি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল অল্প এবং তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন এবং এটাও সুস্পষ্ট যে তিনি তাতার ভাষা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিখেছিলেন। তাঁকে রাজ-দরবারে এক সম্মানিত মর্যাদা দিয়ে প্রধানত দক্ষিণ চীনে অনেকবার রাজকার্যে পাঠানো হল। 'সদাহাস্যময় ও ঐশ্বর্যশালী বিরাট দেশ', 'সমস্ত পথ জুড়ে পথিকদের জন্য সুন্দর অতিথিশালা', 'চমৎকার দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ক্ষেত ও বাগান', বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের 'অনেক মঠ', 'সুন্দর রেশম, সোনার ও

পাটের কাপড়', 'প্রতিনিয়ত নগরী ও নাগরিক সমিতির অবস্থান' প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি যে কাহিনী বলে গেছেন তা সমগ্র ইউরোপে প্রথমে অবিশ্বাস এবং পরে ইউরোপীয়দের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করে তোলে। তিনি বলে গেলেন ব্রহ্মদেশের কথা, তাদের সৈন্যদের শত শত হস্তী-বাহিনী, কী করে এই পশু-বাহিনী মঙ্গোল তীরন্দাজবাহিনীর কাছে পরাভূত হল, কী করে মঙ্গোলরা পেগু অধিকার করল। তিনি বললেন জাপানের কথা, সে দেশের সোনার কথা অনেক বাড়িয়েই বলে গেলেন। তিন বছর মার্কো ইয়াংচাও নগরীর শাসনকর্তা হিসাবে শাসন করেন এবং চীনা অধিবাসীদের কাছে তাতারদের চেয়ে বেশি বিদেশী বলে তিনি চিহ্নিত হন নি। তাঁকে হয়ত কোন কাজে ভারতবর্ষেও পাঠানো হয়েছিল। চীনা দলিলে পাওয়া যায় যে জনৈক পোলো ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রীসভায় যুক্ত ছিলেন—পোলোর অবিস্মরণীয় কাহিনীর সত্যতার এক মহার্ঘ প্রমাণ।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীর প্রকাশ ইউরোপীয় কল্পনাশক্তির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে ইউরোপীয় রোম্যান্সে, মার্কো পোলোর কাহিনীতে উল্লিখিত নাম ক্যাথে (উত্তর চীন) এবং ক্যাম্বালাক (পিকিং) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুই শতাব্দী পরে মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীর এক পাঠক, ক্রিস্টোফার কলাম্বাস নামে এক জেনোয়াবাসী নাবিক পশ্চিমমুখে সাগর পাড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুরে চীনে পৌঁছবার চমৎকার এক মতলব করেন। সেভিলে কলাম্বাসের টীকা-টিপ্পনী-সমেত এই ভ্রমণ-কাহিনী আছে। একজন জেনোয়াবাসীর চিন্তাধারা কেন এই দিকে ঝুঁকবে তার অনেক কারণ আছে। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত এই নগরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের এক নিরপেক্ষ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, এবং জেনোয়াবাসীরা সেখানে ইচ্ছামত বাণিজ্য করত। কিন্তু জেনোয়াবাসীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী 'ল্যাটিন' ভিনিসিয়ানরা গ্রীকদের বিরুদ্ধে তুর্কীদের মিত্র এবং সহায় ছিল, এবং তুর্কী অধিকারের পর কনস্ট্যান্টিনোপল জেনোয়াবাসীদের বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। বহুদিন-বিস্মৃত পৃথিবীর গোলাকার তত্ত্বের আবিষ্কার আবার ধীরে ধীরে মানুষের মন অধিকার করতে লাগল। সুতরাং পশ্চিমমুখো হয়ে চীনে যাওয়ার কল্পনা তখন খুবই স্বাভাবিক। দুটি ব্যাপারে আরো উৎসাহ পাওয়া গেল। নাবিকদের দিক-নির্ণয় যন্ত্র তখন আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং মানুষের আর জাহাজ চালানোর জন্য দিক স্থির করতে পরিষ্কার রাত এবং তারার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করতে হয় না; এবং নরম্যান, ক্যাটালোনিয়ান, জেনোয়াবাসী এবং পর্তুগীজরা তখন আটলান্টিক

সাগর পাড়ি দিয়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, মেডিরা ও এজোর্স পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে।

তবু তাঁর এই কল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য জাহাজ সংগ্রহ করতে কলাম্বাসকে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। তিনি ইউরোপের এক রাজ-দরবার থেকে আর-এক রাজ-দরবারে দ্বারস্থ হতে লাগলেন। অবশেষে মুরদের কাছ থেকে সম্প্রতি-অধিকৃত গ্রানাডায় তিনি ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন এবং তিনটি ছোট জাহাজ নিয়ে অজানা সাগর পাড়ি দিতে সমর্থ হলেন। দু-মাস ন-দিন সাগরযাত্রার পর তিনি এক দেশে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন এ দেশ ভারতবর্ষ ; কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে এক নতুন দেশ এবং এর স্পষ্ট অস্তিত্ব পুরাতন জগৎ কোনদিন সন্দেহও করে নি। তিনি স্পেনে ফিরলেন সোনা, তুলো, অদ্ভুত জন্তু এবং খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য দুটি বুনো চিত্রিত ভারতীয়কে নিয়ে। তাদের ভারতীয় বলা হত এইজন্য যে, তিনি তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসই করতেন যে তিনি যে-দেশ খুঁজে পেয়েছেন তা ভারতবর্ষ। অনেক বছর পরে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সমগ্র আমেরিকা মহাদেশও যুক্ত হয়েছে।

কলাম্বাসের সাফল্যে সাগর পাড়ি দেওয়ার উৎসাহ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হল এবং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনে কার্যে নিরত ম্যাগেলান নামে এক পর্তুগীজ নাবিক পাঁচটি জাহাজ নিয়ে সেভিল থেকে পশ্চিমমুখো যাত্রা করেন এবং তাদের মধ্যে একটি, 'ভিক্টোরিয়া', ১৫২২ সালে নদী বেয়ে সেভিলে ফিরে আসে। সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিল এই জাহাজটিই। ২৮০ জন নাবিকের মধ্যে মাত্র ৩১ জন শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিল, ম্যাগেলান স্বয়ং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিহত হন।

ছাপা বই, পৃথিবী-পরিক্রমার সম্ভাবনা, আশ্চর্য দেশ, অজ্ঞাত জন্তু ও গাছপালা, আশ্চর্য আচার-ব্যবহার ও সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান, সাগর-পারে আকাশে ও জীবনের পরিক্রমায় নতুন আবিষ্কার ইউরোপীয়দের মনে নতুন আশা এনে দিল। বহুদিন-অনাদৃত ও বিস্মৃত গ্রীক সৎ-সাহিত্যগুলি আবার দ্রুত ছাপা হতে লাগল এবং লোকে পড়তে শুরু করল এবং প্লেটোর স্বপ্ন এবং প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মর্যাদার যুগ তাদের সকলের চিন্তাকে রঙিন করে তুলল। পশ্চিম ইউরোপে রোম্যান রাজত্ব প্রথম আইন ও শৃঙ্খলা আনে এবং ল্যাটিন চার্চ তার পুনঃপ্রবর্তন করে ; কিন্তু পৌত্তলিক ও ক্যাথলিক রোমে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা শাসকদের দ্বারা প্রতিহত হত। ল্যাটিনপন্থী মনের রাজত্ব শেষ হয়ে

আসতে লাগল। ত্রয়োদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে সেমাইট, মঙ্গোলদের উদ্দীপনাময় প্রভাব এবং গ্রীক সৎ-সাহিত্যের পুনরাবিষ্কারের কল্যাণে ইউরোপীয় আর্যরা ল্যাটিন ঐতিহ্যমুক্ত হয়ে মানসিক ও বস্তুতান্ত্রিক জগতে আবার মনুষ্যজাতির নেতা হয়ে উঠল।

ল্যাটিন গির্জার সংস্কার

এই মানসিক পুনরুজ্জীবনে ল্যাটিন গির্জার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। তার অঙ্গহানি হয়; এবং যে অংশ জীবিত ছিল তাকেও পুনর্গঠিত করতে হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গির্জা কেমনভাবে সমস্ত খৃষ্ট-জগতের প্রায় স্বেচ্ছাচারী নায়কত্ব গ্রহণ করেছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে কেমনভাবে মানুষের মনে ও বৈষয়িক ব্যাপারে তার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। লোকের যে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মোৎসাহ আদি-যুগে তার সহায় ও শক্তি ছিল, কেমন করে তা তার দম্ভ অত্যাচার ও কেন্দ্রীকরণের জন্য তার বিরুদ্ধচারী হয়ে ওঠে এবং কী করে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের গোঁড়া ধর্মবিমুখতা রাজারাজড়াদের গির্জাকে অমান্য করার সাহস এনে দেয়—একথাও আমরা বর্ণনা করেছি। ধর্ম নিয়ে অবান্তর বিরাট মতভেদ তার ধর্মসম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক মর্যাদা একেবারে ক্ষুন্ন করে দেয়। বিদ্রোহের শক্তি এখন তাকে দুদিক থেকে আঘাত করে।

ইংরেজ উইক্লিফের ধর্মানুশাসন সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৩৯৮ সালে জন হাস্ নামে এক শিক্ষিত চেক প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উইক্লিফের ধর্মানুশাসন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই ধর্মানুশাসন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করেও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারিদিকে সাড়া তোলে। ১৪১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ দূর করবার জন্য কনস্ট্যান্সে সমস্ত গির্জার এক সভা আহূত হয়। সম্রাটের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করে ধর্ম-বিরুদ্ধতার জন্য বিচার করা হয় এবং ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। বোহেমিয়ার অধিবাসীদের শান্ত করার পরিবর্তে এর ফলে হল সে দেশের হাস্-সমর্থকদের বিদ্রোহ—ল্যাটিন খৃষ্টরাজ্য ভাঙনের প্রথম ধর্ম-যুদ্ধ। কনস্ট্যান্সে একত্রিত খৃষ্টরাজ্যের প্রধান হিসাবে বিশেষ নির্বাচিত পোপ পঞ্চম মার্টিন এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আহ্বান করলেন।

এই বলিষ্ঠ কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে পাঁচটি মোট ক্রুসেড চালানো হয় এবং প্রত্যেকটিই ব্যর্থ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং ওয়াল্ডেন্সদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ইউরোপের সমস্ত রকম গুণ্ডামি বোহেমিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু

বোহেমিয়ার চেকরা সশস্ত্র প্রতিরোধে বিশ্বাস করত। হাস্-সমর্থকদের গাড়ির শব্দে এবং দূরবর্তী সৈন্যদলের সঙ্গীত শুনে সে ক্রুসেড উপে গেল এবং সকলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত পালিয়ে গেল ; একবার যুদ্ধ করার জন্য তারা অপেক্ষাও করে নি (ডোমাজ্‌লিসের যুদ্ধ ১৪৩১)। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে হাস্-সমর্থকদের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য বললে সমস্ত গির্জার আর এক সভা বসে এবং সেখানে ল্যাটিন গির্জার আচার সম্বন্ধে বহু প্রতিবাদ গৃহীত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক বিরাট মড়ক সমগ্র ইউরোপে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এনে দেয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম দুর্দশা ও অশান্তি দেখা দেয় এবং ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে চাষী-বিদ্রোহ শুরু হয়। হাস্-সমর্থকদের যুদ্ধের পর এই চাষী-বিদ্রোহ জার্মানিতে প্রবল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা ধর্মভাব গ্রহণ করে। এই বিপ্লব-বিকাশের উপর ছাপাখানা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। হল্যাণ্ড এবং রাইনল্যাণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সহজে স্থানান্তরিত করা যায় এমন ছাপাখানা দেখা দেয়। এই শিল্পকলা ইটালি ও ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইংল্যাণ্ডে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটন ওয়েস্টমিনস্টারে ছাপাখানা চালু করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাইবেল ছাপা ও বিতরণ শুরু হয়, এবং জনমত প্রকাশের প্রচুর সুবিধা দেখা যায়। অতীতে কোন জাতির পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, ইউরোপীয় জগৎ সেই এক পাঠক-জগতে পরিণত হল। ঠিক যখন গির্জায় বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন, নিজেকে রক্ষা করার শক্তি নিঃশেষিত এবং রাজারা গির্জার প্রচুর ঐশ্বর্যের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য সচেষ্ট, ঠিক তখনই হঠাৎ মানুষের মন স্পষ্টতর চিন্তাধারা এবং সহজবোধ্য বন্যায় প্রবাহিত হল।

জার্মানিতে মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬) নামে এক ভূতপূর্ব ধর্মযাজকের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গির্জার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়। তিনি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে উইটেনবুর্গে এসে গোঁড়া মত ও আচারের বিরুদ্ধে তর্ক শুরু করেন। প্রথমে তিনি পণ্ডিতদের মত ল্যাটিন ভাষায় বিতর্ক করেন। তারপর তিনি ছাপা বইকে শক্তিশালী অস্ত্রস্বরূপ ধারণ করে জার্মান ভাষায় সাধারণ লোকের জন্য তাঁর মতবাদ ছড়িয়ে দেন। হাস্‌কে যেভাবে নিবৃত্ত করা হয়েছিল তাঁকে নিবৃত্ত করতেও সেরকম চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ছাপাখানা দেশের অবস্থা পরিবর্তিত করে দিয়েছিল এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে রাজারাজড়াদের মধ্যে তাঁর এত মিত্র ছিলেন যে তাঁর সে দুর্ভাগ্য হয় নি। কারণ সেই ক্রমবর্ধমান চিন্তাধারা ও শিথিল ধর্মবিশ্বাসের যুগে অনেক রাজাই রোমের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের ধর্ম-বন্ধন ছিন্ন করার সুযোগ দেখলেন। তাঁরা নিজেরাই জাতীয় ধর্ম-সংগঠনের প্রধান হওয়ার কামনা করেছিলেন। একে-একে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, উত্তর জার্মানি ও বোহেমিয়া

রোমের ধর্ম-যোগাযোগ থেকে নিজেদের ছিন্ন করে ফেলে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা রোম থেকে পৃথকই আছে।

এইসব রাজারা তাঁদের প্রজাদের আধ্যাত্মিক বা মানসিক চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটুও চিন্তিত ছিলেন না। ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ এবং তাঁদের প্রজাদের বিদ্রোহকে রোমের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু যে-মুহূর্তে এই ভাঙন সফল হল এবং রাজদণ্ডের অধীনে জাতীয় গির্জা প্রতিষ্ঠিত হল, তাঁরা আর এই জনপ্রিয় আন্দোলনের উপর কোনরকম কর্তৃত্ব রাখতে পারলেন না। কিন্তু যিশুর অনুশাসনে ছিল চিরকালীন অদ্ভুত প্রাণবীর্য, জনসাধারণ ও ধর্মযাজকদের প্রতিটি আনুগত্য ও প্রতিটি পরাধীনতার মধ্যে সকলে খুঁজে পেত মানুষের আত্মমর্যাদা ও তার সত্যশীলতার প্রতি সুস্পষ্ট আহ্বান। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল, যারা বাইবেলকেই জীবন ও বিশ্বাসের পথ-প্রদর্শক হিসাবে মেনে নিল। তারা রাজকীয় গির্জার শাসন মানতে অস্বীকার করল। ইংল্যাণ্ডে এই বিদ্রোহীদের বলা হত ননকনফরমিস্ট এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ দেশের রাজনীতিতে তারা বিরাট অংশ গ্রহণ করে। ইংল্যাণ্ডে রাজার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ জানিয়েছিল গির্জার কাছে, যার ফলে রাজা প্রথম চার্লসের মস্তকচ্ছেদন করা হয় (১৬৪৯), এবং এগার বছর ধরে ননকনফরমিস্টদের অধীনে ইংল্যাণ্ড প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য হয়ে থাকে।

ল্যাটিন খৃষ্টরাজ্য থেকে উত্তর ইউরোপের এক বিরাট অংশের সম্পর্কচ্ছেদকেই সাধারণভাবে Reformation বা ধর্ম-সংস্কার বলা হয়। কিন্তু এই ক্ষতির আঘাত ও ভার রোম্যান গির্জারও বহু পরিবর্তন সাধন করে। গির্জাকে পুনর্গঠিত করে নতুন জীবন আনার চেষ্টা করা হয়। এই পুনরুজ্জীবনের যুগে ইনিগো লোপেজ দ্য-রোকাল্ড নামে এক তরুণ স্পেনীয় সৈন্য, লোয়োলার সেণ্ট ইগ্নাসিয়াম নামে সমধিক পরিচিত, এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকে বিচিত্র জীবন-যাপনের পর তিনি ধর্মযাজক হন (১৫৩৮) এবং তাঁকে সোসাইটি অব্ জীসাস প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেওয়া হয়—ধর্মসেবায় সামরিক নিয়মানুবর্তিতার ঔদার্য ও শৌর্যের ঐতিহ্য-প্রয়োগের স্পষ্ট প্রচেষ্টার প্রাথমিক অভিযান। সোসাইটি অব্ জীসাস বা জেসুইটরাই হল ধর্মবিশ্বাস প্রচারে ও সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষ, চীন ও আমেরিকায় এরাই খৃষ্টধর্ম নিয়ে গেছিল। রোমের গির্জার দ্রুত নিমজ্জন এরাই বন্ধ করেছিল। ক্যাথলিক জগতে এরাই শিক্ষার মানের উন্নতি করেছিল; এরা ক্যাথলিক বুদ্ধির মানের উন্নতি করে এবং যে ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত, তা এই জেসুইট পুনরুজ্জীবনের কাছে অনেকাংশে ঋণী।

সম্রাট পঞ্চম চার্লস

পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্য পঞ্চম চার্লসের রাজত্বে একরকম চরম শীর্ষে আসে। ইউরোপীয় সম্রাটদের মধ্যে তিনি এক অত্যন্ত অসাধারণ সম্রাট ছিলেন। কিছুদিন তাঁকে শার্লমেঁর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে মনে করা হত।

তাঁর এই বিরাটত্ব কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়। তার জন্য দায়ী তাঁর পিতামহ, সম্রাট প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান (১৪৫৯-১৫১৯)। বিশ্বশক্তির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করতে কোন কোন রাজবংশ যুদ্ধ করেছেন, কোন কোন রাজবংশ রাজনৈতিক চক্রান্ত করেছেন; হাপসবুর্গ বংশ বিবাহ করে সে আশা চরিতার্থ করেছে। হাপসবুর্গ বংশের আদি রাজ্য অস্ট্রিয়া, স্টিরিয়া, আলসাস ও আর কয়েকটি জেলার অংশ নিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়ান তাঁর জীবন শুরু করেন। বিবাহ করে—ভদ্রমহিলার নামে আমাদের কিছু যায় আসে না—তিনি লাভ করেন নেদারল্যাণ্ড ও বার্গাণ্ডি। তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যুতে বার্গাণ্ডির অধিকাংশ তাঁর হাতছাড়া হয়, কিন্তু নেদারল্যাণ্ড তাঁর হাতে থাকে। তারপর তিনি বৃট্যানিতে বিবাহ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতা তৃতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুতে তিনি সম্রাট হন এবং বিবাহ করে মিলানের ডিউকের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। অবশেষে তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার কন্যার,—কলাম্বাসের সেই ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার দুর্বলমনা মেয়ের সঙ্গে। তাঁরা যে তখন শুধু সংযুক্ত স্পেন, সার্দিনিয়া এবং দুই সিসিলির উপরই রাজত্ব করছিলেন তা নয়, ব্রেজিলের পশ্চিমের সমগ্র আমেরিকা তাঁদের শাসনাধীন ছিল। এইভাবে তাঁর পৌত্র পঞ্চম চার্লস আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ এবং ইউরোপের যে তৃতীয়াংশ থেকে এক অর্ধেক তুর্কীরা ছেড়ে দিয়েছিল তার উত্তরাধিকারী হলেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মতামহ ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যুতে, তাঁর মা জড়বুদ্ধি হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনিই সমস্ত স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং তাঁর পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ান ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মারা গেলে ১৫২০ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে তাঁকে সম্রাট নির্বাচিত করা হয়।

তাঁকে দেখতে ছিল মাঝামাঝি, খুব বুদ্ধিদীপ্ত আকৃতির নয়, উপরের ঠোঁট একটু পুরু, থুতনি বিশ্রী লম্বা। তিনি এসে পড়লেন এক তরুণ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের জগতে। সে জগৎ ছিল প্রতিভাশালী তরুণ সম্রাটদের যুগ। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রথম ফ্র্যান্সিস ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে অষ্টম হেনরি ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। ভারতবর্ষে তখন বাবরের (১৫২৬-৩০) এবং তুর্কীতে সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেণ্টের যুগ (১৫২০)—

দুজনেই সমান কৃতী সম্রাট ছিলেন এবং পোপ দশম লিও (১৫১৩) একজন বিশিষ্ট পোপ ছিলেন। পোপ এবং প্রথম ফ্র্যান্সিস চার্লসের সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ একজন ব্যক্তির হাতে অত শক্তি-সঞ্চয় তাঁরা ভয় করেছিলেন। প্রথম ফ্র্যান্সিস এবং অষ্টম হেনরি দুজনেই সম্রাট হওয়ার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু (১২৬৩ থেকে) তখন বহুদিন-প্রতিষ্ঠিত হ্যাপসবুর্গ সম্রাটের ঐতিহ্য চলে আসছে, এবং প্রচুর উৎকোচে চার্লসের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব হয়।

প্রথমটা এই যুবক তাঁর মন্ত্রীদের হাতে এক সুন্দর খেলার পুতুল হয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করতে থাকেন এবং শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর এই সু-উচ্চ আসনের ভীতিকর জটিলতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। সে আসন যেমন বিস্ময়কর তেমনি তা ক্ষণস্থায়ী।

তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকেই তাঁকে জার্মানিতে লুথারের আন্দোলন-উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর নির্বাচনে পোপের বিরুদ্ধে জন-সংস্কারকদের পক্ষ গ্রহণ করার সম্রাটের একটি কারণ ছিল। কিন্তু তিনি বড় হয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্যাথলিক দেশ স্পেনে, এবং তিনি লুথারের বিরুদ্ধে যাওয়াই স্থির করলেন। সুতরাং তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট রাজাদের, বিশেষ করে স্যাক্সনির ইলেক্টরের বিরাগভাজন হন। এক বিরাট ভাঙনের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই ভাঙনই খৃষ্ট ধর্মরাজ্যের দুই বিবদমান দলে পরিণত হয়। এই ফাটল রোধ করার জন্য তিনি সত্যকার আন্তরিক পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। জার্মানিতে ব্যাপক রাজনৈতিক বিদ্রোহ হয় এবং সাধারণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গণ্ডগোলের সঙ্গে জড়িত হয়ে ওঠে। এবং এই আভ্যন্তরীণ গোলমালকে জটিলতর করে তুলেছিল পুব ও পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ। পশ্চিমে ছিলেন চার্লসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথম ফ্র্যান্সিস ; পুবে চির-অগ্রসরমান তুর্কীরা—তখন তারা হাঙ্গারিতে উপস্থিত হয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে অস্ট্রিয়ান রাজ্যগুলির কাছ থেকে বাকি খাজনা আদায় করছিল। চার্লস স্পেন থেকে সৈন্য এবং অর্থ ইচ্ছা করলেই পেতে পারতেন, কিন্তু জার্মানি থেকে কোন রকম কার্যকরী অর্থসাহায্য লাভ করা কঠিন ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন আরো জটিল আকার ধারণ করেছিল। বাধ্য হয়ে তাঁকে ধ্বংসাত্মক ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মোটামুটি অষ্টম হেনরির সহায়তায় চার্লস প্রথম ফ্র্যান্সিস ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ছিল উত্তর ইটালি ; দু-দলেরই

সৈন্য-পরিচালনা ছিল অত্যন্ত খারাপ ; তাদের অগ্রগমণ বা পশ্চাদপসরণ নির্ভর করত নতুন সৈন্যবাহিনীর আগমনের উপর। জার্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করে মার্সেইলস নিতে না পেরে ইটালিতে পশ্চাদপসরণ করল, মিলান তাদের হাতছাড়া হল এবং পাভিয়ায় তারা অবরুদ্ধ হল। প্রথম ফ্র্যান্সিস বহুদিন ধরে পাভিয়া অবরোধ করে ব্যর্থ হন, নতুন জার্মান বাহিনী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু পাছে তিনি অত্যন্ত শক্তিমান হয়ে ওঠেন এই ভয়ে অষ্টম হেনরি ও পোপ চার্লসের বিরুদ্ধে গেলেন। বুরবোঁর কনস্টেবলের অধীনে মিলানস্থ জার্মান সৈন্যবাহিনী বহুদিন বেতন না পেয়ে তাদের সেনাপতিকে রোম আক্রমণে বাধ্য করল। তারা ওই নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে একেবারে বিধ্বস্ত করল (১৫২৭)। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় পোপ সেন্ট এঞ্জেলোর দুর্গে আত্মগোপন করে রইলেন। অবশেষে তিনি ৪০০,০০০ ডাকাট উৎকোচের পরিবর্তে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলেন। দশ বছর ধরে এইরকম নিরর্থক যুদ্ধ সমস্ত ইউরোপকে দুর্বল করে তুলেছিল। অবশেষে সম্রাট ইটালিতে বিজয়ীর গৌরব লাভে সমর্থ হন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পোপ তাঁকে অভিষিক্ত করেন —তিনিই শেষ জার্মান সম্রাট যাঁর বোলোনাতে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

ইতিমধ্যে তুর্কীরা হাঙ্গারিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করছিল। ১৫২৬ সালে তারা হাঙ্গারির রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেছিল, বুডাপেস্ট অধিকার করেছিল, এবং ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেণ্ট ভিয়েনা প্রায় অধিকার করেছিলেন। সম্রাট তাদের এই অগ্রগমণে বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তুর্কীদের প্রতিহত করার সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের নিজেদের সীমান্তে উপনীত এই দুর্দান্ত সর্বদলীয় শত্রুর বিরুদ্ধে জার্মান রাজাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সম্রাট কিছুতেই পারলেন না। কিছুদিন প্রথম ফ্র্যান্সিস অনমনীয় রইলেন, এবং আবার নতুন করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হল : কিন্তু ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্স বিধ্বস্ত করার পর চার্লস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন করলেন। তখন ফ্র্যান্সিস ও চার্লস তুর্কীদের বিরুদ্ধে এক মৈত্রী গড়ে তুললেন। কিন্তু যে প্রোটেস্ট্যাণ্ট জার্মান রাজারা রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তাঁরা সম্রাটের বিরুদ্ধে স্মালকালডি লীগ (Schmalkaldic League) নামে এক চক্র গঠন করলেন, এবং খৃষ্টধর্মরাজ্যের পক্ষে হাঙ্গারি-পুনরধিকারের জন্য এক বিরাট অভিযানের পরিবর্তে চার্লসকে জার্মানির ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের দিকে দৃষ্টি দিতে হল। এই দুর্যোগের এক পরিণতিই তিনি দেখতে পেলেন—যুদ্ধ। প্রাধান্যের জন্য রাজাদের মধ্যে রক্তপিপাসু বিবেকহীন বিবাদ,

কখনো যুদ্ধ এবং ধ্বংসে মেতে উঠছে, কখনো চক্রান্ত ও কূটনৈতিক চালে নিমজ্জিত হচ্ছে; যেন রাজাদের রাজনৈতিক চালের এক সাপের ঝাঁপি—উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে মধ্য-ইউরোপকে বারবার জনহীন ও ধ্বংসে পরিণত করেছে।

এই ক্রমবর্ধমান বিবাদের মূলে কোন্ শক্তি কাজ করছিল, মনে হয় সম্রাট তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁর যুগে এবং তাঁর মর্যাদায় তিনি একজন নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং যে ধর্ম-বিরোধে সমস্ত ইউরোপকে যুদ্ধে ছিন্ন-ভিন্ন করে তুলছিল, মনে হয় সম্রাট তাকে সত্যকার ধর্মতত্ত্বীয় মতভেদ বলে মনে করেছিলেন। সমিতি এবং সভা আহ্বান করে এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। বহু উপায় নির্ধারণ ও অপরাধ-স্বীকারের চেষ্টাও করা হয়। জার্মান ইতিহাসের ছাত্রকে নুরেমবার্গের ধর্মশান্তি বৈঠক, রাতিসবনের সমিতির মীমাংসা, আউস্‌বুর্গের সভা প্রভৃতির বিশদ ইতিহাস পড়তে হবে। মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের উদ্বেগবহুল জীবনের কয়েকটি নিদর্শনের জন্যই শুধু আমরা এই কয়টি ঘটনার উল্লেখ করলাম। সত্য কথা বলতে গেলে, এই বিবদমান রাজাদের একজনও সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে কোন কিছু করেন নি। বিশ্বব্যাপী ধর্ম-বিরোধ, সাধারণ মানুষের সত্যানুসন্ধিৎসা, সে-যুগের জ্ঞানার্জন স্পৃহা—এ সবই ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজাদের কূটনৈতিক মস্তিষ্কের আবিষ্কৃত কল্পনা ও চাল। ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরি প্রথম জীবনে ধর্মবিমুখতার বিরুদ্ধে এক পুস্তক লিখে পোপের কাছ থেকে 'ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক' বা 'Defender of the Faith' সম্মান লাভ করেন; কিন্তু তিনিও তাঁর প্রথমা পত্নীর সঙ্গে বিবাদ-বিচ্ছেদ করে অ্যান বোলিন নামে এক যুবতীকে বিবাহ করার এবং ইংল্যাণ্ডের গির্জার প্রচুর ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজাদের দলে যোগ দিলেন। সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে ইতিপূর্বেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট দলে যোগ দিয়েছে।

মার্টিন লুথারের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। এইসব অভিযানের ঘটনা নিয়ে আমাদের বিড়ম্বিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। লোচাউ-এ প্রোটেস্ট্যাণ্ট স্যাক্সন সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়। একরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেই সম্রাটের অবশিষ্ট বিরোধী দলের প্রধান হেসএর ফিলিপকে ধরে বন্দী করা হয় এবং তুর্কীদের বাৎসরিক খাজনার উৎকোচে নিবৃত্ত করা হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফ্র্যান্সিসের মৃত্যুতে সম্রাট স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সুতরাং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চার্লস একরকম মীমাংসার পথ দেখতে পেলেন এবং যে-সব জায়গায় শান্তি ছিল না সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা করলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে

সমগ্র জার্মানিতে আবার যুদ্ধ বেধে গেল,—ইন্সব্রুক থেকে দ্রুত পলায়নই চার্লসকে বন্দীদশা থেকে রক্ষা করে এবং ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে পাসাউর সন্ধির ফলে আর-এক ক্ষণস্থায়ী শান্তি ফিরে আসে।...

বত্রিশ বছর ধরে এই ছিল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। খুব আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ইউরোপীয় মন তখন ইউরোপীয় প্রাধান্যের জন্যই ব্যস্ত ছিল। তুর্কী, ফরাসী, ইংরাজ কিংবা জার্মান—কেউই তখন পর্যন্ত আমেরিকার বিরাট মহাদেশ সম্বন্ধে রাজনৈতিক চেতনার কিংবা এশিয়ার নতুন জলপথ আবিষ্কারের উপর কোনরকম গুরুত্ব আরোপ করে নি। আমেরিকায় তখন বিরাট বিরাট ব্যাপার ঘটছিল: মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়ে কর্টেজ স্পেনের পক্ষে মেক্সিকো নামে বিরাট নিওলিথিক সাম্রাজ্য জয় করেছেন, পিজারো পানামার যোজক আক্রমণ করেছেন (১৫৩০) এবং পেরু নামে আর এক আশ্চর্য দেশ জয় করেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এ-সব ঘটনাকে স্পেনের রাজকোষে প্রয়োজনীয় এবং শক্তিবর্ধক রৌপ্যের আমদানি ছাড়া আর তারা কিছুই মনে করত না।

পাসাউর সন্ধির পর থেকেই চার্লস তাঁর চিন্তাধারার সবিশেষ অভিনবত্ব প্রদর্শন করেন। এতদিনে তিনি তাঁর সম্রাটত্বের মাহাত্ম্যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। এইসব ইউরোপীয় বিরোধের অসহ্য অসারতা তাঁর মনকে আবিষ্ট করে। তাঁর স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না; স্বভাবতই তিনি অলস ছিলেন এবং তাঁকে বাতে কাবু করে ফেলেছিল। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। জার্মানির সমগ্র অধিকার তিনি তাঁর ভাই ফার্ডিনাণ্ডকে দিয়ে দিলেন এবং স্পেন ও নেদারল্যাণ্ড দিলেন তাঁর ছেলে ফিলিপকে। তারপর একরকম সাড়ম্বর অসন্তোষের মধ্যে তিনি ট্যাগাম উপত্যকার উত্তরে পাহাড় এবং ওক ও চেস্টনাট বনের মধ্যে য়ুস্টের এক মঠে অবসর গ্রহণ করলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ক্লান্ত, বিশ্ব-বিমুখ মহান সম্রাটের এই অবসর গ্রহণ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে শান্ত নির্জনতায় ভগবানের কাছে শান্তি-ভিক্ষা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ানুভূতি দিয়ে অনেক কথাই লেখা হয়েছে; কিন্তু তাঁর এই অবসর গ্রহণে ছিল না নির্দয়তা বা সংযমের পরিচয়। তাঁর সঙ্গে প্রায় ১৫০ জন কর্মচারী ছিল; রাজদরবারের মতই তাঁর আবাস ছিল আড়ম্বরময় ও উৎসবমুখর; এবং দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন পিতৃভক্ত—তাঁর পিতার উপদেশ ছিল তাঁর কাছে আদেশের মত।

ইউরোপের শাসনকার্য ব্যাপারে চার্লসের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যদি দূর হয়ে থাকে, তবে তাঁর এই ধরনের জীবন গ্রহণে আরও কোন উদ্দেশ্য ছিল। প্রেস্‌কট বলেন:

'কুইক্সাডা কিংবা গাজটেলু আর ভাল্লাডোলিডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে দৈনিক যে

পত্রালাপ চলত, তাতে এমন একটি চিঠিও পাওয়া যাবে না যা সম্রাটের অসুস্থতা বা খাওয়া সম্বন্ধে লেখা নয়। অনবচ্ছিন্ন কথনের মত একটা চিঠি আর-একটা চিঠিরই সংযোজক ছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগে এ ধরনের কোন বিষয়ের কথনো এত গুরুত্ব অর্জন খুব কদাচিৎ হয়। ভোজনতত্ত্ব ও রাজনীতির আশ্চর্য মিশ্রণে সমৃদ্ধ এতগুলি চিঠি পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাম্ভীর্য রক্ষা নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর হয়েছিল। ভাল্লাডোলিড থেকে লিসবনে রাজদূতের যাওয়ার পথ একটু ঘুরিয়ে জারা-ণ্ডিলার মধ্য দিয়ে নেওয়া হত, সেখান থেকে রাজার জন্য খাবার আসত। বৃহস্পতিবার তার আনতে হত মাছ পরের Jour maigre বা গরীবানা দিনের জন্য; ধারে-কাছের মাছ চার্লসের মনে হত নিতান্ত ছোট, সুতরাং ভাল্লাডোলিড থেকে বড় বড় মাছ তাঁর জন্য পাঠাতে হত। সমস্ত রকমের মাছ এবং মাছের সমধর্মী সমস্ত রকম জিনিসই তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। ঈল মাছ, ব্যাঙ, শামুক প্রভৃতি তাঁর খাদ্যতালিকায় উচ্চ মর্যাদা পেত। ছোট ছোট মাছ, বিশেষ করে এঙ্কোভি, ছিল তাঁর প্রিয় এবং দক্ষিণ দিকের দেশ থেকে তা আনতে পারতেন না বলে তাঁর খুব দুঃখ ছিল। ঈলমাছের একরকম তরকারির প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তি ছিল…'*

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় জুলিয়াস চার্লসকে একটি ষাঁড় পাঠিয়ে উপবাসে নিবৃত্ত করেন এবং সংস্কার অভিষেকের দিনই ভোরবেলাতে তাঁকে উপবাস ভঙ্গ করতে বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন।

ভোজন এবং পরিচর্যা! আদিম যুগে আবার প্রত্যাবর্তন। পড়াশুনোর অভ্যাস তাঁর কোনকালে ছিল না, কিন্তু শার্লমেঁর মত খাওয়ার সময় তাঁকে বই পড়ে শোনানো হত এবং এক সমালোচকের মতে তিনি 'সুমিষ্ট ও স্বর্গীয় সমালোচনা'ও করতেন। অন্য সময় কাটত যান্ত্রিক খেলা নিয়ে, গান বাজনা শুনে কিংবা যে-সব রাজকার্য তাঁর কাছে ছিটকে আসত তাই দেখে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে তিনি ধর্মভাবাপন্ন হয়ে পড়েন, যদিও তাতে আড়ম্বর ও আতিশয্যই ছিল বেশি। প্রতি শুক্রবার লেন্টএ তিনি অন্যান্য ধর্মযাজকদের সঙ্গে একত্রে পাপস্খালন ক্রিয়ায় রক্তপাত পর্যন্ত প্রফুল্ল মনে সহ্য করতেন। এতদিন রাজনৈতিক কারণে যে ধর্ম-গোঁড়ামি সংযত ছিল,তা এই শারীরিক কসরৎ ও বাতের জন্য প্রকাশ্য হয়ে উঠল। ভাল্লাডোলিডের কাছাকাছি প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মভাব এসে পৌঁছেছে শুনে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ এবং তাঁর উপদেষ্টাদের আমার আদেশ জানাও যে এই পাপ আরো ছড়াবার আগে সকলে স্বস্থানে থেকে এর মূলে কুঠারাঘাত করে যেন নিশ্চিহ্ন করেন।' এ-ধরনের এক অপরাধে সাধারণ ক্ষমা-প্রদর্শন উচিত

* প্রেসকট এর Appendix to Robertson's History of Charles V.

হবে কি না সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তাই ক্ষমা-প্রদর্শন নিষেধ করলেন : 'কারণ ক্ষমা প্রদর্শন করলে অপরাধী পুনর্বার অপরাধানুষ্ঠানের সুযোগ লাভ করবে।' উদাহরণ স্বরূপ নেদারল্যাণ্ডে প্রযুক্ত তাঁর কর্মপন্থা বিশেষভাবে সুপারিশ করলেন : 'যারা যারা তাদের ভুল মতি নিয়ে অবাধ্য রইল, তাদের সকলকে জীবন্ত দগ্ধ করা হল এবং যাদের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেওয়া হল, তাদের মস্তক ছেদন করা হল।'

ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা এবং আসনের মতই সমাধিকার্যেও তাঁর উৎসাহ সমান অর্থপূর্ণ ছিল। তাঁর কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল যে ইউরোপে কোন এক মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর সমাধির একান্ত প্রয়োজন এবং তাঁর জীবনের সমাপ্তি-রচনা বহু পূর্বেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। যুস্টের প্রতিটি সমাধিকার্যেই যে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন শুধু তা নয়, সেই অনুপস্থিত মৃত জনের আত্মার শান্তির জন্য উপাসনা-সভার আয়োজন করিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিতে এক উপাসনার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন এবং সব শেষে তাঁর নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

'সমস্ত গির্জায় কালো পর্দা টাঙানো হয়েছিল, শত শত মোমবাতির আলোতেও তার অন্ধকার দূর হয় নি। অনুষ্ঠানোচিত পোশাক পরে ধর্মযাজকরা এবং কালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে গভীর শোকাচ্ছন্ন সম্রাটের গৃহস্থেরা কালো কাপড়ে আবৃত বিরাট কফিন ঘিরে দাঁড়াল। কফিনটিকে গির্জার মাঝখানে উঁচুতে তুলে রাখা হয়েছিল। মৃত ব্যক্তির সমাধি-উপাসনা তারপর সম্পন্ন হল ; এবং সন্ন্যাসীদের শোকাবহ ক্রন্দনের মধ্যে মৃতের আত্মা যাতে আশীর্বাদপূত আত্মাদের আবাসে সাদরে গৃহীত হয় তার প্রার্থনা ধীরে ধীরে উর্ধ্বে উঠতে লাগল। তাদের প্রভুর মৃত্যুর ছবি মনে পড়ায় চার্লসের প্রতিটি অনুচরের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হয়ে উঠল— কিংবা, এই দুর্বলতার করুণাত্মক প্রদর্শনীর সমবেদনায় হয়ত তারা অভিভূত হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গাবরণে দেহাচ্ছাদন করে হাতে একটি জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে একত্র হয়ে চার্লস তাঁর নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেখলেন ; এবং এই বীভৎস অনুষ্ঠান শেষ হলে পুরোহিতের হাতে তাঁর সেই জ্বলন্ত কাঠি সমর্পণ করলেন—সর্বশক্তিমানের পদতলে নিজের আত্মাকে নিঃশেষে সমর্পণ করার প্রতীক হিসাবে।'

এই প্রহসনের দুই মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের স্বল্পস্থায়ী প্রাধান্যও অবলুপ্ত হল। তাঁর রাজত্ব ইতিপূর্বেই তাঁর ভাই ও ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। পঙ্গু ও মরণাপন্ন

অবস্থায় পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্য প্রথম নেপোলিয়নের কাল পর্যন্ত টিকে ছিল। আজও পর্যন্ত তার অসমাহিত ঐতিহ্য রাজনৈতিক বাতাসকে বিষাক্ত করে রেখেছে।

ইউরোপে রাজনৈতিক পরীক্ষা, একাধিপত্য, পার্লামেণ্ট ও প্রজাতন্ত্রের যুগ

ল্যাটিন গির্জা ভেঙে গেছে, পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্য চরম ধ্বংসের সম্মুখীন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপের ইতিহাস হল নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন ধরনের শাসনতন্ত্রের অনুসন্ধানে মানুষের অন্ধকারে হাতড়ানোর কাহিনী। অতীতের পৃথিবীতে বহুদিন ধরে রাজবংশের পরিবর্তন হয়েছে, এমনকি শাসক-জাতি এবং ভাষারও পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু রাজার কিংবা মন্দিরের শাসনের ধারা প্রায় স্থায়ী ছিল, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ধারা আরো অধিক স্থায়ী ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে এই আধুনিক ইউরোপে রাজবংশের পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর, এবং ইতিহাসের কৌতূহল শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠনের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমরা আগেই বলেছি, ষোড়শ শতাব্দী থেকে পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস হল নবোদ্ভূত কয়েকটি পরিস্থিতির সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরি-গ্রহণে মনুষ্যজাতির চেষ্টা, প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই চেষ্টা। নবোদ্ভূত পরিস্থিতি-গুলির অতি দ্রুত পরিবর্তন এই পরিগ্রহণ-চেষ্টাকে জটিলতর করে তুলছিল। এই পরিগ্রহণ, প্রধানত অজ্ঞানে এবং প্রায়ই অনিচ্ছায় (কারণ মানুষ সাধারণত ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন অপছন্দ করে), বরাবরই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পিছনে পড়ে রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে মনুষ্যজাতির ইতিহাস হল জীবনের সমস্ত পূর্ব-অভিজ্ঞতার কাছে নতুন প্রয়োজন ও সম্ভাবনার উপযোগী মানবিক সংগঠনীর সমস্ত ব্যবস্থার সজ্ঞান ও সুস্পষ্ট পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রাতিষ্ঠানগুলির ধীর ও অনিচ্ছুক হৃদয়ঙ্গম, তাদের ক্রমোত্তর অযোগ্যতা ও বিরক্তিকর নিষ্ক্রিয়তার কাহিনী।

মানুষের জীবনের পরিস্থিতিতে কী এই পরিবর্তন, যা মাঝে-মাঝে বর্বর-বিজয়ে সতেজ হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্য পুরোহিত চাষী ও ব্যবসায়ীর সাম্যে বিশৃঙ্খলতা এনে দিয়েছে, অথচ যা পুরাতন পৃথিবীতে একশত শতাব্দীরও বেশিদিন ধরে মানুষের সমস্ত ব্যাপারকে একত্র কার্যকরী করে রাখতে পেরেছিল?

সেগুলি বহুমুখী এবং বিভিন্ন রকমের, কারণ মানুষের জীবনে অনেক রকমের জটিলতা। কিন্তু প্রধান পরিবর্তনগুলি একটি কারণের জন্যই হয়েছে মনে হয়: যথা, সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং ব্যাপ্তি: প্রথমে সামান্য একদল বুদ্ধিমান লোক থেকে তার আরম্ভ, এবং তারপর ধীরে ধীরে ও শেষ পাঁচশো বছরে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়া।

কিন্তু মানব-জীবনের প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিস্থিতিরও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। জ্ঞানের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সমান তালে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে এর অত্যন্ত সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছে। সাধারণ ও আদিম কামনা ও প্রবৃত্তি-সঞ্জাত জীবনকে অতৃপ্তিকর আখ্যা দেওয়া এবং বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ করা ও সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রতি এক প্রবণতা অতিমাত্রায় চলে আসছে। বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম, গত কুড়িটি শতাব্দীতে যেসব বিরাট ধর্ম সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করেছে—এই ব্যাপার হল সব কটিরই সাধারণ বিশেষত্ব। পূর্বের ধর্মভাবের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই মানুষের আত্মাকে নিয়েই তাদের ছিল একরকম কাজ। পুরোহিত ও মন্দির-জড়িত যে পৈশাচিক ও শোণিত-কলঙ্কিত পুরাতন ধর্মগুলির কিছুটা তারা রূপান্তরিত করেছে এবং কিছুটার স্থানাধিকার করেছে, তাদের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিণতিতে এই নতুন ধর্মগুলি একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক। যে ব্যক্তিগত আত্ম-মর্যাদা এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির সাধারণ স্বার্থে দায়িত্ব গ্রহণে পূর্ববর্তী সভ্যতার মানুষের কোন বোধ ছিল না, এই নতুন ধর্মগুলি ধীরে ধীরে সেই জিনিসই তাদের মধ্যে আনতে পেরেছিল।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিস্থিতির প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে আদি সভ্যতায় লেখার সরলীকরণে ও ব্যাপক ব্যবহারে, যার ফলে বৃহত্তর সাম্রাজ্য ও ব্যাপকতর রাজনৈতিক বোঝাপড়া কার্যকরী ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। পরের অগ্রগতি দেখা গেল পরিবহনে অশ্বের ব্যবহারে, পরে উটের ব্যবহারে, চাকাবিশিষ্ট গাড়ির ব্যবহারে। রাস্তাঘাটের এবং লোহা আবিষ্কারের ফলে সামরিক কলাকুশলতার উন্নতি তো তার পরে এল। মুদ্রা প্রচলনের ফলে হল গভীর অর্থনৈতিক আলোড়ন এবং এই সুবিধাজনক অথচ শঙ্কাজনক প্রথার ফলে ঋণ, অধিকার ও বাণিজ্যের প্রকৃতিতে পরিবর্তন। সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা বাড়তে শুরু করল এবং এদের সঙ্গে তাল বজায় রাখতে মানুষের কল্পনাশক্তিও সেইসঙ্গে বাড়ল। স্থানীয় দেবতা বিলুপ্ত হল, এল ঈশ্বর-শাসিত দেশের যুগ, এবং পৃথিবীর বিরাট ধর্মের অনুশাসন। আরো এল লিখিত যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস ও ভূগোল, বিরাট অজ্ঞানতা সম্বন্ধে মানুষের প্রথম অনুভূতি এবং প্রথম রীতিমত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা।

গ্রীক ও অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে আরম্ভ হয়েছিল, তা কিছুদিনের জন্য বাধা পায়। টিউটনীয় বর্বরদের আক্রমণ, মঙ্গোল-জাতির পশ্চিমমুখী অভিযান, ধর্মীয় পুনর্গঠনের আন্দোলন ও মড়ক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপর গুরুতর চাপ দেয়। আবার যখন বিবাদ-বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে সভ্যতা জাগ্রত হল তখন ক্রীতদাস-প্রথা আর অর্থ-নৈতিক জীবনের ভিত্তি নয়, এবং প্রথম কাগজের কল সমবেত সংগৃহীত জ্ঞান ও ছাপা বইয়ের সহযোগিতার এক নতুন মাধ্যমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই জিনিসকে কেন্দ্র করে জ্ঞানানুসন্ধানের রীতিমত বৈজ্ঞানিক পন্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

এবং এই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই রীতিসম্মত চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে দিন দিন নানা আবিষ্কার হতে থাকছে। প্রত্যকটি আবিষ্কারের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃততর সীমানা নিয়ে, পরস্পরের বেশি লাভ কিংবা ক্ষতি, ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা : এবং এই আবিষ্কার দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। এ ধরনের কোন ব্যাপারের জন্য মানুষের মন তৈরি হয় নি এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরাট দুর্ঘটনাগুলির ফলে যতক্ষণ না মানুষের মন দ্রুত এই পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারল, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আবিষ্কারের বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলিকে সংহত করার জন্য রীতিবদ্ধ বুদ্ধিসম্মত পরিকল্পিত কোন প্রচেষ্টার কথা ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করতে পারেন না। গত চার শতাব্দীর মানুষের ইতিহাস হল বিপদ সম্বন্ধে সজ্ঞান ও সুযোগ-সন্ধানী মানুষের মত নয়, বরং আগুন-লাগা কয়েদীর মত, যে ঘুমন্ত অবস্থাতেই আগুনের তাপ ও শব্দকে তার আদিম ও অসঙ্গতিপূর্ণ স্বপ্নের অংশ মনে করে অস্থিরভাবে ছটফট করছে।

ইতিহাস একক জীবনের কাহিনী না হয়ে জন-সমাজের কাহিনী হওয়ায় ঐতিহাসিক দলিলে যেসব আবিষ্কারের কথা প্রধানত পাওয়া যায় তা সংযোগ-ব্যবস্থা নিয়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রধান যে আবিষ্কারের কথা আমরা জানতে পারি, তা হল ছাপা কাগজ এবং দিকনির্ণয়-যন্ত্র-সমন্বিত বিরাট সমুদ্রগামী জাহাজ। প্রথম জিনিসটি শস্তা হয়ে তার প্রসারে শিক্ষা জ্ঞান আলোচনা ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মৌলিক প্রয়োগে বিপ্লব এনে দিল, আর শেষেরটি গোলাকার পৃথিবীকে এক করল। যে কামান ও বারুদ মঙ্গোলরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম জগতে প্রথম এনেছিল, তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও উন্নতিও সমান গুরুত্বের আসন গ্রহণ করেছিল। তার ফলে ব্যারনদের দুর্গ কিংবা প্রাচীর-বেষ্টিত নগরীর নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে গেল। কামান সামন্ততন্ত্র উড়িয়ে

নিয়ে গেল। কনস্ট্যাণ্টিনোপল কামানের মুখে আত্মসমর্পণ করল। মেক্সিকো ও পেরু স্পেনীয়দের কামানের বিভীষিকায় পরাজিত হল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা গেল নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার উন্নতি, প্রথমে খুব পরিস্ফুট না হলেও শেষ পর্যন্ত নব ইতিহাস রচনার গুরুত্বে পূর্ণ। এই বিরাট অগ্রগতির নায়কদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬)—পরবর্তী জীবনে লর্ড ভেরুলাম, ইংল্যাণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলর। ডক্টর গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩) নামে কলচেস্টারের ফলিত দার্শনিক আর-এক ইংরেজের তিনি শিষ্য এবং হয়ত মুখপত্র ছিলেন। প্রথম বেকনের মত এই দ্বিতীয় বেকনও পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য প্রচার করে বেড়াতেন এবং গবেষণার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নকে রূপ দিতে এক কৌতূহলোদ্দীপক ও ফলপ্রসূ রূপক, আদর্শ রাজ্য The New Atlantisএর প্রয়োগ করতেন।

গবেষণায় উৎসাহ, এবং জ্ঞান-বিনিময় ও প্রকাশের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন, ফ্লোরেণ্টাইন সোসাইটি এবং পরে আরো অনেক জাতীয় সংস্থার উদয় হল। এই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি যে শুধু অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উৎসই ছিল তা নয়, বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর যে হাস্যকর ধর্মতত্ত্বীয় ইতিহাস মানুষের চিন্তাধারাকে পঙ্গু ও প্রভাবিত করে রেখেছিল তারও ধ্বংসাত্মক সমালোচনার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠল।

ছাপা বই কিংবা সমুদ্রগামী জাহাজের মত মানব-জীবন পরিস্থিতির পক্ষে এমন প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক আবিষ্কার সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর দেখা না গেলেও, যেসব বৈপ্লবিক তথ্য ও জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছিল তা উনবিংশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছিল। আবিষ্কার-কার্য ও পৃথিবীর মানচিত্র-অঙ্কন চলতে লাগল। টাসমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে মানচিত্রে দেখা গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধাতুবিদ্যায় কোক কয়লার প্রচলনে গ্রেট বৃটেনে লোহার দাম যেমন শস্তা হল, তেমনি কাঠকয়লার চেয়ে অনেক বড়-বড় টুকরোয় লোহা ঢালাই ও ব্যবহার করা সম্ভব হল। আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগের সূচনা হল।

স্বর্গ-নগরের গাছের মত বিজ্ঞানে একই সঙ্গে এবং অনবচ্ছিন্নভাবে কুঁড়ি, ফুল ও ফল পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রকৃত ফলবতী হয়ে ওঠে। প্রথমে আসে বাষ্প ও ইস্পাত, রেলগাড়ি, বড় বড় জাহাজ, বিরাট বিরাট পুল ও বাড়ি, অসীম শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, মানুষের প্রত্যেকটি বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর প্রচুর সম্ভাবনা এবং তারপর আসে আরও বিস্ময়কর আবিষ্কার : বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের গুপ্তধন মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত হয়।… ‥

ষোড়শ শতাব্দীর ও তারও পরবর্তী মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে আমরা ঘুমন্ত ও স্বপ্নমগ্ন বন্দীর সঙ্গে তুলনা করেছি যার কারাগারে আগুন লেগেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানস তখনও তার ল্যাটিন সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর—ক্যাথলিক গির্জার অধীনে পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। আমাদের স্বপ্নে মাঝে-মাঝে কোন অবাধ্য শক্তি এসে অসম্ভব ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার টুকরো এনে ফেলে দেয়: ঠিক সেইরকম সে-যুগের স্বপ্নের মধ্যে যেমন আমরা দেখি সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ঘুমন্ত মুখ আর অদম্য ভোজনস্পৃহা, তেমনি ওদিকে ইংল্যাণ্ডের সপ্তম হেনরি ও লুথারকে ক্যাথলিক ধর্মের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে দেখি।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্বপ্ন ব্যক্তিগত রাজত্বে রূপ নিল। এই সময়ে প্রায় সমস্ত ইউরোপের কাহিনীই মোটামুটি যা দাঁড়ায় তা হল এই: সম্রাটের হাতে শাসনক্ষমতা সংহত করার চেষ্টা, সেই ক্ষমতার পথে বাধা দূর করা ও ধারে-কাছের দুর্বল অঞ্চলের উপর সেই ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করা, এবং সম্রাটের অত্যাচার ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথমে জমিদার এবং পরে বহির্বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী ও মহাজন ব্যক্তিদের দৃঢ় প্রতিরোধ। সর্বত্রই যে এক দলের জয় হয়েছে তা নয়; কোথাও হয়ত রাজা তাঁর ক্ষমতা আরোপ করেছেন, আবার কোথাও বা হয়ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক রাজাকে কাবু করেছেন। এক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে রাজাই জাতীয় জগতের সূর্য ও কেন্দ্রমণি হয়ে রয়েছেন, অথচ ঠিক তাঁর রাজ্য-সীমার বাইরেই দুর্দম বণিক-সম্প্রদায় একটি প্রজাতন্ত্র চালাচ্ছেন। এই বিপুল বিভিন্নমুখিতা থেকে বোঝা যায় যে কত পরীক্ষা-সঞ্জাত, কী রকম স্থানীয়-পরিস্থিতি-ঘটিত সে সময়ের সমস্ত শাসনতন্ত্র ছিল।

এইসব জাতীয় নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতেন রাজার মন্ত্রী, কিংবা ক্যাথলিক দেশে প্রায়ই প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ; তিনি রাজার পিছনে থেকে তাঁর অপরিহার্য কর্তব্যের মাধ্যমে রাজার উপর কর্তৃত্ব করতেন।

এই অল্প পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় নাটকের বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। হল্যাণ্ডের বণিক-সম্প্রদায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়ে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের পুত্র, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেনরি ও তাঁর মন্ত্রী উলসি, রানী এলিজাবেথ ও তাঁর মন্ত্রী বার্লে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। কিন্তু প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লসের মূর্খতার জন্য তা বিনষ্ট হয়। প্রজাবিদ্রোহিতার অপরাধে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদনে (১৬৪৯)

ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এক নূতন মোড় নেয়। প্রায় চার বছর (১৬৬০ পর্যন্ত) বৃটেন ছিল প্রজাতন্ত্র রাজ্য; এবং পার্লামেন্টের প্রাধান্যে রাজা ছিলেন স্তিমিত ও অস্থায়ী শক্তি। অবশ্য তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮২০) সেই শক্তির প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন এবং আংশিকভাবে সফলও হন। কিন্তু অন্যদিকে ফ্রান্সের রাজা ইউরোপের সমস্ত রাজার চেয়ে অধিক সুষ্ঠুভাবে একাধিপত্যে সবচেয়ে বেশি সাফ ্য অর্জন করেন। রিচেলু (১৫৮৫-১৬৪২) ও মাজারিন (১৬০২-৬১) নামে দুই মন্ত্রী সেই দেশে রাজশক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি করেন এবং 'গ্র্যাণ্ড মনার্ক' রাজা চতুর্দশ লুইয়ের (১৬৩৪-১৭১৫) দীর্ঘ রাজত্ব এবং নিপুণ কার্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতা তাঁদের সাহায্য করে।

চতুর্দশ লুই বাস্তবিকই ইউরোপের আদর্শ রাজা ছিলেন। সমস্ত দোষগুণ জড়িয়ে তিনি একজন অত্যন্ত সুদক্ষ রাজা ছিলেন; তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের চেয়ে তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল অনেক বেশি, এবং যে বিপুল আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে তিনি বিদেশী রাজনীতির জটিলতার মধ্যে দেশকে প্রায় দেউলিয়ার সম্মুখীন করে ফেলেছিলেন, তা আজও আমাদের নিদারুণ বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁর প্রথম ইচ্ছা ছিল ফ্রান্সকে শক্তিশালী করা এবং তার সীমানা রাইন নদী ও পিরিনিজ পর্বতমালা পযন্ত বৃদ্ধি করা এবং স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ড দখল করা, ও তাঁর পরবর্তী ইচ্ছা ছিল, ফরাসী রাজারা যেন পুনর্গঠিত পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যে শার্লমেঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হতে পারেন। যুদ্ধের চেয়েও উৎকোচকে তিনি সরকারী দপ্তরে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস তাঁর বেতনভুক ছিলেন এবং পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ শাসকরাও তাই ছিলেন। তাঁর অর্থ, অর্থাৎ ফ্রান্সের করদাতাদের অর্থ, সর্বত্রই যেত। কিন্তু আড়ম্বরই ছিল তাঁর চিরন্তন নেশা। ভার্সাইএ তাঁর বিরাট রাজপ্রাসাদ, তার নাচ-ঘর, বারান্দা, আয়না, রাস্তা, ফোয়ারা, বাগান সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় এবং ঈর্ষার বস্তু ছিল।

সার্বজনীনভাবে সকলে তাঁকে নকল করতে শুরু করে। ইউরোপের প্রতিটি বড় এবং ছোট রাজা তাঁর প্রজাদের কিংবা নিজের ঋণগ্রহণের ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশি ব্যয়ে নিজের নিজের ভার্সাই সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সর্বত্রই ধনীরা তাঁদের পল্লীনিবাস এই নতুন আদর্শে তৈরি করছিলেন। সুন্দর বস্ত্রশিল্প ও গৃহসজ্জার এক বিরাট শিল্প গড়ে উঠল। এই সৌখিন শিল্পকলাগুলি সর্বত্রই সতেজে বৃদ্ধি পেতে লাগল: স্থাপত্য, গিল্টি-করা কাঠের কাজ, ধাতু-শিল্প, চিত্র-বিচিত্র চামড়ার কাজ, সঙ্গীত, অপূর্ব চিত্র, সুন্দর ছাপা, চমৎকার বাসন এবং বহুমূল্য দ্রব্য। আয়না ও সুন্দর আসবাব-পত্রের মধ্যে বাস করতেন

এক অদ্ভুত শ্রেণীর 'ভদ্রলোক', মাথায় তাঁদের পাউডার-মাখানো লম্বা পরচুলা, গায়ে সিল্ক ও লেসের জামা, পায়ে উঁচু লাল গোড়ালি-ওলা জুতো ; আশ্চর্য রকমের এক বেতের উপর ভর দিয়ে থাকতেন তাঁরা : আর তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিলেন 'ভদ্রমহিলারা'—মাথায় পাউডার-মাখানো চুলের রাশি, পরনে ঝোলানো সিল্ক ও সাটিনের বাহুল্য। এরই মাঝখানে থেকে অভিনয় করতেন মহান লুই, পৃথিবীর সূর্য : তিনি জানতেনই না সেই হতভাগ্য রুগ্ন ও বুভুক্ষুদের কথা, যাদের কাছে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারত না।

এই একাধিপত্য ও পরীক্ষামূলক শাসনতন্ত্রের যুগে জার্মানরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্ত ছিল এবং রাজা ও ডিউকদের দরবার যথাসম্ভব ভার্সাইয়ের
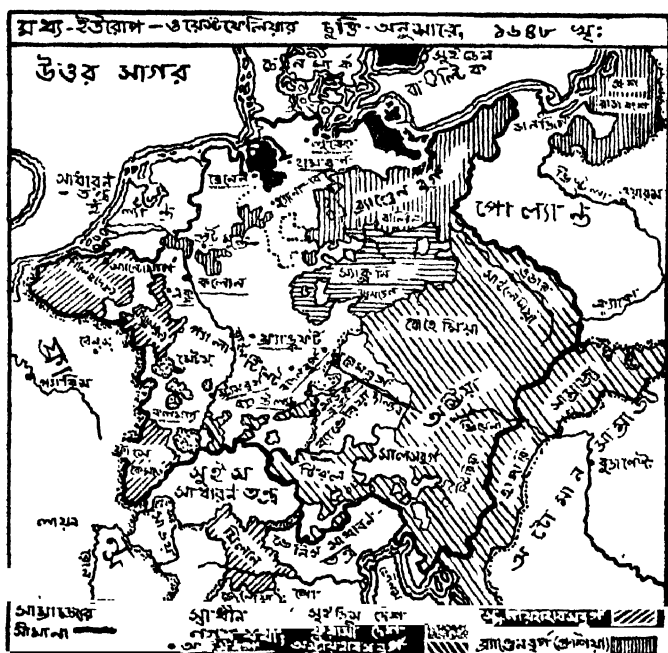
আড়ম্বরকে নীচভাবে অনুকরণ করে চলেছিল। জার্মান, সোয়েড ও বোহেমিয়ানদের মধ্যে রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য বিধ্বংসী কলহ বা ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮) এক শতাব্দী কাল জার্মানির প্রাণবীর্য নিঃশেষ করে ফেলেছিল। এই সংগ্রাম যে দুর্বল তালি-মারা অবস্থায় শেষ হল, ত মানচিত্রেই পরিস্ফুট হবে—ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি (১৬৪৮) অনুযায়ী ইউরোপের যে মানচিত্র। জমিদারি,ডিউকদের অধিকার,ছোট রাজ্য ইত্যাদির কিছু ছিল সাম্রাজ্যের অধীনে,

কিছু বা বাইরে। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন যে সুইডেনের শক্তি জার্মানির অনেকখানি অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল; এবং সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ ব্যতীত ফ্রান্স রাইন নদীর থেকে অনেক দূরে ছিল। এই জোড়াতালির মধ্যে প্রাসিয়া রাজ্য—১৭০১ খৃষ্টাব্দে এটি রাজ্যে পরিণত হয়—ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করে এবং অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রাসিয়ার ফ্রেডেরিক দি গ্রেট (১৭৪০-৮৬) পট্সডামে তাঁর ভার্সাই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর রাজসভায় ফরাসী ভাষা প্রচলিত ছিল, ফরাসী সাহিত্য পড়া হত এবং ফরাসী রাজাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা চলত।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হানোভারের ইলেক্টর ইংল্যাণ্ডের রাজা হওয়ায় সাম্রাজ্যের অর্ধেক অভ্যন্তরে ও অর্ধেক বাইরে-থাকা রাজ্যগুলির সঙ্গে আর-একটি অনুরূপ রাজ্য যোগ হয়।

পঞ্চম চার্লসের বংশধরদের অস্ট্রীয় শাখা সম্রাট উপাধি বজায় রাখলেন, স্পেনীয় শাখা স্পেনের আধিপত্য বজায় রাখলেন। কিন্তু পুবদিকে আবার আর এক সম্রাটের উদয় হয়। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর (১৪৫৩) মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক, ইভান দি গ্রেট (১৪৬২-১৫০৫) বাইজান্টাইন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে দাবি জানালেন এবং তাঁর পতাকায় বাইজান্টাইন দুমুখো ঈগল পাখির ছবি গ্রহণ করলেন। তাঁর পৌত্র চতুর্থ ইভান, ইভান দি টেরিবল (১৫৩৩-৮৪) রাজ-উপাধি হিসাবে সীজার (জার) নাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই শুধু রাশিয়াকে আর বহুদূরবর্তী কিংবা এশীয় সাম্রাজ্য বলে ইউরোপীয়দের মনে হল না। জার পিটার দি গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আওতার মধ্যে রাশিয়াকে এনে ফেললেন। তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য নেভা নদীর উপর পিটার্সবুর্গ নামে এক নতুন রাজধানী তৈরি করলেন—এটি রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাতায়নের কাজ করত, যদিও আঠার মাইল দূরে এক ফরাসী স্থপতিশিল্পীর সাহায্যে পিটারহফএ তাঁর ভার্সাই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসিয়ার মত রাশিয়াতেও ফরাসীই রাজভাষা হল।

অস্ট্রিয়া, প্রাসিয়া ও রাশিয়ার মাঝখানে পড়ে পোল্যাণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়েছিল—বিরাট জমিদারদের এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনকামী জমিদারেরা তাঁদের নির্বাচিত রাজাকে নামমাত্র রাজার বেশি সম্মান দিতেন না। পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন মিত্ররাজ্য হিসাবে রাখার ফ্রান্সের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার ভাগ্যে ছিল তার তিন প্রতিবেশীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া। সুইজারল্যাণ্ড এ সময়ে ছিল ছোট-ছোট প্রজাতন্ত্র-রাজ্যের সমষ্টি।

ভেনিস প্রজাতন্ত্র রাজ্য, জার্মানির মত ইটালিও ছোট-ছোট ডিউক ও রাজাদের মধ্যে বিভক্ত। পোপ তাঁর নিজের জমিদারির উপর রাজার মত আধিপত্য করতেন, যদিও অবশিষ্ট ক্যাথলিক দেশ হস্তচ্যুত হওয়ার ভয়ে খৃষ্টধর্মরাজ্যের সাধারণ কল্যাণের কথা স্মরণ করানো বা ক্যাথলিক রাজা বা প্রজাদের কাজে কোন হস্তক্ষেপ করার আর তাঁর এতটুকু সাহস ছিল না। সর্ববাদীসম্মত কোন রাজনৈতিক আদর্শ ইউরোপে কখনো ছিল না; ইউরোপ ছিল বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদে বিভগ্ন।

প্রত্যেক রাজা এবং প্রজাতন্ত্র রাজ্য অপর রাজ্যকে জোর করে দখলের চেষ্টা করতেন। প্রত্যেকেই তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আক্রমণাত্মক মৈত্রীর বৈদেশিক নীতি প্রয়োগ করতেন। আমরা, ইউরোপীয়রা, আজও এই বিভিন্নমুখী রাজাদের যুগের শেষভাগে বাস করছি এবং তৎকালীন উৎপন্ন ঘৃণা যুদ্ধ ও সন্দেহ আজও সহ্য করছি। আধুনিক বুদ্ধিতে এই যুগের ইতিহাস দিন দিন 'গালগল্প', নিরর্থক ও বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। ছোটখাট উৎকোচ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী বুদ্ধিমান ছাত্রকে বিরক্তই করে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এই যে, হাজার সীমানার বাধা সত্ত্বেও পাঠ ও চিন্তা তখনও বিস্তার লাভ করছিল এবং নতুন নতুন আবিষ্কার তখনও হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে-যুগের রাজসভা ও রাজনীতিতে সন্দিগ্ধ ও ছিদ্রান্বেষী এক সাহিত্য গড়ে উঠল। ভল্টেয়ারের 'ক্যাণ্ডিড'এ ইউরোপীয় জগতের অপরিকল্পিত বিশৃঙ্খলার অসীম ক্লান্তির প্রকাশ দেখতে পাই।

এশিয়া ও সাগরপারে ইউরোপীয়দের নতুন সাম্রাজ্য

মধ্য ইউরোপ যখন এইরকম বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল, পশ্চিম ইউরোপীয়রা, বিশেষত ওলন্দাজ (ডাচ: হল্যাণ্ডের অধিবাসী), স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ফরাসী ও বৃটিশরা সাত সাগরের পারে তাদের সংগ্রামের সীমানা বাড়িয়ে চলেছিল। ছাপাখানা ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রথমে অনিশ্চিতভাবে এবং পরে বিরাট মাতন তুলেছিল, কিন্তু অপর আবিষ্কার, সমুদ্রগামী জাহাজ, লোনা জলের সুদূরতম সীমানা পর্যন্ত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার পরিসর দৃঢ়ভাবে প্রসারিত করছিল।

ওলন্দাজ ও উত্তর আটলাণ্টিক ইউরোপীয়দের সাগরপারের প্রথম উপনিবেশ-গুলির পত্তন হয় সাম্রাজ্য হিসাবে নয়, বাণিজ্য ও খনিজ দ্রব্যের জন্য। স্পেনীয়রাই এই ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিল; আমেরিকার নতুন জগতের সমস্তটাকেই

তারা তাদের সাম্রাজ্য হিসাবে দাবি করে। খুব শীঘ্রই পর্তুগীজরা তার থেকে অংশ দাবি করল। পোপ এই নতুন মহাদেশকে এই দুই প্রথম আগন্তুকের মধ্যে ভাগ করে দিলেন—পৃথিবীর অধীশ্বরী হিসাবে রোমের এইটিই অন্যতম শেষ কাজ—পর্তুগালকে দিলেন ব্রেজিল ও কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের ৩৭০ লীগ দূরে এক সীমারেখার পূর্বে অবস্থিত সমস্ত দেশ, এবং স্পেনকে দিলেন সমস্ত অবশিষ্টাংশ
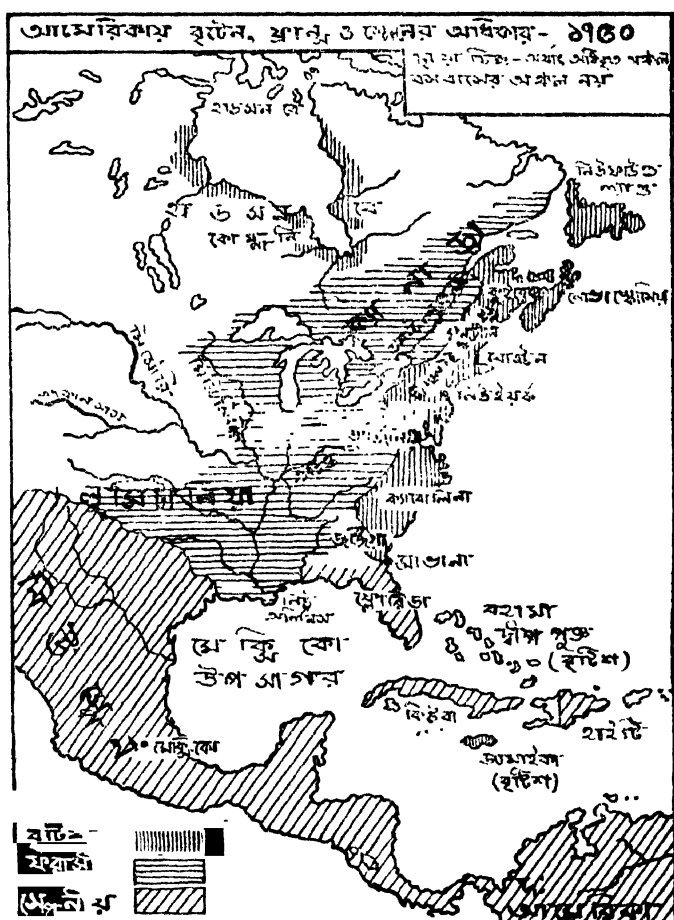
(১৪৯৪)। এই সময় আবার পর্তুগীজরা সাগরপারে দক্ষিণ ও পূবদিকেও তাদের অভিযান চালিয়েছিল। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা লিসবন থেকে যাত্রা করে কেপ ঘুরে জাঞ্জিবার এবং পরে ভারতবর্ষের কালিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ ও মলাক্কায় পর্তুগীজ জাহাজ দেখা যায় এবং পর্তুগীজরা

ভারত মহাসাগরের চারিপাশে তাদের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে দুর্গ দিয়ে সুদৃঢ় করে তোলে। মোজাম্বিক, ভারতবর্ষে গোয়া এবং আরো দুটি ছোট ছিটমহল, চীনে মাকাও, টাইমোরের একাংশ, আজ পর্যন্ত পর্তুগীজ উপনিবেশ।

পোপের মীমাংসার ফলে যেসব জাতি আমেরিকার অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তারা স্পেন ও পর্তুগালের অধিকার-স্বত্ব মানল না। ইংরেজ, দিনেমার (ডেনমার্কের অধিবাসী), সোয়েড এবং সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজরা উত্তর আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উপর অংশ দাবি করল ; ফ্রান্সের মহামহিম ক্যাথলিক সম্রাটও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মতই পোপের মীমাংসাকে দূরে ফেলে দিয়েছিলেন। ইউরোপের যুদ্ধগুলির ফল এই দাবি ও উপনিবেশের উপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছিল।

সাগরপারের সাম্রাজ্য-কাড়াকাড়িতে শেষ পযন্ত ইংরেজরাই সবচেয়ে সফল হয়। সোয়েড ও দিনেমাররা জার্মানির জটিল পরিস্থিতিতে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়ে যে, দেশের বাইরে সৈন্য পাঠিয়ে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট 'উত্তর দেশের সিংহ', গুস্তাভাস অ্যাডল্ফাস নামে সুইডেনের এক অভিনব রাজা, জার্মান রণক্ষেত্রে সুইডেনের সমস্ত শক্তির অপচয় করেন। আমেরিকায় সুইডেন যে ছোট-ছোট উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ওলন্দাজরা তার উত্তরাধিকারী হয় এবং ওলন্দাজরা ফরাসী আক্রমণের এত নিকটে ছিল যে বৃটিশদের কাজ থেকে তাদের নিজেদের উপনিবেশ রক্ষা করা সুদূর-পরাহত ছিল। দূর-প্রাচ্যে সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বৃটিশ ফরাসী ও ওলন্দাজ এবং আমেরিকায় ছিল বৃটিশ ফরাসী ও স্পেনীয়। বৃটিশদের মস্ত সুবিধা ছিল তাদের সীমান্ত—ইংলিশ চ্যানেলের 'রজত-রেখা'। ল্যাটিন সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য তাদের একটুও জড়িয়ে ফেলতে পারে নি।

ফ্রান্স বরাবর ইউরোপ নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছে। সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে স্পেন ইটালি ও জার্মান বিশৃঙ্খলতার উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পুবে ও পশ্চিমে তার সীমানা-বৃদ্ধির সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনেও রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধের ফলে অনেক ইংরেজ চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল। তাদের সেখানে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, বংশবৃদ্ধি ও জনবল আমেরিকার সংগ্রামে বৃটিশদের মস্ত সুবিধা এনে দিয়েছিল। ১৭৫৬ ও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ও তার আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের কাছে ফরাসীরা ক্যানাডা দিয়ে দিতে বাধ্য হল, এবং কয়েক বছর পরে বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে ফরাসী ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে চরম

প্রাধান্য বিস্তার করল। বাবর আকবর ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের বিরাট মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রায় একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছিল এবং একটি লণ্ডনের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, 'বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' কর্তৃক ভারতবর্ষ-অধিকার সমগ্র বিজয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা।

রানী এলিজাবেথের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠনের সময় এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কয়েকজন বিশিষ্ট নাবিকদের এক কোম্পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ধীরে ধীরে তারা তাদের সৈন্যবাহিনী গঠন করতে ও তাদের জাহাজ অস্ত্র-সমৃদ্ধ করতে বাধ্য হয়। তারপর লাভের ঐতিহ্যমাণ্ডত এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শুধু যে মশলা নীল চা ও মণিমুক্তার ব্যবসাই করতে লাগল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের রাজ্যের রাজস্বের এবং ভারতবর্ষেরও ভাগ্যের ব্যবসা শুরু করল। এই কোম্পানি এসেছিল বাণিজ্যের জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য রকমের জলদস্যুতা আরম্ভ করল। তার কাজে বাধা দেবার কোন শক্তি ছিল না। তার ক্যাপ্টেন, সেনাপতি, কর্মচারী, এমন কি কেরানী ও সাধারণ সেনারাও যে প্রচুর ধনরত্ন বোঝাই করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসবে, এতে এমন আশ্চর্য হবার আর কী আছে?

এইরকম পরিস্থিতিতে এবং এক বিরাট ঐশ্বর্যশালী দেশ তাদের করতলগত হলে তাদের কী করা উচিত বা অনুচিত, মানুষ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এ দেশ ছিল তাদের কাছে এক আশ্চর্য দেশ। এখানকার রৌদ্র অন্য রকম; এখানকার বাদামি লোকেরা তাদের কাছে ভিন্ন জাতির, তাদের সহানুভূতির বাইরে; এদের রহস্যময় মন্দিরের ছিল অদ্ভুত আচার-ব্যবহার। দেশে ফিরে যখন এই সেনাপতি ও কর্মচারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার কুৎসিত দোষারোপ করত তখন দেশের ইংরেজরা হতবুদ্ধি হয়ে যেত। ক্লাইভের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট নিন্দাজনক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের দ্বিতীয় শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয় এবং মুক্তি দেওয়া হয় (১৭৯২)। পৃথিবীর ইতিহাসে এ একটি অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব ঘটনা। ইংরেজ পার্লামেণ্ট লণ্ডনের এক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভুত্ব করছে, যে প্রতিষ্ঠান আবার সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার বহু-গুণ-বিশিষ্ট এক দেশের উপর কর্তৃত্ব করছে। অধিকাংশ ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষ ছিল বহু দূরের; অদ্ভুত, প্রায় অনধিগম্য এক দেশ, যেখানে দরিদ্র সাহসী যুবকরা যায় এবং বহু বৎসর পরে অত্যন্ত ধনী এবং খিটখিটে 'বৃদ্ধ ভদ্রলোক' হয়ে দেশে ফেরে। প্রাচ্যের এই অসংখ্য বাদামি লোকদের জীবন কী ধরনের ছিল, তা ছিল ইংরেজদের ধারণাতীত। তাদের কল্পনা সত্য পরিচয় লাভে ব্যর্থ

হল। ভারতবর্ষ উপকথার মত অসত্য রয়ে গেল। তাই কোম্পানির কাজের উপর কার্যকরী কোন তত্ত্বাবধান ও শাসন করা ইংরাজদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এবং যখন পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলি সাগর-পারের এই সব আশ্চর্য দেশের জন্য সাত সাগরে লড়াই করে মরছিল, তখন এশিয়ার মাটির উপর দুটি বিজয়-সাফল্য সঙ্ঘটিত হয়। চান ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোল শাসন দূর করে দিয়েছিল এবং ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশজ মিঙ বংশের শাসনাধীনে বর্ধিত হচ্ছিল। তারপর আর এক মঙ্গোল জাতি, মাঞ্চু, চীন অধিকার করে এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের উপর প্রভুত্ব করে। ইতিমধ্যে রাশিয়া পুব দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং বিশ্ব-ঘটনায় প্রাধান্য অর্জন করছিল। পুবেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, পুরাতন কেন্দ্রস্থ এই বিরাট শক্তির অভ্যুত্থান মানুষের নিয়তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কসাক নামে একদল খৃষ্টান তৃণাঞ্চলের জাতির অভ্যুত্থানের ফলেই এই শক্তির এতটা প্রসার সম্ভব হয়েছিল—এই কসাকরা পশ্চিমে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারির সামন্তরাজ ও পুবে তাতারদের মধ্যে প্রাচীরের কাজ করত। কসাকদের বলা যেতে পারে প্রাচ্য ইউরোপের বন্য অধিবাসী; পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের বন্য অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। বদমাইস, অত্যাচারিত নির্দোষ, বিদ্রোহী প্রজা, ধর্ম-বিদ্রোহী, চোর, ভবঘুরে, হত্যাকারী—অর্থাৎ যাদের পক্ষে রাশিয়ায় বাস করা কঠিন ছিল তারা এই দক্ষিণের তৃণাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করত এবং জীবন ও স্বাধীনতার জন্য পোল, রুশ ও তাতারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত। পুব থেকে পলাতক তাতাররাও এদের শক্তিবৃদ্ধি করতে লাগল। তারপর বৃটিশ শাসনতন্ত্র যেমন স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডারদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করে, সেইরকম এদেরও রাশিয়ার রাজ-বাহিনীতে গ্রহণ করা হয়। এশিয়ায় নতুন জায়গা তাদের দেওয়া হয়। যাযাবর মঙ্গোলদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির বিরুদ্ধে, প্রথমে তুর্কীস্তানে পরে সাইবেরিয়া থেকে আমুর পর্যন্ত, এদের অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলদের ক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন। জেঙ্গিস এবং তাইমুরলেনের দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে মধ্য এশিয়া পৃথিবীর প্রাধান্যের ভূমিকা থেকে অত্যন্ত শক্তিহীন অবস্থায় নেমে এসেছিল। জলবায়ুর পরিবর্তন, অলিপিবদ্ধ মড়ক, ম্যালেরিয়া জ্বরের মত কোন রোগের সংক্রমণ হয়ত এই মধ্য এশিয়ার জাতির জীবনে এই অন্তর্বর্তী কালে (পৃথিবীর ইতিহাসের মাপকাঠিতে হয়ত ক্ষণস্থায়ী ছাড়া আর কিছু নয়) এরা তাদের খেলা খেলে গেছে। কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে, চীন থেকে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারও এদের কিছুটা

শান্ত করে ফেলেছিল। যাই হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম থেকে রাশিয়া ও পুব থেকে চীন, এই মঙ্গোল তাতার ও তুর্কীদের বাইরে অভিযান চালাতে দেয় নি, বরং তাদের দেশ আক্রমণ করে। তাদের পরাজিত করে একেবারে কোনঠাসা করে রেখেছিল।

সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী ধরে কসাকরা ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে পুব দিকে অগ্রসর হয়ে যেখানেই চাষবাসের ভাল জমি-জায়গা দেখছিল সেখানেই আস্তানা গড়ে তুলছিল। দক্ষিণে তখনও তুর্কোমানরা শক্তিশালী ও যুধ্যমান থাকায় এইসব উপনিবেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য দুর্গ ও সৈন্য-শিবিরের বেষ্টনী তৈরি করা হয়, অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগর অবধি না পৌঁছনো পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে রাশিয়ার কোন সীমান্ত ছিল না।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশে নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত ও ভগ্ন ইউরোপে এক আশ্চয ও অস্থায়ী দৃশ্য দেখা যায়। তখন আর তাদের কোনও ঐক্যমূলক রাজনৈতিক বা ধর্মীয় চিন্তাধারা ছিল না; তবুও ছাপা বই, ছাপা মানচিত্র, সমুদ্র-গামী জাহাজে করে সুদূর দেশ পাড়ি দেওয়ার সুযোগ মানুষের চিন্তাধারাকে এত জাগ্রত করে তুলেছিল যে বিশৃঙ্খল ও যুধ্যমান হলেও তারাই পৃথিবীর সমস্ত উপকূলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অবশিষ্ট মানবজাতির চেয়ে একটা অস্থায়ী ও প্রায় ঘটনাচক্রে-পাওয়া বেশি সুযোগ-সুবিধা তাদের এই অপরিকল্পিত ও অসংবদ্ধ প্রয়াসে উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছিল। এই সুযোগ-সুবিধার জন্যই নতুন এবং জনশূন্যপ্রায় আমেরিকা মহাদেশে পশ্চিম ইউরোপীয়েরাই অধিবাসী হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ বাসভূমি বলে প্রায় স্থির হয়ে থাকে।

যে উদ্দেশ্য কলম্বাসকে আমেরিকায় ও ভাস্কো-দা-গামাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিল, তা হল প্রত্যেক নাবিকের চিরন্তন প্রথম উদ্দেশ্য—বাণিজ্য। যদিও প্রাচ্যের জনবহুল ও ঐশ্বর্যশালী দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান এবং ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্রই ছিল এবং ইউরোপীয়েরা দেশে ফিরে লব্ধ অর্থ ব্যয়ের আশা পোষণ করত, কিন্তু আমেরিকার ইউরোপীয়েরা অতি সীমিত উৎপাদনশক্তির দেশে এসে সোনা ও রুপো অন্বেষণের এক নতুন প্রলোভনে পড়ে গেল। আমেরিকায় ইউরোপীয়েরা শুধু যে সশস্ত্র বণিক হয়ে যেত তা নয়, নতুন ব্যবসার পত্তনে, খনির সন্ধানে, প্রাকৃতিক সম্পদের অন্বেষণে এবং চাষবাস করতেও যেত। উত্তরে যেত পশমের খোঁজে। খনি ও চাষবাসের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন। তারা সাগর-

পারে লোকদের স্থায়ী বাসিন্দা হবার সুযোগ দিত। অবশেষে অনেক সময়ে, যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ইংরেজ পিউরিটানরা ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিউ-ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিল, যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওগলেথর্প ইংল্যাণ্ডের ঋণ পরিশোধে অক্ষম অপরাধীদের জর্জিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওলন্দাজেরা অনাথ ছেলেমেয়েদের উত্তমাশা অন্তরীপে পাঠিয়ে দিত, ইউরোপীয়েরা নতুন আবাস-সন্ধানে স্বেচ্ছায় সাগর পাড়ি দিত। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিশেষ করে বাষ্প-জাহাজ প্রবর্তনের পর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার জনহীন দেশে ইউরোপীয়দের আগমন কয়েক দশক ধরে বহুলাংশে বর্ধিত হল।

এইভাবে সাগর-পারে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের পত্তন হয় এবং যে-দেশে ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম হয় তার চেয়ে অনেক অনেক বড় জায়গায় তা পুনঃস্থাপিত হয়। এই নতুন দেশে পূর্ব-সৃষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসে এই নতুন অধিবাসীরা অপরিকল্পিতভাবে এবং প্রায় অদৃশ্য ভাবেই উন্নতি করতে থাকে ; ইউরোপের রাজনীতি তাদের বিচলিত করতে পারে নি এবং তাদের সঙ্গে ওখানকার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের ছিল না। এইসব লোকদের তাদের পৃথক সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা হওয়ার বহুদিন পযন্তও ইউরোপীয় মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদরা আমেরিকাকে তাদের 'অভিযাত্রী উপনিবেশ', 'রাজস্বের উৎস', 'রাজ্য', 'অধীন রাজ্য' বলে মনে করতেন। এবং সমুদ্র থেকে শান্তিমূলক কোন ব্যবস্থার বাইরে দেশের বহু অভ্যন্তরে সকলে চলে যাওয়ার পরেও তাঁরা এদের প্রাচীন মাতৃভূমির অসহায় প্রজা বলে মনে করতেন।

তার কারণ এই যে, উনবিংশ শতাব্দীরও অনেক দিন পর্যন্ত এইসব সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় থাকত সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে। মাটির উপরে ঘোড়া তখন পযন্ত দ্রুতগামী ছিল এবং অশ্বের অভাব-হেতু দেশের রাজনৈতিক ধারায় একতা ও সংযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশে উত্তর আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল বৃটিশের অধীনে। ফ্রান্স আমেরিকা ত্যাগ করে চলে গেছে। পর্তুগীজ-অধিকৃত ব্রেজিল এবং ফরাসী, বৃটিশ, দিনেমার ও ওলন্দাজ-অধিকৃত কয়েকটি ছোটখাট দ্বীপ ছাড়া ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা, ক্যালিফোনিয়া এবং দক্ষিণ দিকের সমস্ত আমেরিকা ছিল স্পেনের অধিকারে। মেইন ও লেক অন্টেরিওর দক্ষিণ দিকের বৃটিশ উপনিবেশই প্রথম দেখাল যে সমুদ্রগামী জাহাজের যোগাযোগ ব্যবস্থাই শুধু সাগরপারের লোকদের এক রাজনৈতিক ধারার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয় না।

এই বৃটিশ উপনিবেশগুলির উৎস এবং চরিত্র ছিল বিভিন্ন রকমের। বৃটিশ ছাড়াও সে-দেশে ফরাসী, সুইডিশ ও ওলন্দাজরা ছিল; মেরিল্যাণ্ডে যেমন ছিল বৃটিশ ক্যাথলিকরা সেইরকম নিউ ইংল্যাণ্ডে ছিল বৃটিশ অতি-প্রোটেস্ট্যাণ্টরা এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তাদের জমি নিজের হাতে চাষ করত ও ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধী হলেও ভার্জিনিয়া ও দক্ষিণ উপনিবেশগুলির বৃটিশরা অত্যন্ত বেশি আমদানি-করা কাফ্রী ক্রীতদাস দিয়ে তাদের জমি চাষ করাত। এইসব রাজ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক ঐক্যও ছিল না। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যেতে গেলে
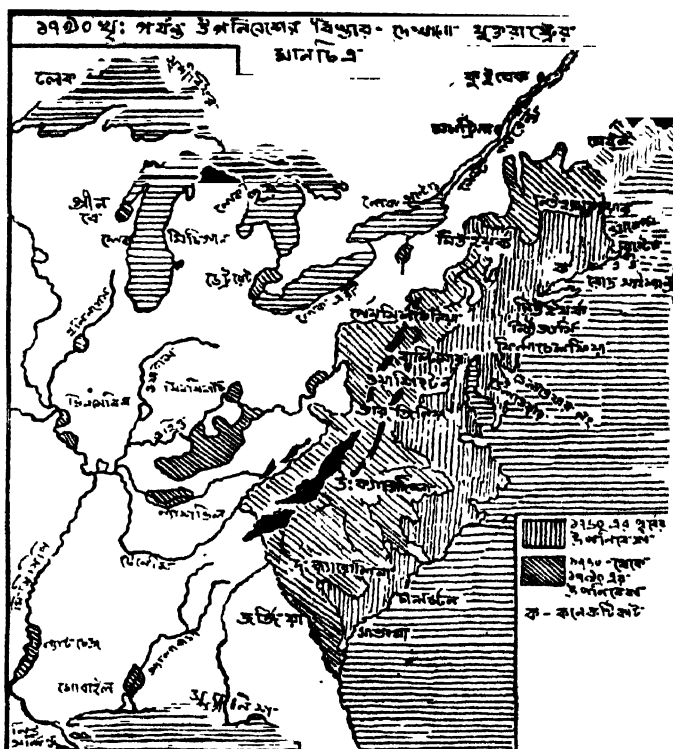
উপকূল ঘেঁসে যেভাবে জাহাজে করে যেতে হত, তার চেয়ে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হওয়াও বোধহয় কম বিরক্তিকর ছিল। উত্তর এবং প্রাকৃতিক আবেষ্টনী যে একতা তাদের মধ্যে এনে দিতে পারে নি, তা এনে দিল লণ্ডনে বৃটিশ শাসন-তন্ত্রের স্বার্থপরতা ও বোকামি। তাদের উপর কর চাপানো হত, কিন্তু কর কী ভাবে ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে তাদের একটি কথাও বলতে দেওয়া হত না; বৃটিশ স্বার্থের জন্য তাদের বাণিজ্যকে বলি দেওয়া হত: ভার্জিনিয়ার লোকদের ইচ্ছা

থাকলেও বর্বর কৃষ্ণজাতির জনসংখ্যা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় তারা দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু এই অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা বৃটিশ শাসনতন্ত্র চালু রেখেছিল।

বৃটেন এ-সময়ে একাধিপত্যের চরম সীমায় চলে যাচ্ছিল এবং তৃতীয় জর্জের (১৭৬০-১৮২০) গোঁয়ার্তুমির জন্য দেশের ও ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেছিল।

নতুন আইনের ফলে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যে আঘাত দিয়ে লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়—ফলে এই বিরোধ চরমে ওঠে। এই নতুন পরিস্থিতিতে তিন জাহাজ আমদানী চা একদল লোক ভারতীয়দের ছদ্মবেশে গিয়ে বোস্টন বন্দরের জলে ফেলে দেয় (১৭৭৩)। যুদ্ধ কিন্তু বাধে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন বৃটিশ সরকার বোস্টনের কাছে লেক্সিংটনে আমেরিকার নেতাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। বৃটিশরা প্রথমে লেক্সিংটনে গুলি চালায় আর যুদ্ধ প্রথম শুরু হয় কংকর্ডে।

এইভাবে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়, যদিও প্রায় এক বছরেরও বেশি ঔপনিবেশিকরা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি যুধ্যমান রাজ্যগুলির সম্মিলিত কংগ্রেস 'স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র' প্রকাশ করে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঔপনিবেশিক-দের অন্যতম জর্জ ওয়াশিংটনকে প্রধান সেনাপতি করা হয়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল বার্গোয়েন নামে এক বৃটিশ সেনাপতি ক্যানাডা থেকে নিউ ইয়র্কে আসার চেষ্টা করায় ফ্রিম্যান্স ফার্মে পরাজিত এবং সারাটোগায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সেই বছরেই ফ্রান্স ও স্পেন বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় সমুদ্রপথে তার যাতায়াতে ভয়ঙ্কর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জেনারেল কর্ণওয়ালিসের অধীনে দ্বিতীয় বৃটিশ বাহিনী ভার্জিনিয়ায় ইয়র্ক টাউন উপদ্বীপে অবরুদ্ধ হয় এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে শান্তি স্থাপিত হয় এবং মেইন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত তেরটি স্বাধীন উপনিবেশ সম্মিলিত স্বাধীন স্বয়ং-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। এইভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ক্যানাডা বৃটিশ পতাকার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখল।

চার বছর ধরে এই রাজ্যগুলির সম্মিলিত সন্ধিপত্রে আবদ্ধ সর্তানুযায়ী অত্যন্ত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ছিল এবং তাদের পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বৃটিশের শত্রুতা এবং কিছুটা ফরাসীদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি তাদের পৃথক হতে দেয় নি। নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং

১৭৮৮ সালে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে প্রেসিডেণ্টের হাতে অসীম ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় এবং ১৮১২ সালে বৃটিশের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাদের জাতীয় একতার মর্যাদা সকলের মনে দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু সে সময়ে রাজ্যগুলির আয়তন এত বিরাট ছিল এবং তাদের স্বার্থ এত বিভিন্ন রকমের ছিল যে সে-সময়ের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা যা ছিল তাতে এই যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় রাজ্যের মত পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হতে বেশি সময় লাগত না। দূর রাজ্যের সেনেটরকে ওয়াশিংটনের কংগ্রেস সভায় উপস্থিত হতে গেলে অত্যন্ত দীর্ঘ, বিরক্তিকর ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আসতে হত; কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এমন সব আবিষ্কারের সূচনা হতে লাগল যার ফলে এই ভাঙনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। খুব শীঘ্রই নদীতে চলার জন্য জাহাজ, তারপর রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ আবিষ্কার আমেরিকাকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তার ছড়ানো জনসংখ্যাকে সংহত করে আধুনিক বিরাট জাতির অন্যতম করে তোলে।

বাইশ বছর পরে আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলিও এই তেরটি উপনিবেশের পন্থা অনুসরণ করে ইউরোপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু এই মহাদেশে তারা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ায় এবং বিরাট পর্বতমালা মরুভূমি অরণ্যভূমি এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্য ব্রেজিল মাঝে থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করায় তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। তারা অনেকগুলি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং প্রথমে অন্তর্যুদ্ধ ও অন্তর্বিপ্লবেই লিপ্ত থাকে।

এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ কিন্তু ব্রেজিলের পক্ষে অন্যভাবে হয়েছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপলিয়নের অধীনে ফরাসী সেনাবাহিনী তাদের মাতৃভূমি পর্তুগাল অধিকার করে এবং সপারিষদ রাজা ব্রেজিলে পলায়ন করেন। সেইদিন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগালই প্রায় ব্রেজিলের অধীনে ছিল, ব্রেজিল পর্তুগালের অধীনে নয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাজার এক পুত্র প্রথম পেড্রোর অধীনে ব্রেজিল নিজেকে পৃথক সাম্রাজ্য বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই নতুন পৃথিবী কোনদিনই একাধিপত্যকে সুনজরে দেখে নি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের সম্রাটকে চুপচাপ জাহাজে চাপিয়ে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ব্রেজিল যুক্তরাষ্ট্র অবশিষ্ট প্রজাতান্ত্রিক আমেরিকার সমপর্যায়ে আসে।

ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্সে একাধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আমেরিকায় তেরটি উপনিবেশ বৃটেনের হাতছাড়া হতে-না-হতেই Grand Monarchyর ঠিক অন্তঃস্থলেই এমন বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে ইউরোপ এই পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্থায়ী প্রকৃতির স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে ইউরোপে ব্যক্তিগত একাধিপত্যের মধ্যে ফরাসী একাধিপত্যই ছিল সবচেয়ে সফল। বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ও ছোট ছোট রাজ্যের কাছে তা ছিল ঈর্ষাজনক ও আদর্শস্বরূপ। কিন্তু অন্যায় ও অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠা ছিল বলেই তার নাটকীয় পতন হয়। চমকপ্রদ ও বীর্যশালী হলেও সাধারণ লোকের জীবন ও মনের অপচয়ই তা করেছে। ধর্মযাজক ও জমিদারদের উপর কর ধার্য না করায় সমস্ত করভার পড়ত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর। চাষী সম্প্রদায় করভারে দেনায় ডুবে থাকত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জমিদার-শ্রেণীর কাছে অপমানিত ও অত্যাচারিত হত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট রাজকোষ একেবারে শূন্য দেখে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিকে আহ্বান করে ত্রুটিপূর্ণ আয় ও সুপ্রচুর ব্যয়ের ধারা নিরসনের জন্য এক মন্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান করেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রথম যুগের মত জমিদার ধর্মযাজক ও জনসাধারণের এক সভা, স্টেটস জেনারেল, ভার্সাইয়ে আহূত হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পর আর তার অধিবেশন হয় নি। এতদিন ধরে ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী একাধিপত্য চলে। এতদিন পরে জনসাধারণ তাদের বহু-দিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশের সুযোগ দেখে। থার্ড এস্টেট বা তৃতীয় সামাজিক শ্রেণী, জনসাধারণের, লোকসভায় কর্তৃত্ব করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তিন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বেধে যায়। এই বিরোধে জনসাধারণই জয়ী হয় এবং যেভাবে বৃটিশ পার্লামেন্ট বৃটিশ রাজাকে সংযত রেখেছে, ঠিক সেইভাবে রাজাকে সংযত রাখার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে স্টেটস জেনারেলকে জাতীয় মহাসভায় পরিবর্তিত করা হয়। রাজা (ষোড়শ লুই) সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সৈন্য তলব করেন। তার ফলে প্যারিস ও ফ্রান্স বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

স্বৈরাচারী একাধিপত্যের পতন হয়েছিল খুব দ্রুত। প্যারিসের জনতা ভীষণ-দর্শন ব্যাস্টিলের কারাগার বিধ্বস্ত করে এবং সমস্ত ফ্রান্স জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ধনীদের প্রমোদ-অট্টালিকা চাষীরা একেবারে ভস্মীভূত করে, তাঁদের উত্তরাধিকারীর দলিল সযত্নে নষ্ট করা হয় এবং

মালিকদের হয় হত্যা নয় বিতাড়িত করা হয়। এক মাসের মধ্যেই পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু কৌলিন্য-প্রথা একেবারে বিনষ্ট হয়। রাজকুমারদের মধ্যে অনেকে এবং রানীর পারিষদেরা দেশান্তরে পালিয়ে যান। প্যারিসে এবং অন্যান্য বড় বড় নগরে অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য এই নাগরিক সমিতিগুলি ন্যাশনাল গার্ড নামে এক নতুন সৈন্য-বাহিনী গঠন করে। এক নতুন যুগের জন্য জাতীয় মহাসভার উপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

এই মহাসভার শক্তির চরম পরীক্ষা ছিল এই দায়িত্ব সম্পাদন করা। স্বৈরাচারী যুগের সমস্ত অবিচার এই মহাসভা ঝড়ের মত বিদায় করে; কর-অব্যাহতি, কৃষি-দাস্য, কৌলীন্য-সূচক খেতাব ও সুযোগ রহিত করে এবং প্যারিসে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। রাজা ভার্সাই ও তার আড়ম্বর ত্যাগ করে প্যারিসে টুইলেরিজ প্রাসাদে অনেক কম আড়ম্বরেব মধ্যে বাস করিতে থাকেন।

দু-বছর ধরে, মনে হয়, জাতীয় মহাসভা এবং ফলপ্রসূ আধুনিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালায়। অনেক কাজ তাদের পরীক্ষামূলক এবং ভ্রান্তিকর হলেও অনেক কাজ ছিল সুষ্ঠু এবং আজও তা প্রচলিত। দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার করা হয়; অত্যাচার, খুশিমত কারাগারে নিক্ষেপ এবং ধর্ম-বিরুদ্ধতার জন্য শাস্তি বন্ধ করা হয়। নর্ম্যাণ্ডি ও বার্গাণ্ডির মত ফ্রান্সের প্রাচীন প্রদেশগুলির পরিবর্তে আশিটি বিভাগ হয়। সেনাবাহিনীর উচ্চতম পদ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য অবারিত করা হয়। এক চমৎকার ও অত্যন্ত সরল প্রথার উপরে আদালত সৃষ্টি হয়, কিন্তু অল্প-দিনের জন্য মাত্র বিচারপতিরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার ফলে তার মূল্য অনেকখানি কমে যায়। এর ফলে জনসাধারণেরই উপর পড়ে বিচারের চরম শক্তি এবং মহাসভার সভ্যদের মত বিচারকরাও লোকরঞ্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। গির্জার সমস্ত বিপুল সম্পত্তি ছাড়িয়ে নিয়ে রাজ-সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে; শিক্ষা বা সেবাধর্মে ব্রতী ব্যতীত অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলা হয় এবং ধর্ম-যাজকদের বেতনভুক করায় জাতির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। ফ্রান্সের ছোটখাট ধর্মযাজকদের পক্ষে এটি খুব খারাপ হয় নি, কারণ তাঁরা বড়-বড় ধর্মযাজকদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বেতন পেতেন। তার উপরে পুরোহিত ও বিশপের নির্বাচন-ব্যবস্থা করায় রোমান গির্জার মূল শক্তিতে আঘাত পড়ে; কারণ তাদের ধারণায় কার্ডিন্যাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পদ-নির্বাচনের অধিকার শুধু পোপের উপরই ন্যস্ত ছিল। অর্থাৎ জাতীয় মহাসভা এক আঘাতে ফরাসী

গির্জাকে ধর্মত না পারলেও কার্যত প্রটেস্ট্যান্ট করে তোলার আদর্শ গ্রহণ করে এবং সর্বত্রই জাতীয় মহাসভা-নির্বাচিত ধর্মযাজক ও রোম-অনুগত বিরোধী ধর্মযাজকদের মধ্যে বিরোধ বেধে যায়।

বাইরের কুলীন ও রাজন্য বন্ধুদের পরামর্শে রাজা ও রানী এমন এক কাজ করেন, যার ফলে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরীক্ষা এক নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। পূর্ব সীমান্তে বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ হয় এবং জুনের এক রাত্রে রাজা ও রানী তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোপনে টুইলেরিজের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে বিদেশী রাজা ও বিতাড়িত অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পলায়ন করেন। ভ্যারেনেসএ তাঁরা ধরা পড়েন ও প্যারিসে তাঁদের নিয়ে আসা হয় এবং সমস্ত ফ্রান্স দেশাত্মবোধক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য উদ্দীপনায় জ্বলে ওঠে। ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র-রাজ্য ঘোষণা করা হয়, অস্ট্রিয়া ও প্রাসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে এবং ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুযায়ী প্রজাদ্রোহিতার অপরাধে রাজার বিচার হয় এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয় (জানুয়ারী, ১৭৯৩)।

ফরাসী জনসাধারণের ইতিহাসে এর পর এক অদ্ভুত যুগ এসে পড়ে। ফ্রান্স এবং প্রজাতন্ত্র রাজ্যের জন্য বিরাট আবেগ ও উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। দেশে ও বিদেশে আপোষ নিষ্পত্তির শেষ হবে; দেশে রাজভক্ত এবং যেকোন রকম দেশদ্রোহিকে দৃঢ়ভাবে দমন করা হবে; বিদেশের সমস্ত বিপ্লবের ফ্রান্স হবে পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক। সমস্ত ইউরোপে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে হবে। ফ্রান্সের যুবকেরা প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতে দলে দলে যোগ দেয়, এক নতুন এবং আশ্চর্য সুন্দর গান সারা দেশ ভরে ফেলে, সেই গান, যা আজও নেশার মত সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত করে—'মার্সাই'। এই গান, ফরাসী বেয়নেটের ঝলসানি ও উৎসাহমুখর কামানের সামনে বিদেশী সৈন্যেরা পিছিয়ে পড়ে; ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ শেষ হওয়ার আগেই ফরাসী বাহিনী চতুর্দশ লুইএরও চরম-লব্ধ সীমান্ত অতিক্রম করে যায়। সর্বত্রই তারা বিদেশে এসে থামে। ব্রাসেলসে তারা এসেছে, সাভয়কে তারা পর্যুদস্ত করেছে, মেয়েন্স তারা আক্রমণ করেছে, হল্যাণ্ডের কাছ থেকে তারা শেল্ট ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর ফরাসী সরকার বোকার মত এক কাজ করে। লুইএর শিরশ্ছেদনের পর ইংল্যাণ্ড তাদের প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করায় ফ্রান্স অপমানিত বোধ করে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটা অত্যন্ত বোকামির কাজ হয়, কারণ যে বিপ্লব ফ্রান্সকে এক নতুন উৎসাহী পদাতিক বাহিনী, উচ্চশ্রেণীর সেনাপতিদের কর-মুক্ত অপূর্ব গোলন্দাজ বাহিনী দেয়, তা নৌবাহিনীর শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতাও নষ্ট করে ফেলে। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের ছিল সমুদ্রে একাধিপত্য। এবং এই যুদ্ধ সমস্ত

ইংল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক করে ফেলে, যদিও প্রথমে তাদের বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিতে গ্রেট বৃটেনে প্রচুর উদার সমর্থন জেগে ওঠে।

পরের কয়েক বছর ফ্রান্স ইউরোপীয় সংযুক্ত শক্তির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে, তার বিশদ বর্ণনা আমরা দিতে পারি না। তারা চিরকালের জন্য অস্ট্রিয়াকে বেলজিয়াম থেকে বিতাড়িত করে, হল্যাণ্ডকে প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে। টেক্সেলে তুষারাবৃত ওলন্দাজ নৌবাহিনী একটি গুলিও না ছুঁড়ে মুষ্টিমেয় অশ্বারোহীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সের ইটালি-অভিযান ব্যাহত হয়; কিন্তু ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক নতুন সেনাপতি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনীকে পিয়েডমণ্ট পার হয়ে মাণ্টুয়া ও ভেরোনা পর্যন্ত বিজয়-গৌরবে নিয়ে যান। সি এফ অ্যাটকিনসন বলেন:

'যা মিত্রশক্তিকে বিস্মিত করে তা হল প্রজাতন্ত্রীদের সংখ্যা ও দ্রুত গতি। এই সৈন্যবাহিনীর বিলম্বের কোন কারণও ছিল না। অর্থাভাবে তাঁবু নেই, এত বেশি গাড়ির প্রয়োজন যে তাদের পরিবহনের ব্যবস্থা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও ছিল না—কারণ যেসব অসুবিধায় বেতনভুক সৈন্যরা সদলে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে যায়, ১৭৯৩-৪ সালের সৈন্যেরা তা হাসিমুখে সহ্য করত। অশ্রুতপূর্ব সংখ্যার এত বিরাট বাহিনীর রসদ নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই ফরাসীরা শীঘ্রই যত্রতত্র ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। এইভাবে ১৭৯৩ সালে যুদ্ধের আধুনিক প্রথার জন্ম হয় – ক্ষিপ্র গতি, জাতীয় শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ, সতর্ক রাত্রি-জাগরণ, সৈন্যদলে যোগদানে আহ্বান, শক্তি; পূর্বে ছিল ধীর গতি, ছোট বেতনভুক সেনাবাহিনী, শিবির ও সম্পূর্ণ রসদ আর ছিল প্রবঞ্চনা। প্রথমটিতে ছিল মীমাংসা চূড়ান্ত করার উদ্দীপনা, দ্বিতীয়টিতে অল্প লাভের জন্য অল্প ঝুঁকি নেওয়া।……'*

এবং যতদিন এই ছিন্ন-জীর্ণবেশী অতি-উৎসাহী সৈনিকরা মার্সাই গান গেয়ে স্বদেশের হয়ে যুদ্ধ করছিল—যে দেশে তারা অনুপ্রবেশ করছিল সে দেশ তারা লুঠ করছে, না তাকে মুক্তি দিচ্ছে একরকম না জেনেও—ততদিন প্যারিসে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের উদ্দীপনা অনেক কম গৌরবের সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসছিল। এই বিপ্লব তখন এক ধর্মোন্মত্ত নেতা রোবেস্‌পিয়েরের হাতে চলে গেছে। এই লোকটিকে বিচার করা কঠিন; দুর্বল দেহ, স্বভাবত ভীরু ও সৌখিন। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ শক্তি ও বিশ্বাস অর্জন করার অসামান্য প্রতিভা। তাঁর স্বকল্পিত উপায়ে এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি ছাড়া আর কেউ একে রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং

* এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় তাঁর 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনারি ওয়ারস্' প্রবন্ধে

শক্তি-সঞ্চয় করতে গেলে এই রাজ্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন। মনে হয়, প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের জীবিত আত্মার উদ্ভব হয়েছিল রাজানুগতদের হত্যা ও রাজার শিরশ্ছেদন থেকে। বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল; পশ্চিমে লা ভেন্দি জেলায় একটি—সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ও গোঁড়া ধর্মযাজককে গদিচ্যুত করায় জনসাধারণ বিদ্রোহ করে, তাদের পরিচালনা করেন ধনী জমিদার ও ধর্মযাজকেরা: আর একটি দক্ষিণে—লিয়ঁ ও মার্সেইল্‌সে বিদ্রোহ হয়, এবং তুলোঁর রাজভক্ত জনসাধারণ ইংরেজ ও স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রবেশ করতে দেয়। রাজভক্তদের নির্মমভাবে হত্যা করে যাওয়া ছাড়া এর আর কোন উত্তর জানা ছিল বলে মনে হয় না।

বিপ্লবী আদালত কাজ শুরু করল, এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল। দেশের এই মেজাজে গিলোটিনের উদ্ভাবনা সময়োচিত হয়: রানীকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়, রোবেস্‌পিয়েরের সমস্ত বিরুদ্ধাচারীকে গিলোটিনে দেওয়া হয়, যে নাস্তিকরা বলত যে ঈশ্বর নেই তাদেরও গিলোটিনে হত্যা করা হয়। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এই নতুন নারকী যন্ত্র মুহুর্মুহু কেটে চলত—মাথা, আরো মাথা, আরো, আরো মাথা। রোবেস্‌পিয়েরের রাজত্বে রক্তের স্রোত বয়ে গেছিল, এবং আফিম-খোরের যেমন দিন-দিন আফিমের মাত্রা বেড়ে যায়, সেইরকম রোবেস্‌পিয়েরের রাজত্বেও রক্তের স্রোত দিন দিন বেড়ে চলল।

অবশেষে ১৭৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে রোবেস্‌পিয়েরেরও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকেও গিলোটিনে হত্যা করা হয়। তাঁর স্থানে পাঁচজনের এক পরিচালক-সমিতি কার্যভার গ্রহণ করে; তাঁরা বিদেশে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন এবং পাঁচ বছর ধরে দেশকে একত্র ধরে রেখে দিলেন। এই বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাসে তাঁদের রাজত্ব এক অদ্ভুত কৌতুকের মত ছিল। তাঁরা ঘটনানুগ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। বিপ্লব-প্রচারের আগ্রহ ফরাসী সৈন্য-বাহিনীকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, দক্ষিণ জার্মানি ও উত্তর ইটালিতে নিয়ে গেছিল। রাজাদের বিতাড়িত করে সর্বত্র প্রজাতন্ত্রী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী সরকারের অর্থনৈতিক উদ্বেগ দূর করার জন্য এই পরিচালক সমিতির উৎসাহিত বিপ্লব-প্রচারের আগ্রহ মুক্তিলব্ধ দেশবাসীর ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে বাধা দেয় নি। তাদের যুদ্ধ দিন দিন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভাব কাটিয়ে প্রাচীন যুগের আক্রমণাত্মক সংগ্রামের ধারা গ্রহণ করছিল। চরম একাধিপত্যের বৈদেশিক নীতির ঐতিহ্য ত্যাগ করাই ফ্রান্সের আদর্শ ছিল; কিন্তু এই পরিচালক সমিতির অধীনে সেই ঐতিহ্য এমন অটুট ছিল যে মনে হবে যেন কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নি।

ফ্রান্স এবং সমস্ত জাতিটির পক্ষে দুঃখের ব্যাপার এই যে, এবার এমন এক মানুষের আবির্ভাব হল, যাঁর মধ্যে ফরাসীদের চিরন্তন জাতীয় আত্মাভিমান সুতীব্র ছিল। তিনি তাঁর দেশকে দশ বছর গৌরবের উজ্জ্বলতম শিখরে রেখেছিলেন এবং তার উপর শেষ পরাজয়ের চরম গ্লানিও এনে দিয়েছিলেন। ইনি হলেন সেই নেপলিয়ন বোনাপার্ট, যিনি পরিচালক সমিতির সৈন্যবাহিনীকে ইটালিতে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেন।

পরিচালক সমিতির পাঁচ বছরের কার্যকালের মধ্যেই তিনি স্বীয় উন্নতির জন্য কৌশল ও কাজ করে যাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অতি সীমিত, কিন্তু তাঁর প্রাণবীর্য ছিল অসাধারণ, কর্মদক্ষতা ছিল অবিশ্বাস্য। তিনি প্রথমে ছিলেন রোবেস্‌পিয়ের-মতাবলম্বী একজন চরমবাদী; তাঁর প্রথম পদোন্নতি শুধু তার জন্যই হয়; কিন্তু ইউরোপে যে নবশক্তির উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সঠিক ধারণা ছিল না। তাঁর চরম রাজনৈতিক কল্পনা তাঁকে পশ্চিম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে তা চটকদার হলেও বিলম্বিত। তিনি প্রাচীন পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের অবশিষ্টকে ধ্বংস করে প্যারিসকে কেন্দ্র করে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভিয়েনাস্থিত সম্রাট পবিত্র রোম্যান সম্রাটের খেতাব ত্যাগ করে শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ার সম্রাট হয়ে থাকেন এবং অস্ট্রিয়ান রাজকুমারীকে বিবাহ করার জন্য তিনি তাঁর ফরাসী পত্নীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রধান অধিনায়ক হলেও কার্যত ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন; এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শার্লমেঁর সুস্পষ্ট অনুকরণে তিনি নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। প্যারিসে পোপ তাঁকে অভিষিক্ত করলেন এবং শার্লমেঁর নির্দেশমত পোপের হাত থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করে নিজের হাতে মাথায় পরেন। তাঁর পুত্রকে রোমের রাজা করা হয়।

কয়েক বছর ধরে নেপোলিয়নের রাজত্ব ছিল বিজয়ের ইতিহাস। ইটালি ও স্পেনের অধিকাংশ তিনি জয় করেছিলেন, প্রাসিয়া ও অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেছিলেন এবং রাশিয়ার পশ্চিমস্থ সমস্ত ইউরোপের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তিনি বৃটিশের হাত থেকে সমুদ্রের কর্তৃত্ব ছাড়িয়ে নিতে পারেন নি এবং তাঁর নৌবাহিনী বৃটিশ অ্যাডমিরাল নেলসনের কাছে ট্রাফালগারের যুদ্ধে (১৮০৫) চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তোলে এবং ওয়েলিংটনের অধীনে এক বৃটিশ বাহিনী ফরাসী বাহিনীকে এই উপদ্বীপ থেকে উত্তর দিকে বহিষ্কৃত করে দেয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর

সঙ্গে তার প্রথম অ্যালেকজাণ্ডারের বিরোধ হয় এবং ছয় লক্ষ সেনার এক অবিশ্বাস্য বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং রুশরা ও রাশিয়ার শীত তাদের পরাজিত এবং অধিকাংশকে নিহত করে। জার্মানি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সুইডেন বিরুদ্ধাচারী হয়। ফরাসী সেনাবাহিনীরা পরাজিত হয় এবং ফন্টেনব্লোতে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করেন (১৮১৪)। তাঁকে এল্‌বায় দ্বীপান্তরিত করা হয় কিন্তু একবার শেষ চেষ্টার জন্য তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং বৃটিশ বেলজিয়াম ও প্রাসিয়ার সম্মিলিত সেনা-বাহিনীর কাছে ওয়াটার্লুতে পরাজিত হন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট হেলেনায় বৃটিশ বন্দী হিসাবে তিনি মারা যান।

ফরাসী-বিপ্লবের শক্তি অপচয়ে শেষ হয়ে গেল। এই বিরাট তুফান যে পরিস্থিতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে, তাকে যথাসম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভিয়েনায় বিজয়ী মিত্রশক্তিদের এক অধিবেশন হয়। প্রায় চল্লিশ বছর ইউরোপে এক রকমের শান্তি, নিঃশেষিত শক্তির এই শান্তি, প্রতিষ্ঠিত থাকে।

১৮৫৪ থেকে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুটি প্রধান ব্যাপার সম্পূর্ণ সামাজিক ও আন্তর্জাতিক অশান্তির প্রতিবন্ধক ও বিভিন্ন যুদ্ধের কারণ হয়। প্রথমটি হল রাজাদের অযৌক্তিক ক্ষমতা-পুনঃগ্রহণের চেষ্টা, এবং মানুষের চিন্তা লেখা ও শিক্ষা-ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ। দ্বিতীয়টি হল ভিয়েনায় রাজনীতিবিদদের ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অকার্যকরী সীমান্ত-নির্দেশ।

পুরাতন কালের একাধিপত্য যুগে প্রত্যাবর্তনের প্রথম এবং সবিশেষ চেষ্টা স্পেনেই দেখা যায়। এখানে এমনকি জনসাধারণের ক্যাথলিক ধর্মের উপর বিশ্বাস কতখানি তা বিচারের জন্য আদালতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসানোর পর আটলান্টিকের ওপারে স্পেনীয় উপনিবেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অনুসরণে ইউরোপীয় প্রধান শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জেনারেল বলিভার ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন। স্পেন এই বিদ্রোহ দমন করতে পারে নি, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মতই এই যুদ্ধ চলতে থাকে এবং অবশেষে 'পবিত্র মৈত্রী'র আদর্শে অস্ট্রিয়া প্রস্তাব করে যে এই সংগ্রামে ইউরোপীয় সম্রাটদের স্পেনকে সাহায্য করা উচিত। ইউরোপে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে বৃটেন কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মনরোর তৎপর ঘোষণাতেই একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। তিনি ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম জগতে ইউরোপীয় প্রথার যে-কোনরকম বিস্তারকে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বলে মনে করবে। এই

হল মনরো ডক্‌ট্রিন, যে ঘোষণায় বলা হল যে আমেরিকার বাইরের কোন সরকারের হস্তক্ষেপ চলবে না, যার জন্য আজ প্রায় একশো বছর প্রধান শক্তি-গোষ্ঠীকে আমেরিকার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং স্প্যানিশ আমেরিকান নতুন রাজ্যগুলিকে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবার ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

কিন্তু স্পেন তার উপনিবেশ হারালেও ইউরোপের সম্রাটদের সাহায্যে সে ইউরোপে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যায়। ইউরোপীয় কংগ্রেসের হুকুম-নামার জোরে ফরাসীরা স্পেনের গণবিদ্রোহ বিনষ্ট করে এবং একই সঙ্গে অস্ট্রিয়াও নেপলসের এক বিদ্রোহ দমন করে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুইএর মৃত্যুতে দশম চার্লস সম্রাট হন। সংবাদপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বাধীনতা ধ্বংস এবং একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ১৭৮৯ সালের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তি ক্রোক ও প্রমোদ-প্রাসাদ ভস্মীভূত করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি ফ্রাঁ দেন। এই প্রাচীন শাসন-পদ্ধতি প্রচলনের বিরুদ্ধে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাঁর পরিবর্তে সম্রাট করেন লুই ফিলিপকে (Louis Philippe)—সেই বিভীষিকার রাজত্বে ডিউক অব অর্লিয়েন্সের যে ফিলিপের শিরশ্ছেদ করা হয়, তাঁরই পুত্র। গ্রেট বৃটেনে এই বিপ্লবের অকুণ্ঠ সমর্থনে এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতেও জন-সহানুভূতিতে ইউরোপের সম্রাটরা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নি। যাই হোক, ফ্রান্সে তবু তো এক সম্রাট সিংহাসনে রইলেন। এই লুই ফিলিপ (১৮৩০-৪৮) আঠারো বছর ধরে ফ্রান্সের আইনানুগ সম্রাট রইলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাটদের কার্যকলাপে উত্যক্ত ভিয়েনা-সম্মেলনের ফলে এই-ভাবেই ইউরোপের শান্তি অস্বস্তিকরভাবে দাঁড়িয়েছিল। ভিয়েনায় রাজনীতি-বিদদের নির্ধারিত অবৈজ্ঞানিক সীমারেখার ফলে দেশে-দেশে বিরোধ হিসাব মতই বাড়ছিল ; কিন্তু সমগ্র মানবজাতির শান্তির কাছে তা আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠছিল। যদি ভিন্ন-ভাষাভাষী লোকে বাস করে, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পড়ে, বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয় এবং বিশেষ করে তা যদি বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী হয়, তবে সেই দেশকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা একরকম অসাধ্য। সুইস পার্বত্য অধিবাসীদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনের মত শুধুমাত্র পরস্পরের কোন দৃঢ় বন্ধন এবং উদ্দেশ্যের জন্যই ভিন্ন-ভাষাভাষী ও ধর্মবিশ্বাসী লোকদের ঐক্যবদ্ধ করাকে সমর্থন করা যায় ; এমনকি সুইজার্ল্যাণ্ডেও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আছে। যেমন, ম্যাসিডোনিয়াতে অধিবাসীরা গ্রামে বা সহরতলীতে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে থাকায় সেখানে বিভাগীয় শাসনের প্রয়োজন। কিন্তু যদি পাঠকেরা ভিয়েনা-

সম্মেলনের তৈরি ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দেন তো দেখবেন যে এই সম্মেলন যেন দেশের লোকদের ক্ষিপ্ত করে তোলার পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিল।

সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে এই সম্মেলন ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র রাজ্য ধ্বংস করে, প্রোটেস্ট্যান্ট ওলন্দাজ ও প্রাচীন স্পেনীয় (অস্ট্রীয়) নেদারল্যাণ্ডের ফরাসী-ভাষী ক্যাথলিকদের সঙ্গে একত্র করে এক নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গড়ে তোলে। এই সম্মেলন জার্মান-ভাষী অস্ট্রিয়ানদের হাতে শুধু যে প্রাচীন ভেনিস প্রজাতন্ত্ররাজ্য তুলে দেয় তা নয়, মিলান পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ইটালিও তাদের দিয়ে দেয়। সার্দিনিয়া পুনর্গঠনের জন্য ইটালির টুকরো টুকরো অংশের সঙ্গে ফরাসী-ভাষী স্যাভয়কে জুড়ে
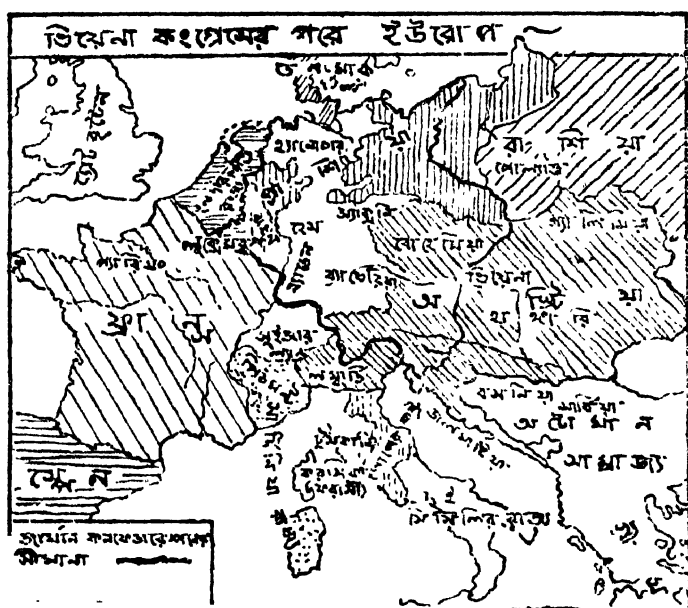
দেয়। জার্মান, হাঙ্গারিয়ান, চেকোস্লোভাক, যুগোস্লাভ, রুমানিয়ান ও বর্তমানে ইটালিয়ান প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী জাতির মিলনের ফলে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি পূর্ব থেকেই দুর্দান্ত বিস্ফোরকের মত হয়ে ছিল, ১৭৭২ ও ১৭৯৫ সালে অস্ট্রিয়ার পোল্যাণ্ড অধিকারকে স্বীকার করে তাকে আরও মারাত্মক করে তোলে। ক্যাথলিক এবং প্রজাতন্ত্রবাদী পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের তুলে দেওয়া হয় কম-সভ্য গোঁড়া গ্রীক-পন্থী জারের শাসনাধীনে, কিন্তু প্রধান জেলাগুলি পায় প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাসিয়া। জার কর্তৃক একেবারে বিদেশী ফিনল্যাণ্ড দখল ও মঞ্জুর হয়, নরওয়ে ও সুইডেনের একেবারে বি-সম লোকদের এক রাজার অধীনে আবদ্ধ রাখা হয়।

পাঠকরা দেখবেন যে জার্মানি ভয়ঙ্কর গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে যায়। ছোট্ট ছোট্ট রাজ্য নিয়ে গঠিত জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের কিছুটা মধ্যে এবং কিছুটা বাইরে প্রাসিয়া ও অস্ট্রিয়া থাকে। হলস্টাইনের জার্মান-ভাষী লোকদের অধিপতি হওয়ার ফলে ডেনমার্কের রাজা জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এসে পড়েন। লুক্সেমবুর্গের রাজা, এবং তার অধিকাংশ অধিবাসী ফরাসী-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাকে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যে লোকেরা জার্মান ভাষায় কথা বলে এবং যাদের আদর্শ জার্মান সাহিত্যের উপর গঠিত, যে লোকরা ইতালীয় ভাষায় কথা বলে এবং ইতালীয় সাহিত্যের উপর যাদের আদর্শ গঠিত এবং যে লোকেরা পোলিশ ভাষায় কথা বলে এবং যাদের আদর্শ পোলিশ সাহিত্যের উপর গঠিত, তারা যে নিজেদের আদর্শে নিজেদের ভাষায় নিজেদের দেশের শাসন পরিচালনা করলে সুখে থাকবে, জগতের কল্যাণকর হবে এবং অন্য আদর্শের লোকদের বিরক্তি উৎপাদন করবে না—এই সম্মেলন সেই সত্যকে একেবারে অবিশ্বাস করে। এই যে এযুগের রচিত একটি বিশেষ জনপ্রিয় গান ঘোষণা করে, 'যেখানেই জার্মান ভাষা প্রচলিত সেইটাই জার্মানদের পিতৃভূমি'—তাতে কি আশ্চর্য হবার কিছু আছে?

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসী-ভাষী বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডে অবস্থিত ওলন্দাজ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বেলজিয়ামের প্রজাতন্ত্রী রাজ্য হওয়া কিংবা ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত হয়ে সম্মিলিত শক্তি এই পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে ও স্যাক্স-কোবার্গ-গোথা বংশের প্রথম লিওপোল্ডকে তাদের রাজা করে দেয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইটালি ও জার্মানিতে ব্যর্থ বিদ্রোহ হয়, কিন্তু রুশ-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে তার চেয়ে অনেক জোরদার বিদ্রোহ ঘটে। প্রথম নিকোলাসের (ইনি ১৮২৫ সালে অ্যালেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হন) শাসনের বিরুদ্ধে ওয়ারসতে এক প্রজাতন্ত্রী সরকার এক বছর ধরে শাসন চালায়। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ও বল প্রয়োগে এই সরকারকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা হয়। পোলিশ ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা হয়, এবং রাজধর্ম হিসাবে রোম্যান ক্যাথলিকের পরিবর্তে গোঁড়া গ্রীক গির্জার ধর্ম চাপানো হয়···

১৮২১ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকরা বিদ্রোহ করে। ছ-বছর ধরে তারা প্রাণপণে যুদ্ধ চালায়, আর সমস্ত ইউরোপ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়, ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা দলে দলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত বৃটেন ফ্রান্স ও রাশিয়া

একত্র কার্যক্ষেত্রে নামে। নাভারিনোর যুদ্ধে (১৮২৭) ফরাসী ও ইংরেজদের কাছে তুর্কী নৌবাহিনী পরাজিত হয় এবং জার তুর্কী আক্রমণ করেন। আড্রিয়ানো-পোলের সন্ধিতে (১৮২৯) গ্রীসকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু তাদের পূর্বতন প্রজাতন্ত্রী রাজ্যে ফিরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় না। ব্যাভেরিয়ার প্রিন্স অটো নামে এক জার্মান রাজাকে গ্রীসের রাজা করা হয় এবং দানিয়ুব অঞ্চলের প্রদেশগুলি (আজকের রুমানিয়া) ও সার্বিয়ার (বর্তমানের যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত) জন্য খৃষ্টান শাসক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তুর্কীদের এই দেশ থেকে একেবারে বিতাড়িত করতে আরো অনেক রক্তক্ষরণের প্রয়োজন হয়েছিল।

বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের বিকাশ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর ধরে যখন রাজশক্তির বিরোধ ইউরোপে বিদ্যমান, ওয়েস্টফালিয়া সন্ধির (১৬৪৮) জোড়াতালি রঙ পরিবর্তন করে ভিয়েনা-সন্ধির (১৮১৫) জোড়াতালিতে পর্যবসিত হচ্ছিল এবং বাষ্পজাহাজ যখন সারা বিশ্বে ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তার করছিল তখন ইউরোপ-পন্থী জগতে তাদের অধ্যুষিত পৃথিবীর সম্বন্ধে ধারণার সংস্কার ও জ্ঞানের ক্রমোন্নতি ঘটছিল।

রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখেই এ সম্ভব হয় এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে কোন আশু প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এই যুগের জনসাধারণের চিন্তাধারার উপরও কোনরকম গভীর রেখাপাত করতে পারে নি। ভবিষ্যতে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই তার পূর্ণ শক্তি অনুভব করা যায়। প্রধানত একদল সমৃদ্ধিশালী ও স্বাধীনচেতা লোকের মধ্যেই এর চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজরা যাঁদের 'প্রাইভেট জেন্টলমেন' বলেন, তাঁদের ছাড়া গ্রীসে বিজ্ঞান-প্রক্রিয়ার আরম্ভ কিংবা ইউরোপে তার নব প্রবর্তন হতে পারত না। এ যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অংশ গ্রহণ করলেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নি। স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তার সংস্পর্শে না এলে বৃত্তিমূলক শিল্প উৎসাহহীন, নব প্রবর্তন বিমুখ ও রক্ষণশীল হতে বাধ্য।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি গঠন ও বেকনের নিউ অ্যাটলান্টিসএর স্বপ্ন সফলে তার প্রয়াস সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে বস্তু ও গতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বহু পরিবর্তন, গণিতশাস্ত্রের প্রচুর উন্নতি, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের ব্যবহারে ক্রমোন্নতি, প্রাকৃতিক

ইতিহাস শিক্ষার নব চেতনা, শারীর-বিজ্ঞানের নব প্রবর্তন সাধিত হয়। অ্যারিস্টটলের পূর্বাভাসিত ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) পূর্বদৃষ্ট ভূ-বিদ্যা পাষাণের দলিল ব্যাখ্যা করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি ধাতুবিদ্যার উপর ছায়াপাত করে। ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহসিক ব্যবহারের সম্ভাবনাশীল উন্নত ধাতুবিদ্যা আবার কার্যকরী আবিষ্কারের উপর ছায়াপাত করে। শিল্পকে বিপ্লবান্বিত করতে নূতন ধরনের যন্ত্রপাতির সুপ্রচুর উদ্ভাবন হয়।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ট্রেভিথিক ওয়াট-এঞ্জিনকে পরিবহনের কার্যে ব্যবহার করে প্রথম বাষ্পীয়-শকট তৈরি করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্টকটন ও ডার্লিংটনের মধ্যে প্রথম রেলপথ খোলা হয় এবং তের টন ওজনের রেলগাড়ি-সমেত স্টিফেন্সনের 'রকেট' ঘণ্টায় চুয়াল্লিশ মাইল জোরে ছুটতে সক্ষম হয়। ১৮৩০ সাল থেকে রেলপথ বিস্তৃত হতে থাকে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ইউরোপে রেলপথ ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষের জীবনের স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এল এক হঠাৎ পরিবর্তন—স্থল-পরিবহনের চরমতম বিকাশ। রুশ-বিশত্তির পর ভিলনা থেকে প্যারিস আসতে নেপালিয়নের লাগে ৩১২ ঘণ্টা—পথ ছিল ১, ৪০০ মাইল। কল্পনা করা যায় এমন সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা তিনি সেই পথ-পরিক্রমায় পেয়েও ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের মত পথ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। সাধারণ এক পথিকের এই পথ অতিক্রম করিতে দ্বিগুণ সময় লাগত। খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতেও রোম থেকে গল যেতে হলে গড়ে এই সময়ই লাগত। তারপর হঠাৎ এল এই বিপুল পরিবর্তন। রেলপথের কল্যাণে যেকোন সাধারণ পথিক এই পথ এখন ৪৮ ঘণ্টায় যেতে পারে। অর্থাৎ এই রেলপথ ইউরোপের পূর্বের দূরত্বকে দশ ভাগ কমিয়ে দিল, একই শাসনাধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজকার্য এই রেলপথের আবিষ্কারে পূর্বের চেয়ে দশ গুণ করা সম্ভব করল। এই সম্ভাবনার প্রকৃত অর্থ ইউরোপ আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। ঘোড়া এবং পথচারীদের যুগের আমলের সীমান্তের জালে ইউরোপ আজও আবদ্ধ। আমেরিকায় এর ফল হয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গেই। এই মহাদেশের অভ্যন্তরে যতই পশ্চিমে যাওয়া যাক না কেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের কাছে নিউইউর্কে অবিচ্ছিন্ন রেলপথে অতি সহজেই আসা যায়। আর কোন উপায়ে যা সম্ভব ছিল না, এই রেলপথ সেই একতা এনে দিল।

প্রথম যুগে বাষ্প-জাহাজ বাষ্প-এঞ্জিনের চেয়ে সামান্য একটু আগে চালু হয়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফার্থ অব ক্লাইড খালে 'শার্লট ডাণ্ডাস' নামে এক বাষ্প-জাহাজ ছিল এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের কাছে হাডসন নদীতে ফুল্টন নামে এক আমেরিকানের স্টীমার, ক্লেরমণ্ট, বৃটেনের তৈরি এঞ্জিন নিয়ে নিউ ইউর্ক (হ্যাবোকেন) থেকে ফিলাডেল্ফিয়ায় যেত। অ্যাটল্যান্টিক পার-হওয়া (১৮১৯) প্রথম বাষ্প-জাহাজ 'সাভানা'ও (তার পালও ছিল) ছিল আমেরিকান। এই জাহাজগুলির ছিল কাঠের চাকা এবং এই ধরনের জাহাজ গভীর সমুদ্রে বিশেষ কার্যকরী নয়। কাঠের চাকা খুব সহজেই ভেঙে যায়, তার পরেই জাহাজ আর চলতে পারে না। স্ক্রু পদ্ধতির বাষ্প-জাহাজ এল অনেক ধীরে ধীরে। স্ক্রুকে কার্যকরী করে তুলতে অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। এর পর সামুদ্রিক পরিবহন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই প্রথম মানুষ সমুদ্র ও মহাসাগর পাড়ি দিতে পারল সময়ের মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে। যে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতে বেশ কয়েক সপ্তাহ—কখনও-কখনও কয়েক মাস— অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হত, তার সময় ধীরে ধীরে কমতে কমতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দ্রুতগামী জাহাজের পক্ষে মাত্র পাঁচ দিন লাগত, এমনকি নির্দিষ্ট সময় আগে থেকে বলে রাখাও যেত।

স্থলে ও জলে বাষ্পীয় পরিবহনের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ভোল্টা, গ্যালভানি ও ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক তথ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে এক নতুন এবং আশ্চর্য সংযোজন পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের জন্ম হয়। ১৮৫১ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম সমুদ্রের নিচে টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত সভ্য জগতে টেলিগ্রাফ ছড়িয়ে পড়ে এবং যে সংবাদ আগে ধীরে ধীরে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেত এসময়ে তা সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সাধারণ লোকের কাছে বাষ্পীয় রেলপথ ও টেলিগ্রাফই সবচেয়ে আশ্চর্য ও বিপ্লবাত্মক ব্যাপার বলে মনে হত; কিন্তু এগুলি ছিল আরো বিরাট সম্ভাবনার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল। যেকোন যুগের সঙ্গে তুলনায় শিল্প জ্ঞান ও পারদর্শিতা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি-লাভ করছিল। গৃহ-নির্মাণ সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা প্রথমে খুব বেশি প্রকট না হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে তারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে খনিজ লোহাকে কাঠ-কয়লা দিয়ে ছোট ছোট লোহার টুকরোয় পরিণত করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নির্দিষ্ট মাপে

আনা হত। তখন তা ছিল এক কারিগরের জিনিস। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার উপর তখন তার গুণ নির্ভর করত। খুব বেশি হলে দুই কি তিন টন (ষোড়শ শতাব্দীতে) ওজনের লোহা নিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল। (সুতরাং কামানের মাপের একটা উচ্চতম সীমা এতে পাওয়া যায়)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বায়ু-চুল্লির (Blast furnace) প্রবর্তন হয় এবং কোক-কয়লার ব্যবহারের ফলে তার উন্নতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে আমরা লোহার পাত (১৭২৮), লোহার শিক বা কড়ির (১৭৩৮) সন্ধান পাই না। ১৮৩৮ সালে ন্যাসমিথের বাষ্পীয় হাতুড়ির আবিষ্কার হয়।

পুরাতন পৃথিবীর ধাতুজ্ঞানের অল্পতার জন্য বাষ্প ব্যবহার করা যেত না। লোহার পাত আবিষ্কারের আগে কিছুতেই বাষ্পীয় এঞ্জিনের, এমনকি আদিম পাম্পিং এঞ্জিনেরও, উন্নতি সম্ভব ছিল না। আধুনিক জগতের চোখে প্রাথমিক এঞ্জিনগুলি লোহার কাজের কুৎসিত এবং হাস্যকর নিদর্শন বলে মনে হবে; কিন্তু সে-যুগের ধাতু-বিজ্ঞানের পক্ষে ঐটুকুই মাত্র সম্ভব ছিল। বেসেমার প্রক্রিয়া আসে ১৮৫৬ সালে এবং ঠিক তার পরেই (১৮৬৪) আসে চুল্লি-প্রক্রিয়া (open-hearth)—যাতে করে ইস্পাত এবং সব রকমের লোহা গলানো, পরিষ্কার করা এবং অশ্রুতপূর্ব মাপে ঢালাই করা সম্ভব হয়। কড়াইয়ে ফুটন্ত দুধের মত আজ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শত-শত টন ভাস্বর ইস্পাতকে আবর্তিত হতে দেখা যায়। সুপ্রচুর ওজনের ইস্পাতের ও লোহার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, এবং আজ মানুষ তার যে গুণ ও বুনট আনতে পেরেছে তার সঙ্গে ইতিপূর্বের মানুষের কোন কার্যকরী প্রগতিই সমকক্ষ নয়। রেলপথ কিংবা বিভিন্ন প্রকারের আদিম এঞ্জিন ছিল নতুন ধাতুবিদ্যা-প্রক্রিয়ার প্রথম জয়লাভ। তারপরেই এল লোহা ও ইস্পাতের তৈরি জাহাজ, বিরাট পুল, এবং ইস্পাতের কাঠামোয় তৈরি বিপুল আয়তনের অট্টালিকা। মানুষ অত্যন্ত দেরিতে বুঝতে পেরেছিল যে সে নিতান্ত ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে রেলপথ পরিকল্পনা করেছিল—সে তার ভ্রমণ আরও আরামে আর বিরাটভাবে সংগঠিত করতে পারত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ২,০০০ টনের বেশি ওজনের কোন জাহাজ পৃথিবীতে ছিল না; আজ ৫০,০০০ টনের জাহাজেও কেউ আশ্চর্য হয় না। এমন অনেকে আছেন যাঁরা একে 'শুধু আয়তনে' প্রগতি বলে উপহাস করেন; কিন্তু এ ধরনের উপহাস শুধু সীমিত মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তাঁরা মনে করেন, বিরাট জাহাজ কিংবা ইস্পাতের কাঠামোর অট্টালিকা শুধু অতীতের ছোট জাহাজ বা বাড়ির অতিকায় রূপ: কিন্তু তা ঠিক নয়; তা হল আরো সুন্দর ও আরো কঠিন

জিনিস দিয়ে আরো হাল্কা অথচ শক্তিশালী করে এক নতুন জিনিস সৃষ্টি; পূর্বের মত স্থূল গণনার কিছু নয়, তা সূক্ষ্ম অথচ জটিল গণনার জিনিস। আগেকার বাড়ি বা জাহাজ নির্মাণে বস্তুই ছিল প্রধান—বস্তু, এবং তার প্রয়োজন দেখে চলতে হত; কিন্তু নতুনের ব্যাপারে বস্তুকে বন্দী, পরিবর্তিত ও বাধ্য করা হয়েছে। কয়লা, লোহা ও বালিকে খনি কিংবা নদীর ধার থেকে খুঁড়ে, ভেঙে, গালিয়ে ঢালাই করে জনবহুল নগরীর ৬০০ ফুট উপরে এক ঝকঝকে ইস্পাত ও কাচের সৌধ-চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার কথা মনে মনে চিন্তা করুন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ইস্পাতে ধাতু-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং তার ফলাফল সম্বন্ধেই আমরা এগুলি উল্লেখ করছি। তামা, টিন এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে অজ্ঞাত নিকেল ও অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি অনেক ধাতুর সম্বন্ধেই আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বিভিন্ন প্রকারের কাচ পাথর প্ল্যাস্টার প্রভৃতি দ্রব্য, রঙ ও জৌলস অর্থাৎ বস্তুর উপর এই বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান প্রভুত্বই এই যন্ত্র-বিপ্লবের এতদিনের কৃতিত্ব। তবুও এইসব ব্যাপারে আজও আমরা সেই প্রথম সূচনার যুগেই রয়েছি। আমাদের শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তির ব্যবহার আমাদের আজও শিখতে হবে। বিজ্ঞানের এই দানের প্রথম ব্যবহার ছিল কুৎসিত, চটকদার, স্থূল ও ভয়ঙ্কর। এত সব বিভিন্ন জিনিসের অধিকারী হয়েও শিল্পী ও যন্ত্রবিদরা তাদের সম্যক ব্যবহার আজও শুরু করেনি।

এই যান্ত্রিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিজ্ঞান বিদ্যুৎবেগে বেড়ে উঠতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেই প্রথম এই অনুসন্ধানব্রতীদের ফল জনসাধারণকে চমকিত করে। তারপর হঠাৎ এল বৈদ্যুতিক আলো ও বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ও শক্তির অবস্থান্তর এবং নল দিয়ে জল পাঠানোর মত তামার তার দিয়ে এই শক্তিকে যান্ত্রিক গতি, আলো বা তাপে পরিণত করে পাঠানোর সম্ভাবনা লোকের মনকে নাড়া দিতে শুরু করল।

এই বিরাট জ্ঞান আহরণে প্রথমে বৃটিশ ও ফরাসীরাই ছিল অগ্রগণ্য; কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে অহঙ্কার ভেঙে যাওয়ার পর জার্মানরা এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এত উৎসাহী ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পড়ে যে শেষপর্যন্ত তারাই এইদিকে অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ইংরেজ ও স্কচ একই সঙ্গে সাধারণ বিদ্যা-কেন্দ্রের বাইরে থেকে বৃটিশ বিজ্ঞান সৃষ্টি করে।

এই সময় বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক শাস্ত্রাভিমানী ব্যক্তিদের হাতে পড়ে দিন দিন অবনতির পথে নেমে যাচ্ছিল। ফরাসী শিক্ষাও তখন প্রাচীন জেস্যুইট-পন্থীদের নির্দেশাধীনে; সুতরাং জার্মানদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক

তথ্যসমূহ গবেষণার পক্ষে অল্পসংখ্যক হলেও, ফরাসী ও বৃটিশ আবিষ্কারক ও গবেষকদের চেয়ে অনেক বেশি-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলা বেশি কঠিন হয় নি। এবং যদিও এই পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছিল, তাহলেও বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকরা তাতে কিছুমাত্র ধনী বা শক্তিশালী হতে পারেন নি। সত্যকার বৈজ্ঞানিকের সাধারণত অর্থকরী বুদ্ধি থাকে না; তিনি তাঁর গবেষণা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তার থেকে কী করে অর্থ লাভ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময়ই তাঁর হয় না। তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অর্থকরী দিকটা স্বভাবতই এবং অতি সহজে গিয়ে পড়ে ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের হাতে। তাই আমরা দেখি যে প্রতি যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে যে নতুন নতুন ধনীর সৃষ্টি হয়, তাঁরা জাতীয় শিক্ষাভিমানী ও ধর্মযাজক প্রমুখ স্বর্ণপ্রসূ মুরগিদের হত্যা করার অতিমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে, এই লাভজনক প্রাণীদের অনাহারে মৃত্যুর পথ দেখিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন যে বুদ্ধিমান লোকদের লাভের জন্যই এই আবিষ্কারক ও গবেষকদের জন্ম প্রকৃতিগত।

এই বিষয়ে জার্মানরা ছিল একটু বেশি বিজ্ঞ। এই নতুন জ্ঞানের প্রতি জার্মান 'পণ্ডিতরা' অত বেশি ঘৃণা দেখাতেন না। তাঁরা এর উন্নতি ও প্রগতি অনুমোদন করেছিলেন। বৃটিশদের মত জার্মান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও আবার বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অতটা অকরুণ ছিল না। এই জার্মানরা বিশ্বাস করত যে, জ্ঞানকেও উৎসাহ দিয়ে বৃদ্ধি করা যায়। তাই তারা বৈজ্ঞানিকদের কিছু-কিছু সুযোগ-সুবিধা দিত; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে তাদের ব্যয়ও তুলনায় বেশি ছিল এবং এই ব্যয়ের ক্ষতিপূরক প্রচুর পুরস্কার তারা পেত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে জার্মান ভাষাকে অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা করে তুলেছিলেন, যাতে তারা সমসাময়িক প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে এবং কয়েকটি বিভাগে, বিশেষ করে রসায়নশাস্ত্রে, জার্মানি তার পাশ্চাত্য প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে গেছিল। জার্মানিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অষ্টম দশকে ফলপ্রসূ হয় এবং যন্ত্র ও শিল্পের দিক দিয়ে জার্মানি বৃটেন ও ফ্রান্সকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে যায়।

অষ্টম দশকে এক নতুন ধরনের এঞ্জিনের ব্যবহার হয়—এমন এক এঞ্জিন, যাতে বাষ্পের প্রসারণ-শক্তির পরিবর্তে এক মিশ্র বিস্ফোরকের প্রসারণ-শক্তির ব্যবহার

প্রবর্তিত হয়— এবং এর ফলে আবিষ্কারের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এইভাবে গঠিত হাল্কা ও অত্যন্ত কার্যকরী এঞ্জিন প্রথমে মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত হয় এবং তার উন্নতির ফলে এই এঞ্জিন এত হাল্কা ও কার্যকরী হয়ে ওঠে যে আকাশে ওড়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়। মানুষকে নিয়ে ওড়ার মত বড় না হলেও ১৮৯৭ সালে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইন্‌স্টিটিউটের প্রফেসর ল্যাংলি একটি উড়ন্ত যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হন। ১৯০৫ সালে মানুষের যাতায়াতের জন্য এরোপ্লেন চালু হয়। রেলপথ ও মোটর গাড়ির চরম উন্নতিতে মানুষের গতিবেগে এক ক্ষণ-বিরতি আসে, কিন্তু এরোপ্লেনের আবিষ্কারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্বও কার্যত কম হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লণ্ডন থেকে এডিনবরায় যেতে লাগত আট দিন; কিন্তু ১৯১৮ সালে বৃটিশ সিভিল এয়ার-ট্রান্সপোর্ট কমিশন জানান যে লণ্ডন থেকে মেলবোর্ণ অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অর্ধেক পথ যেতে আর কয়েক বছরের মধ্যেই সেই আটদিনই মাত্র সময় লাগবে।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার সময়-দূরত্ব হ্রাসের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। মানুষের সম্ভাব্য শক্তির গভীরতা ও বিরাটত্বের এ একটা দিক মাত্র। যেমন, উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-রসায়ন ঠিক অনুরূপ উন্নত হয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ফসল পাওয়া যেত, মানুষ আজ সার ব্যবহারের জ্ঞানে তার চার-পাঁচ গুণ ফসল পেতে শুরু করল। চিকিৎসা-শাস্ত্রে হয়েছিল আরো অসাধারণ উন্নতি; মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেল, দৈহিক কার্যক্ষমতা বাড়ল, অসুখে জীবনের অপচয় কমে গেল।

এখন মানুষের জীবনে এমন এক বিরাট পরিবর্তন এল যার ফলে ইতিহাসে এক নতুন যুগ শুরু হল। এই শতাব্দীর আর সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই এই যান্ত্রিক বিপ্লব আসে। প্যালিওলিথিক যুগ থেকে কৃষি যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ মিশরের পেপির সময় থেকে তৃতীয় জর্জের সময় পর্যন্ত এই বিরাট সময়ে মানুষ যা করতে পারে নি, এই অল্প সময়ে মানুষ তার বস্তুতান্ত্রিক পরিস্থিতির অনেক, অনেক বেশি উন্নতি করেছে। মানুষের জীবনে এক বিরাট বস্তুতান্ত্রিক কাঠামোর জন্ম হয়েছে। স্পষ্টতই তার দাবি আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পুনর্মীমাংসা। কিন্তু এই সমাধানগুলি যন্ত্র-বিপ্লবের উন্নতির অপেক্ষায় আছে, এবং আজও তারা তাদের প্রাথমিক যুগে।

শিল্প-বিপ্লব

কৃষি-প্রথা এবং ধাতু-আবিষ্কারের মত একটা নতুন পদক্ষেপ, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিপ্রসূত মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতার কাছে একেবারে নতুন, সেই যন্ত্র-বিপ্লব তার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির বা শিল্প-বিপ্লবের মিশিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা বহু ইতিহাসে দেখা যায়। এই শিল্প-বিপ্লব এমন একটা কিছু যার উৎস একেবারে পৃথক এবং যার ঐতিহাসিক নজির আছে। এই দুই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলছিল, তারা পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়াশীলও ছিল; কিন্তু জন্মে ও প্রকৃতিতে তারা ছিল একেবারে পৃথক। কয়লা, বাষ্প কিংবা যন্ত্র না থাকলেও শিল্প-বিপ্লব হতে পারত; তবে, সেটা সংঘটিত হত রোম্যান প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের শেষ কয়েক বছরের অনুরূপ ঘটনার পথ ধরে। বাস্তুহারা মুক্ত কৃষক, দলবদ্ধ শ্রমিক, বিরাট জমিদারি, বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি এবং সমাজ-বিধ্বংসী অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাসের আবার তবে পুনরাবৃত্তি হত। এমনকি, যন্ত্র ও শক্তির আগেই কারখানা-প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কারখানা যন্ত্র দিয়ে তৈরি নয়, শ্রম-বিভাগ নীতিতেই তৈরি। শিল্পের কাজে জল-চালিত চাকার ব্যবহারেরও আগে অনুশীলিত ও ঘর্মাক্ত কারিগরেরা পোশাক-পরিচ্ছদ, পীসবোর্ডের বাক্স, আসবাব-পত্র, রঙিন মানচিত্র, পুস্তকের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি করত। অগস্টাসের যুগে রোমে কারখানা ছিল। পুস্তক-প্রকাশের কারখানায় নতুন বই বহুসংখ্যক সারিবদ্ধ অনুলিপিকারককে নকল করতে দেওয়া হত। ডিফো এবং ফিল্ডিংএর রাজনৈতিক পুস্তিকার মনোযোগী পাঠকরা একথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির আগেই দরিদ্র লোকদের একত্র করে তাদের সমবেত চেষ্টায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি মোরএর 'ইউটোপিয়া'তেও (১৫১৬) এই তথ্য পাওয়া যায়। এ ছিল সামাজিক উন্নতির নিদর্শন, যন্ত্রের নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিরও কিছু বেশি পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস ছিল খৃষ্টপূর্ব শেষ তিন শতাব্দীতে রোম-অনুকৃত পথেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ইউরোপে রাজনৈতিক অনৈক্য, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন, জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণ এবং বোধহয় যান্ত্রিক জ্ঞান ও আবিষ্কারে পশ্চিম ইউরোপের বুদ্ধিপ্রবণতার আধিক্য এই পথকে সুন্দর এক নতুন দিকে নিয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টধর্মের মহিমায় মানুষের সম-স্বার্থতার ধারণা নতুন ইউরোপীয় জগতে খুব বেশি প্রসারিত হয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক শক্তিও ততটা একাগ্রীভূত ছিল না এবং অর্থকামী শক্তিমান

পুরুষ তাই স্বেচ্ছায় দাস ও সমবেত শ্রম-প্রথা ত্যাগ করে যান্ত্রিক শক্তি ও যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করতে তৎপর হয়।

যন্ত্র-বিপ্লব, যান্ত্রিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, মানুষের অভিজ্ঞতায় এক নতুন জিনিস এবং এর স্পষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিল্পনৈতিক ফলাফল-নিরপেক্ষ হয়েই তার উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু অন্যদিকে যন্ত্রবিপ্লবের জন্য মানুষের জীবনের অবারিত পরিবর্তনে মানুষের ইতিহাসের অন্যান্য ব্যাপারের মত, শিল্প-বিপ্লব ক্রমাগত বেশি পরিবর্তিত ও বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল ও হয়ে আসছে। একদিকে রোম্যান প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীতে ধনসঞ্চয়, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিশ্চিহ্ন হওয়া ও ব্যবসায়ে প্রচুর মূলধন নিয়োগ এবং অন্যদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় একই রকম অর্থের কেন্দ্রীভূত হওয়ার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যন্ত্র-বিপ্লবের ফলে শ্রমের প্রকার-ভেদ। পুরাতন পৃথিবীর শক্তি ছিল মনুষ্য-শক্তি; সব কিছুই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করত নির্বোধ এবং পদানত মানুষের মাংসপেশীর কর্মশক্তির উপর। বলদ বা ঘোড়ার শক্তিও সামান্য পাওয়া যেত। ওজনে ভারী কিছু তুলতে হলে মানুষ তা তুলত; পাথর কাটার সময় মানুষ তা টুকরো টুকরো করে কাটত; জমিতে লাঙল দেওয়ার সময় মানুষ আর বলদ লাঙল দিত; বাষ্প-জাহাজের রোম-সংস্করণ ছিল দাঁড়টানা জাহাজ, ঘর্মাক্ত দেহে মানুষকেই তা টানতে হত। আদি সভ্যতায় মনুষ্যজাতির এক বড় ভাগই যান্ত্রিক দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। অবশ্য প্রথম চালু হওয়ার সময় যে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতিতে মানুষের এই বোকার মত পরিশ্রমের পূর্বাভাস পাওয়া গেছিল, তা নয়। খাল খুঁড়তে, রেলপথ তৈরি করতে এবং আরও অনেক কাজে মানুষের বিরাট বড় দল ব্যবহার করা হত। খনি-খনকদের সংখ্যাও প্রচুর বেড়ে গেল। কিন্তু কাজের সুবিধা ও দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে গেল আরও বেশি এবং উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন পরিস্থিতির সহজ যুক্তি আরো পরিস্ফুট হল। যান্ত্রিক ভাবে মানুষ যা করতে পারত, তার চেয়ে অনেক দ্রুত এবং অনেক ভালভাবে যন্ত্রই তা করতে পারত। মানুষের প্রয়োজন হল শুধু যেখানে শুদ্ধি এবং বিচার দরকার। মানুষের দরকার হত মানুষ হিসাবেই। যে দাস্যবৃত্তির উপর পূর্বের সমস্ত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, সেই আজ্ঞাবহ প্রাণী, সেই অপ্রয়োজনীয় বুদ্ধির মানুষ আজ মনুষ্যজাতির কল্যাণে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।

কৃষি এবং খনি প্রভৃতি প্রাচীন শিল্প এবং একেবারে আধুনিক ধাতুবিদ্যা-

প্রক্রিয়া—উভয় ক্ষেত্রেই এটি সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা এবং ফসল কাটার জন্য যে যন্ত্র এল, তা অনেক লোকের কাজ একা করতে পারত। রোম্যান সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সুলভ ও অবনমিত মানুষের উপর; আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে সুলভ যন্ত্র-শক্তির উপর। একশো বছর ধরে শক্তি হচ্ছে সুলভ এবং শ্রমিক হচ্ছে মহার্ঘ। এক পুরুষ কাল ধরে যে খনির কাজে যন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে নি, তার কারণ এই যে, তখন মানুষের চেয়ে যন্ত্রের দাম ছিল বেশি।

এই যে পরিবর্তন, তা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পুরাতন সভ্যতার যুগে ধনী এবং শাসক-শ্রেণীর প্রধান দুর্ভাবনা ছিল দাস-সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখা। উনবিংশ শতাব্দী যতই এগোতে লাগল, বুদ্ধিমান লোকদের কাছে ততই এ-কথাটা পরিষ্কার হতে লাগল যে সাধারণ মানুষকে দাসের চেয়ে ভাল অবস্থায় আনা প্রয়োজন। অন্তত শুধু 'শিল্পের উৎকর্ষতার' জন্যই তাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন। সে কী করেছে তা অন্তত তার জানা দরকার। খৃষ্টধর্মের প্রথম প্রচারের সময় থেকে জনসাধারণের শিক্ষার দাবি ইউরোপে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, এশিয়ার যেখানে যেখানে ইসলাম ধর্ম গেছে ঠিক সেখানেও শিক্ষার দাবি উঠেছে—কারণ যে ধর্ম তাকে মুক্তি দিয়েছে কিংবা যে ধর্মগ্রন্থে এই বিশ্বাসের কথা লিখিত আছে তার সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা ধর্মের দিক দিয়ে কিছুটা প্রয়োজন ছিল। খৃষ্টধর্ম-বিরোধে বিভিন্ন দল ভক্ত-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। যেমন, ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ এবং স্বমতানুশ্রয়ী ব্যক্তিদের শিশুকালেই দলবদ্ধ করার প্রয়োজনের ফলে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়—'জাতীয়' গির্জা-বিদ্যালয়, ভিন্নমতাবলম্বী 'বৃটিশ' বিদ্যালয় এবং এমনকি রোম্যান ক্যাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য-ধর্মী সমস্ত জগতে জনসাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি হয়। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কিছুটা হলেও এতটা ব্যাপক অগ্রগতি হয় নি—সুতরাং পূর্বে পাঠক ও অ-পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা আজ শিক্ষার স্তরে আরো একটু বেশি প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। এই ব্যাপারের পিছনে ছিল আবার যন্ত্র-বিপ্লব; আপাতদৃষ্টিতে হয়ত তা সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ, কিন্তু সমস্ত জগতে একেবারে অশিক্ষিত শ্রেণীকে রহিত করার ব্যাপারে তার চেষ্টা ছিল অত্যন্ত বেশি।

রোম প্রজাতন্ত্রী সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক বিপ্লব জনসাধারণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নি। আজ আমরা যেমন দেখি, সেই রকম সাধারণ রোম্যান অধিবাসী স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে তাদের জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখতে পারে নি। কিন্তু

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যতই এই শিল্প-বিপ্লব অগ্রসর হতে লাগল ততই তার জীবনকে কী ভাবে তা পরিবর্তিত করছিল, সাধারণ মানুষ সামগ্রিক একটি প্রক্রিয়া হিসাবে স্পষ্টই তা দেখতে পাচ্ছিল—কারণ এখন তারা পড়তে, আলোচনা করতে ও সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং ইতিপূর্বে জনসাধারণ যা পারেনি, আজ তারা ঘুরে-ফিরে সমস্ত কিছুই দেখতে ও বুঝতে পারছে।

আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারার বিকাশ

প্রাচীন সভ্যতার আচার, সংস্কার ও রাজনৈতিক ভাবধারা যুগে যুগে জাগ্রত হয়, কোন মানুষ তা সৃষ্টি করে নি বা পূর্বে থেকে তার কল্পনা করে নি। শুধুমাত্র মানুষের যৌবনোদ্ভেদের শতাব্দী অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক মানুষ প্রথম চিন্তা করতে আরম্ভ করে, প্রথম প্রশ্ন তোলে এবং মানুষের শাসন-বিধি ও রীতির এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

গ্রীস ও আলেকজান্দ্রিয়ার মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির গৌরবোজ্জ্বল প্রভাতেব কথা আমরা আগেই বলেছি এবং আরো বলেছি, কী করে দাস-প্রথার সভ্যতার বিপর্যয় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও স্বৈরাচারী রাজশক্তির কালো মেঘ সেই সূচনার সম্ভাবনাকে অন্ধকার করে তোলে।. পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর আগে আর ঠিক নির্ভয় চিন্তাধারার আলো ইউরোপীয় হীনাবস্থা ভেদ করে প্রকাশ হয় নি। ইউরোপের এই মানসিক আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার করার ব্যাপারে আরবদের কৌতূহল ও মঙ্গোলদের বিজয়-ঝটিকার অংশ কতখানি—তাও আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি। প্রথমে প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানেরই বৃদ্ধি হয়। এই জাতির পুনরুজ্জীবিত মনুষ্যত্বের প্রথম ফল হয়েছিল বস্তুতান্ত্রিক সাফল্য ও বস্তুতান্ত্রিক শক্তি। মানবিক সম্বন্ধ, একক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা ও অর্থনীতির বিজ্ঞান শুধু যে সূক্ষ্ম ও জটিল—তাই নয়, আরো অনেক হৃদয়ানুভূতি দিয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। এ-সবের প্রগতি ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর, এবং বহু বিরাট বাধা অতিক্রম করে সম্ভব হয়েছে। নক্ষত্র কিংবা অণুর সম্বন্ধে একেবারে বিপরীত প্রস্তাব মানুষ নিরাসক্ত হয়ে শুনে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনের পথের সম্বন্ধে ধারণা আমাদের চারিপাশের প্রত্যেককে স্পর্শ ও চিহ্নিত করে।

গ্রীসে যেমন প্লেটোর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অ্যারিস্টটলের কঠোর তথ্যানুসন্ধানের পূর্বে এসেছে, সেই রকম ইউরোপেও নতুন যুগের প্রথম রাজনৈতিক অনুসন্ধানও প্লেটোর 'রিপাব্লিক' ও 'ল-জ' পুস্তকের অনুকরণে কল্পনা-প্রসূত কাহিনীর মাধ্যমে

লেখা হয়। প্লেটোর বিচিত্র অনুকরণে স্তর টমাস মোর-এর ইউটোপিয়া দরিদ্রদের সম্বন্ধে নব-বিধান আনয়নে সফল হয়েছিল। নেয়াপোলিটান ক্যাম্পানেলার 'সিটি অব দি সান' ছিল অনেক বেশি অদ্ভুত এবং তার প্রভাবও ছিল কম।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আমরা প্রচুর ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাহিত্য প্রকাশিত হতে দেখতে পাই। এই আলোচনায় পথ-প্রদর্শকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক ইংরেজ গণতন্ত্রীর পুত্র, অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট ছাত্র, জন লক— তিনি চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্রের দিকে প্রথমে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। শাসনতন্ত্র, পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ও শিক্ষার উপর তাঁর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর মন কত সজাগ ছিল। ইংল্যাণ্ডের জন লকেরই অনুরূপ এবং কিছু পরে, ফ্রান্সে মন্তেস্ক (১৬৮৯-১৭৫৫) সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুসন্ধানমূলক ও মৌলিক বিশ্লেষণের সম্মুখীন করেন। ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী একাধিপত্যের যাদুময় মাহাত্ম্যকে তিনি নিরাবরণ করে দেখান। যে-সব মিথ্যা ধারণা এতদিন মনুষ্য-সমাজের পুনর্গঠনের স্বেচ্ছাকৃত ও সতর্ক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে, তা দূর করার জন্য তিনি ও লক সমান গৌরব দাবি করতে পারেন।

তাঁর উত্তরকালীন মধ্য ও তার পরবর্তী দশকগুলির লোকেরা তাঁর নৈতিক ও বুদ্ধিদীপ্ত সবল যুক্তির সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করত। জেসুইটদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত 'এন্‌সাইক্লোপেডিস্ট' নামে একদল প্রতিভান্বিত লোকেরা এক নতুন পৃথিবী গঠনে ব্রতী হলেন (১৭৬৬)। এন্‌সাইক্লোপেডিস্টদের সঙ্গে পাশাপাশি ইকনমিস্ট বা ফিজিওক্র্যাটরা খাদ্য ও বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ সম্বন্ধে সাহসিক অথচ অসংস্থিত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। নীতিগতভাবে, 'কোড ডি লা নাটুর' এর গ্রন্থকার ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিন্দা করে সমভোগবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সমাজতন্ত্রী বলে যাঁরা পরিচিত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বিরাট ও বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগোষ্ঠীর তিনি অগ্রদূত ছিলেন।

সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের একশো সংজ্ঞা, এবং হাজার শ্রেণীর সমাজতন্ত্রী আছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণাকে অস্বীকার করার চেয়ে বেশি কিংবা কম কিছুই নয়। সমস্ত যুগের এই ভাবধারার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে পারি। এই ব্যাপার ও আন্তর্জাতিকতাবাদের চিন্তাধারার উপরেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ আজ প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাতিদের যুধ্যমান প্রবৃত্তির থেকেই সম্পত্তির ধারণা এসেছে। মানুষ ঠিক মানুষ হওয়ার বহু আগে, পূর্বসূরী বানরও সম্পত্তির মালিক ছিল। আদিম সম্পত্তির জন্যই পশু লড়াই করে। কুকুর ও তাহা রড়, ব্যাঘ্রী ও তার বাসা, হরিণ ও তার দল—এই হল মালিকানার চিহ্ন। 'আদিম সাম্যবাদ'এর মত নিরর্থক ও হাস্যকর কথা আর নেই। সমাজবিদ্যায় আর আদি প্যালিওলিথিক যুগে পরিবার-ভুক্ত জাতির বৃদ্ধ সর্দার মালিকানা দাবি করত তার স্ত্রী ও কন্যা, অস্ত্রশস্ত্র ও তার দৃশ্যমান জগতের উপর। আর কেউ যদি তার জগতে এসে পড়ত, তবে সে তার সঙ্গে যুদ্ধ করত এবং পারলে তাকে হত্যা করত। অ্যাটকিনসন তাঁর 'প্রাইম্যাল ল-জ' বইয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন কী করে তরুণতর ব্যক্তিদের সত্তা, বাইরের উপজাতি থেকে অধিকৃত তাদের স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব, তাদের নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার এবং তাদের শিকার-করা পশুদের উপর তাদের অধিকারে বৃদ্ধ সর্দারের সহিষ্ণুতার ফলে জাতিবৃদ্ধি হয়। একের ও অপরের সম্পত্তির মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মানব-সমাজের বৃদ্ধি হয়। তাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে বাইরের উপজাতিকে বিতাড়িত.করার উদ্দেশ্যেই এই আপোষ-নিষ্পত্তি মানুষের মনে আসে। এই পাহাড় ঝর্ণা তোমারও নয়, আমারও নয়—কারণ এ আমাদের সকলের। প্রত্যেকেই আমরা হয়ত এইসব নিজের বলে চাই, কিন্তু তাতে লাভ হবে না; অন্যেরা তবে আমাদের মেরে ফেলবে। সুতরাং সমাজ প্রথম থেকেই মালিকানা লাঘব করে এসেছে। আজকের সভ্য জগতের চেয়ে শিশুদের এবং আদিম বর্বরদের মধ্যে মালিকানার দাবি ছিল অনেক বেশি প্রবল। এই ব্যাপার যুক্তির চেয়ে আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যেই গভীরভাবে নিহিত রয়েছে।

আজকের বর্বর এবং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে মালিকানার অধিকারের কোন সীমারেখা নেই। স্ত্রীলোক, প্রাণদণ্ড-মুকুব বন্দী, পশু, বনাঞ্চলের পরিষ্কৃত ভূমি, পাথরের খনি এবং সব কিছুই—যার জন্য কেউ লড়াই করতে পারে, সে-ই তার মালিক হতে পারে। সমাজ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিধ্বংসী সংগ্রাম বন্ধ করার জন্য একরকমের আইন তৈরি হয়, মালিকানার বিরোধ মীমাংসার জন্য মানুষ স্থূল কিন্তু কার্যকরী কতগুলি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে। যে মানুষ প্রথমে কিছু তৈরি করত বন্দী করত বা দাবি করত, তার উপর সে অধিকারের দাবি করতে পারত। যে খাতক ঋণ শোধ করতে পারত না, স্বাভাবিক ভাবেই সে মহাজনের সম্পত্তি হত। অধিকৃত জমি অন্য কেউ যদি ব্যবহার করতে চাইত তো মালিকের পক্ষে তার কাছ থেকে খাজনা আদায় করাও অনুরূপ স্বাভাবিক ছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের সঙ্গে মানুষ যতই পরিচিত হতে লাগল, ততই সব কিছুর উপরে অসীমিত

অধিকারকে নিরর্থক বলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল। মানুষ যে শুধু সকলেরই অধিকারভুক্ত, সকলেরই সমান দাবিযুক্ত এক জগতে জন্মগ্রহণ করেছে দেখতে পেল তা নয়, তারা জন্মে দেখল যে সকলেরই তাদের উপর অধিকার ও দাবি আছে। প্রথম যুগের সভ্যতায় সামাজিক সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া আজ কঠিন, কিন্তু যে রোম্যান প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের ইতিহাসের কথা আমরা বলেছি, তাতে দেখতে পাই যে ঋণ শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠতে পারে এবং সেই অবস্থায় তা বাতিল করা উচিত,এবং জমির অসীমিত অধিকারও অনুরূপ অসুবিধাকর হতে পারে। ব্যাবিলোনিয়ায় শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে ক্রীতদাস রক্ষার সংখ্যাও অত্যন্ত কঠোরভাবে পরিমিত করা হয়েছিল। সবশেষে মহাবিপ্লবী ন্যাজারেথের যিশুর অনুশাসনে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অচিন্ত্যপূর্ব আঘাত হানতে দেখি। তিনি বলেছিলেন, বিশাল সম্পত্তির মালিকদের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে একটি উটের সুচের ফুটোর মধ্য দিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। মনে হয়, বিগত পঁচিশ-ত্রিশ শতাব্দী ধরে সম্পত্তির অনুমোদিত পরিমাপ সম্বন্ধে দৃঢ় অনবচ্ছিন্ন সমালোচনা চলে আসছিল। ন্যাজারেথের যিশুর মৃত্যুর একহাজার নশো বছর পরে আমরা দেখি, খৃষ্টধর্মদীক্ষিত সমগ্র জগৎ মানুষের কোন সম্পত্তি না থাকার পক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করছে। এবং 'মানুষ তার সম্পত্তি নিয়ে যা-খুশি তাই করতে পারে'—এই ধারণাতে ও তার অন্য ধরনের সব সম্পত্তির সম্বন্ধেও আজ সকলের সন্দেহ এসেছে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের এই জগৎ তখনো এ ব্যাপারে প্রশ্নাত্মক যুগেই ছিল। কোন-কিছুর সম্বন্ধেই তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মীমাংসিত সিদ্ধান্ত ছিল আরো অল্প। আর প্রথম চেষ্টা ছিল রাজাদের অপচয় ও লোভ এবং ধনী যোদ্ধাদের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করা। ফরাসী বিপ্লবের আরম্ভও হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কর থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু বিপ্লবের সাম্যবাদনীতিই ছিল যে সম্পত্তি রক্ষার জন্য, বিপ্লব তারই একেবারে বিরোধী। যখন বহু লোকের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই, খাওয়ার কিছু নেই, এবং যতক্ষণ না তারা পরিশ্রম করে—কঠোর পরিশ্রম করে—ততক্ষণ মালিকরা তাদের না দেবেন বাসস্থান না দেবেন খাবার—তখন কী করে সমস্ত লোক স্বাধীন ও সমান হতে পারে?

'ভাগ করা'ই হল এই ধাঁধার একমাত্র সমাধান, জানালো এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল। তারা সম্পত্তিকে সর্বজনীন করতে চাইল। আদি সমাজতন্ত্রীরা—আরো সঠিক হতে গেলে, সমভোগবাদী বা কম্যুনিস্টরা—অন্য পথ দিয়ে

এই পরিণতি আনতে চাইল, তাদের মত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে 'রহিত করা'। রাজ্যই (অবশ্য, গণতন্ত্রী রাজ্য) সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।

এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের যে স্বাধীনতা ও সুখ-সন্ধানী বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন লোক একদিকে যেমন সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব স্বতন্ত্র করতে চাইছিল, অন্যদিকে সেই সম্পত্তিকেই একেবারে রহিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক তা-ই। এই হেঁয়ালির সমাধান ছিল এই যে, মালিকানা একটি জিনিস নয়, অনেক জিনিসের সমষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রথমে বুঝতে শেখে যে সম্পত্তি শুধুমাত্র একটি সরল জিনিস নয়, সম্পত্তি বলতে বিভিন্ন মূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ মালিকানার জটিলতাও বোঝায়। বহু জিনিস (যেমন, মানুষের শরীর, শিল্পীর কাজের জিনিস, কাপড়-চোপড়, টুথ-ব্রাশ) একান্তভাবে ও নিঃসন্দেহে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং রেলগাড়ি, বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি, বাড়ি, ফসলের ক্ষেত, বিলাস-নৌকো প্রভৃতি অনেক রকমের জিনিস আছে যার প্রত্যেকটিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখা দরকার যে তার কতখানি এবং কীরকম ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে আসতে পারে এবং কতখানিই বা সরকারী বলে সাব্যস্ত হতে পারে, সমষ্টির স্বার্থে কতখানিই বা সরকার হাতে নিতে পারে এবং কতখানি ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। ঠিকভাবে দেখতে গেলে, এইসব প্রশ্ন রাজনীতি ও সুষ্ঠু সরকারী শাসন-ব্যবস্থার পর্যায়ে এসে পড়ে। এগুলি সমাজ-মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রশ্ন জাগায় এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সম্পত্তির সমালোচনা আজও বিজ্ঞানের চেয়ে বিরাট উত্তেজনাময় এক আন্দোলন বললেই ঠিক হয়। একদিকে আমাদের অধিকারের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা এবং তার প্রসার করার দাবি নিয়ে ব্যক্তিত্ববাদীরা, অন্যদিকে আমাদের সম্পত্তি একত্র করে আমাদের মালিকানার অধিকারকে সংযত করার দাবি নিয়ে সমাজ-তন্ত্রীরা। শাসনতন্ত্র চালানোর জন্য আমাদের উপর সামান্যতম কর-ধার্যের ঘোরতর বিরোধী চরম ব্যক্তিত্ববাদী ও যেকোন রকমের সম্পত্তি বঞ্চনায় বদ্ধপরিকর কম্যুনিস্ট এই দুই একেবারে পরস্পর-বিরোধী দলের মধ্যে সব রকম স্তর ও ভেদের মতাবলম্বী কার্যত পাওয়া যায়। আজকের সাধারণ সমাজতন্ত্রীদের সঙ্ঘক্রিয়াবাদী (Collectivist) বলা যেতে পারে ; তাঁরা অনেক কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে দেন ; কিন্তু শিক্ষা, পরিবহন, খনি, জমি, দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি অত্যন্ত সুসংগঠিত রাজ্য-সরকারের হাতে রেখে দিতে চান। আজকাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত ও পরিকল্পিত সমাজতন্ত্রের দিকে যুক্তিবাদী লোকদের

ক্রমশ আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। আজ ক্রমে ক্রমে এটাই বেশি পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে যে বড় বড় ব্যাপারে অশিক্ষিত লোকেরা সহজে এবং সাফল্যের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না, এবং জটিল রাজ্যগঠনে প্রতিটি পদক্ষেপ ও ব্যক্তিগত যে কারবারই রাজ্য গ্রহণ করে তার কাজে অনুরূপভাবে শিক্ষার প্রগতি এবং তার তত্ত্বাবধান ও সঠিক দোষ-গুণ বিচারের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আসে। যেকোন বিরাট সমষ্টিগত কাজ-কারবারের জন্য সমসাময়িক রাজ্যের সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক নীতি আজ অত্যন্ত স্থূল।

কিন্তু এক সময় মালিক ও শ্রমিকদের, বিশেষ করে স্বার্থপর মালিক ও বিরোধী শ্রমিকদের বিরোধের ফলে মার্ক্সএর নামের সঙ্গে জড়িত এক অত্যন্ত আদিম ও স্থূল কম্যুনিজম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। মার্ক্স তাঁর সিদ্ধান্তে এই বিশ্বাসে নির্ভর করে আসেন যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর মানুষের মন সীমাবদ্ধ এবং আমাদের সভ্যতায় ধনী ও মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্ব অপরিহার্য। যন্ত্র-বিপ্লবের প্রয়োজনে শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট শ্রমিক দল ক্রমে ক্রমে শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠবে এবং (শ্রেণী-সচেতন) অল্পসংখ্যক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতায় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কোন উপায়ে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকরা শক্তি অধিকার করে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থাসম্পন্ন রাজ্য গঠন করবে। এই বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ—সম্ভাব্য বিদ্রোহ—সবই ঠিক বোঝা যায়; কিন্তু তাতে এটাই পরিস্ফুট হয় না যে এর ফলে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা-সম্পন্ন রাজ্য, কিংবা সমাজ-বিধ্বংসী প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু জন্মগ্রহণ করবে।

মার্ক্স জাতি-বিরুদ্ধ সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী-সংগ্রাম স্থাপন করতে চেয়েছিলেন; মার্ক্সবাদ পর পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন (Workers' International) আহ্বান করে। কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিবাদী চিন্তার গোড়া থেকেও আন্তর্জাতিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হওয়া সম্ভব। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকে এই ধারণাই সকলের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে বিশ্বব্যাপী শ্রী ও সৌভাগ্যের জন্য স্বাধীন ও অবাধ বাণিজ্যের প্রয়োজন। যে ব্যক্তিবাদী দেশের প্রতিকূলতা করে, সে শুল্ক সীমা ও জাতীয় সীমান্তগ্রাহ্য সমস্ত স্বাধীন ব্যাপারের দমনেরও প্রতিকূলতা করবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একেবারে প্রাথমিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, মার্ক্সবাদীদের শ্রেণী-সংগ্রাম সমাজতন্ত্রবাদ ও ভিক্টোরীয় যুগের বৃটিশ বণিক-সম্প্রদায়ের অবাধ-বাণিজ্য দর্শনের মত পরস্পর-বিরোধী আদর্শাশ্রয়ী দুই চিন্তাধারা শেষপর্যন্ত দেশের গণ্ডী ও বাধা অতিক্রম

করে মানবিক ব্যাপারের নতুন বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষণের সেই একই পথ-সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। বাস্তবের যুক্তি মতবাদের যুক্তির কাছে জয়ী হয়। এইটুকু আমরা উপলব্ধি করি যে, একেবারে বিপরীতমুখী প্রারম্ভবিন্দু থেকে শুরু করেও ব্যক্তিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ একই সাধারণ পরীক্ষার অংশ: সে পরীক্ষা হল, মানুষ একত্র কাজ করতে পারে এমন এক বিস্তৃততর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যার উদ্ভাবন, এমন এক পরীক্ষা যা আবার ইউরোপে শুরু হয়েছিল এবং পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যে ও খৃষ্টরাজ্যে মানুষের বিশ্বাস শিথিল হওয়ায় এবং আবিষ্কারের যুগ ভূমধ্যসাগরস্থিত জগৎ ছাড়িয়ে তার দিকচক্রবাল সমগ্র বিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত করার পর এই পরীক্ষা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

সমস্ত মানুষ এক সমাজের অন্তর্গত, এবং এই ব্যাপারে যে বিশ্বব্যাপী সর্বসাধারণের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত, এ কথাই আজ দিন দিন সকলের কাছে সহজ হয়ে উঠছে। যেমন, এই গ্রহের সমস্তটা এখন এক অর্থনৈতিক সমাজ, এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য চাই বহুব্যাপ্তি-বিশিষ্ট এক পরিচালনা। আবিষ্কার মানুষের প্রচেষ্টাকে এত বেশি শক্তি ও ব্যাপ্তি দিয়েছে যে বর্তমানে এই ব্যাপারের খণ্ডাত্মক ও বিবদমান পরিচালনা দিন দিন অপচয়বহুল ও শঙ্কাসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। রাজস্ব ও অর্থকে আজ বিশ্ব-কল্যাণের জন্যই সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ব্যবহার করা উচিত। সংক্রামক ব্যাধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও দেশান্তর-গমন আজ বিশ্ব-সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। মানুষের কাজের অধিকতর শক্তি ও পরিসরের জন্য আজ যুদ্ধ অসমঞ্জস বিধ্বংসী ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, এমনকি মানুষে ও মানুষে, সরকারে ও সরকারের মধ্যে সমস্যা-সমাধানের অসৌষ্ঠব রীতি হিসাবেও অচল। এ-সব ব্যাপারের জন্য আজ পর্যন্ত সমস্ত শাসনতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপ্তি ও পরিসর-বিশিষ্ট শাসন ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান সমস্ত শাসনতন্ত্রকে এক করে কিংবা জয় করে সমস্ত পৃথিবীতে একত্রীভূত এক বৃহৎ শাসনতন্ত্র গঠন করতে পারলেই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। বর্তমান সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে মানুষ মানবজাতির পার্লামেণ্ট, বিশ্ব কংগ্রেস, পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি বা সম্রাটের কথা চিন্তা করছে। এ ধরনের কোন উপসংহারের জন্যই আমাদের মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া জাগে, কিন্তু অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা ও আলোচনা শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। এই পথে বিশ্বের একতায় বাধা সুপ্রচুর। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়

বা উন্নতি, শ্রমিক অবস্থার সমতা, বিশ্বশান্তি, মুদ্রাবিধি, জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাসম্পন্ন বহু বিশেষ সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকেই আজকের চিন্তাধারা মোড় ফিরেছে বলে মনে হয়।

সারা পৃথিবী আবিষ্কার করতে পারে যে, তার সাধারণ স্বার্থ আজ একটি সমস্যা হিসাবেই সকলে গ্রহণ করেছে, যদিও বিশ্ব-সরকার বলে যে কিছু আছে, এ কথা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু এ রকম মানবীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠারও আগে, দেশাত্মবোধক সন্দেহ ও ঈর্ষাকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক আবেগ-সৃষ্টিরও আগে, এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে সর্বসাধারণের মানবীয় ঐক্যের সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা গড়ে উঠবে, এবং সমস্ত মানুষ যে এক পরিবারভুক্ত, এই ধারণা বিশ্বজনের বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে।

বিশ শতাব্দীরও বেশি দিন ধরে মহান সার্বভৌম ধর্মগুলি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপন ও বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এসেছে; কিন্তু দলীয়, জাতীয়, ধর্মীয় ও বর্ণীয় বিরোধ-জনিত ঘৃণা, ক্রোধ ও অবিশ্বাস আজ পর্যন্ত সমস্ত মনুষ্য-সমাজের কার্যকরী অংশীদার হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মহানুভবতাকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে এসেছে। খৃষ্টযুগের ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সময় যেমন খৃষ্টরাজ্যের ধারণা মানুষের আত্মাকে অধিকার করার জন্য চেষ্টা করেছিল, এখন ঠিক সেইরকম এক ভ্রাতৃত্বের ধারণা মানুষের আত্মাকে অধিকার করার জন্য সংগ্রাম করছে। এই রকমের ধারণার প্রচার ও বিজয়ের জন্য দায়ী কয়েকটি অত্যন্ত অনুরক্ত ও অপ্রসিদ্ধ সেবাব্রতী ধর্মসমাজ এবং এই কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে কিংবা তার কী ফল-হতে পারে, তা সমসাময়িক কোন লেখক কল্পনা করতে পারেন না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যার সঙ্গে অবিমিশ্রভাবে মিশে গেছে বলে মনে হয়। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ ও উজ্জীবিত করতে পারে যে সৃজনী-শক্তি, তার কাছে আবেদনেই রয়েছে এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সমাধানের ইঙ্গিত। সাধারণের কল্যাণের দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অবিশ্বাস অশিক্ষা ও অহমিকাকে প্রতিফলন করে এবং নিজেও প্রতিফলিত হয়। একক ব্যক্তির অধিকারের দাবির বাহুল্য সম্রাট ও জাতির হিংস্র লোভেরই অনুরূপ ও এক অংশ। সেই একই প্রবৃত্তি-প্রবণতা, একই অজ্ঞানতা ও ঐতিহ্যের ফল তারা। সমস্ত জাতির সমাজতন্ত্রবাদই আন্তর্জাতিকতা। মানুষের যোগাযোগ ও সহযোগিতার এই ধাঁধার কোন প্রকৃত ও চরম সমাধানের জন্য এমন যথেষ্ট

গভীর ও শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও পর্যাপ্ত পরিকল্পিত শিক্ষাবিষয়ক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান যে থাকতে পারে, যারা এসব সমস্তার সম্মুখীন হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ এ কথা অনুভব করতেই পারে না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মানুষ বৈদ্যুতিক রেলপথ পরিকল্পনায় যেমন অপারগ ছিল, আমরাও এক কার্যকরী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনায় ঠিক সেইরকম অপারগ, যদিও আমরা জানি এ খুবই সম্ভব এবং শীঘ্রই কার্যে পরিণত হতে পারে।

কোন মানুষ তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে যেতে পারে না, এবং যে শান্তির উষাক্ষণের জন্য সমস্ত ইতিহাস প্রতীক্ষমান, কত পুরুষানুক্রম পরে আমাদের এই অপচয়ময় লক্ষ্যহীন জীবনের তিমির-রাত্রি অবসান করে তার উদয়-সমারোহ হবে—তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী করা একেবারে অসম্ভব। আমাদের প্রস্তাবিত সমাধান আজও অস্পষ্ট ও স্থূল। আমাদের উত্তেজনা ও সন্দেহ তাদের ঘিরে রেখেছে। আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ হলেও, মানসিক বুদ্ধি-বৃত্তির পুনর্গঠনের এক বিরাট ব্যাপার চলছে, আমাদের চিন্তাও প্রস্ফুটতর ও সঠিকতর হয়ে আসছে—ধীরে কিংবা দ্রুত ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু যতই স্পষ্ট হয়ে আসছে, ততই তারা মানুষের মন ও কল্পনাশক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। আশ্বাস ও সঠিকতার অভাবের জন্যই তাদের বর্তমান এই অনাধিপত্য। তাদের বিভিন্নভাবে এবং বিশৃঙ্খলভাবে পরিবেশনের জন্যই তাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা। কিন্তু নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর নতুন স্বপ্ন অমিত শক্তির অধিকারী হবে। হয়ত এখনই খুব দ্রুত সে-শক্তি আসতে পারে। এবং এই স্পষ্টতর ধারণাকে কেন্দ্র করে যুক্তিগতভাবে ও প্রয়োজন-মত শিক্ষার পুনর্গঠনের এক বিরাট ব্যাপার এসে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তার

পরিবহনের নতুন উদ্ভাবনে উত্তর আমেরিকাই পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে দ্রুত ও বিস্ময়কর ফল দেখিয়েছিল। মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীর উদারনৈতিক ভাবধারা যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে গ্রহণ করেছিল এবং তার শাসন-তন্ত্র গঠিত হয়েছিল সেইভাবে। রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম ও রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল, সম্মান-সূচক উপাধি ভূষণ রহিত হল, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সম্পত্তি রক্ষায় উৎসাহ বর্ধিত হল, এবং প্রথমে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবস্থার প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক বয়স্ক লোকের ভোটদানের অধিকার হল। ভোট দেওয়ার প্রণালী অত্যন্ত স্থূল হওয়ার ফলে রাজনৈতিক জীবন সুসংগঠিত দলীয় যন্ত্রের হাতের মুঠোয় চলে গেল কিন্তু

তার জন্ম এই নতুন ভোটাধিকারী জনতা সমসাময়িক অন্য কোন দেশের লোকের চাইতে শক্তি, উৎসাহ ও জনহিতৈষিতায় পিছিয়ে ছিল না।

তারপর এল রেলপথের দ্রুত প্রসার, যার দিকে আমরা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, যে আমেরিকার সমস্ত উন্নতির মূলে এই রেলপথের দ্রুত প্রসার, তার কথাই সে সবচেয়ে কম অনুভব করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এমন ভাবে রেলপথ, বাষ্প-জাহাজ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নিয়েছে, যেন তারা তাদের বিস্তার ও বৃদ্ধির স্বাভাবিক এক অংশ। কিন্তু তারা তা নয়। যুক্তরাস্ট্রের একতা রক্ষার জন্মই যেন ঠিক সময়ে তারা এসে উপস্থিত হয়েছিল। আজকের যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম সৃষ্টি করে বাষ্প-জাহাজ, এবং তার পর রেলপথ। এদের ছাড়া বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র—এই এক বিরাট মহাদেশীয় জাতি, একেবারে অসম্ভব হত। জনতার পশ্চিমমুখো গতি অনেক মন্থরতর হত। হয়ত তারা মধ্যবর্তী বিরাট সমতল-ভূমি অতিক্রম করতে পারত না। মহাদেশের এপার থেকে ওপারের অর্ধেকেরও কম দূর, সমুদ্র-উপকূল থেকে মিসৌরীতে কার্যকরী উপনিবেশ গড়ে তুলতে লেগেছিল প্রায় ২০০ বছর। নদীর পরপারে প্রথম যে রাজ্য স্থাপিত হয়, তা ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাষ্প-জাহাজ রাজ্য, মিসৌরি। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী সমস্ত রাজ্য কয়েক বছরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।

সিনেমার সংস্থান আমাদের থাকলে ১৬০০ সাল থেকে এক এক বছর করে আমেরিকার মানচিত্র আমরা কত চমৎকার করে দেখাতে পারতাম: একটি বিন্দুতে একশো জন লোক, এরকম ছোট ছোট বিন্দু দিয়ে হাজার হাজার লোক, ছোট তারকার চিহ্ন দেখাত লক্ষ লোকের অধ্যুষিত নগরী।

পাঠকেরা দেখতেন, উপকূলবর্তী অঞ্চল ও নদীর মোহনায়, ইণ্ডিয়ানা, কেনটাকি প্রভৃতির মধ্যে কেমন এই বিন্দুগুলি ছড়িয়ে পড়ছে। ১৮১০ সালের কাছাকাছি কোথাও এক পরিবর্তন দেখা যাবে। নদীর গতিপথ যেন কর্ম-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিন্দুগুলির সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাষ্প-জাহাজের জন্মই এই ঘটনা। এই প্রথম অভিযাত্রী বিন্দুগুলিকে শীঘ্রই দেখা যাবে বিরাট নদীর মুখের কতগুলি জায়গা থেকে লাফিয়ে কানসাস ও নেব্রাস্কায় ছড়িয়ে পড়তে।

তারপর এই কালো বিন্দুগুলি হামাগুড়ি দেবে না, ছুটতে শুরু করবে। এখন তাদের আবির্ভাব এত দ্রুত হবে যে মনে হবে যেন স্প্রেয়িং মেশিন দিয়ে তাদের ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লোকের অধ্যুষিত প্রথম নগরী দেখানোর জন্ম হঠাৎ

এখানে সেখানে প্রথম তারকা-চিহ্ন ফুটে উঠবে। প্রথমে একটি দুটি, তারপর প্রচুর নগরী—প্রত্যেকটি রেলপথের জালে যেন এক-একটি গ্রন্থি।

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির মত ব্যাপারের আর পৃথিবীর ইতিহাসে কোন পূর্ববর্তিতা দেখা যায় না; এ এক নতুন ধরনের ঘটনা। এ রকমের কোন এক সমাজের অস্তিত্ব পূর্বে হতে পারত না, এবং হলেও রেলপথের অভাবে বহু পূর্বে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রেলপথ বা টেলিগ্রাফ ছাড়া ক্যালিফোর্নিয়াকে ওয়াশিংটনের চেয়ে পিকিং থেকেই ভালভাবে শাসন করা যেত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনতা যে শুধু দুর্দম বেগে বেড়ে উঠেছে তা নয়, তারা সমভাবাপন্নও থেকেছে। তারা আরো একাত্ম হয়েছে। এক শতাব্দী আগে ভার্জিনিয়ার লোকের সঙ্গে নিউ ইংল্যাণ্ডের লোকের যতটা মিল ছিল, আজ স্যানফ্র্যান্সিসকোর লোকের সঙ্গে নিউ-ইয়র্কের লোকের তার চেয়ে অনেক বেশি মিল। আর এই একাত্মকরণের প্রক্রিয়া অবাধে চলছে। রেলপথ, টেলিগ্রাফ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দিন দিন এক বিরাট ঐক্যে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। বিমান-পথ এই বন্ধনকে আরো শক্ত করে তুলছে।

ইতিহাসে এ একেবারে নতুন জিনিস। আগে ১০০,০০০,০০০ এরও বেশি জনসংখ্যা নিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল পরস্পর-বিরোধী জনসংখ্যার সংমিশ্রণ; এরকম বিপুল-সংখ্যক একজাতীয় লোক কখনো ছিল না। এই নতুন জিনিসের জন্য আমরা একটি নতুন নাম চাই। ফ্রান্স কিংবা হল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্ট্রকেও আমরা একটি দেশ বলি; কিন্তু এক্কা গাড়ি ও মোটর গাড়ি মধ্যে যে পার্থক্য, এই দুই প্রকারের দেশের মধ্যেও ঠিক সেইরকম পার্থক্য। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি তারা; তাদের কাজের গতি কিংবা প্রথাও একেবারে বিভিন্ন। পরিমাপে ও সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র আজ কোন ইউরোপীয় দেশ ও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপথে।

কিন্তু চরম বিরোধের এক এক যুগের মধ্য দিয়ে আমেরিকানরা আজকের এই বিরাটত্ব ও সুনিশ্চিত নিঃশঙ্কতার পথে এসেছে। দক্ষিণ ও উত্তর রাষ্ট্র-সমূহের আদর্শ ও স্বার্থের গভীর সংঘাত নিবারণ-সম্ভাবনার আগেই নদীপথের বাষ্প-জাহাজ, রেলপথ, টেলিগ্রাফ কিংবা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধাদি এসে পৌছয় নি। দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি ছিল দাস-প্রথার পক্ষে; উত্তর রাষ্ট্রগুলিতে সমস্ত মানুষই ছিল স্বাধীন। যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই বিভাগের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মতানৈক্যের বিরোধ ও বিসংবাদ প্রথমে রেলপথ ও বাষ্প-জাহাজ ঠিক বাড়িয়ে তোলে নি। কিন্তু নতুন পরিবহনের সুযোগে একতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নই সকলের মনে উঁকি দিতে লাগল: দক্ষিণ রাষ্ট্রের, না উত্তর রাষ্ট্রের আদর্শ সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে? দুই দলের মধ্যে মীমাংসার

কোন সম্ভাবনাই ছিল না। উত্তরের আদর্শ ছিল স্বাধীন ও ব্যক্তিত্ববাদী, দক্ষিণের ছিল বিরাট জমিদারি ও বিরাট-সংখ্যক কালা আদমির উপর সচেতন ভদ্রগোষ্ঠীর প্রভুত্ব ও আধিপত্য।

জনস্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলে যতই নতুন দেশ এক-একটি নতুন রাজ্যে গঠিত হয়ে উঠতে লাগল, যতই তারা নতুন আমেরিকান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে লাগল, ততই দুই আদর্শের সংঘাতের ক্ষেত্র প্রশস্ত হতে লাগল : যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত স্বাধীন অধিবাসীর দেশ হবে, না, এখানে জমিদারি ও ক্রীতদাস-প্রথা থাকবে। ১৮৩৩ সাল থেকে এক আমেরিকান দাস-প্রথা-বিরুদ্ধ সমিতি শুধু যে দাসপ্রথা-বৃদ্ধিকেই প্রতিরোধ করে চলছিল তা নয়, সমস্ত দেশে দাস-প্রথা একেবারে বিলুপ্তির জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। টেক্সাসকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশানুমতি দেওয়ার ব্যাপারে এই বিরোধ সম্মুখ-সংঘর্ষে পরিণত হল। টেক্সাস প্রথমে ছিল মেক্সিকো গণতন্ত্রের এক অংশ, কিন্তু দাস-প্রথাবদ্ধ রাজ্যের লোকদেরই ছিল এটি এক উপনিবেশ, এবং মেক্সিকো থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র তাকে গ্রহণ করে। মেক্সিকোর আইনানুযায়ী টেক্সাসে দাস-প্রথা রহিত ছিল, কিন্তু এখন দক্ষিণ রাজ্যগুলি টেক্সাসে দাস-প্রথা চালুর জন্য দাবি জানাল এবং শেষ পর্যন্ত তা লাভও করল।

ইতিমধ্যে সমুদ্রযাত্রার উন্নতির ফলে ইউরোপ থেকে প্রচুর লোক আমেরিকায় আসতে লাগল এবং ফলে উত্তর-রাজ্যগুলির জনসংখ্যা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আয়োয়া, উইসকন্সিন, মিনেসোটা ও ওরেগন প্রভৃতি কৃষি-দেশকে এক-একটি রাজ্যে পরিণত করে তুলল : তার ফলে সেনেটে কিংবা হাউস অব রেপ্রেজেণ্টেটিভে দাস-প্রথা-বিরুদ্ধ উত্তর-রাজ্যগুলির আধিপত্য-বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা গেল। তুলো-চাষের দেশ দক্ষিণ-রাজ্যগুলি দিন-দিন দাস-প্রথা-বিরুদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতায় ও কংগ্রেসে তাদের আধিপত্যের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা তুলল। দক্ষিণে মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিয়ে পানামা পর্যন্ত এক বিরাট দাস-রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্নে দক্ষিণ রাজ্য বিভোর হয়ে পড়ল।

১৮৬০ সালে দাস-প্রথা-বিরোধী অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের আবার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে দক্ষিণ-রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করা মনস্থ করল। দক্ষিণ ক্যারোলিনা পৃথক হওয়ার আইন পাশ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা ও টেক্সাস তার সঙ্গে যোগ দিল এবং আলাবামার মণ্টগোমেরিতে এক সম্মেলন আহ্বান করে আমেরিকার সম্মিলিত

রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে জেফার্সন ডেভিসকে মনোনীত করল এবং নিগ্রো দাস-প্রথাকে স্বীকার করে এক নতুন শাসন-তন্ত্র রচনা করল।

স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর যে নতুন মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন একেবারে তাদের আদর্শ-স্বরূপ। জনস্রোতের পশ্চিম দিকের প্রবাহে তিনিও ছেলেবেলায় ভেসে বেড়িয়েছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল কেণ্টাকিতে (১৮০৯)। ছেলেবেলায় তাঁকে ইণ্ডিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারপর তিনি যান ইলিনয়েসএ। সে যুগে ইণ্ডিয়ানার জীবন-যাত্রা ছিল ভীষণ কষ্টকর—বিজন প্রদেশের মধ্যে ছোট একটা কাঠের বাড়ি; এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা একরকম তিনি পান নি বললেই হয়। কিন্তু তাঁর মা খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁকে পড়াতে শুরু করেন এবং তিনি একজন অত্যন্ত অনুরাগী পাঠক হয়ে ওঠেন। সতের বছর বয়সে তিনি একজন তরুণ ক্রীড়াবিদ, বেশ নাম-করা পালোয়ান ও দৌড়বীর হয়ে ওঠেন। একটা গুদামে তিনি কিছুদিন কেরানির কাজ করেন, এক মাতাল অংশীদারের সঙ্গে ব্যবসায় নামেন এবং ঋণে এত জড়িয়ে পড়েন যে পনের বছরের মধ্যেও তা পুরো শোধ করতে পারেন নি। ১৮৩৪ সালে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ইলিনয়েস রাজ্য থেকে হাউস অব রেপ্রেজেণ্টেটিভে মনোনীত হন। কংগ্রেসে দাস-প্রথা-রক্ষা দলের বিরাট নেতা ইলিনয়েসএর সেনেটর ডগলাস সভ্য হওয়ায় বিশেষ করে ইলিনয়েসেই দাস-প্রথা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগুন জ্বলে ওঠে। ডগলাস একজন বিশেষ সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং কয়েক বছর ধরে লিঙ্কন বক্তৃতা ও পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালালেন এবং ধীরে ধীরে তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের শেষ সংগ্রাম হয় ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আন্দোলন, এবং ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণের রাজ্যগুলি ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পৃথক হয়ে ছোটখাট যুদ্ধ চালাচ্ছে।

আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ হয়েছিল অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে। কয়েক হাজার সৈন্য থেকে আরম্ভ করে কয়েক লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনীর সৃষ্টি হয়, এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য-সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি হয়ে ওঠে। নিউ মেক্সিকো থেকে পূর্বসাগর উপকূল পর্যন্ত বিরাট জায়গা জুড়ে এই যুদ্ধ চলে। প্রধান লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটন ও রিচমণ্ড। টেনেসি ও ভার্জিনিয়ার পাহাড়ে ও জঙ্গলে এবং মিসিসিপির তীর ধরে এই বিরাট সংগ্রামের সম্বন্ধে বিশদ করে বলার স্থানসঙ্কুলান এই পুস্তকে সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের প্রচুর অপচয়, ও ভীষণ নরহত্যা সংঘটিত হয়। আক্রমণের পরেই আসে পাল্টা আক্রমণ;

আশার পরেই হতাশা, আবার আশা এবং নৈরাশ্য। মাঝে মাঝে সম্মিলিত রাষ্ট্রদলের প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে ওয়াশিংটন চলে আসে, আবার কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী রিচমণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। সম্মিলিত দলের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম এবং তাদের সম্ভার-ব্যবস্থা খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল লী নামে এক অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতির পরিচালনায় তারা যুদ্ধ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাপতিত্ব ছিল অনেক নিকৃষ্ট। সেনাপতিদের পদচ্যুত করা হত, নতুন সেনাপতি নিয়োগ করা হত; এবং অবশেষে শেরমান ও গ্র্যান্টের

অধীনে এই হীনবল দক্ষিণ-রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়। ১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে শেরমানের নেতৃত্বে এক কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর বাম দিক চূর্ণ করে এই সম্মিলিত রাজ্যগুলির বুকের উপর দিয়ে টেনেসি থেকে জর্জিয়া অতিক্রম করে একেবারে সমুদ্র-উপকূলে এসে উপস্থিত হয়, এবং তারপর মোড় ফিরে ক্যারোলিনার ভিতর দিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর পশ্চাৎ দিক আক্রমণ করে। শেরমান এসে তাঁকে ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত গ্র্যাণ্ট লীকে রিচমণ্ডের সামনে আটকে রাখলেন। ৯ই এপ্রিল, ১৮৬৫ সালে লী এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী অ্যাপোম্যাটক্স কোর্ট হাউসে আত্মসমর্পণ করেন

এবং এক মাসের মধ্যেই সম্মিলিত দলের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং সম্মিলিত রাষ্ট্রের অবসান হয়।

এই চার বছরের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের প্রচুর দৈহিক ও আত্মিক নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। প্রত্যেকের মনেই রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ দৃঢ়বদ্ধ ছিল এবং উত্তরাংশ দক্ষিণাংশের উপর দাস-প্রথা বন্ধ করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। সীমান্ত রাজ্যগুলিতে ভাই-ভাই পিতা-পুত্র পরস্পর দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। উত্তরাংশ তাদের আদর্শ সত্য বলে মনে করত, কিন্তু আবার অনেক অনেক লোকের মনে হত সে আদর্শ একেবারে সম্পূর্ণ ও অবিসংবাদী সত্য নয়। কিন্তু লিঙ্কনের কাছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁর আদর্শ ছিল ঐক্য: তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অখণ্ড শান্তি। তিনি দাস-প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন; কিন্তু তাঁর কাছে দাস-প্রথা ছিল গৌণ; তাঁর মুখ্য দৃষ্টি ছিল, যাতে আমেরিকা দুই বিরুদ্ধবাদী ও বিবদমান অংশে বিভক্ত না হয়।

যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সেনাপতিরা অত্যন্ত দ্রুত দাস-প্রথা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন, তখন লিঙ্কন তাদের সে উৎসাহ প্রশমিত করেন। এক-এক রাজ্য ধরে দাস-প্রথা রদ ও তার জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসেই শুধু পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় কংগ্রেস আইন সংশোধন করে দেশ থেকে দাস-প্রথা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সমস্ত রাজ্যে এ প্রস্তাব সমর্থিত হয়ে আসার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়।

১৮৬২ এবং ১৮৬৩ সালেও যখন যুদ্ধ চলতে থাকে, তখন প্রাথমিক আতিশয্য ও উৎসাহ কমে এসেছে, এবং রণ-ক্লান্তি ও যুদ্ধ-বিরক্তির সমস্ত অবস্থাই আমেরিকা পেয়েছে। প্রেসিডেন্টের পিছনে তখন পরাজয়বাদীরা, বিশ্বাসঘাতকের দল, পদচ্যুত সেনাপতি, কুটিল রাজনৈতিক চাল ও সন্দিগ্ধ ও ক্লান্ত জনসাধারণ এবং সামনে অনুপ্রাণিত সেনাপতিরা ও হতাশ সৈন্যবাহিনী। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা নিশ্চয় ছিল এই যে, রিচমণ্ডে জেফার্সন ডেভিসের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। ইংরেজ সরকার অন্যায় ব্যবহার করেন এবং ইংল্যাণ্ডের সম্মিলিত রাজ্যের প্রতিনিধিদের তিনটি দ্রুতগামী জাহাজ চালানোর অনুমতি দেন—আলবামা জাহাজের কথাই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। তারা সমুদ্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য-জাহাজের পিছনে তাড়া করে হয়রান করে বেড়াত। মেক্সিকোয় ফরাসী সৈন্যবাহিনী মনরো ডকট্রিনকে মনের আনন্দে

দু-পায়ে মাড়াচ্ছিল। রিচমণ্ড থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার এক সুচতুর প্রস্তাব এল: এই যুদ্ধের প্রশ্ন ভবিষ্যৎ আলোচনায় মীমাংসিত হবে, এখন উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যগুলি মিত্র হয়ে মেক্সিকো থেকে ফরাসীদের তাড়াক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে লিঙ্কন এ-সব প্রস্তাবে কর্ণপাত করবেন না। ফরাসীদের তাড়াতে হলে এক জাতি হয়ে তাড়ানো যেতে পারে, দুই জাতি হয়ে নয়।

সুদীর্ঘকালের চরম বিপর্যয় ও নিষ্ফল চেষ্টা, বিভেদ ও মন্দীভূত সাহসের তমিস্রার ভিতর দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে শক্ত হাতে এক করে ধরে রাখলেন; এবং তিনি যে তাঁর অভিপ্রায়ে একবারও দ্বিমনা হয়েছিলেন, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এমন এক-এক সময় গেছে যখন করবার কিছুই নেই, দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিমূর্তির মত তখন হোয়াইট হাউসে একা নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন: আবার এক-এক সময় লঘু কাহিনী ও পরিহাসে তাঁর মনকে বিশ্রাম দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রকে বিজয়ী হতে তিনি দেখে গেছিলেন। রিচমণ্ডের আত্মসমর্পণের একদিন পরে তিনি সেখানে প্রবেশ করেন এবং লীর বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের কথা শোনেন। ওয়াশিংটনে ফিরে এসে তিনি ১১ই এপ্রিল জনসাধারণের কাছে শেষ ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল পরাজিত রাজ্যের সঙ্গে পুনর্মিলন ও সেখানে কেন্দ্রানুরক্ত শাসনের পুনস্থাপন করা। ১৪ই এপ্রিলের সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের ফোর্ডের থিয়েটারে তিনি যখন অভিনয় দেখছিলেন, তখন বুথ নামে এক অভিনেতা সকলের অলক্ষ্যে তাঁর বক্সে প্রবেশ করে মাথার পিছনে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর বিরুদ্ধে বুথের ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল। কিন্তু লিঙ্কনের কাজ শেষ হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পেয়েছিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত কোন রেলপথ ছিল না: যুদ্ধের পর একটি দ্রুত-বর্ধমান গাছের মত রেলপথ সারা দেশ ছেয়ে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট দেশকে এক অভঙ্গুর মানসিক ও বস্তুতান্ত্রিক একতায় আবদ্ধ করে। যতদিন না চীনের সর্বসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠছে ততদিন পৃথিবীর মধ্যে এই আমেরিকাই সবচেয়ে বড় প্রকৃত জনসমাজ গড়ে তুলেছে।

ইউরোপে জার্মানির প্রাধান্য-বিস্তার

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের দুঃসাহসের পর ইউরোপ কয়েক বছর অরক্ষিত শান্তি ও পঞ্চাশ বছর পূর্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আধুনিক পুনরুজ্জীবনের মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে ছিল, এ আমরা আগেই বলেছি। শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত

ইস্পাতের ব্যবহার, রেলপথ,বাষ্প-জাহাজ প্রভৃতির নতুন সুযোগ-সুবিধা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে নি। কিন্তু নাগরিক শিল্পোন্নতি-জনিত সামাজিক রেষারেষি বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স বিশেষ করে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিল। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পর আর-একটি বিপ্লব হয় ১৮৪৮ সালে। তারপর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এক ভাইপো তৃতীয় নেপোলিয়ন হন প্রথমে প্রেসিডেন্ট এবং পরে (১৮৫২ সালে) সম্রাট হন।

তিনি প্যারিসকে নতুন করে গঠনে ব্রতী হলেন : সুদর্শন, অস্বাস্থ্যকর, সপ্তদশ শতাব্দীর এই নগরীকে তিনি আধুনিক সুপ্রশস্ত, ল্যাটিন-ভাবাপন্ন মার্বেল নগরীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি ফ্রান্সকেও পুনর্গঠিত করে এক অপূর্ব মনোহর আধুনিক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। ' সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃহৎ শক্তিদের যে প্রতিযোগিতায় সমগ্র ইউরোপ ব্যর্থ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তাঁরও সেইদিকে তেমনি ঝোঁক ছিল। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসও (১৮২৫—৫৬) আক্রমণাত্মক হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল গ্রাসের উদ্দেশ্যে দক্ষিণের তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর চাপ দিচ্ছিলেন।

শতাব্দী শেষ হওয়ার পরেই ইউরোপ আবার নতুন যুদ্ধের আবর্তে পড়ল। 'শক্তি-সাম্য' ও আধিপত্যের জন্যই ছিল এই যুদ্ধ। তুর্কীকে সাহায্য করে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও সার্দিনিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাভূত করে। প্রাসিয়া (ইটালিকে মিত্র হিসাবে নিয়ে) ও অস্ট্রিয়া জার্মানিতে প্রাধান্য লাভের জন্য যুদ্ধ করে, স্যাভয়ের বিনিময়ে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার কবল থেকে উত্তর-ইটালি মুক্ত করে দেয়, এবং ইটালি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাজ্যে পরিণত হয়। তারপর তৃতীয় নেপোলিয়ন দুর্বুদ্ধি-চালিত হয়ে আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের সময় মেক্সিকোয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন ; সেখানে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে তিনি সম্রাট করেন এবং যে-মুহূর্তে তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসেন, মেক্সিকানরা ম্যাক্সিমিলিয়ানকে গুলি করে হত্যা করে।

১৮৭০ সালে ইউরোপে প্রাধান্য লাভের জন্য ফ্রান্স ও প্রাসিয়ার মধ্যে এক বহুদিন-মুলতুবি-থাকা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রাসিয়া বহুদিন পূর্বেই এই সম্ভাবনার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হচ্ছিল এবং ফ্রান্স আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠেছিল। অত্যন্ত দ্রুত এবং নাটকীয় ভাবে তার পরাজয় হয়। অগস্টে জার্মানরা ফ্রান্স আক্রমণ করে : সম্রাটের অধীনে এক বিরাট ফরাসী বাহিনী সেপ্টেম্বর মাসে সেডানে আত্মসর্পণ করে, আর একটি আত্মসমর্পণ করে অক্টোবরে মেৎসএ, এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অবরোধ ও বোমা-বর্ষণের পর প্যারিস জার্মানদের

অধিকারে আসে। আলসেস ও লরেইন প্রদেশ দুটি জার্মানদের দিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টে শান্তিচুক্তি সই হয়। অস্ট্রিয়া বাদে, সমস্ত জার্মানি এক সাম্রাজ্যে একতাবদ্ধ হয় এবং প্রাসিয়ার রাজা জার্মান সম্রাট হিসাবে ইউরোপীয় সীজারদের উজ্জ্বল তালিকায় স্থান লাভ করেন।

তারপর তেতাল্লিশ বছর ধরে ইউরোপ মহাদেশে জার্মানি সর্বপ্রধান শক্তি বলে স্বীকৃত হয়। ১৮৭৭—৮ সালে রুশ-তুর্কী-যুদ্ধ হয় এবং তারপর বল্কান প্রদেশে কয়েকটি সামান্য সীমান্ত অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও স্থির থাকে।

সাগরপারে বাষ্প-জাহাজ ও রেলপথের নতুন সাম্রাজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ছিল সাম্রাজ্যচ্যুতির ও সাম্রাজ্যবাদীদের মোহমুক্তির যুগ। বৃটেন ও স্পেন থেকে তাদের আমেরিকার উপনিবেশে যাওয়ার সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর পথের জন্য যাতায়াত খুব সহজ ও সুখকর ছিল না; সুতরাং উপনিবেশ-গুলি তাদের বিশেষ মতবাদ, স্বার্থ, এমন কি কথা বলার ধরন-সমেত নতুন ও বিশিষ্ট জন-সমাজে পৃথক হয়ে উঠল। তাদের যোগসূত্র ছিল জাহাজ; তার স্বল্পতা ও অনিশ্চতায় তারা বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ক্যানাডায় ফ্রান্সের অধিকারের মত বিজন দেশে কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র, কিংবা ভারতবর্ষে বৃটেনের মত বিদেশী লোকদের মধ্যে কয়েকটি বাণিজ্য-উপনিবেশ তাদের কোনরকম জীবনরক্ষার প্রয়োজনে জাতির সমর্থন লাভের জন্য দেশ ও জাতিকে আঁকড়ে ধরার যুক্তি পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে সাগরপারের দেশ-শাসনের ব্যাপারে ঠিক অতটুকুই এবং তার একটুও বেশি মাথা না ঘামানোই উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মানচিত্রে ইউরোপের বাইরে যে চিত্রময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, ১৮২০ সালে তার সীমা অত্যন্ত কমে যায়। শুধু রুশরাই এশিয়ার উপর দিয়ে তাদের সীমান্ত বরাবর বাড়িয়ে যায়।

১৮১৫ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্য বলতে ছিল ক্যানাডার স্বল্পাধ্যুষিত সমুদ্র-উপকূল, নদী ও হ্রদ অঞ্চলগুলি, বিরাট বিজন প্রদেশের মধ্যে হাডসন বে কোম্পানির কয়েকটি পশম-বাণিজ্য কেন্দ্র, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতবর্ষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, কৃষ্ণজাতি ও বিপ্লব-ধর্মী ওলন্দাজ-অধ্যুষিত উত্তমাশা অন্তরীপের উপকূলাঞ্চল; আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য-কেন্দ্র, রক জিব্রাল্টার, মাল্টা দ্বীপ, জামাইকা, দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গায়না ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কয়েকটি দাস-প্রথা-সমন্বিত ক্ষুদ্র অঞ্চল, এবং পৃথিবীর অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার বটানি বে ও টাসমানিয়াতে অপরাধীদের জন্য দুটি ছোট দ্বীপ।

স্পেনের ছিল কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কয়েকটি উপনিবেশ, ও পর্তুগালের আফ্রিকায় কয়েকটি পুরাতন যুগের অধিকার ছিল। হল্যাণ্ডের ছিল ইস্ট ইণ্ডিজ ও ডাচ গায়নায় কয়েকটি দ্বীপ এবং ডেনমার্কের ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একটি কি দুটি দ্বীপ। ফ্রান্সের ছিল পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জের দু-একটা দ্বীপ ও ফরাসী গায়না। ইউরোপীয় শক্তিরা যেন ঠিক এতটা জায়গাই চেয়েছিল। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরই যা-কিছু একটু রাজ্য-বিস্তারের উৎসাহ দেখা গেছিল।

ইউরোপ যখন নেপোলিয়নের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন উত্তর দেশের তুর্কোমান ও অনুরূপ আক্রমণকারীদের মতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন গভর্ণর জেনারেলের অধীনে ভারতবর্ষে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এবং ভিয়েনার শান্তি-চুক্তির পর এই কোম্পানি রাজস্ব আদায়, যুদ্ধ চালানো, এশীয় শক্তিদের কাছে দূত পাঠানো ইত্যাদির মত কাজ এক প্রায়-স্বাধীন রাজ্যের মতই করে যেতে লাগল : কিন্তু এই রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য চালান হত পশ্চিম দেশে।

কীভাবে বৃটিশ কোম্পানি কখনো এক শক্তির মিত্র কখনো বা অন্য শক্তির মিত্র হয়ে প্রাধান্য বজায় রেখে, শেষ পর্যন্ত সকলকে পরাস্ত করে ভারত দখল করল—সে-কথা এখানে বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। তার শক্তি আসাম, সিন্ধু ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আজকের ইংরেজ স্কুলের ছাত্রদের কাছে পরিচিত ভারতবর্ষের মানচিত্র তার আকার গ্রহণ করতে শুরু করল—বৃটিশ শক্তির অধীনস্থ বিরাট প্রদেশগুলির মাঝে মাঝে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য।

ভারতবর্ষে পর পর কয়েকটি দেশীয় সৈন্য-বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বৃটিশ রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করে। 'ভারতবর্ষের উন্নততর শাসনের জন্য প্রণীত আইন' নামে এক নতুন আইন-বলে গভর্ণর জেনারেলের পরিবর্তে ভাইসরয় সম্রাটের প্রতিভূ হলেন এবং কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে দায়বদ্ধ সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড বীকন্সফিল্ড মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করে কার্য সমাধা করেন।

এই অভিনব পন্থায় আজ ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে যোগসূত্র আছে। ভারতবর্ষ অজাও সেই প্রবল-প্রতাপ মোগলদেরই সাম্রাজ্য রয়ে গেছে, শুধু সেই প্রবল-প্রতাপ মোগলদের পরিবর্তে এসেছে 'রাজদণ্ড-চালিত প্রজাতন্ত্রী রাজ্য' গ্রেট বৃটেন। ভারতবর্ষ হয়েছে স্বেচ্ছাচারহীন এক স্বৈর-শাসন। তার শাসনে স্বৈর-একাধিপত্যের অসুবিধাও আছে, গণতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের অব্যক্তিক দায়িত্বহীনতাও আছে। নালিশের জন্য ভারতবাসীর কোন দৃশ্যমান সম্রাট নেই; তার সম্রাট এক স্বর্ণ-

প্রতীক : তাকে হয় ইংল্যাণ্ডে পুস্তিকা বিতরণ করতে হবে, নয় বৃটিশ হাউস অব কমন্সে একটি প্রশ্নাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্লামেন্ট যত বেশি বৃটিশ ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়বে, ভারতবর্ষের প্রতি তার দৃষ্টি তত অল্প পড়বে এবং ততই তার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

ভারতবর্ষ ছাড়া, রেলপথ ও বাষ্প-জাহাজের সুব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের বিশেষ বিস্তার আর হয় নি। বৃটেনের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মনে করতেন, সাগরপারের সাম্রাজ্য দেশের দুর্বলতারই একরকম উৎস। ১৮৪২ সালে তামার খনি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশের অত্যন্ত ধীর গতিতে উন্নতি হচ্ছিল এবং ১৮৫১ সালে সোনা পাওয়ায় এটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। পরিবহনের উন্নতির ফলে অস্ট্রেলিয়ার পশম ইউরোপের এক বিশেষ পণ্য বলে পরিগণিত হয়। ক্যানাডাও ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত বিশেষ অগ্রসর হয়নি ; বৃটিশ ও ফরাসী অধিবাসীদের বিরোধে সব সময়েই ছিল অশান্তি ; বেশ কয়েকবার বড়-রকমের বিদ্রোহ দেখা দেয়, এবং ১৮৬৭ সালে এক নতুন আইনের বলে ক্যানাডাকে স্বায়ত্তশাসিত সাম্রাজ্যে পরিণত করেই এই অন্তর্বিরোধ দূর হয়। ক্যানাডার দৃষ্টিভঙ্গী রেলপথই পরিবর্তিত করে। ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের মত, ক্যানাডাও এর ফলে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হতে সক্ষম হয়। তার শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইউরোপে পণ্যসামগ্রী হিসাবে পাঠাতে পারে এবং তার দ্রুত বিস্তার সত্ত্বেও ভাষায়, স্বার্থে ও সহানুভূতিতে একই জাতি থাকতে পারে। সত্য-সত্যই রেলপথ, বাষ্প-জাহাজ ও টেলিগ্রাফ ঔপনিবেশিক প্রগতির সমস্ত অবস্থাকেই বিশেষভাবে পরিবর্তিত করে তোলে।

১৮৪০ সালের আগেই নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এই দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাবনা তদন্ত করার জন্য নিউজিল্যাণ্ড ল্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হয়। নিউজিল্যাণ্ডকেও বৃটিশ রাজদণ্ডের অধীনে একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হিসাবে যোগ করা হয়।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, পরিবহনের নতুন পদ্ধতির সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে বৃটিশ অধিকারের মধ্যে ক্যানাডাই অগ্রণী হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলি, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ইউরোপের বাজার অধিকার করার জন্য গো-ব্যবসা ও কফির চাষই প্রশস্ত মনে করল। এতদিন পর্যন্ত এই অনধ্যুষিত বর্বর দেশে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ সোনা কিংবা অন্য ধাতু, মশলা, হাতীর দাঁত কিংবা ক্রীতদাসের লোভেই এসেছে। কিন্তু

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশীয় সরকার বাইরের দেশ থেকে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের অনুসন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিল; বৈজ্ঞানিক শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা মাল, সব রকমের তেল ও চর্বি, রবার ও তখন পর্যন্ত অনেক অপাংক্তেয় দ্রব্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বিরাট দেশের উপর প্রভুত্বের ফলে গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড ও পর্তুগাল ব্যবসার ক্ষেত্রে দিন দিন অত্যন্ত লাভবান হয়ে উঠছিল। ১৮৭১ সালের পর জার্মানি সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স এবং কিছু পরে ইটালি, অনধিকৃত কাঁচা মালের দেশ কিংবা আধুনিকীকরণে লাভবান হওয়া সম্ভব এমন প্রাচ্য দেশের সন্ধানে মন দেয়।
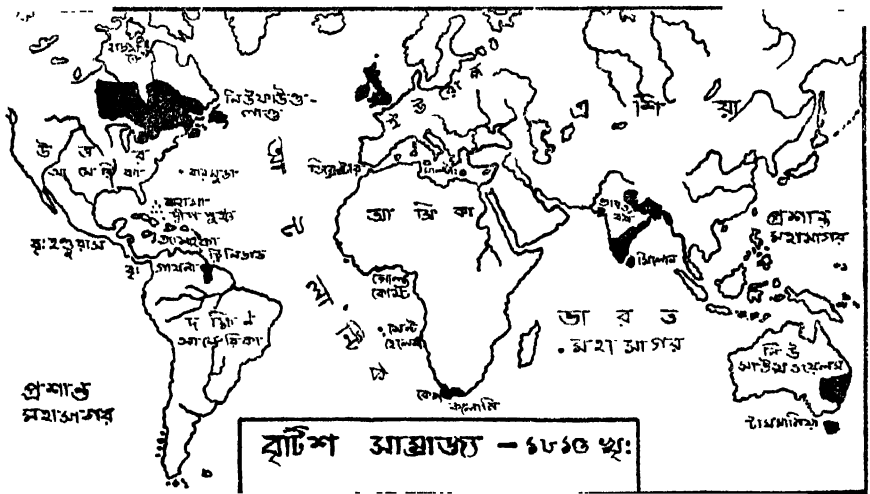
সুতরাং মনরো ডক্‌ট্রিনের বলে আমেরিকান অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর আর সর্বত্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে অরক্ষিত দেশ ভাগাভাগির আবার নতুন করে অভিযান শুরু হল।

ইউরোপের কাছেই আফ্রিকা,—লাভের অস্পষ্ট সম্ভাবনা সকলের মনে। ১৮৫০ সালেও এটি এক তিমিরান্ধ রহস্যের দেশ; শুধু মিশর এবং উপকূলই সকলের জানা। যেসব অভিযাত্রী এবং বীরের দল প্রথম এই আফ্রিকার অন্ধকারে প্রবেশ করেন, কিংবা যেসব রাজকর্মচারী রাজনৈতিক ব্যবসায়ী ঔপনিবেশিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁদের অনুসরণ করেন—তাঁদের চমকপ্রদ সব কাহিনী বলার জায়গা এখানে নেই। এ এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ: আশ্চর্য বামন-জাতীয় লোক, ওকাপির মত অদ্ভুত জন্তু, চমৎকার ফল ফুল ও পোকা-মাকড়, ভয়ঙ্কর অসুখ, বন ও পাহাড়ের অবিশ্বাস্য দৃশ্য, বিরাট অন্তর্দেশীয় সমুদ্র, দুর্নিবার নদী ও জল-প্রপাত! এমনকি আদিম জাতির

দক্ষিণমুখী যাত্রার প্রয়াস ও তাদের অলিখিত ও নিশ্চিহ্ন সভ্যতার অবশিষ্টের সন্ধান জিমবাবোয়েতে পাওয়া গেল। এই নতুন জগতে এল ইউরোপীয়রা, এবং এসে দেখল যে আরব দাস-ব্যবসায়ীরা সেখানে আগেই বন্দুক হাতে এসে দাঁড়িয়েছে ও কাফ্রী জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই, অর্ধশতাব্দী না যেতেই, সমস্ত আফ্রিকার মানচিত্র আঁকা, আবিষ্কার, হিসাব হয়ে যায় এবং ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যে তাঁর ভাগাভাগি হয়ে যায়। এই ভাগাভাগিতে সে-দেশের লোকদের উন্নতির দিকে কণামাত্র দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। আরব দাস-ব্যবসায়ীদের ঠিক বিতাড়িত করা না হলেও তাদের শক্তি খর্ব করা হয়; কিন্তু বেলজিয়ান কঙ্গোতে শক্তি-প্রয়োগে আদিবাসীদের দিয়ে বাধ্যতামূলক বন্য রবার সংগ্রহের অতিমাত্রায় লোভ ও অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ আদিবাসীদের প্রতিবাদের ফলে কুৎসিত হত্যা-তাণ্ডব সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে কোন ইউরোপীয় শক্তিই একেবারে নির্দোষ নয়।

বৃটেন কী করে যে ১৮৮৩ সালে মিশরের অধিকার লাভ করল এবং আইনানুগভাবে মিশর তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কী করে ছিল এবং মার্চাণ্ড নামে এক কর্নেল পশ্চিম উপকূল থেকে মধ্য-আফ্রিকা অতিক্রম করে ফাশোদায় নীল নদীর উত্তরাঞ্চল অধিকারের চেষ্টা করার ফলে এই কাড়া-কাড়ির জন্য কী করে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনে ১৮৯৮ সালে প্রায় যুদ্ধ বেধে যায়, তা আমরা এখানে সবিস্তারে বলতে পারি না।

কিংবা এ-কথাও এখানে বলা সম্ভব নয়, কেন বৃটিশ সরকার প্রথমে বুয়র বা অরেঞ্জ নদী অঞ্চল ও ট্রান্সভালের ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের মধ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাজ্য স্থাপন করতে দেয় এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালকে গ্রাস করে: কিংবা কেমন করে ট্রান্সভালের বুয়ররা স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করে মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধে (১৮৮১) আবার স্বাধীনতা অর্জন করে সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারে মাজুবা পাহাড়ের স্মৃতি ইংরেজদের মনে জাগিয়ে রাখে। ১৮৯৯ সালে আবার এই দুই রাজ্যের সঙ্গে বৃটিশদের যুদ্ধ বাধে এবং তিন বৎসরব্যাপী এই যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও বৃটিশরা এই দুই রাজ্য অধিকার করে।

তাদের পরাধীনতার দিন ছিল খুব অল্প। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, যে সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের অধিকার করেছিল তার পতনের পর, লিবারেল দল দক্ষিণ আফ্রিকা স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং এই দুই প্রজাতন্ত্রী রাজ্য স্বাধীন হয়ে কেপ কলোনি ও নাটালের সঙ্গে একত্র হয়ে স্বেচ্ছায় বৃটিশ অধীনে স্বায়ত্ত-শাসিত এক সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকা রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

পঁচিশ বছরের মধ্যেই আফ্রিকার ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়। তিনটি ছোট রাজ্য শুধু এই ভাগাভাগিতে পড়ে নি : পশ্চিম উপকূলে মুক্ত কাফ্রী দাসদের রাজ্য লাইবেরিয়া, মুসলমান সুলতানের অধীনে মরোক্কো এবং এক আদিম ও অদ্ভুত খৃষ্টধর্ম-সম্পন্ন বর্বর দেশ আবিসিনিয়া --১৮৯৬ সালে অ্যাডোয়ার যুদ্ধে ইটালির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সে তার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

এশিয়ায় ইউরোপীয় আক্রমণ ও জাপানের অভ্যুত্থান

আফ্রিকার মানচিত্রের ইউরোপীয় রঙে আপাদ-মস্তক চিত্রণ পৃথিবীর ঘটনানুযায়ী চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে খুব বেশি লোক যে মেনে নিয়েছিল, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এ ব্যাপার যে স্বীকৃত হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানসের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট ছিল অত্যন্ত অগভীর এবং সুচারু সমালোচনার অভ্যাসও মোটে ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্র-বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয়দের পুরাতন পৃথিবীর উপর যে ক্ষণস্থায়ী সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত হয়, বিরাট মঙ্গোল-বিজয়ের সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে লোকে এই কথাই মনে করে যে, মনুষ্যজাতির চিরস্থায়ী নেতৃত্বের অধিকার ইউরোপীয়দের উপরই বর্তমান। বিজ্ঞানের আদান-প্রদান ও তার ফলাফল সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তারা এ কথা জানত না যে ফরাসী এবং ইংরেজদের মতই যে-কোন চীনা বা ভারতবাসী সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা করতে পারে। তাদের ধারণা ছিল যে পাশ্চাত্যের অন্তর্জাত মণীষা এবং প্রাচ্যের আলস্য ও রক্ষণশীলতা ইউরোপীয়দের চিরন্তন প্রাধান্য বজায় রাখবে।

এই মোহ তাদের এতদূর পেয়ে বসে যে, বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি যে শুধু পৃথিবীর বর্বর ও অনুন্নত দেশ নিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে তা নয়, জনসমৃদ্ধ ও সভ্য এশীয় দেশগুলিকেও এমন ভাগাভাগি করতে চায়, যেন সে-দেশের লোকেরা ব্যবসার জন্য কাঁচা মাল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের বৃটিশ রাজত্বের আভ্যন্তরীণ অনিশ্চিত কিন্তু বাহ্যত অপূর্ব সাম্রাজ্যবাদিতা, কিংবা ওলন্দাজদের ইস্ট ইণ্ডিজে সুবিস্তৃত লাভজনক অধিকার পারস্য, খণ্ডিত অটোমান সাম্রাজ্য, সুদূর ভারত, চীন ও জাপানে অনুরূপ গৌরবের স্বপ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলিকে অভিভূত করে তোলে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানি চীনে কিয়াও-চাউ এবং বৃটেন উই-হাই-উই অধিকার করে, এবং পরের বছর রাশিয়া পোর্ট-আর্থার ছাড়িয়ে নেয়। সমস্ত চীন

জুড়ে ইউরোপীয়দের প্রতি ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে। ইউরোপীয় ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিকিংএ ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীদের আক্রমণ ও অবরোধ করে। ইউরোপীয়দের সম্মিলিত বাহিনী পিকিংএ অভিযান চালায়, সৈন্যবাহিনীদের রক্ষা করে এবং প্রচুর ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি চুরি করে। তারপর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া আবিষ্কার করে এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ তিব্বত আক্রমণ করে।

কিন্তু বৃহৎ শক্তিদের সংগ্রামে এক নতুন শক্তির উদয় হয়—জাপান। এতদিন জাপান ইতিহাসে ক্ষুদ্র ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। মানুষের সাধারণ জীবন ও ভাগ্যের রূপায়নে তার নিভৃত সভ্যতার বিশেষ কোন দান নেই; সে পেয়েছে অনেক, দিয়েছে খুব কম। জাপানীরাও মঙ্গোল জাতি। তাদের সভ্যতা এবং তাদের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্য চীনাদের কাছ থেকেই পাওয়া। তাদের ইতিহাস আকর্ষণীয় এক কাহিনীর মত; খৃষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে তারা সামন্ত-প্রথা ও বিজয়-অভিযান চালু করে: কোরিয়া ও চীনে তাদের আক্রমণ ইংরেজদের ফ্রান্স আক্রমণের প্রাচ্য সংস্করণের মত। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম ইউরোপের সঙ্গে জাপানের পরিচয় হয়; ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন পর্তুগীজ একটি চীনা জাহাজে করে গিয়ে উপস্থিত হয়, এবং ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার নামে এক জেসুইট ধর্মযাজক ওখানে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। কিছুদিন জাপান ইউরোপীয়দের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে আদান-প্রদান চালায়, এবং চীনা ধর্মযাজকেরা অনেককে ধর্মান্তর গ্রহণে দীক্ষিত করে। উইলিয়ম অ্যাডামস নামে এক ইউরোপীয় জাপানীদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন এবং তিনি তাদের বড় বড় জাহাজ-নির্মাণ শিক্ষা দেন। জাপানে তৈরি জাহাজে করে ভারতবর্ষ ও পেরুতে সমুদ্রযাত্রাও চলে। তারপর স্পেনীয় ডোমিনিকান, পর্তুগীজ জেসুইট এবং ইংরেজ ওলন্দাজ প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে কলহ শুরু হওয়ায় প্রত্যেকটি দল অপর দলগুলির রাজনৈতিক কু-অভিসন্ধি সম্বন্ধে তাদের সাবধান করে। প্রভুত্বের শীর্ষে জেসুইটরা অত্যন্ত ক্রূরতার সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধদের অত্যাচার ও অপমান করে। অবশেষে জাপানীরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে ইউরোপীয়রা এক দুর্বিসহ নোংরা জাত, এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম পোপ ও স্পেনীয় আধিপত্যের রাজনৈতিক স্বপ্নের মুখোস মাত্র—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিকারই এই বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করে; খৃষ্টানদের উপর তীব্র অত্যাচার চলে এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে জাপানকে ইউরোপীয়দের কাছে একেবারে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং ২০০ বছর তারা

এইভাবে থাকে। এই দুই শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের থেকে এমন ভাবে জাপান বিচ্ছিন্ন ছিল, যেন মনে হয় তারা অন্য কোন গ্রহে বাস করছিল। সমুদ্রোপকূল-যাত্রী জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ তৈরি একেবারে নিষিদ্ধ হয়। কোন জাপানী বাইরে যেতে পারত না,কোন ইউরোপীয়কে দেশে ঢুকতে দেওয়া হত না।

দুই শতাব্দী ধরে জাপান ইতিহাসের প্রধান স্রোতের বাইরে ছিল। এক চিত্রময় সামন্ত রাজ্যে তারা বাস করত, জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ জন ছিল সামুরাই বা সৈনিক—তারা, সামন্তরাজেরা এবং তাদের পরিবারবর্গ অবশিষ্ট জনগণের উপর অবারিত অত্যাচার চালাত। ইতিমধ্যে বাইরের বিরাট পৃথিবীতে এসেছে নতুন দৃষ্টি ও নতুন শক্তি। জাপানের পাশ দিয়ে জাহাজের আনাগোনা ঘনঘন হতে শুরু করে; মাঝে মাঝে জাহাজডুবি হওয়ার পর নাবিকরা জাপানের তীরে এসে ওঠে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের একমাত্র যোগসূত্র ওলন্দাজ উপনিবেশ দেশিমা দ্বীপ থেকে সাবধান-বাণী আসত যে জাপান পশ্চিম পৃথিবীর শক্তির সঙ্গে সমান তালে যাচ্ছে না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরে বিপন্ন কয়েকটি জাপানী নাবিক নিয়ে একটি জাহাজ তারা-আঁকা ও ডোরা-কাটা অদ্ভুত পতাকা উড়িয়ে ইয়েদো উপসাগরে উপস্থিত হয়। কামানের গোলা মেরে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পতাকা তারপর অনেক জাহাজেই দেখা যায়। ১৮৪৯ সালে এই রকম একটি জাহাজ এসে আঠার জন বন্দী জাহাজ-ডুবি আমেরিকান নাবিকের মুক্তি দাবি করে। তারপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরির অধীনে চারটি আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ আসে এবং চলে যেতে অস্বীকার করে। নিষিদ্ধ সমুদ্রে নোঙর ফেলে পেরি জাপানের অধীশ্বর দুই রাজার কাছে তাঁর বার্তা জানালেন। ১৮৫৪ সালে তিনি আবার এলেন বাষ্পচালিত ও বিরাট কামানে সজ্জিত দশটি জাহাজ নিয়ে এবং ব্যবসা ও পরস্পর সংযোগের যে প্রস্তাব করলেন তা প্রত্যাখ্যান করার শক্তি জাপানের ছিল না। শান্তি-চুক্তি সই করতে তিনি ৫০০ রক্ষী নিয়ে নামলেন। বাইরের জগতের জীবদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল হতভম্ব জাপানী জনতা।

রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও বৃটেন আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। শিমোনোসেকি প্রণালীর উপর প্রভুত্বশীল এক সামন্তরাজ বিদেশী জাহাজের উপর গোলা-বর্ষণ কর্তব্য বিবেচনা করায় বৃটিশ, ওলন্দাজ ও আমেরিকার সম্মিলিত গোলাবর্ষণে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস এবং তরবারি-ধারী সৈনিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অবশেষে কিয়োটোয় অবস্থিত সম্মিলিত নৌ-সেনাপতিরা শান্তি-চুক্তির পুনর্বিবেচনা করে জাপানকে সমস্ত জগতের কাছে উন্মুক্ত করে দেন।

এই ঘটনাবলীর অপমান জাপানীদের গভীর ভাবে নাড়া দেয়। অত্যাশ্চর্য বুদ্ধি ও বীর্যে তারা তাদের সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউরোপীয় শক্তির সমতুল্য করার কাজে ব্রতী হয়। জাপান যে-ভাবে পদক্ষেপ করে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও কোন জাতি সেভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। ১৮৬৬ সালে সে ছিল মধ্যযুগীয়, আদিম ও চরম সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের ব্যঙ্গচিত্রের মত; ১৮৯৯ সালে সে হয়ে গেল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন, সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ইউরোপীয় শক্তিদের সমকক্ষ। এশিয়া যে ইউরোপের চেয়ে সর্ববিষয়ে অত্যন্ত পিছনে, জাপান এই ধারণা একেবারে পরিবর্তিত করিয়ে দিল। ইউরোপের সমস্ত প্রগতি জাপানের প্রগতির কাছে অত্যন্ত মন্থর বলে মনে হতে লাগল।

১৮৯৪-৫ সালে জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধের কথা এখানে সবিস্তারে বলা সম্ভব নয়। এই যুদ্ধ তার পাশ্চাত্যানুসরণের সীমারেখা নির্দেশ করে। তার পাশ্চাত্য ধরনে শিক্ষিত এক অত্যন্ত পারদর্শী সৈন্যবাহিনী এবং ছোট হলেও সুদৃঢ় নৌবাহিনী ছিল। বৃটেন ও আমেরিকা তার সঙ্গে তখন থেকেই এক ইউরোপীয় শক্তির মত ব্যবহার করলেও এবং তার এই নব-জাগরণের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেও এশিয়ায় নতুন নতুন ভারতবর্ষের সন্ধানে ব্রতী অন্যান্য শক্তিবর্গ সেকথা একেবারে বুঝতে পারে নি। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়ে কোরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ফ্রান্স ততদিনে দক্ষিণে টনকিন ও আন্নামে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত, জার্মানি বুভুক্ষুর মত আর কোন উপনিবেশের শিকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই তিন শক্তি একত্র হয়ে জাপানকে চীনের যুদ্ধ থেকে কিছু লাভ করতে বাধা দেয়। এই সংগ্রামে জাপান শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তারা তাকে যুদ্ধের ভয় দেখাল।

জাপান কিছুদিন চুপচাপ সব সহ্য করে তার শক্তি সঞ্চয় করে। দশ বছরের মধ্যেই সে রাশিয়ার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই ঘটনা এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে: ইউরোপীয় দম্ভের যবনিকাপাতের যুগ। কিন্তু পৃথিবীর অর্ধ-পথ দূরে যে বিপদ তাদের জন্য সৃষ্টি হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে অবশ্য রুশ জনসাধারণ নির্দোষ ও অজ্ঞান ছিল, এবং জ্ঞানী রুশ রাজনীতিজ্ঞরাও মূর্খের মত এই পরদেশ আক্রমণের বিরুদ্ধেই ছিলেন; কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউক ও তাঁর আত্মীয় ভাইয়েরা সমেত একদল অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি জারকে সর্বদা ঘিরে রেখেছিলেন। মাঞ্চুরিয়া ও চীন লুণ্ঠনের আশায় তাঁরা প্রচুর অর্থ নিয়োগ করেন। সুতরাং তাঁরা সৈন্য অপসারণ সহ্য করতে রাজি নন। সুতরাং জাপানী সৈন্যের বিরাট বাহিনী সমুদ্র পার হয়ে পোর্ট আর্থার ও কোরিয়ায় উপস্থিত হয় এবং অপর

দিক থেকে সাইবেরিয়ার রেল-পথ দিয়ে ট্রেন বোঝাই অসংখ্য রুশ চাষী আসে সুদূর রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে।

অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অসাধু নেতৃত্বের ফলে রুশরা কি জলে, কি স্থলে পরাভূত হয়। রুশীয় বাল্টিক রণতরী-বাহিনী আফ্রিকা ঘুরে ৎসুসিমা প্রণালীতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়। এই সুদূরবর্তী ও নিরর্থক হত্যাকাণ্ডে ক্রুদ্ধ জনতার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে জার যুদ্ধ বন্ধ করেন (১৯০৫); ১৮৭৫ সাল থেকে অধিকৃত সাখালিনের দক্ষিণার্ধ তিনি প্রত্যর্পণ করেন, মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসরণ করেন ও কোরিয়াকে জাপানের হাতে তুলে দেন। এশিয়ার ইউরোপীয় আক্রমণ প্রায় শেষ হয়ে আসে এবং ইউরোপের নাগপাশ সংহরণ আরম্ভ হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ সাম্রাজ্য

বাষ্প-জাহাজ আর রেলপথের সৃষ্টির ফলে যে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সেই সাম্রাজ্যের উপাদানগুলির বিভিন্ন প্রকৃতি ও গঠনের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব। রাজনৈতিক সংমিশ্রণের দিক দিয়ে এই সাম্রাজ্য একেবারে অদ্বিতীয় ছিল এবং এখানো আছে।

এই সাম্রাজ্যের প্রধান এবং কেন্দ্রস্থল হল 'রাজা-শোভিত প্রজাতন্ত্রী রাজ্য', (অসংখ্য আইরিশের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও) আয়ার্ল্যাণ্ড-সমেত সংযুক্ত বৃটিশ রাজ্য। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট দ্বারা গঠিত বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সম্মতিতে নেতৃত্ব, মন্ত্রীসভার সদস্য ও রাজ্যশাসন-প্রণালী নিরূপিত হয় এবং নির্বাচনও নির্ভর করে বৃটেনের ঘরোয়া রাজনীতির উপর। এই মন্ত্রীসভাই হল দেশে-বিদেশে যুদ্ধ ও শান্তি-সৃষ্টির জন্য দায়ী এবং অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের উপর শাসনের চরম ও কার্যকরী অধিকারী।

রাজনৈতিক প্রাধান্যের দিক দিয়ে বৃটিশ রাজ্যগুলির মধ্যে তারপর যথাক্রমে আসে রাজা-শোভিত প্রজাতন্ত্রী রাজ্য অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (সর্বাপেক্ষা পুরাতন বৃটিশ অধিকার—১৫৮৩), নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা—বৃটিশ মন্ত্রীসভা কর্তৃক সেখানে রাজ-প্রতিভূ নিয়োগ সত্ত্বেও, গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ প্রত্যেকটি কার্যত স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য;

তারপরেই আসে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের বর্ধিত রূপ—অধীন ও 'রক্ষিত' রাজ্য-সমেত বেলুচিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্য ও তার সঙ্গে এডেন: যার উপর বৃটিশ রাজা ও পার্লামেণ্টের অধীন ভারত-সচিবের দপ্তর আদিম তুর্কমান রাজবংশের অনুরূপ প্রভুত্ব করেন;

তারপর মিশরে বৃটিশের অনিশ্চিত অধিকার—নামমাত্র তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও দেশীয় সম্রাট খেদিভএর শাসনাধীনে হলেও কার্যত প্রায় বৃটিশ স্বেচ্ছাচারী শাসনে নিয়ন্ত্রিত ;

তারপর বৃটিশ ও (বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন) মিশর সরকার কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত আরও অনিশ্চিত 'ইঙ্গ-মিশরীয়' সুদান প্রদেশ ;

তারপর নির্বাচিত বিধান-সভা ও বৃটিশ-নিযুক্ত রাজকর্মচারী সমেত মাল্টা, জামাইকা, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, বার্মুডার মত কিছু-বৃটিশ কিছু-বৃটিশ-নয় কতকগুলি আংশিক স্বায়ত্তশাসিত দেশ ;

তারপর ঔপনিবেশিক দপ্তরের মাধ্যমে বৃটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্বৈর শাসনে আবদ্ধ সিংহল, ত্রিনিদাদ, ফিজি (সরকার-নিযুক্ত বিধান-সভা আছে), জিব্রাল্টার ও সেণ্ট হেলেনার (গভর্নরের অধীন) মত বৃটিশ উপনিবেশ ;

তারপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও অল্প-সভ্য দেশীয় লোকদের অধ্যুষিত প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের বিরাট অঞ্চল : তাদের কারও বা শাসন করেন (বাসুতোল্যাণ্ডের মত) উপজাতীয় দলপতিদের প্রধান হয়ে কিংবা (রোডেশিয়ার মত) কোনও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে এক হাই কমিশনার। কোন ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তর, কোন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দপ্তর, আবার কোন ক্ষেত্রে ভারত-সচিবের দপ্তর—এই সবচেয়ে শেষের ও অনির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত দেশগুলির খবরদারি করে ; যদিও আজ ঔপনিবেশিক দপ্তর এই সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করেছে।

অতএব এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন একটি দপ্তর বা কোন একটি মস্তিষ্ক সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য কখনো পরিচালনা করে নি। ইতিপূর্বে যাকে সাম্রাজ্য বলা হত, এই সাম্রাজ্য তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—কতগুলি দেশের সংগ্রহ ও বৃদ্ধির সংমিশ্রণ মাত্র। সুবিস্তৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা এখানে বিরাজিত ; সেইজন্যই রাজকর্মচারীদের অত্যাচার ও অবিচার এবং বৃটিশ জনসাধারণের অবজ্ঞা ও নিস্পৃহতা সত্ত্বেও পরাধীন দেশের অনেক লোকই একে সহ্য করেছে। এথেনিয়ান সাম্রাজ্যের মত এটিও সাগরপারের সাম্রাজ্য ; তার পথ সমুদ্র-পথ, তার সাধারণ যোগসূত্র বৃটিশ নৌ-বলের মাধ্যমে। সমস্ত সাম্রাজ্যের মতই এর সংহতি রক্ষা করেছে যোগযোগ-রক্ষার এক প্রক্রিয়া ; ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নৌ-বিদ্যা, জাহাজ-নির্মাণ ও বাষ্প-জাহাজের উন্নতি এক শক্তিশালী পরিবহনের মাধ্যম গঠন সম্ভব ও সহজসাধ্য করে তুলেছে—যাকে বলা হয় Pax Britannica, এবং আকাশ-পথ বা স্থল-পথের নতুন দ্রুত পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হয়ত তাকে যে-কোন সময় অসুবিধাজনক অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে।

ইউরোপে অস্ত্রসজ্জার যুগ ও ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ

যে বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমেরিকায় বাষ্প-জাহাজ এবং রেলপথ-প্রজাতন্ত্রী-রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র বিশ্বে এই অনিশ্চিত বৃটিশ বাষ্প-জাহাজ সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তার ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত ঘনসন্নিবিষ্ট অন্যান্য জাতির উপর সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেখা দেয়। মানুষের জীবনের ঘোড়া ও রাজপথের যুগের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই তারা তাদের আবদ্ধ দেখতে পায়, এবং তাদের সাগর-পারের প্রসারতা গ্রেট বৃটেন অনেকাংশে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। শুধু রাশিয়ারই পুবদিকে বিস্তারের স্বাধীনতা ছিল; এবং জাপানের সঙ্গে সংঘর্ষে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সে সাইবেরিয়া ভেদ করে বিরাট রেলপথ টেনে নিয়ে যায়, এবং বৃটিশের বিরক্তি উদ্রেক করে দক্ষিণ-পুব দিকে পারস্য ও ভারত-সীমান্ত পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় শক্তির অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত ঘন-সন্নিবেশের মধ্যে ছিল। মনুষ্য-জীবনের এই নতুন সরঞ্জামের সম্ভাবনাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে একটু উদারতার সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হত,—হয় স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া, নয় কোন প্রবল শক্তির জোর করে ঐক্যবদ্ধ করে দেওয়া। আধুনিক চিন্তাধারা হল প্রথম বিকল্পের পক্ষে, কিন্তু রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সমস্ত শক্তি ইউরোপকে শেষের বিকল্পে ঠেলে দেয়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতন ও নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের আশা ও আশঙ্কাকে জার্মান আনুকূল্যে সমাবিষ্ট এক ইউরোপের ধারণার দিকে নিয়ে যায়। চুয়াল্লিশ বছরের অস্বস্তিকর শান্তিকাল ধরে ইউরোপের রাজনীতি এই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে চলেছে। শার্লমেঁর সাম্রাজ্যের ভাগাভাগির পর থেকে ইউরোপে প্রাধান্য লাভে জার্মানির চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে দৃঢ় সখ্য জ্ঞানে নিজের দুর্বলতা শোধরাবার চেষ্টা করে, এবং জার্মানি একান্তভাবে হাত মেলায় অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের সঙ্গে (প্রথম নেপোলিয়ানের সময় থেকে এটি পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যের নাম পরিহার করেছে) এবং নব-গঠিত ইটালি রাজ্যের সঙ্গেও মোটামুটি সখ্যতা স্থাপন করে। প্রথমে গ্রেট বৃটেন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে মহাদেশের ব্যাপারে অর্ধ-অনাসক্তের মত নীরব থাকে। কিন্তু জার্মান নৌবাহিনীর আক্রমণাত্মক বিস্তারে তাকে ধীরে ধীরে ফরাসী-রুশ দলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের (১৮৮৮-১৯১৮) সুবিরাট কল্পনা জার্মানিকে অসময়ে সাগরপারে শিকার-সংগ্রহের দুষ্প্রচেষ্টায় ঠেলে দেয়, যার ফলে শুধু গ্রেট বৃটেনই নয়, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রও তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।
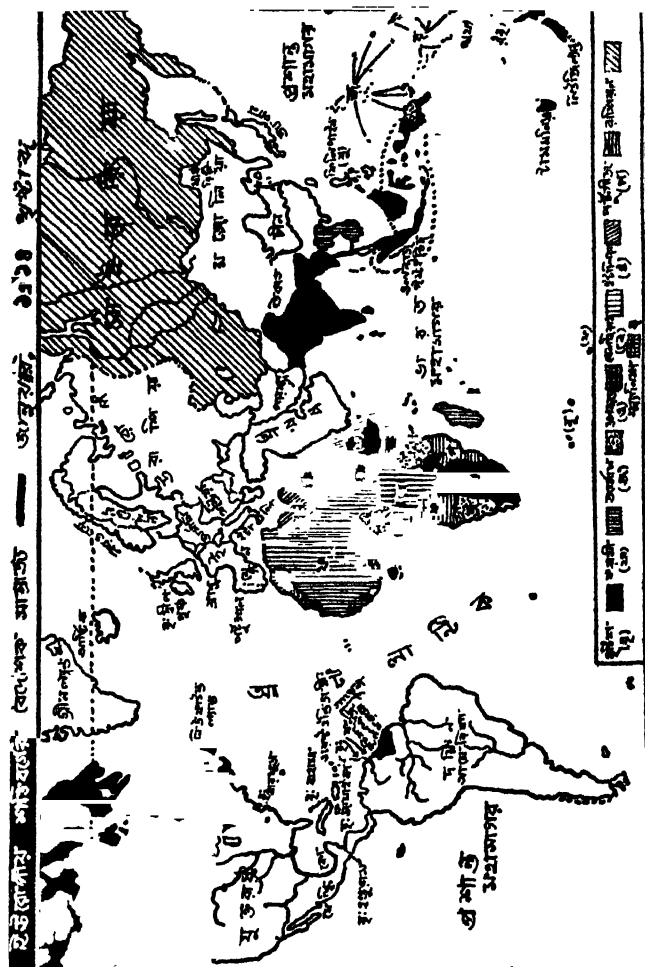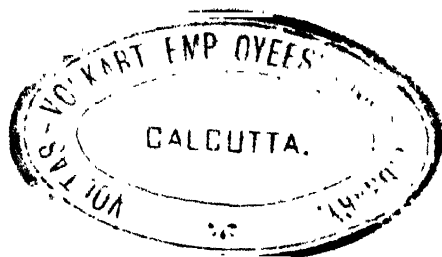
এই সমস্ত জাতি অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়। বছরের পর বছর কামান, যুদ্ধ-সরঞ্জাম, যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতির জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধি হতে থাকে। বছরের পর বছর এই সব জিনিসের দাঁড়িপাল্লা কাঁপতে কাঁপতে যেন যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়, আবার কোনরকমে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত আসে সেই যুদ্ধ। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া ফ্রান্স, রাশিয়া ও সার্বিয়া আক্রমণ করে; জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় বৃটেন সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়ামের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে এবং মিত্র হিসাবে জাপানকেও যুদ্ধে টেনে আনে এবং খুব শীঘ্রই তুর্কী জার্মান পক্ষে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইটালি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং সেই বছরের অক্টোবর মাসে বুলগারিয়া কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রুমানিয়া এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করা হয়। এই বিরাট মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার জন্য কে কতখানি দায়ী, এই ইতিহাসে তা নির্দেশ করার মত স্থান নেই। মহাযুদ্ধ কেন আরম্ভ হয়েছিল, তার চেয়ে কেন মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে তা বন্ধ করা হয় নি—এইটাই প্রশ্ন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সক্রিয়তায় যে দুর্ঘটনা সম্ভব হয়, তার চেয়ে মানুষের কাছে অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার এই যে, লক্ষ লক্ষ লোকের 'স্বদেশপ্রেমিকতা', নির্বুদ্ধিতা ও উদাসীনতার কারণেই স্পষ্ট এবং উদার নীতিতে ইউরোপীয় একতার জন্য এমন কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয় নি যার ফলে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারত।

এই যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা দেওয়ার স্থান আমাদের নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট দেখা গেল যে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রগতি যুদ্ধের রীতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞান দেয় শক্তি—ইস্পাত, দূরত্ব ও ব্যাধির উপর শক্তি; পৃথিবীর নৈতিক ও রাজনৈতিক মণীষার উপর তার সদ্‌ব্যবহার বা অপপ্রয়োগ নির্ভর করে। সন্দেহ ও ঘৃণার সেকেলে রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ধ্বংস ও প্রতিরোধের অতুলনীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে দেখতে পায়। যুদ্ধের প্রথম যুগে জার্মানদের প্যারিসের দিকে তীব্র বেগে ছুটতে এবং রাশিয়াকে পূর্ব প্রাসিয়া আক্রমণ করতে দেখা যায়। এই দুই আক্রমণই প্রতিহত হয়। তারপর প্রতিরোধার্থক শক্তির উন্নতি হয়: দ্রুত গতিতে ট্রেঞ্চ-যুদ্ধের ব্যবস্থা করা হয়, এবং এমন এক সময় আসে যখন যুধ্যমান সৈন্যবাহিনীকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ট্রেঞ্চের মধ্যেই বসে থাকতে হয়: প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার না করে সামান্য অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের সেই সৈন্যবাহিনী; এবং রণক্ষেত্রে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য সমস্ত

জনগণকে তাদের পিছনে সংগঠিত করা হয়। সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া প্রায় আর সব জিনিসের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপের সুস্থদেহী প্রত্যেকটি মানুষকে সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী বা তাদের প্রয়োজনে গড়া কল-কারখানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। শিল্পক্ষেত্রে পুরুষের পরিবর্তে অসংখ্য স্ত্রীলোক কাজ করে। এই বিরাট সংগ্রাম-কালে যুধ্যমান দেশগুলির অর্ধেক লোক তাদের জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তাদের সামাজিক জীবন থেকে মূলোৎপাটিত হয়ে অন্য ধারার জীবনযাত্রায় বাধ্য হয়। শিক্ষা ও সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা সীমাবদ্ধ এবং সামরিক ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, সামরিক শাসন ও প্রচার-কার্যের জন্য সংবাদ-সরবরাহ হয় পঙ্গু ও ভ্রষ্ট।

সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে খাদ্য-সরবরাহ ধ্বংসে ও আকাশ-পথে আক্রমণের মাধ্যমে রণক্ষেত্রের পশ্চাতের যুধ্যমান জনসাধারণের উপর আক্রমণে এসে দাঁড়ায়। তারপর ট্রেঞ্চে অবস্থিত সৈন্যদের প্রতিরোধ-শক্তি চূর্ণ করার জন্য কামানের আকার ও দূর-ক্ষেপণ ক্ষমতার দ্রুত উন্নতি এবং ট্যাঙ্ক নামে একপ্রকার চলমান ছোট দুর্গ ও বিষ-বাষ্প গোলার সুচতুর কৌশলের উদ্ভাবন হয়। এই সমস্ত নতুন রণ-কৌশলের মধ্যে আকাশ-পথে আক্রমণ একেবারে যুগান্তকর ছিল যুদ্ধকে দ্বি-পরিসর থেকে ত্রি-পরিসরে নিয়ে যাওয়ায়। তখন পযন্ত মানুষের ইতিহাসে যেখানে সৈন্যবাহিনী গিয়ে মিলিত হত, সেখানেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকত। এখন সে যুদ্ধ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে জেপেলিন এবং পরে বোমারু বিমান রণক্ষেত্র অতিক্রম করে নাগরিক জীবনের বিস্তৃততর অঞ্চলেও যুদ্ধক্ষেত্র প্রসারিত করে। সভ্য যুদ্ধের নাগরিক ও সৈনিকদের পূর্বতন প্রভেদ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যে খাদ্য উৎপাদন করে, যে জামা সেলাই করে, যে গাছ কাটে কিংবা বাড়ি তৈরি করে—প্রত্যেকটি রেল স্টেশন, গুদামই আজ ধ্বংসের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধের প্রতিটি মাসেই আকাশ-পথের আক্রমণ-পরিধি ও বীভৎসতা বৃদ্ধি লাভ করে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বিরাট অঞ্চল অবরুদ্ধের মত হয়ে পড়ে এবং প্রতি রাত্রে তার উপর বিমান-আক্রমণ চলে। বোমার বিস্ফোরণ, বিমান-ধ্বংসী কামানের অসহ্য কর্কশ ধ্বনি, অগ্নি-নির্বাপক যান ও অ্যাম্বুলেন্সের অন্ধকার ও নির্জন পথে দ্রুত পরিক্রমার মধ্যে লণ্ডন ও প্যারিসের মত অরক্ষিত নগরগুলি রাতের পর রাত অতন্দ্র জেগে থাকে। বৃদ্ধ এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

যুদ্ধের চিরন্তন পরিণতি, মড়ক, ১৯১৮ সালে যুদ্ধ একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসে নি। চার বছর ধরে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সাধারণ মহামারী ঠেকিয়ে

রেখেছিল : তারপর ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়কে সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। দুর্ভিক্ষকেও কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা গেছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের প্রারম্ভেই সমস্ত ইউরোপ প্রায় একরকম দুর্ভিক্ষের মধ্যে এসে যায়। কৃষক-সম্প্রদায়কে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে খাদ্য-উৎপাদন প্রচুর কমে যায়, এবং সাবমেরিনের দৌরাত্ম্যে, সীমান্ত বন্ধের ফলে, প্রচলিত পরিবহন-পথের ভাঙনে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবহন-প্রথার বিশৃঙ্খলতায় খাদ্য-সরবরাহও ব্যাহত হয়। বিভিন্ন সরকার ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু খাদ্য সরবরাহ অধিকার করে জন-সাধারণের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে কোন রকমে কাজ চালালেন। চতুর্থ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী পোশাক পরিচ্ছদ, গৃহ, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খাদ্যের অভাব অনুভূত হয়। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাময় হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই ক্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, এবং অধিকাংশ লোকেই অনভ্যস্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়।

সত্যকারের যুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯১৮ সালের বসন্তে এক আপ্রাণ চেষ্টায় জার্মানরা প্রায় প্যারিসের কাছাকাছি এলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙে পড়ে। তাদের রসদ ও শক্তির শেষ সীমায় তারা এসে পড়ে।

রাশিয়ার নতুন সমাজ-ব্যবস্থা

কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের পতনের এক বছরেরও বেশ কিছু আগেই রাশিয়ার অর্ধ-প্রাচ্য রাজতন্ত্র, যা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রসারণ বলে ওরা দাবি করে, তার অবসান হয়। যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই জার-তন্ত্রে সুবিস্তৃত পচন ধরেছিল : রাজসভা ছিল সেই আজগুবি ধর্মীয় প্রতারক রাসপুটিনের করায়ত্ত, এবং কি বেসামরিক কি সামরিক, রাজ্যশাসন পরিচালনা ছিল অযোগ্যতা ও অসাধুতায় পূর্ণ। যুদ্ধের প্রারম্ভে রাশিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের সাড়া পড়ে যায়। এক বিরাট বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়, কিন্তু তাদের জন্য না ছিল কোন সামরিক সাজসরঞ্জাম না ছিল উপযুক্ত সামরিক নেতৃত্ব ; এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদহীন এবং কু-পরিচালিত এই বিরাট দলকে জার্মান ও অস্ট্রিয়া সীমান্তে ঠেলে দেওয়া হয়।

প্যারিস পর্যন্ত তাদের প্রথম বিজয়-অভিযান থেকে যে জার্মানরা তাদের সমস্ত শক্তি ও লক্ষ্য ফেরাতে বাধ্য হয়, তা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব প্রাশিয়াতে এই রুশ বাহিনীর আবির্ভাবের জন্যই শুধু,—আজ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। লক্ষ লক্ষ কু-পরিচালিত রুশ কৃষকদের কষ্ট ও মৃত্যু

ফ্রান্সকে সেই প্রথম অভিযানে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ এই মহান ও দুঃখী জনসমাজের কাছে আমৃত্যু ঋণবদ্ধ হয়। কিন্তু এলোমেলো, বিস্তৃত ও কু-শৃঙ্খলাবদ্ধ সাম্রাজ্যের শক্তির চেয়ে এই যুদ্ধের চাপ ছিল অনেক বেশি। তাদের রক্ষার জন্য কামান না দিয়ে, এমনকি বন্দুকের গুলি পর্যন্ত না দিয়ে সাধারণ রুশ সৈনিকদের যুদ্ধে পাঠানো হয়। সামরিক উৎসাহের প্রলাপে তাদের সেনাপতি ও অন্যান্য সামরিক কর্মচারী তাদের অপচয় করেন। কিছুদিন তারা পশুর মত নীরবে সহ্য করল; কিন্তু একেবারে অজ্ঞানেরও সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এই অপচিত ও বিশ্বাসহৃত সাধারণ মানুষের বিরাট বাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে জার-তন্ত্রের প্রতি এক গভীর ঘৃণা সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৯১৫ সালের শেষ থেকেই রাশিয়া তার পশ্চিমী মিত্র-শক্তির কাছে এক গভীর উৎকণ্ঠার উৎস হয়ে ওঠে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সে পরিপূর্ণ আত্মরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকে এবং জার্মানির সঙ্গে তার পৃথক সন্ধির গুজবও শোনা যায়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর পেত্রোগ্রাদের এক নৈশ ভোজসভায় সন্ন্যাসী রাসপুটিনকে হত্যা করা হয় এবং জনতন্ত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক বিলম্বিত প্রচেষ্টা করা হয়। মার্চ মাসের মধ্যেই নানারকম ঘটনা দ্রুত ঘটতে শুরু করে: পেত্রোগ্রাদের খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা এক বৈপ্লবিক বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়: জন-প্রতিনিধির সভা,ডুমাকে, দমন করার এক চেষ্টা হয়; উদারনৈতিক নেতাদেরও বন্দী করার চেষ্টা হয়; প্রিন্স ল্ভোফের নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং জার সিংহাসন ত্যাগ করেন (১৫ই মার্চ)। এক সময় মনে হয়েছিল যে, হয়ত এক নতুন জারেরই অধীনে একটি সংযত ও পরিমিত বিপ্লব সম্ভব। কিন্তু তারপর স্পষ্ট দেখা গেল যে রাশিয়ার সাধারণ লোক এতদূর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে যে, এ-ধরনের সমাধান আর কোন রকমে সম্ভব নয়। ইউরোপের পুরাতন সব বন্দোবস্ত, জার, যুদ্ধ এবং বৃহৎ শক্তি প্রভৃতির প্রতি রুশ জনসাধারণের বিজাতীয় ঘৃণা ধরে গেছিল; তারা তখন অসহ্য দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে খুব শীঘ্র মুক্তি চায়। রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মিত্রশক্তির কোন বোধশক্তি ছিল না; তাঁদের রাজনীতিবিদরা রাশিয়া সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন; জনসাধারণের দিকে না তাকিয়ে রাশিয়ার রাজ-সভার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা এই নতুন পরিস্থিতিতে মস্ত ভুল করলেন। এই রাজনীতিবিদদের গণতন্ত্রের প্রতি একটুও সহানুভূতি ছিল না, তাই এই নতুন মন্ত্রীসভার সঙ্গে যতদূর সম্ভব প্রতিকূল আচরণ করলেন। এই রুশ গণতন্ত্রী মন্ত্রীসভার প্রধান ছিলেন কেরেনস্কি নামে এক চমৎকার নেতা ও বক্তা; দেশের মধ্যে তিনি 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লব' নামে

এক বিপুল বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিপদগ্রস্ত হলেন, দেশের বাইরের মিত্রশক্তিরা তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করলেন। তাঁর মিত্ররা কৃষকদের আকাঙ্ক্ষিত জমি দিতেও তাঁকে দেয় নি, যুদ্ধ-সীমান্তের বাইরে কোনরকম শাস্তি রাখতেও দেয় নি। ফরাসী ও বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি হৃতশ্বাস এই রাশিয়াকে নতুন করে যুদ্ধাভিযানের জন্য উত্যক্ত করতে লাগল ; কিন্তু যখন অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানরা সমুদ্র ও জলপথে রিগার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল, তখন বৃটিশ নৌবাহিনী বাল্টিক অভিযানের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে চুপ করে রইল। নতুন প্রজাতন্ত্রী রাশিয়া কারো কোন সাহায্য না পেয়ে একাই লড়াই করতে লাগল। নৌবাহিনীর দিক দিয়ে বৃটিশদের বিরাট প্রাধান্য এবং বিরাট ইংরেজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ লর্ড ফিশারের (১৮৪১-১৯২০) তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও, এটা মনে রাখা কর্তব্য যে কয়েকটি সাবমেরিন আক্রমণ ছাড়া তারা জার্মানদের হাতে বাল্টিক সাগরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছেড়ে দেয়।

কিন্তু রুশ জনসাধারণ যুদ্ধ-বন্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। যেভাবেই হোক যুদ্ধের অবসান চাই। সোভিয়েট নামে সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে পেত্রোগ্রাদে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং এই প্রতিষ্ঠান স্টকহল্‌মে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য দাবি জানায়। বার্লিনে খাদ্য-দাঙ্গা তখন লেগে গেছে, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় গভীর রণক্লান্তি এসেছে এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এ-ধরনের সম্মেলনে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গণতন্ত্র-মাফিক এক শান্তি এনে দিতে পারত এবং জার্মানিতে বিপ্লবও সংঘটিত করতে পারত। কেরেনস্কি তাঁর পাশ্চাত্য মিত্রদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক দলের অল্পসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী সমাজ-তান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতার ব্যাপ্তির ভয়ে তাঁরা তা অস্বীকার করেন। মিত্রদের কাছ থেকে নৈতিক কিংবা কার্যকরী কোন সাহায্য না পেয়েও এই হতভাগ্য 'মডারেট' রুশ গণতন্ত্র রাজ্য তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং জুলাই মাসে একবার শেষ প্রাণান্তকর অভিযানের চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম সামান্য সাফল্যের পর এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং আর-একবার রুশদের বিরাট হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

রুশদের সহ্যের শেষ সীমা এসে গেছিল। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যে, বিশেষ করে উত্তর সীমান্তে, বিদ্রোহ দেখা দিল এবং ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে কেরেনস্কির মন্ত্রীত্বের পতন ঘটিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সমাজতন্ত্রীদের পরিচালিত সোভিয়েট শাসনভার গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য শক্তিদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ

না করেই সন্ধির শপথ গ্রহণ করে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে এক পৃথক সন্ধি-চুক্তি ব্রেস্ট লিটোভস্কে স্বাক্ষরিত হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, এই বলশেভিক সমাজতন্ত্রীরা কেরেনস্কি যুগের আলঙ্কারিক আইন-বিশারদ ও বিপ্লবীদের থেকে একেবারে পৃথক ধরনের। তাঁরা উৎকট মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, রাশিয়ায় তাঁদের এই শাসনাধিকারের ফলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হবে,এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই ও নিজেদের শক্তিতে গভীর বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে ব্রতী হলেন। পশ্চিম ইউরোপীয় ও আমেরিকান সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ সংবাদ রাখেন নি, এবং এই অসাধারণ পরীক্ষাকে পরিচালনা বা সাহায্যও করতে পারেন নি, এবং যেকোন উপায়ে ও যেকোন মূল্যে সমগ্র বিশ্বের সামনে এই রুশ জবর-দখলকারীদের ধ্বংস করার জন্য ও হীন প্রমাণ করবার জন্য শাসক-সম্প্রদায় ও সংবাদপত্রগুলি একজোট হয়। সমগ্র পৃথিবীতে রাশিয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর সব তথ্য আবিষ্কার করে সংবাদপত্রগুলি প্রচারে ব্যস্ত হয়; বলশেভিক নেতাদের এমন রক্তলোলুপ ও লুণ্ঠনকারী দানব ও ইন্দ্রিয়াসক্ত বলে চিত্রিত করা হয়, যার কাছে রাসপুটিনের রাজত্বে জারের রাজসভার প্রকৃত অবস্থাও অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে হত। এই হৃতশ্বাস দেশে বহু অভিযান চালানো হয়, বিদ্রোহী ও লুণ্ঠনকারীদের উৎসাহ দেওয়া হয়, অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করা হয়, এবং বলশেভিক শাসন-ভীত শত্রুদের কাছে আক্রমণের যেকোন রকম প্রক্রিয়াই খুব হীন বা বীভৎস বলে মনে হয় নি। পাঁচ বছরের নিদারুণ যুদ্ধে অবসন্ন ও বিশৃঙ্খল রুশ বলশেভিকরা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ আক্রমণকারীদের সঙ্গে আর্কেঞ্জেলে, পূর্বে সাইবেরিয়ায় জাপানীদের সঙ্গে, দক্ষিণে রুমানিয়ান ফরাসী ও গ্রীকদের সঙ্গে, সাইবেরিয়ায় রুশ এ্যাডমিরাল কোলচাকের সঙ্গে এবং ক্রিমিয়ায় ফরাসী নৌবাহিনীর সাহায্যে বলীয়ান জেনারেল ডেনিকিনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। সেই বছরের জুলাই মাসে জেনারেল ইউডেনিচের অধীনে এক এস্টোনীয় বাহিনী প্রায় পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। ফরাসীদের কথায় উত্তেজিত হয়ে পোলরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আবার নতুন করে রাশিয়া আক্রমণ করে; এবং তারপর জেনারেল র‍্যাঙ্গেল নামে এক নতুন প্রতিক্রিয়াশীল লুণ্ঠক জেনারেল ডেনিকিনের মত তাঁর স্বদেশ আক্রমণ ও ধ্বংস করার কাজে অগ্রসর হলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ক্রোন্সতাদ্‌ৎএর নাবিকেরা বিদ্রোহ করে। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ সরকার এইসব আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। রাশিয়া এ সময়ে অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখিয়েছিল, এবং অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত হলেও

রুশ জনসাধারণ অবিচলিতভাবে তা সহ্য করেছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বৃটেন ও ইটালি এই কম্যুনিস্ট শাসনকে একরকম স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু বলশেভিক সরকার বিদেশী হস্তক্ষেপ ও অন্তর্বিদ্রোহ দমনে সফল হলেও রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট মতবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করায় তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। রুশ কৃষকরা ক্ষুদ্র জমি-বুভুক্ষু ভূস্বামী—আকাশে ওড়ার কল্পনায় তিমিমাছ যতখানি দূরে, চিন্তায় ও প্রক্রিয়াতে তারাও কম্যুনিজম থেকে ঠিক ততখানি দূরে ; বিপ্লব তাদের বড়-বড় জমিদারের জমি ভাগ করে দিল বটে, কিন্তু মুদ্রার বিনিময়ে তাদের ফসল উৎপাদনে বাধ্য করতে পারে নি, এবং এই বিপ্লব, অন্য জিনিসের সঙ্গে, অর্থ-মূল্যও ধ্বংস করে দিয়েছিল। যুদ্ধে রেলপথ ধ্বংস হওয়ায় বিশৃঙ্খল কৃষি আজ শুধু কৃষকদের নিজেদের প্রয়োজন-মত উৎপাদনেই সীমিত হল। শহর ও নগরগুলি অনাহারে রইল। কম্যুনিস্ট মতবাদানুগ দ্রুত ও কু-পরিকল্পিত শিল্প-উৎপাদনও ঠিক একই রকম ব্যর্থ হল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াকে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আধুনিক সভ্যতার এক বিরাট চিত্র বলে মনে হয়। রেলপথ মরচে পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে চলেছে, শহরগুলি ধ্বংসের পথে, সর্বত্রই প্রচুর মৃত্যু। তবুও এ দেশ তার সীমান্তে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পূর্ব প্রদেশগুলিতে অনাবৃষ্টির ফলে চাষীদের মধ্যে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকে।

কিন্তু এই দুঃখ-কষ্ট ও তার থেকে রাশিয়ার উজ্জীবনের প্রশ্ন আমাদের এখানে আলোচিত বর্তমান বিতর্কমূলক বিষয়গুলির এত কাছাকাছি নিয়ে আসে যে এ নিয়ে এখানে আর আলোচনা করা চলে না।

এইরকম দুঃখকর পরিস্থিতিতে পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ার গতি মন্থর করা স্থির হল। এক নতুন অর্থনৈতিক পদ্ধতি (New Economic Policy = N. E. P.) গ্রহণ করা হয়, এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার আংশিক উন্নতি হয়। মনে হয় যেন রাশিয়া সংগঠনী সমাজতন্ত্রের থেকে দূরে সরে গিয়ে একশো বছর পূর্বেকার যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির অনুরূপ পরিস্থিতিতে ফিরে আসছে। আমেরিকার ছোটখাট চাষীদের অনুরূপ কুলাক নামে এক শ্রেণীর সমৃদ্ধশালী কৃষক সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেল। ছোটখাট স্বাধীন ব্যবসায়ী বহুগুণে বেড়ে গেল। কিন্তু এইভাবে তাদের আদর্শ একেবারে ত্যাগ করে এবং রাশিয়াকে আমেরিকার একশো বছর পিছিয়ে থাকতে দিতে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রস্তুত ছিল না। ১৯২৮ সালে এই দল কম্যুনিস্ট পন্থায় দেশের উন্নতির জন্য চরম প্রচেষ্টা করল। সরকারী শিল্পগুলির, বিশেষ করে

নিত্য-প্রয়োজনীয় ভারী দ্রব্যাদির দ্রুত প্রসারের ব্যবস্থা করতে, এবং সেই-সঙ্গে চাষীদের পৃথক উৎপাদনকে বৃহৎ সমবায় উৎপাদনে পুনঃস্থাপন করতে, একটি পঞ্চ-বর্ষ পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে দুস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হয়—প্রধান হল, জনসাধারণের অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা, প্রয়োজনমত উপযুক্ত কারিগর ও ফোরম্যানের অভাব, এবং পাশ্চাত্য জগতের কোন সাহায্যের পরিবর্তে প্রকাশ্য শত্রুতা। যাই হোক, শিল্পের দিক দিয়ে অনেকখানি সাফল্য তারা অর্জন করেছিল। অপচয় এবং অনুপাতের অভাবও যেমন ছিল, তেমনি তারা যে ভাল কিছু করতে পেরেছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। এই সাহসিক ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কৃষি-দ্রব্যাদির উৎপাদন ভাল হয় নি, এবং ১৯৩৩-৪ সালের শীতকালে রাশিয়া আবার চরম খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হল।

ব্যক্তিগত লাভের ধনিকতন্ত্রের ফলভোগী অবশিষ্ট পৃথিবী রাশিয়ার এই পরীক্ষাকে কৌতূহল, অবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত এক বিচিত্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। পুরাতন পদ্ধতিও ভালভাবে চলছিল না। এই পদ্ধতিতে ক্রয়-ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হয়ে উঠছিল এবং তার গতিশীলতাও হারিয়ে ফেলছিল। তার আত্মতুষ্টিও আর হচ্ছিল না। 'পরিকল্পনা' কথাটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। পরবর্তী অধ্যায়ে যে অর্থনৈতিক গুরুভারের কথা উল্লেখ করব, তা যতই বাড়তে লাগল, ততই 'পরিকল্পনা'র সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৯৩৩ সালের মধ্যে এমন কোন আত্ম-সম্মানজ্ঞানী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না যাঁর কোন 'পরিকল্পনা' নেই। রাশিয়াকে পৃথিবী অন্তত এতখানি শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

১৯৩৩ সালের খারাপ ফসল সত্ত্বেও, ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই সাফল্যের আবহাওয়া ছিল। আবার উৎপাদন ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান ওই দেশে ভ্রমণে গিয়ে ক্যাভিয়ের ও ভদ্‌কার মহোৎসব করলেন। প্রচুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষ করে সুপ্রজন বিদ্যা ও সুমেরু অভিযান সাফল্যের সঙ্গে হয়। নীপ্রোস্ট্রয় বাঁধ ও টার্ক-সিব রেলপথের মত অনেক বিরাট জনগণের মঙ্গলকর কাজ সুসম্পন্ন হয়। প্রচুর পুনর্গঠন ও সাধারণভাবে পুনঃসজ্জাও করা হয়। কিন্তু যেকোন সমালোচনা কঠিনভাবে দমন করা হত এবং যেকোন রকম বিরুদ্ধ মতকে গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে গুম করা হত। শ্বাসরুদ্ধ বিরুদ্ধতা সব সময়েই শেষপর্যন্ত অপরাধজনক বিরুদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়। এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অন্তঃস্থলে মতভেদ প্রখর হয়ে উঠছিল। লেনিনের অকাল-মৃত্যুতে ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত হলেন ট্রটস্কি, যাঁর আশ্চর্য সামরিক নেতৃত্বে ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে এই গণতন্ত্রী

রাজ্য সমস্ত বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, এবং কম্যুনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সম্পাদক স্ট্যালিন। লেনিনের গৌরব ও সম্ভ্রম এ-দুজনের কারুরই ছিল না। ট্রটস্কি ছিলেন প্রতিভাদীপ্ত কিন্তু অহঙ্কারী, স্ট্যালিন ছিলেন ভয়ঙ্কর একরোখা। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে বিতাড়িত ট্রটস্কি ১৯২৭ সালে দেশত্যাগ করে প্রথমে তুর্কীতে গেলেন, তারপর ফ্রান্স, নরওয়ে এবং শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোয়; এবং সেখান থেকেই তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান তর্ক-দ্বন্দ্ব চালালেন ও সমগ্র পৃথিবীর 'বামপন্থীদের' দুই বিবদমান অংশে ভাগ করে দিলেন।

মনে হয় রাশিয়ার অভ্যন্তরেও স্ট্যালিনের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী কর্মচারী ও জনসাধারণের গুপ্ত সংগ্রাম চলছিল; কিন্তু সেই ইতিহাসের অনেকখানি আজ পর্যন্ত অস্পষ্টতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রতিরোধ যেমন ছিল, তেমন আনুগত্যহীনতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীও নিশ্চয়ই ছিল। এ-ধরনের প্রতিরোধ, ততটা সুসংগঠিত না হলেও, লেনিনের বিরুদ্ধেও হয়ত খুব সম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রতিরোধ সুসংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হয়। কিছুদিন সোভিয়েট সরকার এই সংগ্রামে অনেকখানি ধৈর্যের পরিচয় দেন। অনেক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার-সমেত বহু দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন কর্মচারীকে রাশিয়ার আধুনিকীকরণে ও শিল্পীকরণে ইচ্ছাকৃত বাধা দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচার করা হয়। তারপর পরবর্তী সব বিচারে ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক ব্যাপার সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বরে ক্রেমলিনে তাঁর পড়ার ঘরে স্ট্যালিনের অন্যতম বিশ্বস্ত মন্ত্রী কিরোভকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত অপরাধীকে শুধু জেলে বা দেশান্তরে পাঠানো হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর স্ট্যালিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। তাঁর পুরাতন সঙ্গীদের পুঞ্জীভূত শত্রুতার ফলে তিনি ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ হতে লাগলেন। অবশেষে সাহিত্যিক গর্কি ছাড়া তাঁর আর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু রইল না এবং গর্কি ১৯৩৬ সালে মারা গেলেন। একটার পর একটা রাজনৈতিক বিচার হতে লাগল, সাক্ষ্য-প্রমাণ আবিষ্কার নিষ্ঠুরভাবে হতে লাগল এবং সাধারণ শাস্তিই হয়ে দাঁড়াল মৃত্যু। একজনের পর একজন পূর্বতন বলশেভিক নেতাদের হত্যা করা হতে লাগল—শেষ পর্যন্ত বাকি রইলেন মাত্র দুই-তিন জন। গর্কির মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে তাঁর চিকিৎসকদের গুলি করে মারা হল, এবং স্ট্যালিন দিন দিন স্বেচ্ছাচারী হতে শুরু করলেন: কোন রকম আপোষ মীমাংসা তিনি মানতে চাইলেন না। তবুও রাশিয়ার বস্তুতান্ত্রিক জীবন বেশ সবলভাবেই অগ্রসর হয়ে চলেছে, জনগণের দুঃখকষ্ট ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং জনসাধারণ বিশেষ অসন্তোষও প্রকাশ করছে না।

জাতি-সঙ্ঘ

মহাযুদ্ধের বীভৎসতা ও বেদনা দেখে মানুষের এই ধারণাই হয় যে, অন্তত বিজয়ী দল এই যুদ্ধকে অতি অবশ্যই এক যুগের অবসান এবং মানুষের ইতিহাসের এক নতুন ও উজ্জ্বলতর দিনের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করে যাবে। ক্ষতিপূরণের ভরসা আমাদের মধ্যে অসীম—অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আমরা আমাদের কাল্পনিক গুণাবলীর উপর ভাগ্যের ঔদাসীন্য মেনে নিই। যুদ্ধোত্তর অঙ্গীকারগুলি অত্যন্ত ধীরে ধীরে আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু আজ আমরা এই কথা স্পষ্ট বুঝতে শুরু করেছি যে, যতই ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক সে-যুদ্ধ হোক না কেন, তা কিছুই নিঃশেষ করে নি, কিছুই আরম্ভ করে নি, এবং কিছুরই মীমাংসা করে নি। এই যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু এনেছে; সমস্ত পৃথিবীতে অপচয় ও দারিদ্র্য ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যে এক সহানুভূতিহীন ভয়ঙ্কর জগতে চরম অসাড়তা বা দূরদৃষ্টির অভাব নিয়ে বেকারের মত বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করে যাচ্ছিলাম—যুদ্ধকে বড়-জোর তারই এক তীব্র স্মারক বলা যেতে পারে। যে জাতীয় ও রাজকীয় লালসা ও স্থূল অভিমান এই নিদারুণ ঘটনার মধ্যে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে টেনে নিয়ে গেছিল, তা যুদ্ধের ক্লান্তি ও রুদ্ধশ্বাস ভাবের হাত থেকে সামান্য সামলে নেওয়ার পরেই আবার অনুরূপ অন্য এক দুর্ঘটনাকে সম্ভবপর করার মত অবিনষ্ট শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। যুদ্ধ এবং বিপ্লব থেকে কোন উপকারই আসে না; ঈষৎ উগ্র ও বেদনাকর উপায়ে যত সব বিঘ্ন ও বাধা ধ্বংস করাই হল বলতে গেলে যুদ্ধের একমাত্র উপকারিতা। মহাযুদ্ধ অনেক রাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন করেছে, কিন্তু তবুও ইউরোপে প্রচুর পতাকা আকাশে উড়েছে, বহু সীমান্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছে, বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী আবার নতুন করে রণসম্ভার সংগ্রহ করে গেছে। যুদ্ধে পরাজয় ও বিসংবাদের পরিণতিকে যুক্তিযুক্ত পরিণতিতে পৌঁছে দেবার চেয়ে বিশেষ কিছু করার পক্ষে ভার্সেইলসের শান্তিপরিষদের আবহাওয়া নিতান্ত প্রতিকূল ছিল। জার্মান, অস্ট্রিয়ান, তুর্ক ও বুলগারিয়ানদের এই সভায় যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হয় নি; আদিষ্ট নির্দেশ মেনে নেওয়াই ছিল তাদের কাজ। এটি ছিল বিজয়ীদের এক সভা। মানুষের কল্যাণের দিক দিয়ে এই সভার স্থান-নির্বাচনও অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই ভার্সেইলস নগরীতেই বিজয়-উল্লাসের সমস্ত রকমের আড়ম্বরের মধ্যে নতুন জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এবং সেই একই 'হল অব মিরস'এ সেই একই দৃশ্যের অতি-নাটকীয় বৈপরীত্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মহাযুদ্ধের প্রথম দিকের সমস্ত উদারতা অনেকদিন নিঃশেষিত হয়েছিল। বিজয়ী দেশের লোকেরা তাদের নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্যক সজ্ঞানী হয়েও এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে পরাজিত দেশগুলিও ঠিক সেই একই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেছে। ইউরোপে জাতীয় চেতনার প্রতিযোগিতা এবং সব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে সংযত রাখার মত কোন সংহত শক্তির অভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল ; অত্যন্ত সীমিত আয়তন কিন্তু অপরিসীম অস্ত্রশস্ত্র ও রণ-সম্ভারের মধ্যে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির বাসের অপরিহার্য পরিসমাপ্তি যুদ্ধে। মুরগির ডিম পাড়ার মতই রণ-সংগঠিত দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এ-কথা দুর্দশাগ্রস্ত ও রণ-ক্লিষ্ট দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে সমস্ত ক্ষতির জন্য নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে পরাজিত দেশগুলির প্রতিটি লোককে দায়ী করেছিল—এবং ফলাফল অনুরূপ হলে এই লোকরাও ঠিক প্রতিপক্ষদের অনুরূপ দায়ী করত। ফরাসী ও ইংরেজদের ধারণা ছিল দোষ জার্মানদের, জার্মানদের ধারণা দোষ রুশ ফরাসী ও ইংরাজদের ; এক-মাত্র অল্পসংখ্যক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দোষ যদি কারুর থাকে তো তা ইউরোপের খণ্ডিত রাজনৈতিক সংগঠনের। প্রতিহিংসার বশে ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ভার্সেইলসএ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল : পরাজিত দেশগুলিকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল; বিজয়ী দেশগুলির আঘাত ও দুর্দশার ক্ষতিপূরণ হিসাবে একেবারে দেউলিয়া দেশগুলির উপর প্রচুর দেনা চাপানো হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ পুনর্গঠনের চেষ্টায় যুদ্ধের প্রতিবন্ধক হিসাবে জাতি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতেও যথার্থ সরলতা ও উদারতা ছিল না।

ইউরোপের দিক দিয়ে বলতে গেলে, চিরন্তন শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সংগঠনের কোন প্রচেষ্টা কখনও হত কি না সন্দেহ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, প্রেসিডেণ্ট উইলসন, এই জাতি-সঙ্ঘের প্রস্তাবকে কার্যকরী রাজনীতিতে এনে ফেলেন। আমেরিকাতেই ছিল এর সবচেয়ে বেশি সমর্থন। নতুন পৃথিবীকে ইউরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপের বাইরে রাখার জন্য মনরো ডকট্রিন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন বিশেষ আদর্শ সৃষ্টি করে নি। তখন হঠাৎ তাকে এক বিরাট যুগ-সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নিতে হয়। তার কাছে কোন সমাধানই ছিল না। আমেরিকার লোকদের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বিশ্বে চিরন্তন শান্তি। পুরাতন পৃথিবীর রাজনীতির প্রতি সংস্কারবদ্ধ প্রচণ্ড অবিশ্বাস ও পুরাতন পৃথিবীর কোন ঘটনার থেকে স্বভাবসিদ্ধ পার্থক্য রক্ষাও এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। বিশ্ব-সমস্যার সমাধান আমেরিকানরা চিন্তা করার আগেই জার্মানদের

সাবমেরিন অভিযানের ফলে তারা জার্মান-বিরোধী দলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের জাতি-সঙ্ঘের উদ্ভাবনা ছিল অল্প-সময়ে-ভাবা একেবারে আমেরিকান-পন্থী বিশ্ব-পরিকল্পনা। এটি ছিল ছাড়া-ছাড়া, অপর্যাপ্ত ও ভয়ঙ্কর এক কল্পনা। অবশ্য ইউরোপ এটিকে আমেরিকানদের সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী বলে মেনে নিয়েছিল। ১৯১৮-১৯ সালের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত যুদ্ধক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এই পরিণতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য পুরাতন পৃথিবীর কোন দেশই তাদের সার্বভৌম স্বাধীনতার কণামাত্র ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। বিশ্ব জাতি-সঙ্ঘের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসনের বাণী এক সময় যেন সমস্ত দেশের সরকারের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিশ্বের জনসাধারণের অন্তরে আঘাত করেছিল; এই সব বাণীকে তারা আমেরিকার সদিচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ বলে মনে করে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে, জনসাধারণের সঙ্গে নয়; তাঁর অদ্ভুত কল্পনা শক্তি ছিল, কিন্তু সেই কল্পনাকে যখন বাস্তবে রূপায়িত করতে যাওয়া হল, তখন যে উৎসাহের তিনি সঞ্চার করেছিলেন তা স্তিমিত হয়ে পড়ল এবং সব কিছুরই অপচয় হল।

তাঁর বই 'দি পীস কনফারেন্স'এ ডক্টর ডিলন বলেন: 'যখন প্রেসিডেন্টের জাহাজ ইউরোপের তীর স্পর্শ করে তখন ইউরোপ ছিল সৃজনশীল কুম্ভকারের জন্য তৈরি মাটির মত। যুদ্ধ-তিরোহিত, অবরোধ-অজ্ঞাত বহু-আকাঙ্ক্ষিত দেশে নিয়ে যাওয়ার মত এক মোজেসকে অনুসরণ করার মত আগ্রহ সমস্ত জাতি আর কখনো প্রকাশ করে নি। তাদের সকলের কাছে তিনি সেই নেতা হয়ে দেখা দিলেন। ফ্রান্সে সমস্ত লোক শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় প্রণাম জানাল, প্যারিসের শ্রমিক নেতারা আমাকে জানালেন যে, তাঁকে দেখে তাঁদের চোখে আনন্দাশ্রু বয়েছিল এবং তাঁর এই মহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে তাঁরা এবং তাঁদের বন্ধুরা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করতে প্রস্তুত। ইটালির শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে তাঁর নাম এক স্বর্গীয় ভেরীর মত, যার আহ্বানে সমস্ত পৃথিবীর পুনর্জন্ম হবে। জার্মানরা তাঁকে এবং তাঁর এই পরিকল্পনাকে তাদের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন মনে করল। নির্ভীক হের মিউলোন বললেন: প্রেসিডেন্ট উইলসন যদি জার্মানদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের চরমতম শাস্তিও দেন, তবে তারা অকুণ্ঠচিত্তে এবং একটি কথাও না বলে সে শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করবে। জার্মান-অস্ট্রিয়ায় তাঁকে পরিত্রাতা মনে করা হত, এবং তাঁর নাম শুনলে সমস্ত দুঃখীর দুঃখকষ্ট এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যেত।......'

প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঠিক এইরকম অসম্ভব আশা সকলের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাদের সকলকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করা কিংবা জাতি-সঙ্ঘের চরম ব্যর্থতা হল অন্য এক কাহিনী। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানুষের ট্র্যাজেডি অত্যন্ত বেশি পরিস্ফুট হয়: তাঁর স্বপ্ন-দর্শনে তিনি বিরাট, কিন্তু তার রূপায়ণে তিনি কত ক্ষুদ্র। আমেরিকা তার প্রেসিডেণ্টের কাজে অমত জানাল এবং তার প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে যে সঙ্ঘ ইউরোপ গ্রহণ করল, তাতে আমেরিকা যোগদান করতে রাজি হল না। আমেরিকার জনগণদের ধীরে ধীরে এই ধারণাই হচ্ছিল যে ক্ষেত্রকে কণামাত্র প্রস্তুত না করেই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। ঠিক সেইরকম ইউরোপও ধীরে ধীরে এই ধারণাই করে নিয়েছিল যে পুরাতন পৃথিবীর চরম দিনে দেওয়ার মত আমেরিকার কিছুই নেই। অসময়ে জাত, ও জন্মেই পঙ্গু এই জাতি-সঙ্ঘ তার বিস্তারিত ও অকার্যকরী আইনকানুন ও অত্যন্ত সীমিত শক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যেকোন কার্যকরী পুনর্গঠনের পক্ষে এক বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। জাতি-সঙ্ঘ না থাকলে এই সমস্যা অনেক সহজ হত। তবুও, এই পরিকল্পনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এই যে বিশ্বব্যাপী উৎসাহ ও উন্মাদনা এবং যুদ্ধ-দমনকারী বিশ্বসংস্থা স্থাপনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের এই যে প্রস্তুতি—তা যেকোন ইতিহাসে বিশেষভাবে লিখিত হওয়া উচিত। যে অদূরদর্শী সরকার মানুষের জীবনকে ভাঙে ও বিশৃঙ্খল করে তোলে, তাকে ছাড়িয়েও বিশ্ব-ঐক্য ও বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক সত্যকার শক্তি আছে।

ভার্সেইলসের সন্ধি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধি এবং জাতি-সঙ্ঘ ছিল এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান শাসনতন্ত্র ও রাজ্যসমূহের বর্তমান কল্পনাকে অপরিহার্য মেনে নিয়েই এই সন্ধি মানবিক ব্যাপারকে জোড়াতালি দেওয়ার এক প্রচেষ্টা-মাত্র ছিল। এই ভুলই আজ সকলের কাছে ধীরে ধীরে অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাসনতন্ত্র কিংবা রাজ্য হল অস্থায়ী ব্যাপার। মানুষের প্রয়োজনের পরিবর্তনে ও প্রসারের প্রয়োজনে তাদের রূপান্তরিত করা যায় এবং করা উচিত। অর্থনৈতিক শক্তির কথা এদের চেয়ে আগে আসবে। সম্পত্তি ও তার ব্যবহারের ধারণার উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলি আবার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। মানুষের মনে যে ধ্যান-ধারণা কাজ করে মানবিক ব্যাপারের প্রকৃতি তার চেয়ে বেশিও নয় কমও নয়, এবং মিথ্যা ব্যাখ্যা বা ভুল বোঝাবুঝিকে পরিষ্কার করাই হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বৈসাদৃশ্যের একমাত্র প্রতীকার। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পুনর্বিন্যাসের মন্থর ও অনিপুণ প্রচেষ্টা হিসাবে পৃথিবীতে এক সভাসমিতির যুগ দেখা গিয়েছিল। এই আলাপ-আলোচনার

মধ্যে ইতিহাসের ছাত্র মানুষের আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মৌলিক ঐক্য রচনায় একেবারে জাতীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে ধীরে ধীরে বৃহত্তর ও সাহসিকতর পদক্ষেপ দেখতে পাবেন—যদিও জনসাধারণ, রাজনীতিবিশারদ ও সংবাদপত্র অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে এই জ্ঞান লাভ করে, এবং ইতিমধ্যে এক শতাব্দীর মধ্যে যা দেখা যায় নি, সেইরকম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। জাতিসমূহের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, জনসাধারণের নিরপত্তাও বিঘ্নিত। অপরাধ বেড়ে গেছে, রাজনৈতিক জীবনেও অনভ্যস্ত অনিশ্চয়তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। এই দুর্দশা নিয়ে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করব না। এখন পর্যন্ত তার অন্তিম অবস্থার মত কিছু হয়ে দাঁড়ায় নি, এবং মানুষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী যে উদ্দীপনাময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল তার পুনরাবৃত্তি করতে প্রয়োজনীয় নৈতিক শক্তি, নেতৃত্ব এবং আন্তরিকতা পুনর্জাগ্রত করার শক্তি আমাদের আছে কি না তা এখনও বুঝে ওঠা অসম্ভব।

জাতি-সঙ্ঘের ব্যর্থতা

একেবারে আরম্ভ থেকেই জাতি-সঙ্ঘ ছিল কেবলমাত্র বিজয়ীদের এক সঙ্ঘ, এবং অর্থনৈতিক ফলাফলকে একেবারে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে ভার্সেইলসের সন্ধিতে যে সীমান্ত রচনা করা হয়েছিল, তাকে রক্ষা করাই ছিল এর ঘোষিত আদর্শ। 'ক্ষতিপূরণ' বলে প্রচুর জরিমানা চাপানো হল। ফরাসী ও বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তরের ঐতিহ্যময় রাজ্যাধিকার-স্পৃহা চমৎকার ভাষার আড়াল দিয়ে সামান্য ঢাকা রইল। জার্মান সাম্রাজ্যের সাগরপারের রাজ্যগুলি কিংবা ছিন্নভিন্ন তুর্কী সাম্রাজ্যের অনেক অঞ্চল ঠিক আগেকার মত আবার তারা অধিকার করল, কিন্তু সে দেশগুলি বিজয়ীদের 'রক্ষণাবেক্ষণ' করতে দেওয়া হল। জাতি-সঙ্ঘ এ-দেশগুলি নিয়ে তাদের হাতে তুলে দিল। এমনকি এই লুণ্ঠিত দেশ-বণ্টনে মিত্র-শক্তিদের মধ্যেও খুব বেশি উদারতা দেখা যায় নি। অধিকাংশ দেশই পড়ল বৃটেন ও ফ্রান্সের ভাগে। ইটালি, গ্রীস ও জাপানের আকাঙ্ক্ষাও কতকটা মেটানো হল। এই অবস্থার সত্যকার রূপের সম্মুখীন হওয়ার মত গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য 'গণতন্ত্রী' দেশে সমাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার অভাব ছিল, যে অভাব প্রায় বিশ বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীতে প্রগতিশীল রাজনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল।

যেমন, গ্রেট বৃটেনে শিশুদের শেখানো হত যে জাতি-সঙ্ঘই আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের একমাত্র প্রতিরূপ এবং বিশ্বশান্তির সুনিশ্চিত প্রতিভূ। এই কথা প্রচারের জন্য অসংখ্য ছোট-ছোট পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভার্সেইলসে

ভাল ভাল জিনিস বিতরণের সময় যারা সন্তোষজনক কোন ভাগ লাভ করে নি সেইসব দেশের শিশুদের এই সঙ্ঘ সম্বন্ধে একটাও ভাল কথা শেখানো হত না। এখন যাদের আমরা উন্মত্ত বিজয়ী বলতে পারি, তাদের দেশের সীমান্তের বাইরে দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জার্মান, হাঙ্গারিয়ান, ইটালিয়ান ও জাপানী শিশু এবং তরুণরা এই কথাই শিখতে লাগল যে জেনেভা মীমাংসার এক আমূল সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। তরুণ ও যুবকদের নম্রতা ও সুতীব্র শক্তির গতি নিয়ে আক্রোশের বন্যা বছরের পর বছর বাড়তে লাগল, এবং পররাষ্ট্র-দপ্তরের শিক্ষিত কর্মচারী ছাড়া আর সকলেই বুঝতে পারল যে এক নতুন আন্তর্জাতিক বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। কিন্তু মহাযুদ্ধে যে আপাত সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন, তাই নিয়ে সব পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদপ্তর একগুঁয়ের মত বসে রইলেন।

এই সঙ্ঘের কাউন্সিলের প্রথম সভা প্যারিসে ১৯২০ সালের ১৬ই জানুয়ারি বসে। তারপর লণ্ডন ও ব্রাসেলসে এর অধিবেশন হয় এবং শেষ পর্যন্ত এক বছর যেতে-না-যেতেই এর প্রধান কার্যালয় জেনেভাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে এখানেই সমস্ত অধিবেশন বসে।

উইলসনের এই মহৎ সমাধান যে ত্রুটিপূর্ণ, তার প্রথম দৃষ্টান্ত সঙ্ঘ ভাল করে বসবার আগেই পাওয়া যায়। চলিত বছরের মধ্যেই হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, সাইবেরিয়া, ফিউম, তুর্কী, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মরক্কো, ব্রেজিল, ও চীনে, যুদ্ধ—কখন-কখন খুব বড় রকমের যুদ্ধ দেখা যায়, এমন কি আয়ার্ল্যাণ্ডে গৃহ-যুদ্ধ বেধে ওঠে। কিন্তু এর অধিকাংশকে মহাযুদ্ধের পরের একরকম 'পরিষ্করণ'-প্রক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের সুব্যবস্থিত যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অ্যাঙ্গোরার বাইরে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক শক্তির বিরাট ধ্বংসে পরিণত হয়। কামাল পাশা গ্রীকদের এশিয়া মাইনর ও থেস থেকে বের করে দেন, এবং স্মার্নাকে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করে অসংখ্য লোক হত্যা করা হয়। মহাযুদ্ধের সময় জারের রাশিয়াকে কনস্ট্যান্টিনোপল দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার এই গণ্ডগোলে যাওয়ার কোন বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এই প্রাচীন রাজধানীটি ইংরেজ সেনাপতি মিল্‌ন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মিত্রশক্তিদের পক্ষে অধিকার করেন এবং গ্রীক বিতাড়নের পর বহুদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর লুজানের সন্ধিতে এটিকে গ্রীকদের প্রত্যর্পণ করা হয় (১৯২৩)। কামালের নেতৃত্বে তুর্কী অত্যন্ত দ্রুত পাশ্চাত্য ধরন গ্রহণ করল। প্রাচীন রীতি-বর্জনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সুলতানের ফেজ ও পর্দা প্রথা লুপ্ত করা এবং তুর্কীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

কনস্ট্যান্টিনোপল পুরাতন মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও অ্যাঙ্গোরাই কামালের রাজধানী হয়ে রইল।

ভার্সেইলসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের কয়েক বছর জার্মানি অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়ে। এই সন্ধিতে পরাজিত দেশগুলিকে তাদের 'যুদ্ধাপরাধ' স্বীকার করিয়ে বিজয়ীদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। বাহ্যত এক পুরুষ বা তারও বেশিদিন ধরে সমস্ত লোককে অর্থনৈতিক দাসত্বে আবদ্ধ রাখার চেষ্টাই হয়েছিল। তারা পরিশ্রম করবে, বিজয়ীরা ফল ভোগ করবে। কিন্তু এর মধ্যেও একটু 'কিন্তু' ছিল। এই বিপুল জরিমানা দেওয়ার একমাত্র উপায় হল রপ্তানির মাধ্যমে, কিন্তু রপ্তানির বন্যায় তো বিজয়ী দেশের শিল্প-জীবন একেবারে বানচাল হয়ে যেতে পারে। এইজন্য তাদের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা শুল্ক-প্রাচীর গড়ে তুলল। তার ফলে যদি জার্মানরা অমানুষিক পরিশ্রম করেও তাদের উপর চাপানো দেনা মেটাবার চেষ্টা করত, তাহলেও তাদের এই প্রাচীরে অযথা মাথা খুঁড়ে মরতে হত এবং অবিক্রীত পণ্য ঘাড়ে নিয়ে তাদের তখনও ঋণগ্রস্ত হয়েই থাকতে হত।

খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার এই অবস্থার মধ্যেই কোনরকমে বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণান্তকর ও আক্রোশপূর্ণ প্রচেষ্টা ও তাদের দুর্লঙ্ঘ্য অসুবিধার কথা বুঝতে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের একেবারে অনিচ্ছা—এইটিই হল উনিশশো বিশ দশকের কাহিনী। ইতিমধ্যে বছরের পর বছর তরুণ জার্মানরা নিজেদের মনে প্রতিহিংসার আগুন পুষে রাখছিল।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে কাইজার হল্যাণ্ডে পলায়ন করায় হোহেনৎ-সোলের্ন বংশের রাজত্ব শেষ হয়, এবং জার্মান গণতন্ত্রের উপর প্রচুর প্রবন্ধ নিবন্ধ শুরু হয়। জার্মান রাজ্যের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও তার অপরিহার্য পরিণতি এবং সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী চরম দণ্ড প্রয়োগে ম. পঁয়কারের নেতৃত্বে ফ্রান্সের অনমনীয় শপথের বিশদ বিশ্লেষণ এই পরিচ্ছেদের কলেবরের তুলনায় অত্যন্ত বড় হবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় জার্মান সাম্রাজ্য অধিকার করা হল এবং রুর (Ruhr) উপত্যকায় সেনেগল থেকে কৃষ্ণকায় সৈন্য এনে মোতায়েন করা হল। ফরাসীদের উৎসাহে জার্মানি থেকে পৃথক এক রাইনল্যাণ্ড সাম্রাজ্য গঠন ও কম্যুনিস্টদের বিদ্রোহের চেষ্টাও হয়। জেনারেল লুডেনডর্ফের অধীনে মিউনিকে দু-এক দিনের জন্য একতন্ত্রের বিভীষিকাও দেখা যায়। এই সব হাঙ্গামার মধ্যেও (প্রেসিডেণ্ট এবার্টের অধীনে) ডক্টর স্ট্রেসেমান বার্লিন থেকে এক অর্ধ-উদারনৈতিক রাইখকে একত্র রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

জার্মানির এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে এক নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কর্কশ ও ক্রুদ্ধ সে স্বর, কিন্তু লক্ষ-লক্ষ ব্যাকুল জার্মানদের, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধোত্তর তরুণদের অন্তরের কথা এই স্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। জার্মানির সঙ্গে প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে—এই ছিল তার অনুধাবিত বক্তব্য ; যেকোন ত্যাগ স্বীকার করে প্রাণপণ চেষ্টায় ১৯১৪ সালের পূর্বের গৌরবময় পরিস্থিতিতে কিংবা তার চেয়েও উচ্চাসনে তাকে তুলতেই হবে। জার্মানি পরাজিত হয় নি, পরাজয় তার পক্ষে অসম্ভব ; দেশের অভ্যন্তর থেকে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ইহুদীরা, প্রতিভাধর ব্যক্তিরা এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্টরা। আবার তার জাতির বিশুদ্ধতা ফিরে পেতে হবে, আদি যুগের 'আর্য' টিউটনদের কষ্টসহিষ্ণু সামরিক জীবনে ফিরে যেতে হবে। অ্যাডলফ্‌ হিটলার নামে এক অস্ট্রিয়ান শিল্পীর সে কণ্ঠস্বর, এবং এই কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভবিষ্যৎহীন জীবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান ক্রমবর্ধমান ও বিপুলসংখ্যক জার্মান তরুণ ও যুবক এক অপ্রতিরোধ্য আবেদন লাভ করেছিল। এই কণ্ঠস্বর এক সঙ্ঘ গড়ে তুলে ছড়িয়ে পড়ল। এই কণ্ঠস্বর 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্টস' নামে এক সংগ্রামশীল রাজনৈতিক দল গড়ে তুলল।

ইহুদীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 'অদ্ভুত ধরনের জাত' হিসাবে বাস করবার তাদের বিরক্তিকর চেষ্টা, 'জাতীয়' হবার চেয়ে 'সার্বভৌম' হওয়ার দাবির ফলে শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থের নয়, লুণ্ঠনেরও তারা একমাত্র লক্ষ্য হল। বিকৃত একচ্ছত্রবাদ দেশপ্রেমিকতার নামে প্রথমেই ইহুদী ও কম্যুনিস্টদের উপর আঘাত হানে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হিটলার জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলর ও সর্বশক্তিমান হন।

ইটালিতেও এর আগে থেকে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল যা নাৎসিদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে কিছুটা সমান্তরাল এবং কিছুটা পৃথক-ভাবাপন্ন। (যেমন, মুখ্যত এরা ইহুদী-বিদ্বেষী ছিল না।) একটি আন্দোলনের শক্তি-সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে অপর আন্দোলনও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিল। মূলে এরা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর থেকে পৃথক ও স্বাধীন ছিল। ইটালির নেতা ছিলেন বেনিতো মুসোলিনি। প্রথমদিকে ওঁরা পরস্পরকে খুব অল্পই চিনতেন। কিন্তু পরে তাঁরা পরস্পরের মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন। সে-যুগের সামাজিক বিবর্তনের তাঁরা প্রকৃত ফলস্বরূপ ছিলেন, অর্থাৎ সর্বদেশে অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক পঙ্গু লক্ষ্যহীন ও বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত যুবকদের অভিব্যক্তিকে তাঁরাই প্রকাশের রূপ দিয়েছেন।

মুসোলিনির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী হয়ে। তিনি 'আভান্তি' নামে এক সমাজতন্ত্রী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বেই

সাহসী ও কর্মঠ নেতা বলে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইটালির মিত্রশক্তির পক্ষে সংগ্রামে যোগদান করা উচিত কি না এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি তাঁর অধিকাংশ 'বামপন্থী' সহকর্মীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান, আভান্তি পত্রিকার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করে নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য 'ইল পোপোলো দ্য ইতালিয়া' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুদ্ধে ইটালি তেমন কোন বিশেষ সমরকুশলতা দেখাতে পারে নি, এবং যুদ্ধের পর ইটালিতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ইতস্তত কম্যুনিস্ট-বিদ্রোহ দেখা যায়। রাজ-সরকার ছিল দুর্বল ও সংশয়ান্বিত এবং অনেকের কাছে কম্যুনিস্ট বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়েছিল। হিটলারের মত মুসোলিনিও সেই একই রকম দেশপ্রেমময় অস্বস্তি অনুভব করছিলেন এবং 'ফাসিস্তি' নামে 'ব্ল্যাকশার্ট'দের এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। তারা যে শুধু জনগণের এক সুদৃঢ় সরকার দাবি করল তা নয়, আর্থিক ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারও চাইল। বড় বড় শিল্পপতি ও মহাজনদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর সমর্থন লাভ করেছিলেন, কেননা 'লাল' বিপ্লবীরা তাঁদের অধিকারচ্যুত করতে পারে, এমনি কতকটা অহেতুক এক আতঙ্ক তাঁদের ছিল এবং সেইসঙ্গে তাঁরা মনে করেছিলেন যে এই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিটিকে ধর্মঘট-ভঙ্গকারী হিসাবে ব্যবহার করে শেষপর্যন্ত নিজেদের হাতের মুঠোয় এনে রাখতে পারবেন। তাঁরা 'লালদের' যেমন খুব বেশি ভয় করতেন, 'কালোদেরও' সেইরকম ভয় করতেন খুবই সামান্য। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনে কোনদিনই মুসোলিনি কোন ব্যক্তিগত মূলধনের দাসত্ব স্বীকার করেন নি। আইন-সম্মত রাজ্যের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল এই সব দুঃসাহসী ব্যবসায়ীদের কঠিন সংযমে রাখা।

হিটলারের কয়েক বছরের আগেই তাঁর আন্দোলন শুরু হয়; জার্মানির মধ্যবিত্ত যুবকরা যে-সংখ্যায় নিহত হয় ইটালিতে সে ধরনের কিছু না হওয়ার জন্যই বোধহয় এটা সম্ভব হয়েছিল। ব্লাকশার্টদের এমন বিপ্লবাত্মক অভিযান, অত্যাচার ও গুপ্তহত্যা শুরু করল যে 'শ্রেণী-সংগ্রাম'-উন্মাদদের বিভীষিকাকেও তারা ম্লান করে দিল। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে হল সেই 'রোম অভিযান': ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ জোর করে শক্তি দখল করল এবং তার পর থেকে অবিচ্ছিন্ন দ্রুততার সঙ্গে মুসোলিনি শক্তির চরম শীর্ষে আরোহণ করলেন। একনায়কত্বের ক্ষমতা-অধিকারে তিনি হিটলারের থেকে প্রায় দশ বছর এগিয়ে ছিলেন।

সমগ্র ইউরোপে, চীনে ও জাপানে একই ধরনের ঘটনায় একই রকমের বিরোধ এবং প্রায় একই রকমের ফল দেখা যাচ্ছিল। অনমনীয় বামপন্থী রাজ-

নৈতিক দলগুলি সর্বত্রই প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলিত করে তুলেছিল ও পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত ছিল এবং সর্বত্রই তারা যে শুধু একনায়ক (ডিক্টেটর) ও সামরিক অধিনায়কদের ক্ষমতা অধিকারের পথ প্রশস্ত করে তুলছিল তা নয়, ব্যক্তিগত রাজত্বের ব্যবস্থা এবং তার চেয়েও যা ভয়ানক, স্বমত প্রকাশ এবং স্বদলীয় রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া অন্য দলের অধিকার দমন করতে ব্যাপৃত ছিল। কম্যুনিজম বা আইন-সম্মত রাজ্য—তাদের কী মতবাদ তাতে কিছুই আসত যেত না। বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, কোন বে-আইনী কার্যের ফলে শেষ পর্যন্ত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল—এ কথাটাও কারো কোনরকম চিন্তার বিষয় ছিল না। কার্যত সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত একই ফল দেখা যেত। ডিক্টেটরদের অধীনে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সার্বভৌম আদর্শ অবহেলিত হতে লাগল এবং সংগ্রামশীল জাতীয় রাজ্যের পুনঃপ্রবর্তন দেখা যেতে লাগল। রুশ একনায়কত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি শান্তির পক্ষপাতী, তার নিজের সীমান্তেই সে খুশি ছিল এবং জাতি-সঙ্ঘের মিথ্যা বিন্যাসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎসুক ছিল। জার্মানি ইটালি ও জাপান এই বিকৃত-কল্পিত সঙ্ঘকে দিন-দিন অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল।

জাপান অস্ত্র-সজ্জিত হয়েই ছিল, অধিকাংশ বিজয়ী দেশের মত সেও অস্ত্র-সজ্জিত থেকে গেল এবং তার নিজের দেশের যুবকদের অস্থিরতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বিশৃঙ্খল চীনের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তরুণদের স্বাস্থ্য ও নিয়মানুবর্তিতা ও তাদের বিমান-বহরের বিরাট উন্নতি-সাধনের জন্য জার্মানি ও ইটালি অসম্ভব পরিশ্রম করতে লাগল। জার্মানির অস্ত্র-সজ্জা ভার্সেইলেসএর সন্ধি-বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু ইটালির উপর এরকম কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। এবং এই তিন দেশের স্কুলে এবং সংবাদপত্রে সংগ্রামাত্মক অভিযানের আদর্শ সুষ্ঠুভাবে প্রচার করা হত।

ইউরোপে কতকগুলি জেলার সঙ্ঘনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা কখনও কার্যকরী হয় নি। লিথুয়ানিয়াকে প্রদত্ত ভিল্‌নাকে নিয়ে রুশ পোল ও লিথুয়ানিয়ানরা মারামারি করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা থাকে পোলদের হাতে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৯২৩ সালে লিথুয়ানিয়া সঙ্ঘ কর্তৃক রক্ষিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে মেমেল শহর ও বন্দরটি অধিকার করে এবং শেষপর্যন্ত মেমেলকে তাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়।

সঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য করার স্পৃহা প্রথম থেকেই দেখা যায় এবং গ্রীস-আলবানিয়ার সীমান্ত-কমিশনের এক ইটালীয় সেনাপতিকে একদল গ্রীক হত্যা

করায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনরকম অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ইটালি কোর্ফুর উপর বোমা বর্ষণ করে এবং সে-কাজ সমর্থনের দাবি জানায়। ইটালির এই কাজে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জাতি-সঙ্ঘ এই পরিস্থিতিকে আইনানুগ করে।

হাঙ্গামার আর-একটি কেন্দ্র ছিল ফিউম। ক্রোসিয়াকে ফিউম দেওয়া হয়েছিল, চটকদার কবি ড' আনুঞ্জিওর (১৯১৯) নেতৃত্বে একদল বোম্বেটে সৈন্য তার উপর আক্রমণ চালায় এবং কয়েকবার হাত বদলের পর ১৯২৪ সালে চির-কালের জন্য ইটালির কুক্ষিগত হয়। এগুলি তুলনায় খুব ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের আইন-কানুনকে কত হাল্কা মনে সকলে দেখত, এগুলি থেকেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জাতিসঙ্ঘের বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের অবাস্তবতা খুব বড় করে সুদূর প্রাচ্যেই প্রথম দেখা গেছিল। প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের এক জন-সমাজ, এক পুরুষের মধ্যেই যাদের প্রাচীন রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে, তাদের স্বকীয় সমস্যার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের যে রাজনীতিবিদরা জাতি-সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছিলেন এবং কর্ণধার ছিলেন তাঁদের কারুরই সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না। তাঁদের কাছে চীন ছিল ফ্রান্স বৃটেন বা জার্মানির মত এক পুরাকালের আইনানুগ দেশ—তাদের নিজেদের মধ্যে একতা আছে, তারা আদালতে আসতে পারে, শপথ করতে পারে, ঋণ করতে পারে, জরিমানা দিতে পারে ইত্যাদি। এই সাধারণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে কয়েকজন শিক্ষিত চীনা এক নতুন চীন গঠনের পরিকল্পনায় ব্রতী হলেন, এবং ১৯১২ সালের পর কয়েক বছর ধরে কুয়োমিণ্টাঙ্ নামে এক সমিতি চীনে আধুনিক দেশপ্রেমবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তাঁদের এই মতবাদে এবং স্থানীয় অভিমতে প্রচুর পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং এই বিরাট দেশে লুণ্ঠনের সম্ভাবনাও ছিল খুব বেশি। জাতি-সঙ্ঘের জাতীয়তা রক্ষার অধিকার-দাবিকে তুচ্ছ করে প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের জার্মান-অধিকৃত শান্টুঙ্ প্রদেশটি জাপানের হাতে তুলে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। প্রথমে এই প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করে আবার তা অধিকার করা হয়। বিভিন্ন নেতার উত্থান-পতন, আধুনাপন্থী সান ইয়াৎ-সেন, 'খৃষ্টান সেনাপতি' ফেঙ্, মঙ্গোলিয়ান চ্যাঙ্ ৎসো-লিন—রাজ-সিংহাসনের উপর তাদের লোভ, পিকিং ন্যানকিঙ্ ও ক্যাণ্টনে মন্ত্রীত্ব পরিবর্তন, বিদেশী-বিরোধী উত্তেজনার যুগ, এবং চীন দেশের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের ক্রমাগত হস্তক্ষেপ প্রভৃতির সম্বন্ধে এখানে এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে আমরা বলতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইটুকুই বেশ

বোঝা গেল যে জাপানই চীনের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণশীল হয়ে উঠেছে, প্রাক্‌যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যানুগ পূর্ব-এশিয়ায় প্রাধান্যের জন্য ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৩২ সালে চীনের থেকে মাঞ্চুরিয়াকে পৃথক করে জাপানী তত্ত্বাবধানে 'রক্ষিত রাজ্য' করা হল।

ইতিমধ্যে বিমানের দ্রুত উন্নতি এবং আকাশ-যুদ্ধের বিরাট সম্ভাবনার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাবও দিন-দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল। প্রাচীন সমস্ত পররাষ্ট্র-দপ্তর এই নতুন অস্ত্রের সম্ভাবনায় পুরাতন স্থল ও নৌ-যুদ্ধের পরিসাধন হতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। দ্রুতগামী বোমারু বিমানের জন্য কার্যত সাবমেরিন সেকেলে হয়ে গেছিল এবং স্থল-সীমান্ত ও সমুদ্রপথের পুরাতন ধারণাও অপ্রচলিত হয়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সম্বন্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আক্রমণশীল রাজ্যগুলিই সবচেয়ে বেশি সজ্ঞান হয়ে উঠেছিল এবং তার বিমান-শক্তির উন্নতির জন্য গোপনে দ্রুত এবং অত্যন্ত বেশি চেষ্টা করতে লাগল। 'উন্মত্ত বিংশ দশকে' যে বৃটেন ও ফ্রান্স সামরিক শক্তির উৎকর্ষে অদ্বিতীয় ছিল, তারা আজকের এই 'বিভীষিকাময় ত্রিংশ দশকে' হঠাৎ বুঝতে পারল যে আকাশ-পথে তারা তাদের প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। হিটলার ও গোয়েরিংএর অধীনে নতুন জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইটালির সাহস বেড়ে গেল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সামনে তারা আজ ক্রমবর্ধমান সাহস ও শক্তি নিয়ে দাঁড়াল, এবং এই দৃষ্টি-বিভাগের মূল্য বুঝতে পেরে জাপানের সামরিক দল চীনে দিন-দিন আক্রমণ তীব্র করে তুলল। মাঞ্চুরিয়াকে গ্রাস করে জাপানী সৈন্যবাহিনী ১৯৩২ সালের শেষে জেহোল প্রদেশ আক্রমণ করল; ১৯৩৩ সালে তারা চীনের বিশাল প্রাচীরে এসে পৌঁছল।

বৃটেন ফ্রান্স কিংবা রাশিয়া যুদ্ধ চায় নি। তারা তিনজনেই তাদের নিজেদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাপে নানাভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। কখনও সত্যকার ভয় দেখিয়ে, কখনও বা ধাপ্পা দিয়ে এই তিন আক্রমণশীল রাজ্য ভার্সেইলসএর সন্ধিপত্র এবং জাতি-সঙ্ঘকে সম্পূর্ণরূপে এবং বরাবরের মত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে ব্যস্ত হল।

১৯৩৪ সালের শেষাশেষি ইটালি ও আবিসিনিয়ার মধ্যে চরম গোলমাল বেধে গেল এবং ১৯৩৫ সালের হেমন্তে আবিসিনিয়া জয় করার উদ্দেশ্যে ইটালি যুদ্ধ শুরু করল। অগ্নি-বোমা ও গ্যাসের নির্মম প্রয়োগে ১৯৩৬ সালের মে মাসে এই অভিযান সাফল্য লাভ করে। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন ও আত্মসাৎ করার ব্যাপারে ইটালি আবিসিনিয়ায় অত্যন্ত বেগ পেল।

সেই বছরেই গ্রীষ্মকালে ক্যাটালোনিয়ান জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বহুদিনব্যাপী সংগ্রামে দুর্বল ম্যাড্রিডের প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানি ও ইটালি কর্তৃক গোপনে সাহায্যলব্ধ মরোক্কোর সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়। এই বিদ্রোহ কোন হঠাৎ-বিপ্লব আনতে পারে নি; স্পেনীয় জনসাধারণ ম্যাড্রিড সরকারকে সাহায্য করতে অগ্রসর হল এবং দুবছর ধরে বর্বর যুদ্ধ-তাণ্ডব চলল, জার্মানি ও ইটালি ধীরে ধীরে আরো প্রকাশ্যভাবে এই যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল। আক্রমণকারীরা নির্মমভাবে শহরগুলিতে বোমাবর্ষণ করতে লাগল এবং এই নতুন যুদ্ধে অসংখ্য শিশু ও নারী নিহত হল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ ঘোষিত হয় নি। আইনত জাপান যেমন চীনের সঙ্গে শান্তিরক্ষা করে চলেছিল, জার্মানি ও ইটালি সেইরকম আইনত স্পেনের সঙ্গে শান্তি-সর্ত পালন করে চলেছিল।

১৯৩৮ সালের বসন্তে ভার্সেইলস সন্ধির নিষেধ একেবারে অগ্রাহ্য করে হিটলার হঠাৎ অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করেন। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে কোনরকম কার্যকরী প্রতিরোধ দেখা যায় নি। দিন দিন হিটলার (মুসোলিনিকে পরম মিত্র হিসাবে পেয়ে) বিশ্ব-ব্যাপারে সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে নাৎসি জার্মানিও দিন দিন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠছিল। 'গণতন্ত্রী' রাজ্যগুলিকে আকাশ-পথের আক্রমণের ভয়—হয়ত এতটা ভয় অহেতুক—একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছিল। এর পূর্বে যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতার ফলে ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের শুরু হয়, তার চেয়ে বেশি -অনেক বেশি অর্থ ব্যয়ে, অনেক প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় অস্ত্র-সজ্জিত হওয়ার এক ভীষণ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

পূর্বতন প্রধান শক্তি, আমেরিকা ফ্রান্স ও বৃটেন, যার যার নিজের দেশের পরিবর্তনশীল ও অনুলব্ধ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে সার্বভৌম উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তা যদি আমরা ধারণা করতে পারি তো আন্তর্জাতিক খেলায় আত্ম-প্রত্যয় এক সরল ও দৃঢ় নীতির অভাব এবং আমেরিকার শুধু দম্ভই নয়, আত্মপ্রত্যয় হারানোর কারণও আমরা সহজে বুঝতে পারব। অবিচ্ছিন্ন চাকুরির তাগিদ নষ্ট করে উৎপাদন ও বিশৃঙ্খল পরিবেশন-প্রক্রিয়ার মধ্যেও এক বিপ্লবের সম্মুখীন তারা হয়েছিল, এবং ছোটরা বড় হওয়াতে পুরাতন স্বাভাবিক শ্রমিক শ্রেণীকে স্থানচ্যুত করে তারা এক অসহিষ্ণু বেকার শ্রমিক-সম্প্রদায় সৃষ্টি করছিল। উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম বিক্রির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এর গুরুত্ব বুঝতে পারল,

এবং যুদ্ধের সময়ে কিংবা যুদ্ধোত্তর চড়া বাজারের দিনে মূলধন প্রচুর পরিমাণে ছড়ানোর ফলে কর্জ-পত্র বিক্রয়ের ধুম লেগে গেল এবং আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। আর্থিক সঙ্কটমুক্ত অনেক অনেক ব্যাঙ্কও বিপদের সম্মুখীন হল। ১৯৩১-৩২ সালের এই সঙ্কটাবস্থায় ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের মত এক নেতা পাওয়া দেশের পক্ষে মহা ভাগ্যের কথা। তিনি ব্যাঙ্ক-সমূহের উপর এক অভূতপূর্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য অর্থসম্পদ সঞ্চয়ই করেছে ও তা করার প্রতিক্রিয়ায় তার সমস্ত সম্বল অপচয় করেছে, তার থেকে তিনি দেশের মুখ ফিরিয়ে দিলেন এক সুপরিকল্পিত আধুনিক অর্থনীতির দিকে—যাকে বলা হয় নিউ ডীল। কিন্তু এই বিরাট সমাজ-তন্ত্রীকরণের জন্য যত সরকারি কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল তার চাহিদা তখনকার শিক্ষিত ও বিদ্বান জনসমাজের পক্ষে মেটানো অসম্ভব ছিল, এবং প্রথম থেকেই নতুন প্রেসিডেন্টের কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর অত্যন্ত মধুর স্বভাবের কয়েকটি ত্রুটি, তাঁর মন্ত্রীত্বের ভাগাভাগি ও সীমিত কর্মক্ষমতা এবং আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট থেকে শুরু করে নিচু আদালত পর্যন্ত সর্বত্রই আইনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি পক্ষপাতিত্বের আধিক্য। পুরাতন পৃথিবীতে যুদ্ধ-সম্ভাবনা যখন ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল, সেই ১৯৩৭-৩৮ সালে তখনও আমেরিকা এই বিরাট পরীক্ষার মুখে। বৃটিশ সাম্রাজ্য কোন বিশেষ বিপদের মধ্যে পড়লে যে তার পূর্ব ও পশ্চিমের নৌ-কেন্দ্রগুলির অবস্থাও ভীতিকর হতে পারে, তা আমেরিকা বুঝতে পারছিল এবং বিমানের আকার ও গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও বড় হয়ে দেখা দিল। তার উপর যুদ্ধ-প্রস্তুতি ছিল বেকার-সমস্যা সমাধানের সাক্ষাৎ উপায়। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যের স্বপ্ন দেখলেও ফ্রান্স ও বৃটেনকে অনুসরণ করে আমেরিকাও অস্ত্রসজ্জার মাতনে যোগ দিল।

গ্রেট বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। আমেরিকার আগেই স্বাধীন ও শক্তিমান ধনীসমাজের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় সংগ্রাম শুরু করেছিল প্রচুর আয়কর মৃত্যু-কর বসিয়ে ও বেকারদের কোন রকমে বেঁচে থাকবার মত ভিক্ষা দিয়ে। এইভাবে সে এক বিপ্লবের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল এবং সমাজ ও নিজেদের বোঝা হয়ে তার বেকার যুবকেরা টো টো করে ঘুরে বেড়াত। এইসব হতাশ্বাস ও নিষ্কর্মা যুবকদের স্বাস্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষা বা তাদের কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধে কিছুই করা হত না। প্রাকৃতিক সম্পদ বা ব্যবসাকে সমাজতন্ত্রীকরণে বাধা দেওয়ার পক্ষে গ্রেট বৃটেনের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত অর্থ রাজনীতির দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী

ছিল। ১৯৩৭ সালে গ্রেট বৃটেনও যুদ্ধভীতি সম্বন্ধে সচেতন হল এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে একত্র হয়ে সামরিক প্রয়োজনের দাসত্বে মন দিল।

পৃথিবীতে যতদিন স্বাধীন জাতীয়তাবাদী রাজ্য থাকবে, যতদিন জাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং জাতীয় ও সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ নিয়মিতভাবে প্রচারিত হবে, যতদিন ব্যক্তিগত লাভের জন্য ঐশ্বর্যের উৎস কুক্ষিগত করা চালু থাকবে, যতদিন অধিকার লাভের জন্য টাকার খেলা চলবে, ততদিন আমাদের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা বাড়তে থাকবে, ততদিন আরো অনেক বিধ্বংসী যুদ্ধের অনুরাগ ভীতি গোলামি ও নিয়মানুবর্তিতার দিকে মানুষের জীবন ও চিন্তা দিন দিন নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে বাধ্য হবে,—এ কথা বুদ্ধিমান লোকের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একরকম যুদ্ধের বায়ু আমাদের জাতিকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে, এক পা এক পা করে আমাদের এক নিষ্ঠুর ও অপকৃষ্ট যুদ্ধের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে এমন এক জীবনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে যেখানে বেদনা ঘৃণা ও আদিম লালসা ছাড়া কোন কৌতূহল নেই, দুঃসহ ধৈর্য ছাড়া কোন কিছু নেই।

অবশ্য আমাদের দুঃখ-দুর্দশা নির্ণয় করা এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে কোন প্রতীকার আবিষ্কার করার চেয়ে তার ধারা বুঝতে পারা অনেক সহজ, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সমাজতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদদের মানসিক কার্যক্রিয়া আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে ঘৃণারও অযোগ্য ছিল। অসংখ্য ব্যর্থ সম্মেলন-সভা ও ঘোষণা হয়েছে এবং অসংলগ্ন বিস্বাদ ভাষা ও অর্ধ-সত্যের প্রচারও অনেক হয়েছে। 'শান্তি' নামে একটি কথার জন্য বিশ্বব্যাপী হাহাকার পড়ে গেছে, কিন্তু সুস্থ প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল জীবনের কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করেন নি। শান্তি-প্রচেষ্টার দিকে বেশ কিছু আলস্য দেখা গেছে, এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ যদি সারা পৃথিবী জুড়ে এক শান্তিসংস্থা গঠন করে চালু রাখতে পারে, তা প্রতিরোধহীনতার সহজ রাস্তায় সম্ভব হবে না। জয় ও দখলের মধ্যেই 'প্যাক্স রোমানা' সম্ভব হয়েছিল এবং 'প্যাক্স মুণ্ডি'র জন্যও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বিরুদ্ধবাদীদের উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

যে বিশ্বযুদ্ধ এখন ধীরে ধীরে অনিশ্চিত শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হল তারই পর-পর ঘটনাগুলি আমরা এখন আরো একটু বিশদ করে বলব।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী, মিঃ লিটভিনভ প্রস্তাব করেছিলেন

যে বৃটেন ফ্রান্স আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ভবিষ্যতে আর কোন আক্রমণ, বিশেষ করে মধ্য-ইউরোপে, যাতে না হয় সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একত্র মিলিত হওয়া প্রয়োজন। জার্মানি ইটালি ও জাপানকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা হয় নি, কারণ মিঃ লিটভিনভ বলেছিলেন, 'আক্রমণ-কারীদের সঙ্গে আমরা আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না।' এটি একটি অত্যন্ত সরল এবং সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছিল, এর ফলে হয়ত ইউরোপীয় সংগ্রাম এড়ানো যেত কিংবা তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যেত; কিন্তু সংখ্যাগুরু বৃটিশ রক্ষণশীল দলের কাছে জার্মান ভীতির চেয়ে কম্যুনিস্ট-ভীতি আরো বেশি ছিল। এই প্রস্তাব যে শুধু ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে স্ট্যালিন এবং মে মাসে মলোটভের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়,—এবং শুধু যে এ-কথাই তাঁরা সকলকে জানান যে বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সহযোগিতায় জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে বাল্টিক রাজ্যগুলিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেছে, তা নয়—জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রস্তাবই ছিল রাশিয়ার ঘোষিত ও সযত্ন-পালিত নীতি।

জার্মান অনুষ্ঠান-তালিকার পরবর্তী ধাপ ছিল চেকোস্লোভাকিয়া ধ্বংস। অস্ট্রিয়া অন্তর্ভুক্তির পর এই দুর্ধর্ষ ছোট্ট দেশটিকে জার্মানি তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল এবং এখন জার্মান জনতার স্বপক্ষে এক প্রচার চলতে লাগল যে সামরিক সুবিধাগত সীমান্ত রক্ষার জন্য ভার্সেইলসএর সন্ধিতে বোহেমিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছিল। এর পরেই যুদ্ধের হুমকি, এবং কতগুলি অবিশ্বাস্য আলাপ-আলোচনা চলল। সকলের সাধারণ শত্রুকে প্রসন্ন করতে মিঃ চেম্বারলেন অত্যন্ত বেশি তৎপর হলেন। তাঁর সেই নীতির বিরুদ্ধে পরে বৃটিশ জনসাধারণ রায় দিয়েছে, কিন্তু সে-সময়ে তারা তাঁর কাজে সম্পূর্ণ আস্থা জানিয়েছিল। তিনি বারকয়েক মিউনিকে যাতায়াত করলেন এবং একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই যে, ডক্টর বেনেসকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে রাশিয়া ফ্রান্স বৃটেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার একত্র মিলিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে জার্মানিকে দমন করার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং চেকোস্লো-ভাকিয়ার সমস্ত সামরিক ঘাঁটি সমর্পণ করে পরিবর্তে হিটলারের সই-করা কতগুলো বাজে কাগজ সঙ্গে করে যখন তিনি হেস্টনের বিমান-বন্দরে উপস্থিত হলেন, এবং যখন তিনি ডাউনিং স্ট্রীটে সম্মিলিত জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করলেন—'প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের যুগে চির শান্তি। এখন আমি আপনাদের যার যার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সুখশয্যায় ঘুমোতে অনুরোধ জানাব',—তখন উচ্চ করতালি-

ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই। বৃটিশ জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে গেল।

প্রস্তুতির নিষ্ঠুর শাসনে মূঢ়তা ও কাপুরুষতার দণ্ড চিরকালই অপরাধের দণ্ডের মতই কঠিন; এবং এখন বৃটেন ও তার সঙ্গে সমস্ত মনুষ্যসমাজ মর্যাদা ও কর্তব্য এড়ানোর হীনতার ফলভোগ করছে। কারণ, জার্মানি এক মুহূর্তের জন্যও তার কথা রাখে নি, এবং আজ এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, জার্মানি যে সত্য রক্ষা করে চলবে তা তখন কেউ বিশ্বাস করতে পেরেছিল। জার্মানি ওৎ পেতে রইল এবং মিঃ চেম্বারলেনের 'ভাল লোক', ইংল্যাণ্ড, ঘুমোতে গেল। চেকোস্লোভাকিয়ার যে-সব জায়গা তাদের দেওয়া হয়েছিল, জার্মান সৈন্যবাহিনী সেই সব অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি পেতে রইল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোস্লোভা-কিয়ার আর অস্তিত্ব রইল না, এবং স্কোডার বিখ্যাত শিল্প-কারখানা জার্মান সৈন্য-বাহিনীর শক্তি আরো বৃদ্ধি করার জন্য অস্ত্র-সম্ভার তৈরি করতে লাগল। নিজেদের বিপদের কথা একবারও চিন্তা না করে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারি লোভীর মত মৃতপ্রায় রাজ্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোল্যাণ্ড তেসেন জেলা কেড়ে নিল, আর হাঙ্গারি অধিকার করল ইউক্রেনের এক ফালি।

তার এই নতুন জায়গার দখল নিয়ে পোল্যাণ্ড খুব বেশি দিন শান্তিতে থাকতে পারল না। জার্মান অভিযানের পরবর্তী লক্ষ্য হল সে। এবার ড্যানজিগের প্রশ্ন নিয়ে চিরাচরিত কলহ হল। পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনের কিংকর্তব্য ভাব ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। বলশেভিজমের ভয়েই তিনি চেকোস্লোভাকিয়াকে বলি দিয়ে এসেছিলেন। তখনও তিনি হিটলারের এই কথাটাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিলেন যে হিটলারের প্রকৃত লক্ষ্য কম্যুনিজম ধ্বংস করা; তখনও তিনি আশা করে বসেছিলেন যে জার্মানি শুধু পুব দিকে অভিযান চালিয়ে যাবে এবং পাশ্চাত্য রাজ্যগুলি তার অনুচরের অমর্যাদাকর কিন্তু লাভজনক ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে। কিন্তু পোল্যাণ্ড পূর্বে এবং তখনও এক-দল-শাসিত রাজ্য ছিল; সে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, ক্যাথলিক এবং রুশ-বিরোধী। জার্মানিকে একত্রে দমন করার আলাপ আলোচনা আবার চলল; কিন্তু বৃটিশ উচ্চ সম্প্রদায়ের রাশিয়ার সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার অনিচ্ছায় তা পঙ্গু হয়ে গেল। তাদের প্রধান ভীতি হল সমাজ-বিপ্লব, জার্মানি নয়।

মার্চ মাসে লিথুয়ানিয়ার বন্দর, মেমেল, জার্মান রাইখের সঙ্গে যুক্ত হয়। জাতি-সঙ্ঘ এবং অন্যান্য সকলকে একেবারে অগ্রাহ্য করে এবং সকলের চিরাচরিত

প্রতিবাদের মধ্যে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ইটালি হঠাৎ আলবানিয়া দখল করে নিল এবং জাতি-সঙ্ঘে আর একটি শূন্য স্থান দেখা দিল। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লিটভিনভ বরাবরই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী রাজগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সুস্পষ্ট ও সুসমঞ্জস ভাব দেখিয়ে এসেছেন, এবং একবার শেষ সাবধানতা জানিয়ে পদত্যাগ করলেন। বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী তিনি আড়ালে রয়ে গেলেন; এবং তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হলেন মিঃ মলোটভ; তাঁর পূর্ববর্তী ব্যক্তির মত তিনি অতটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ছিলেন না। লিটভিনভের এই ব্যবহার বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তরে একটি আঁচড়ও কাটল না, এবং বাস্তবিকই রুশ-বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়ার কোন ঘটনা যদি না দেখে থাকা যায় তো তারা কখনও দেখবার চেষ্টা করে নি। রাশিয়া লোপ পাক—এই তাদের সহজ ও সত্যকার কাম্য ছিল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, ২৪শে অগস্ট, বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তর পোল্যাণ্ডের সঙ্গে পরস্পর-সাহায্যের চুক্তি-পত্র সই করে। এর আগেই জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণাত্মক সন্ধি হয়ে গেছিল। জার্মান পররাষ্ট্র-মন্ত্রী, রিবেনট্রপ, রাশিয়ায় গিয়ে স্ট্যালিন ও মলোটভকে বৃটিশের দ্বি-মুখী (double dealing) নীতি সম্বন্ধে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাগে এবং ন্যায়সঙ্গত সন্দেহে রাশিয়া গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, এবং যে ধাপ্পার বলে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের প্রভাবশালী মহলে নাৎসি-প্রীতি সঞ্চার করতে পেরেছিল, জার্মানি সেই কমিণ্টার্ন-বিরুদ্ধতার ভাণ একেবারে ত্যাগ করল। সে তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। জার্মানি পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড-সীমান্ত অতিক্রম করল এবং বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল ৩রা সেপ্টেম্বর। এইভাবে একদিন বৃটেনের নিদ্রিত 'ভাল লোকেরা' জেগে উঠে দেখল যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে সমর-সংগঠিত জাতির সঙ্গে তারা যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র অনেক অনেক দূরে। তবুও আরও ছয় মাস তারা নিরুদ্যম হয়েই রইল, কারণ তাদের ভুল জানানো হয়েছিল, সাবধান করা হয় নি; তারা অপ্রস্তুত ছিল, এবং তাদের বারবার মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করা হয়েছিল।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মান অভিযান সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত চমৎকার ছিল। বোধহয় বেশ কিছুটা পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ সেখানে হয়েছিল এবং সম্মিলিত আকাশ আক্রমণে পোল্যাণ্ডের বহু বিমান-বন্দরে বোমা ফেলে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। পোলিশ সৈন্যবাহিনী সুতীব্র সংগ্রাম করে ও জার্মান ট্যাঙ্কের অনুপ্রবেশে ও তাদের অত্যন্ত অধিক পরিমাণের অস্ত্রসম্ভারের জন্য পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং জার্মান হাই কম্যাণ্ড ঘোষণা করেন (১২ই সেপ্টেম্বর) যে অরক্ষিত শহর,

গ্রাম ইত্যাদি 'পোলিশ অসামরিক জনসাধারণদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্য' বোমা ও কামান বর্ষণে ধ্বংস করা হবে। পোলিশ জনসাধারণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পোলিশ সৈন্যেরা পিছু হঠে লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গারি ও রুমানিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। গভর্ণমেণ্ট পালিয়ে গিয়ে রুমানিয়ায় আশ্রয় নেয় এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর ওয়ারস-র পতন হয়।

পোল্যাণ্ডের অবস্থা খুব সঙিন দেখে ১৬ই সেপ্টেম্বর রাশিয়া একরকম বিনা বাধায় পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম করে। ১৯১৮ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কার্জন চুক্তির ফলে যতটুকু সীমান্ত তাদের অধিকারে ছিল, ততটুকু পর্যন্ত এসেই তারা ক্ষান্ত হল, এবং যে ছোট রাজ্যখণ্ড তারা দখল করল তাতে সত্যকার পোলিশ বাসিন্দা ছিল না বললেই চলে। জাতিসঙ্ঘের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে লিথুয়ানিয়ার কাছ থেকে যে ভিলনা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা আবার পূর্বের মালিককে প্রত্যর্পণ করা হল। রাশিয়া এর পর তিনটি বাল্টিক শক্তির সঙ্গে সন্ধি করল (আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, বৃটেন ও ফ্রান্স এদের নিরাপত্তার সম্মিলিত দায় নিতে অস্বীকার করেছিল) এবং এর ফলে তাদের আকাশ ও উপকূলের প্রতিরক্ষার কার্যকরী তত্ত্বাবধান রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অধীনে চলে গেল। এই পরিস্থিতির সুযোগে রাশিয়া যে বাল্টিক উপকূলের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল, এইটাই স্পষ্ট বোঝা গেল। 'পুঁজিবাদী' রাজ্যগুলির সমবেত আক্রমণের ভয় তার বরাবর ছিল এবং ফিনল্যাণ্ড এই আক্রমণের নেতৃত্ব করতে পারে এমন সন্দেহের কিছুটা কারণও তার ছিল। তাদের এতটা ভয়ের অবশ্য হয়ত কারণ ছিল না। ফিনল্যাণ্ডের কামান পিটার্সবুর্গের পথের উপর এতখানি খবরদারি করছিল যে আর কোন জাত তা সহ্য করত না। শক্তিশালী বিদেশী জাতি যদি এসে স্ট্যাটেন দ্বীপ দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত করে তুলত, তবে আমেরিকাও তা নীরবে সহ্য করত বলে ধারণা করা অসম্ভব। প্রচুর আলাপ-আলোচনাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না, এবং ৩০শে নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের কয়েকটি শহরের উপর বোমা বর্ষণ করে যুদ্ধ শুরু করল। এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা থেকে রাশিয়া বিরত হলেও পারত। এই যুদ্ধ সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে সবিশেষ কঠিন ও ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিন মাস আশ্চর্য সুন্দর যুদ্ধের পর ফিনল্যাণ্ড পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি করল।

এদিকে পশ্চিম দিকে যুদ্ধ প্রধানত সমুদ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। অত্যন্ত সুরক্ষিত ম্যাজিনো ও সিগফ্রিড লাইনের আড়ালে ফরাসী ও জার্মানরা পরস্পরের সম্মুখীন হল। যুদ্ধ-সীমান্তের উত্তর দিকে সামান্য আক্রমণ চলল।

জার্মানির নতুন করে ইউ-বোট যুদ্ধ একেবারে ব্যর্থ হয়। নতুন ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বৃটিশ নৌবাহিনী অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে এই সব উৎপাত উৎখাত করে এবং মাত্র কয়েকটি জাহাজ হারায়—একটা বুঝি যুদ্ধ-জাহাজ, 'কারেজাস' নামে একটা বড় বিমানবাহী জাহাজ এবং ছোটখাট কয়েকটা জাহাজ। কনভয়-করা জাহাজের ক্ষতির সংখ্যা আশাতীত কম ছিল, এবং প্রচুর রণসম্ভার বৃটেনে আসতে শুরু করল। বৃটিশ যত না হারিয়েছে, তার চেয়ে বেশি জাহাজ অধিকার করেছে। তিনটি ছোট ও দুর্বল জাহাজ, 'এক্সিটার', 'অ্যাকিলিস' ও 'অ্যাজাক্স', 'গ্রাফ স্পী' জাহাজটিকে অবরোধ করে কোনঠাসা করে। শেষ পর্যন্ত 'গ্রাফ স্পী' যুদ্ধ করার চেয়ে স্বেচ্ছায় জল-নিমজ্জন বেছে নেয়। তার ক্যাপ্টেন আত্মহত্যা করেন।

পশ্চিম যুদ্ধ-সীমান্তে প্রায় ছয়মাস ধরে উৎকণ্ঠাময় পরিস্থিতি ছিল। বৃটিশের প্রস্তুতির উদ্যমও বাড়তে লাগল এবং দিন দিন অনেক সৈন্য, কামান ও অন্যান্য রণসম্ভার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে লাগল।

এই বিরতির সময় কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের ধরপাকড় ও তাদের উপর চরম অত্যাচারের জন্য ফরাসীদের ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হয়। এই অত্যাচার যে শুধু কম্যুনিস্টদের উপর নিবদ্ধ ছিল তা নয়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও এর থেকে বাদ যান নি। আইন-সভার প্রায় পঞ্চাশ জন কম্যুনিস্ট ডেপুটিকে হয় গ্রেপ্তার করা হয় নয় তাঁরা আত্মগোপন করেন, এবং দেশের সমস্ত কম্যুনিস্ট পৌরসভার পরিবর্তে বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয়। বামপন্থী সমাজতন্ত্রী ভাব, কি শহরবাসী কি চাষী, সমস্ত ফরাসীদের মধ্যেই অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ছাপ দিয়ে গেছিল, সুতরাং এ-ধরনের কাজ সরকারের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নি। তাদের অনেকের কাছে রাশিয়াই ছিল সমাজ-বিপ্লবের প্রতীক। তারা ধনিকের ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করছে কি না প্রশ্ন করতে শুরু করল, এবং অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ শুধু যে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল তা নয়, অস্ত্র-নির্মাণ কারখানাতেও ছড়িয়ে গড়ল। আক্রমণকারীরা আর-একবারের মত প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাধারণ মানুষের বিপ্লবাদর্শের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। কেন না, দালা-দিয়েরের ডান দিকে আরো অনেক ভয়ঙ্কর, অসন্দিগ্ধ ও নির্বাধ স্বদেশদ্রোহিতাও জমাট হচ্ছিল।

সে বছর শীতকালে অসাধারণ ঠাণ্ডা পড়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়েছিল এবং সমগ্র ইউরোপে ফসলের পরিস্থিতি সাধারণ সময়ের তুলনায় খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নরওয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি

পড়ল। এই দেশের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সকলের মনে সন্দেহ জাগল। রাজা হাকন অত্যন্ত বেশি বৃটিশ-অনুরক্ত ছিলেন এবং জনসাধারণ ছিল গণতন্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ মিত্র শক্তিবর্গ বুঝতে পারল যে নরওয়ের উপকূলের তিন মাইলের সীমারেখাটি জার্মান জাহাজগুলি বৃটিশদের আক্রমণ করার সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য গোপনে ব্যবহার করছে। অ্যাল্টমার্ক ঘটনা নিয়ে ব্যাপারটি চরম সীমায় ওঠে। নিজে ধ্বংস হওয়ার আগে 'অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী' জাহাজটি যত জাহাজ ডুবিয়েছিল, তার তিনশো থেকে চারশোর মত নাবিককে নরওয়ের বন্দর-কর্তাদের সহযোগিতায় জার্মানরা এই উপকূলবর্তী সীমারেখার মধ্য দিয়ে পাচার করছিল। একটা বৃটিশ ডেস্ট্রয়ারকে তাদের সন্ধানে পাঠানো হল, এবং নরওয়ের দুটি গানবোটের প্রতিবাদ এবং জাহাজে কোন বন্দী আছে এ-কথা অস্বীকার করা সত্ত্বেও ডেস্ট্রয়ারটি যোসিং প্রণালীতে প্রবেশ করে এই গণ্ডগোলে চড়ায় আটকে-যাওয়া অপরাধী জাহাজ থেকে বন্দীদের মুক্ত করে।

এর পরেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। জার্মানরা একই সঙ্গে নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করল। ডেনমার্ক সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করল। অসলো প্রতিরোধ করল, কিন্তু তার ফ্যাসিস্ট-পন্থী জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতকতা করল। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিশৃঙ্খল সংগ্রাম চলল। ৯ই এপ্রিল জার্মানির নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ শুরু হয়। ৮ই মে বৃটিশ হাউস অব কমন্স এই নিদারুণ পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান-সভা বসিয়েছিল। নিচে মিঃ লয়েড জর্জের এক বক্তৃতা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল :

'১৯১৪ খৃষ্টাব্দের তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে আজ হিটলার তাঁর দেশকে সামরিক দিক দিয়ে অনেক ভাল পরিস্থিতিকে নিয়ে গেছেন। সামরিক পরিস্থিতির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, নরওয়ে ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, জার্মানদের হাতে। যার ডাইনে জার্মানি বামে জার্মানি, সেই সুইডেনের সমালোচনা করে কোন লাভ নেই। ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সমালোচনা করার আমাদের কী অধিকার আছে? তাদের বিপন্মুক্ত ও রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা আমরা করেছিলাম। পোল্যাণ্ডে আমরা একটাও এরোপ্লেন পাঠাইনি, নরওয়ের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত দেরি করেছি। আমাদের মর্যাদাহানির সম্বন্ধে আজ আর কারুর কি কোন সন্দেহ আছে? চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করতেও আমরা প্রতিশ্রুত। আজ বাজারে আমাদের প্রতিশ্রুতি-পত্রগুলি (Promissory notes) নেহাতই বাজে কাগজের সামিল।……

'১৯৩৫ সালে পুনরস্ত্রসজ্জার প্রতিশ্রুতি আমরা লাভ করেছিলাম, এবং ১৯৩৬

সালে এই সভায় প্রকৃত প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়। প্রত্যেকেই জানে যে, যা কিছু করা হয়েছে তা হয়েছে বিনা আন্তরিকতায়, অকার্যকরীভাবে, বুদ্ধিহীনতা ও অনিচ্ছা দিয়ে। তারপর এল যুদ্ধ। কিন্তু অস্ত্রসজ্জার গতি সামান্যও বাড়ানো হয় নি। সেই একই অকর্মণ্যতা, একই ফাঁকিবাজি। পৃথিবীর সকলেই জানে যে সামরিক দিক দিয়ে আমরা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছি······

'মিঃ চেম্বারলেন বলেছিলেন, "আমি আমার বন্ধু লাভ করেছি।" প্রধান মন্ত্রীর বন্ধুরা কে, এটি আজ প্রশ্ন নয়। এটি তার চেয়েও বড় এক সমস্যা। প্রধান মন্ত্রীর মনে রাখা অবশ্যই দরকার যে আমাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে কি শান্তি ও কি যুদ্ধকালে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি বেকায়দায় পড়েছেন। তিনি আত্মত্যাগের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। দেশের নেতৃত্ব বলবৎ থাকলে জাতি তা করতে প্রস্তুত। আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে প্রধান মন্ত্রীর আজ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাবার সময় এসেছে, কেননা এই যুদ্ধে জয়লাভের ব্যাপারে তাঁর পদত্যাগের চেয়ে বড় আর কিছু সাহায্য হতে পারে না।'

বৃটেনে যখন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মিঃ চেম্বারলেনের দম-বন্ধ-করা মুখোস খোলার প্রয়াস চলছিল, জার্মানি তখন নির্মমভাবে গোয়েরিং গোয়েবলস ও হিটলার—এই ভয়ঙ্কর ত্রিমূর্তির আওতায় এসে পড়েছিল। ১০ই মে জার্মানি একসঙ্গে হল্যাণ্ড বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করায় ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের ক্ষীণ সামরিক বিজ্ঞানের উপর আর এক আঘাত পড়ল।

পরবর্তী যুগের ইতিহাসের ছাত্রের কাছে—যদি পরবর্তী যুগেও ইতিহাসের ছাত্র বলে কিছু থাকে—এটাই খুব আশ্চর্যের মনে হবে যে, আক্রমণ-আশঙ্কার প্রবল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই তিনটি দেশের একটিও ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে যুক্তভাবে কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থার চেষ্টা করে নি। তাদের বিপর্যয়ের মূলে সেই স্বদেশদ্রোহিতা, সেই অনান্তরিক চেষ্টাই কাজ করেছিল। ফরাসীরা তাদের ম্যাজিনো লাইন বেলজিয়াম সীমান্তের দিকে আর প্রসারিত করে নি, এবং উন্মুক্ত বামপ্রান্তে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। দেশ-প্রেমিক ওলন্দাজ (ডাচ) ও বেলজিয়ানরা দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করল বটে, কিন্তু দেশের ভিতরে স্বদেশদ্রোহিতা ও প্যারাসুট-বাহিনী সমস্যা চিন্তা করার জন্য মিত্রশক্তি পাঁচ-ছয় বছর সময় পাওয়া সত্ত্বেও সমর-নায়করা এজন্য একেবারে অপ্রস্তুত ছিল। রটারড্যামের অধিকংশ অঞ্চলেরই গুয়েনিকার দশা হল, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অসংখ্য নরনারী চাপা পড়ল, এবং চারদিনের মধ্যেই সমস্ত ওলন্দাজ প্রতিরোধ-শক্তি ভেঙে পড়ল।

মিত্রশক্তির সঙ্কুচিত যুদ্ধ-সীমান্তে জার্মানদের চাপ বাড়তে লাগল। তাদের হাতে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ছিল সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক। সেডানের কাছাকাছি ফরাসী ব্যূহ ভাঙতে শুরু করল, এবং তারা যে ফাঁকটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তাই ধরে জার্মানরা পূবদিকে আক্রমণ চালাতে লাগল। বাঁ দিকে প্যারিসকে ছেড়ে দিয়ে তারা ইংলিস চ্যানেল ও ইংল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হল। মিত্রশক্তি এই ফাঁক পূর্ণ করতে না পারায় উত্তরাংশে এক বিরাট ইঙ্গ-ফরাসী-বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের প্রধান প্রতিরোধ-কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের বন্দিত্বও আশু ঘনিয়ে এল। উত্তরাংশের এই বাহিনীর বিরাট এক অংশ ছিল বৃটিশ; তার অপচয়ে বৃটেন অরক্ষিত হয়ে পড়বে। নিজের দেশ আক্রান্ত হওয়ার সময় যে রাজা লিওপোল্ড ফ্রান্স ও বৃটেনের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন সেই তিনি হঠাৎ তখন এক অত্যন্ত কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজের প্রশস্ত সময় পেয়ে গেলেন। মিত্রশক্তিকে কিছুমাত্র সংবাদ না দিয়ে, তাঁর গভর্ণমেণ্টের সর্বসম্মত মত অগ্রাহ্য করে, তাঁর বেদনার্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য তাঁর দেশের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল তাদের কথা একটিবারও না ভেবে, তিনি জার্মানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রসংবরণ করতে আদেশ দেন (২৮শে মে)।

বৃটিশ সৈন্যবাহিনী প্রায় ধরা পড়ে গেছিল; কিন্তু তাদের সাধারণ সৈন্যের অপূর্ব গুণ তাদের আত্মসমর্পণের হাত থেকে রক্ষা করে। তারা লড়াই করে ডাঙ্কার্কের দিকে এগিয়ে যায়, কয়েকটি পরীক্ষা-কঠোর দিন তারা ডাঙ্কার্ক অবরোধ করে রাখে, এবং জার্মানী শক্তির বিরাট চাপ সত্ত্বেও ফরাসী ও স্বদেশভক্ত বেলজিয়ান বাহিনী-সমেত তাদের চ্যানেল অতিক্রম করিয়ে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সৈন্যবাহিনীর কর্তব্য-নিষ্ঠা এত চমৎকার ছিল, এবং এই বিরাট দলকে জাহাজে পার করাতে এমন সাহসিকতার দৃষ্টান্ত দেখা গেছিল যে, বৃটিশ জনসাধারণ হতাশ না হয়ে বরং অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিল। মিঃ চেম্বারলেনের পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শেষ পর্যন্ত মিঃ উইনস্টন চার্চিল বললেন, 'সফল পশ্চাদপসরণ জয়লাভ নয়।' প্রচুর কামান ও অন্যান্য রণ-সম্ভার ফেলে আসতে হয়েছিল এবং ফরাসীদের প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থারও ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল।

মুসোলিনির এখন যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় এল, এবং তা তিনি ১০ই জুন করলেন। আল্পস সীমান্তে ইটালির সৈন্য-বাহিনী কুচকাওয়াজ করতে লাগল, এবং ফরাসী রাজ্যের মধ্যে ডিউসের ফোটো তোলা হল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী নিদারুণভাবে বিধ্বস্ত হল। প্যারিস পরিত্যাগ করে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বোর্দোয়

স্থানান্তরিত হল। ১৩ই জুন একবার শেষবারের মত মরিয়া হয়ে মঁসিয়ে রেনো সাহায্যের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি বললেন, 'ফ্রান্সের জীবন নিয়ে' এই সংগ্রাম। প্রেসিডেণ্টের উত্তর এল অতি সত্বর গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং জিনিস-পত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। শেষে দ্ব্যর্থক উক্তি দিয়ে তিনি শেষ করলেন : 'এই বক্তব্যের মধ্যে যে কোনরকম সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নেই, আমি জানি তা আপনারা বুঝতে পারবেন। এ-ধরনের প্রতিশ্রুতি শুধু কংগ্রেসই দিতে পারে।'

এর পর মসিয়েঁ রেনো পদত্যাগ করলেন, তাঁর পরিবর্তে প্রধান মন্ত্রী হলেন বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হলেন আরো বৃদ্ধ মার্শাল ওয়েগাঁ। এই নতুন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এর পর অত্যন্ত সুচারু রূপে তাঁদের দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে লাগলেন। শেষ মুহূর্তে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের সঙ্গে একটা অ্যাক্ট অব ইউনিয়নের প্রস্তাব করলেন। বৃটেন ও ফ্রান্স পৃথক কোন সন্ধি না করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল—কিন্তু এ-কথা সেদিন ভুলে যাওয়া হল, এবং আর-একবার বৃটেনকে ফ্রান্স থেকে তার বিপদগ্রস্ত সৈন্যদের অপসারণের ব্যবস্থা করতে হল। বিজয়ী জার্মান সৈন্যবাহিনী সমস্ত ফ্রান্স ও চ্যানেলের দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল এবং ১০৬৬ সাল থেকে ডাচি অব নর্ম্যাণ্ডির জমিদারির ছোট্ট এক টুকরো, যা আজ পর্যন্ত বৃটিশদের অধিকারে ছিল, তা সেদিন বৃটিশদের বিস্মিত করে জার্মানদের করতলগত হল। এখন বৃটিশদের পক্ষে যুদ্ধ সত্যিই অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল এবং এক নতুন উদ্দীপনা ও শক্তির অগ্রদূত হয়ে মিঃ চার্চিল দাঁড়ালেন। ফ্রান্সের বন্দর, ও তার চেয়েও বেশি ফরাসী নৌবাহিনী যে ত্রাসের সঞ্চার করল, তাদের সঙ্গে ছেলেখেলা চলে না। কতগুলি ফরাসী জাহাজ স্বেচ্ছায় বৃটিশের দলে যোগ দিল এবং ফ্রান্সের পুনরধিকার সংগঠনের জন্য জেনারেল দ্য গলের অধীনে লণ্ডনে এক ফরাসী জাতীয় কমিটি গঠন করা হল। অ্যাডমির‍্যাল সমারভিল 'স্ট্রাসবুর্গ' ও 'ডাঙ্কার্ক' নামে দুটি যুদ্ধজাহাজ সমেত এক বিরুদ্ধাচারী সৈন্যদলকে ওরানের যুদ্ধে পরাজিত করে জাহাজদুটিকে নিমজ্জিত করেন। ইটালির নৌবাহিনীর সঙ্গে প্রথম বড় লড়াইয়ে পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত জাহাজ, ইটালির বিখ্যাত ক্রুজার 'বার্তোলোমিও কোলিওনি'কে অস্ট্রেলিয়ান ক্রুজার 'সিডনি' ডুবিয়ে দেয়। নিজেদের দ্বীপে, সমুদ্রে, আকাশে, এবং বিশেষ করে আকাশে, বৃটিশ ধাতু যেন এতদিনের অব্যবহারের জমাট ময়লা ঘসে তুলে নিজের পূর্ব দীপ্তি প্রকাশ করতে লাগল। এক অত্যন্ত চমৎকার হোম-গার্ড সৃষ্টি হল, নিদারুণ আশঙ্কার পরিবর্তে দুর্নিবার আশার সঞ্চার হল। বৃটিশ বিমান বাহিনীর

প্রাধান্য দিন দিন বাড়তে লাগল। এখন সমাজের সমস্ত স্তর থেকে, সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশ থেকে এবং সমস্ত মিত্রশক্তি থেকে পাইলট নেওয়া হতে লাগল, এবং তাদের গুণপণা আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখা গেল। যতই দিন যেতে লাগল ততই বৃটেন আক্রমণের কার্যকরী সম্ভাবনা দূরে সরে যেতে লাগল।

এবার দৃষ্টি গেল স্পেনের দিকে, তারপর ভূমধ্য-সাগরে, তারপর আবার পুবে। এটা দিন দিন পরিষ্কার হতে লাগল যে রাশিয়া তার নিজের ভবিষ্যৎ এ-রকম ভাবে কল্পনা করে নিয়েছে যা যেমন জার্মান-পক্ষীয়ও নয়, তেমনি বৃটিশ-শাসক-শ্রেণী-পক্ষীয়ও নয়। সে জার্মানির সঙ্গে তার সীমান্তে ও দানিয়ুব ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সৈন্যসমাবেশ করতে লাগল। রুমানিয়া ১৯১৮ সালে বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকো-ভিনার যে অঞ্চল নিয়ে নিয়েছিল, জার্মানি এখন অত্যন্ত জোর গলায় তা প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ জানাল, এবং জার্মানির কাছে ব্যর্থ আবেদন জানিয়ে শেষ পর্যন্ত রুমানিয়া তা ফেরৎ দিতে সম্মত হল। তারপর সে বাল্টিক রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের অদ্ভুত এক সামাজিক বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করে এবং ওই তিনটি রাজ্যই সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশ করে।......

এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেন্টের সুদূর নীতিজ্ঞান জেগে উঠল। নেভা মোহানার থেকে ফিনল্যাণ্ডকে বহিষ্কৃত করায় যত না আপত্তি উঠেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আপত্তি উঠল এই দেশগুলির বিলুপ্তিতে। আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট, মিঃ কর্ডেল হাল এই জোরজবরদস্তি অন্তর্ভুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ মলোটভ কম্যুনিস্ট আদর্শগত চিরাচরিত বাক্যে তার রূঢ় জবাব দিলেন। এই দুই বিরাট শক্তির শান্তিরক্ষায় সমান আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এবং অপরের সাহায্য ব্যতীত একের পক্ষে তা অসম্ভব জেনেও, তাদের মধ্যে ভাঙনের মুখ বেড়ে যেতে লাগল। অথচ কাল্পনিক এক বোঝাপড়ার অভাব ছাড়া তাদের ছাড়াছাড়ির কোন অর্থই হয় না।

যদি বা ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটিশের সম্মিলিত রাজ্যগুলি তাদের সমস্ত সৈন্য একত্রিত করে রীতিমত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নীতি কিন্তু ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তার প্রচার-ব্যবস্থাও ছিল অসমর্থনীয়। গ্রেট বৃটেনে দিন দিন বেড়ে-ওঠা বাস্তুহারা ও বিদেশীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে সুইণ্টন কমিটি নামে এক রহস্যময় অর্ধ-গোপন সমিতি গঠিত হয়। এই কমিটির ধড়-মুণ্ড সবই ছিলেন জনৈক মিঃ লয়েড-গ্রীম, যিনি ১৯২৪ সালে কানলিফ-লিস্টার নাম গ্রহণ করেন এবং লর্ড সুইণ্টন নামে তাঁকে 'পিয়ার' করা হয়। ইউরোপে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেনের যাদের সহযোগিতা সবচেয়ে প্রয়োজন, তাদের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও

মর্মান্তিক নির্যাতন শুরু হল। তাদের সঙ্গে যে অযৌক্তিক শত্রুতা ও পাশবিক আচরণ করা হয়েছে, তা বৃটিশের সুনামে অপরিমার্জনীয় কলঙ্ক লেপন করেছে। ন্যাশনাল সোস্যালিজম ও ফ্যাসিজমের চির-বৈরীদের অত্যন্ত বিভীষিকার মধ্যে অন্তরীণ করে রাখা হল, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল ; অনেকে আত্মহত্যা করল। ক্যানিং, পামারস্টোন, মেলবোর্নের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী গ্রেট বৃটেনের নীতিই ছিল ইউরোপের প্রতিটি দেশের বৈপ্লবিক কার্যকে সমর্থন করা, আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করা। সে-ই দাস-ব্যবসা বিলুপ্ত করেছিল। বৃটিশের দম্ভ ছিল এই যে, যেখানেই বৃটিশ পতাকা উড্ডীন সেখানেই মানুষ স্বাধীন। এখন এক বেদনাভিভূত পৃথিবী এই প্রশ্নই তুলল, বৃটেন কি সে কথা আজ ভুলে গেছে? গণতন্ত্রের এই সমস্ত বাগাড়ম্বর কি ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়?

এই নির্যাতনের কুফল যুক্ত হল যুদ্ধের শুরু থেকেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণায় অস্বীকৃতির সঙ্গে। সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে পৃথিবীর সমস্ত উদারনৈতিক শক্তি বৃটিশকে তা ঘোষণা করতে অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু তবু যুদ্ধ-আবদ্ধ কঠিন-হৃদয় টোরিজমের শৃঙ্খল থেকে জাগ্রত বৃটিশ জনসাধারণ নিজেদের হাত মুক্ত করতে অপারগ হয়ে পড়েছিল···

এইভাবে দেশের ক্রমবর্ধমান সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে বৃটিশ যুদ্ধ চালিয়ে গেল। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে লণ্ডনের উপর সাঙ্ঘাতিক ও অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণে জনসাধারণের দৃঢ় সহ্যক্ষমতা দেখা গেল এবং বৃটিশ বিমানবাহিনীর দ্রুত উন্নতিও দেখা গেল। প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেণ্টের নেতৃত্বে আমেরিকার অভিমতও দিন-দিন বৃটিশ সমর-প্রয়াসের পক্ষে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে লাগল। বছর ঘুরতেই যুদ্ধের এক নতুন পরিস্থিতি দেখা গেল। মুসোলিনির সৈন্যবাহিনী মিশর ও সুয়েজ খালের দিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং বিজয় সম্বন্ধে তিনি এত বেশি আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছিলেন যে তিনি আলবানিয়া অধিকার করলেন (১৯৩৯) এবং গ্রীস আক্রমণ করলেন (১৯৪১)। প্রেসিডেণ্ট মেটাক্সাস গ্রীক সৈন্য-বাহিনীকে অত্যন্ত সুদক্ষ ও রণপারদর্শী করে তুলেছিলেন। জেনারেল ওয়াভেল নামে এক নতুন-দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত সেনাপতি বৃটেনে দেখা গেল এবং তিনি ইটালিয়ানদের এত দ্রুত ও এত জোরে উত্তর আফ্রিকা, এরিট্রিয়া ও আবিসিনিয়ায় আঘাত করলেন যে ঠিক ইটালিয়ানদের মত তাঁর স্বদেশবাসীরাও বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল। দশ সপ্তাহের মধ্যেই ফ্যাসিজমের বেলুন ফেঁসে গেল। সংখ্যায় অনেক কম কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সুসজ্জিত বৃটিশ কমনওয়েলথের উজ্জীবিত সৈন্যদল লোহিত সাগর থেকে সাইরেনাইকা পর্যন্ত ছড়ানো সমস্ত ইটালিয়ান সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত

ও বন্দী করল, ওদিকে বৃটিশ বিমানবাহিনীর সাহায্যে গ্রীকরা আলবানিয়ায় ইটালিয়ানদের বিধ্বস্ত করল। ঠিক এইরকম বুদ্ধিদীপ্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বে বৃটিশরা ১৯৪০ সালে মরওয়েতে নাৎসি আক্রমণ চূর্ণ করতে পারত। কিন্তু পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ মানুষের অনেক সৃজনী প্রয়াসই ইচ্ছায় বা অজ্ঞানকৃত আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যাহত হয়।

মানব-গোষ্ঠীর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী*

প্রজাতি হিসাবে মানুষ যে আজ উন্মত্ত, এ কথাকে কোনরকমেই বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলা চলে না এবং মানুষের আত্ম-প্রত্যয় পুনরুদ্ধারের মত এত প্রয়োজনীয় এখন আর কিছুই নেই। যখন কারুর কাজকর্ম ধ্যানধারণা তার পরিস্থিতির সঙ্গে এমন বেমানান ও বেখাপ্পা হয়ে ওঠে যে তাকে নিজের এবং অপরের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হয়, তাকেই আমরা উন্মাদ বলি। উন্মত্ততার এই সংজ্ঞার মধ্যে আজ মনুষ্যজাতির প্রত্যেকেই এসে পড়ে এবং আজ মানুষকে হয় আত্মস্থ হতে হবে, নয়ত ধ্বংস অনিবার্য। ধ্বংস, কিংবা পরিণততর শক্তি ও প্রয়াসের এক নতুন যুগে প্রবেশ। মাঝামাঝি আর কোন কিছু নেই। হয় উত্থান, নয় পতন। আজ যেখানে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আর তার থাকা সম্ভব নয়।

মানুষের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্তসারে আমরা মনুষ্য সমাজের স্থির অগ্রগতি বর্ণনা করে এসেছি। সুপ্রতিষ্ঠিত স্বদেশপ্রেম, অপ্রচলিত ধর্মানুরাগ, বিধিনিষেধ ও আচার ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, অনেক সময় বহু জীবন ও সুখের বিনিময়ে, সংযোগ ও পরিবহনের উন্নতি কেমন মানুষকে এক বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে বাধ্য করেছে, তা দেখেছি এবং, বিশেষ করে ২৩৮ থেকে ২৫৬ পাতায়, বিগত শতাব্দীতে স্বাধীন বিজ্ঞান-চিন্তা ও আবিষ্কার যে সুযোগ ও ভাঙন এনেছে,—তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্তমান সার্বভৌম শিক্ষার সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও আমাদের সম্পত্তির সনাতন পদ্ধতির জটিলতায় যে গুরুত্ব সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সে সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করেছি। জনসাধারণ আজ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সম্পত্তির এক বিশেষ আকার হয়েছে মুদ্রা কিংবা মুদ্রার প্রতিশ্রুতির মত তার চলিত অবস্থা (liquid form)। মহা-যুদ্ধের পর থেকেই মানুষের মনে আর্থিক সমস্যা অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থকে একটি জিনিস বা পদ্ধতি ধরে নেওয়ার ফলে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই ব্যর্থ হয়েছে, যদিও বস্তুত সম্পর্কগত জটিলতার এটি একটি অংশমাত্র, যার যে-কোন

*Homo Sapiens.

অংশের সামান্য পরিবর্তন সমস্তটুকুকেই রূপান্তরিত করে তোলে। যেমন, যখন অর্থের মূল্য-মান বাড়ে এবং জিনিসের দামও বাড়ে তখন উত্তমর্ণরা অর্থে বঞ্চিত হয়, এবং যখন অর্থের মূল্য-মান কমে তখন অধমর্ণের কাঁধে অনেক বেশি বোঝা চাপে। আপনি যা কিনছেন বা বিক্রি করছেন তার পরিবর্তনে অর্থের প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসতে পারে। একরকম যৌক্তিকতার সঙ্গে এই কথাটা ঘোষণা করা হয় যে, বে-সরকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রেডিট সৃষ্টিতে জোর করে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। ব্যবহারের সঙ্গে অর্থের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। শুধু এক প্রকারের অর্থ নেই, বহু প্রকারের অর্থ আছে। কম্যুনিজমের জন্য এক প্রকার অর্থ, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য আর-এক প্রকারের এবং মালিকানা পরিচালনা ও স্বাধীন কার্যকলাপের পদ্ধতির প্রতিটি সম্ভাব্য ধারার জন্য এক-এক প্রকারের অর্থ।

যথাযথ মানসিক শক্তি, সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে অর্থ ও ক্রেডিটের যন্ত্র দুঃসাহসী ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনের অবিরত বিশৃঙ্খলার উৎস হয়ে আছে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা দূর করার মত কোন জাদুবাক্য নেই। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে আজ পৃথিবীর কোন সাধারণ মানুষই কোথাও মুক্ত নয়।

মানুষের চলমান জীবন-পরিস্থিতির পরিবর্তনের গভীরতা ও প্রকৃত মান আমরা এখনই ঠিক বুঝতে পারছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্যমশীল ব্যক্তিরা সামান্যতম কৃতজ্ঞতা-বোধ না দেখিয়ে, কিংবা তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না পোষণ করেই বিজ্ঞান-দত্ত প্রাচুর্য ও শক্তির উপহার ছিনিয়ে নিয়েছিল। এখন তার বিল এসে পৌঁছচ্ছে। দূরত্বের মান এত পরিবর্তিত হয়েছে, প্রাপ্তব্য প্রাকৃতিক শক্তি এত বিশাল হয়ে উঠেছে যে বর্তমান রাজ্যগুলির পৃথক সত্তা একরকম অসম্ভব। তবুও জেদের বশে তা-ই আঁকড়ে ধরে আমরা ধ্বংসের পথে চলেছি। বাঁচতে হলে যে-কোন উপায়ে অর্থোন্মত্তদের বিতাড়িত করতেই হবে: যে-কোন রকমেই হোক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং এই মনুষ্যজাতির সাধারণ জীব-বিদ্যার বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণকে সংগঠিত করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে অনেক প্রতিষ্ঠিত জিনিসের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। বৃটিশের বিশ্ব-প্রাধান্যের অবসানের সম্ভাবনায় ইংরেজ পাঠক খুব বিচলিত হয়ে পড়বেন না। আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে তা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম এবং তার সম্যক ব্যবহার করতে পারি নি। আমরা কয়েকটি ভাল ও সদাশয় কাজ করলেও এত বেশি কিছু করিনি যাতে আমরা নেতৃত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে

পারি। ডিসরেইলি ও কিপলিংএর উদ্ভট নীতি বা নীচতায় আমরা যে সত্য কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারতাম না, আজ তুলনাত্মক দুর্দশার যুগে আমরা ইংরেজরা যেন সেই সত্যকে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হই; সেই সত্যটি এই যে, মানুষের আদর্শ নিয়ত পৃথিবী জুড়ে সাম্য ও ঐক্যের দিকে। প্রাধাণ্যের আদর্শ আজ ব্যর্থ, মর্যাদার আদর্শ অবিশ্বাস্য। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, বিশ্ব গণতন্ত্রে ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বে আজ আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, নয়ত সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ

মনের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা

॥ ১ ॥ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে পুস্তক প্রকাশকালীন সময়কার ঘটনাবলী

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জীবনের ইতিহাস ১৯৪০—৪১ সাল পর্যন্ত এনেছি এবং ঘটনার ক্রমানুগতির দিক দিয়ে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আর নেই। রাজনৈতিক চাপে কয়েকটি সংস্করণে কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছিল, এখন আবার তাদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আজ এই পুস্তকটি সমগ্রভাবে গ্রন্থকারের নামে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, এবং এবার আর এইরকম বাদ দেওয়ার কোন অজুহাত, কোনও অনুমতি দেওয়া চলবে না।

এই ইতিহাসে ঘঠনার কালানুক্রম অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণভাবে একত্রিত করা হলেও এই ঘটনাগুলির মুল্যের কিন্তু বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার আগে এই সময়ের ঘটনাবলীর পুনরালোচনা প্রয়োজন। অনেক ঘটনাই আজ পাঠকের মনে স্পষ্ট জেগে থাকায় এগুলিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

১৯৪০—৪১ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশ অপ্রস্তুত থাকায় হাতে সময় নিতে চাইছিল এবং একই সঙ্গে তার সম্ভাব্য মিত্রদের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে বসেছিল। হতভাগ্য ইহুদী ছাড়া যাদের উপরই আক্রমণ চালানো হতে পারে.হিটলার কৌশলে মিথ্যা কথায় তাদের সঙ্গে সন্ধি ও বোঝাপড়া করতে লাগলেন। সে সময়ে আমেরিকা তাঁর উচ্চাভিলাষের পাল্লার বাইরে ছিল। ইউরোপ-কেন্দ্রস্থ পৃথিবী জয়ই তাঁর তখন লক্ষ্য ছিল। মলোটভ, বুলগারিয়ার রাজা বরিস, ক্রীড়নক যুগোস্লোভ গভর্ণমেণ্টের এক প্রতিনিধি—প্রত্যেকেই চেম্বারলেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিটলারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গেলেন। কিছুদিন গ্রেট বৃটেনই একা এক প্রবল আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করল। কিন্তু মলোটভের সঙ্গে কথাবার্তার পর হিটলার রাশিয়া সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাশিয়া শক্তি সঞ্চয় করছিল। তার কাছ থেকেই ছিল সবচেয়ে আগে বিপদ আসবার সম্ভাবনা। বৃটেন প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু আক্রমণের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন।

রাশিয়াকে কাবু না করা পর্যন্ত বৃটেন আক্রমণ স্থগিত থাকতে পারে। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণে আমেরিকা একমত না-ও হতে পারে, কিন্তু বৃটেন আক্রমণের ফলে তাঁর আদি বাসভূমির সঙ্গে রুজভেল্ট এক সন্ধি করে বসতে পারেন। হয়ত ইংল্যাণ্ডে সহজেই সৈন্য নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু মোসলির দল ইত্যাদির সাহায্য সত্ত্বেও তাদের ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। জার্মানির থাবা এখানে সেখানে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অত্যন্ত বেশি ছড়ানো, এবং বৃটিশ জনসাধারণের দুর্দম বলে একটু সুনাম আছে। তারা হয়ত দশ লক্ষ লোক দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু তাঁর হাতে উদ্বৃত্ত হিসাবে এখন তার সিকি লোকও নেই। যুদ্ধবন্দীদের জন্য বৃটেন হয়ত বন্দী-শিবিরে পরিণত হবে, এবং শেষপর্যন্ত এই ভূমিকাতেই নাৎসিরা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিল।

হিটলারী বাহিনী বৃটিশ ফাঁদে পা দিল না বটে, কিন্তু লণ্ডনের অবিমিশ্র, অশিক্ষিত কিন্তু দৃঢ়মনা জনসাধারণের মনের জোর ভাঙবার জন্য তারা প্রবল আক্রমণ চালাল। 'বৃটেনের যুদ্ধ' নামে যা অভিহিত, তা এবার শুরু হল। এর ফলেই আকাশপথে বৃটিশের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য বোঝা যেতে লাগল। ১৯৪০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৮৬৭ শত্রুর বিমান ভূপাতিত করা হয়েছিল—বৃটিশের ক্ষতি হয়েছিল ৬২১টি বিমান—তার মধ্যে ৬০০র কিছু কম লোক মারা গেছিল এবং অবশিষ্টরা প্যারাস্যুট করে নেমে আবার যুদ্ধে যোগদান করেছিল। কিন্তু লণ্ডনের সাধারণ নাগরিকের প্রচুর ক্ষতি হয়; ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৪,০০০ নিহত এবং ২০,০০০ আহত হয়, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ এক লণ্ডনেই সংঘটিত হয়। গিল্ডহল চূর্ণ হয় এবং স্যর ক্রিস্টোফার রেনএর আটটা গির্জা নাৎসি 'কুলটুরকাম্ফ'এ বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কোনরকম ইচ্ছা প্রকাশ না করে আমেরিকাকে তখনও লাইনের ধারে বসে বৃটিশের প্রশংসনীয় যুদ্ধে হাততালি দিতে দেখে চার্চিল দেশের মুখপত্র হয়ে আমেরিকাকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আমাদের অস্ত্র দিন, তবেই আমরা কাজ শেষ করতে পারব।' অক্টোবর মাসে ইটালিয়ানরা ইংল্যাণ্ড ধ্বংসে অংশ-গ্রহণে আবেদন জানাল এবং এই সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য করতে লাগল।

কিন্তু ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর মানুষের বিরুদ্ধে নাৎসি ষড়যন্ত্রের চেয়েও সুদূরপ্রসারী, বুদ্ধিদীপ্ত ও গভীর এক ব্যাপার আত্মপ্রকাশ করে বৃটিশ ও আমেরিকাকে একেবারে বিড়ম্বিত করে তোলে। বহু বছর ধরে এশিয়ায় সুপরিকল্পিত ইউরোপীয়-বিরোধী প্রচার চালানো হতে থাকে, এবং এর কেন্দ্র হয় জাপানীদের উর্বর, কূট ও সংগ্রামী মস্তিষ্ক। পশ্চিমী মানুষের সেই সীমাবদ্ধ

ভাষা হিন্দুস্থানীতে এই প্রচার তেমন বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। ভারতবর্ষ থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রাচ্যের সমস্ত সংবাদপত্রে তার প্রকাশ পায়। সমস্ত চীন জুড়ে এই প্রচার ছড়িয়ে পড়ে, এবং সর্বত্রই নব-জাগ্রত এশীয় জগতের সর্বস্বীকৃত নেতা রূপে জাপান ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই জাপানই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভের জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট ছিল ও ইতিমধ্যেই হনলুলু ও ক্যালিফোর্নিয়ায় গুপ্তচর ও বিধ্বংসী প্রতিনিধি-সমেত প্রচুর আমেরিকা-ভাবাপন্ন জাপানী অধিবাসী ছিল, তারা তাদের জাতীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখায় পূর্ণব্রতী হয়েছিল। অন্যান্য ইউরোপীয়দের মতই জার্মানদের সম্বন্ধেও জাপানীদের অত্যন্ত হীন ধারণা ও মর্যাদা-বোধ ছিল, এবং এই ক্ষুদে পীত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে হিটলারেরও প্রথম প্রথম ঠিক একই রকমের হীন ধারণা ছিল।

ওয়াশিংটনে বসে জাপানী রাজনীতিবিদরা যখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর বহুদিন-লালিত পরিকল্পনা বিশ্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পার্ল হার্বারের নৌ-ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর চুপচাপ অলস ভঙ্গীতে পড়ে থাকার সময় জাপানীরা তার উপর অতর্কিত আক্রমণ করল। দুটি যুদ্ধ-জাহাজ, তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও আরো দুটি যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস হল এবং জাপান ঘোষণা করল যে তারা বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ও 'রিপাল্‌স' নামে যুদ্ধ-জাহাজদুটি বিমান-সাহায্য বঞ্চিত (!!) অবস্থায় জাপানীদের আকাশ থেকে ছোঁড়া টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হল। এই গুরুত্বপূর্ণ 'বিমান-সাহায্য-বঞ্চিত' কথাটি আমি আবার উল্লেখ করতে চাই। আজও পর্যন্ত আমরা জানি না যে, এই নিদারুণ অনবধানতার জন্য দায়ী কে!

॥ ২ ॥ প্রাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান

'মানব-গোষ্ঠীর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী' অধ্যায়টিতে এই ইতিহাস ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এসেছে। সেদিন থেকে এত সব বড় ঘটনা ঘটে গেছে যে মানুষের কাহিনীর সমাপ্তির কথা বুদ্ধিমান পরিদর্শকেরা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থায় মানব-গোষ্ঠীর দিনও ফুরিয়ে গেছে। গ্রহেরা এবার তার প্রতি বিরূপ এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান অন্ধকার নিয়তির সঙ্গে এখন যে প্রাণী ভাল যুঝতে পারবে, তাকেই আসন ছেড়ে দিতে হবে।

এই নতুন প্রাণী সম্পূর্ণ এক অজানা কিছু হতে পারে, কিংবা নব-রূপান্তরিত মনুষ্য-বীজের থেকে তার উৎপত্তি হতে পারে, এমনকি মনুষ্য-জীবনের সরাসর অবিচ্ছেদও হতে পারে; কিন্তু তা কখনই আর মানুষ হবে না। খাড়া-ওঠা

কিংবা খাড়া-পড়া ছাড়া মানুষের আর গত্যন্তর নেই। যেকোন দিনের মতই, হয় যোগ্যতা নয় ধ্বংস, এ-ই প্রকৃতির অনমনীয় আদেশ।

উত্থান অথবা পতনের এই বিকল্প আমাদের অনেকের কাছেই কটু লাগবে। যে শক্তি আমাদের সুদীর্ঘ কাল মানুষ হয়ে থাকার আস্বাদ দিয়েছে, তা সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জাহির করার এমন এক দৃঢ়তা দিয়ে গেছে যার ফলে ইঁদুর কিংবা অন্য কোন অপরিচ্ছন্ন অবাঞ্ছিত আগন্তুক ক্ষুদ্র জীব যে আমাদের ধ্বংস আনবে, তা আমরা সহ্য করতে পারি না। মানুষের মৃত্যুতেও আমরাই থাকতে চাই এবং ইডিপাসের মত আমাদের উত্তরসূরীর প্রথম কাজেই যদি মাতৃহত্যা বা পিতৃহত্যাও হয়, তবুও আমাদের পরিবর্তে পরবর্তী সৃষ্টি-দেবতার নতুন কোন সৃষ্টিতে আমরাও একটু অধিকার চাই।

এই গ্রহের সর্বত্রই মানুষের চিহ্ন ও কাজ ছড়িয়ে আছে, এবং মানুষের স্মৃতির এই বিস্তৃত বণ্টন যে বিগত লক্ষ বছরের প্রয়াস, একথা অনুধাবন করতে আমাদের অধিকাংশের অত্যন্ত বেশি মস্তিষ্ক সঞ্চালন করতে হয়। সৌরজগতে তেজস্ক্রিয় বস্তুর উৎপত্তি ও রেডিয়ামের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চয়ই প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছে এবং পৃথিবীতে জীবন আসার অনেক আগেই তা নিঃশেষ হয়েছে। কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির ডক্টর এল. এইচ. ফেদার বলেন :

'সমস্ত তেজস্ক্রিয় প্রজাতিকে "প্রাকৃতিক" এই কারণে বলা যায় যে, মহা-জাগতিক অভিব্যক্তির কোন এক সময়ে তার এই অবস্থা পাওয়া গেছিল এবং যেখানে তাদের উৎপত্তি সেই উত্তপ্ততর নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে হয়ত এখনও তা পাওয়া যায়—এবং পাওয়া হয়ত সম্ভব, কিন্তু সূর্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবীতে সে অবস্থা পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর অধিবাসী হিসাবে, আমরা বিচ্ছিন্নতার পর ত্রিশ লক্ষ বছর পরেও (৩×১০^{৯} বছর) আমাদের পৃথিবীতে যে-সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাদেরই শুধু "প্রাকৃতিক" বলি।'

এই ইতিহাসের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে ১৯৪০ সন পর্যন্ত জানা পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ডক্টর ফেদার সহজভাবে সময়ের যে সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, আমরা তখন সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ছিলাম না। এবং অন্য দিকেও এখন আমরা জীবনের প্রকৃতির বৈপ্লবিক রহস্যভেদের সম্মুখীন হয়ে পড়ছি। উপসংহারের এই অধ্যায়ে, যাকে কয়েকটি শিরোনামাভূষিত ছোট ছোট বিভাগে ভাগ করলে আমাদের সুবিধাই হবে, লেখক মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনের কাহিনী আবার ধরবেন এবং বুদ্ধিমান পরিদর্শকদের মনে যে নতুন রহস্য-লোক আলোকপাত করছে, তারই আলোয় তাকে নতুন

করে বলবেন। বস্তুত পূর্ব-কথিত কাহিনীই তিনি বলবেন, কিন্তু তা সুদূরবিস্তৃত চক্রবালের কাঠামোয় নতুন করে সাজানো হবে। এই সময়-কাঠামো স্থানের মত আমাদের মনের সংগঠনের এক চিন্তাধারা: আমরা এর মধ্যে চিন্তা করি, এর অনেক অলীক গুণ আছে বলে সন্দেহ করি, এবং আমরা সময়হীনতা বা অনন্ত-কালের কথা বলতে পারি। কিন্তু এগুলি একেবারে নেতিবাচক শব্দ, যার মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত বস্তুই নেই। আমাদের নিশ্চিত কল্পনা রেডিয়াম ঘড়ির প্রথম ঘণ্টার বাইরে যেতে পারে না।

তারপর ধীরে ধীরে এই গ্রহে অপরিচিত আগন্তুক, জীবের বাস সম্ভব হয়। কত জোরে, কিংবা কত দূর থেকে এই গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তা আমরা জানি না; এই গ্রহটি একটি উপগ্রহ, চন্দ্র, সংগ্রহ করে এবং এক বায়ু-স্ফীত তরঙ্গে তার গতি কমিয়ে তার মুখ জননী পৃথিবীর দিকে চিরকালের জন্য ফিরিয়ে রাখে। এইভাবে চান্দ্র মাসই চান্দ্র দিন। আমাদের এই গ্রহও হয়ত সূর্যের দিকে অনুরূপ এক মন্দনে অগ্রসর হচ্ছে; আজকের এই শেষের মন্থর দিনগুলির নিরিখে পৃথিবীতে জীবনের প্রথম দিকের আদি বর্ষ ও যুগগুলি সমস্ত রকম তুলনার বাইরে চলে গেছিল। যন্ত্র তখন অনেক দুর্বল ব্রেক নিয়ে ছুটে চলত। সেই অসম্ভব দ্রুততার যুগে, বাষ্পের ঘন মেঘের চন্দ্রাতপের আড়ালে শুরু হল এক ছন্দের অনুক্রম, যাকে আমরা বলি জীবন।

গভীর সমুদ্রের অন্ধকারে, নীরস স্থলভাগের কঠিন শুষ্কতায় কোন ছন্দোময় সম্ভাবনা ছিল না। অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন তাঁর অন্যতম এক অপূর্ব প্রবন্ধে যেমন লিখেছেন, এই ছন্দ শুধুমাত্র জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী বন্ধনীতেই পাওয়া যেত। অন্ধকারের পরে এল আলো, আলোর পরে অন্ধকার, এবং বস্তুর মধ্যের সেই আশ্চর্য স্পন্দন—জীবন শুরু হল। শিলালিপির স্বাক্ষর উদ্ধারে ব্রতী পৃথিবীর প্রাচীন জীবজন্তু-বিষয়ক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা সূর্য-কিরণের এই বাষ্পের অবগুণ্ঠন ভেদ করে জীবন-ছন্দ জাগানোর পূর্বেও অজ্ঞাত কালব্যাপী জীবনহীন যুগের সন্ধান পেয়েছেন।

এই অস্পষ্ট ছন্দের ফলাফল আজ পর্যন্তও অনিশ্চিত রয়ে গেছে। সেগুলি ছিল একেবারে আদিম, সুতরাং সমকালীন জীবনের ক্ষুদ্রতম কলা-উপাদানে কিংবা সমুদ্রের জলের উপরে তাদের নিকটতম উপমিতি পাওয়া যাবে। ডায়াটম বা তার মত কোন পদার্থের প্রচুর বিচ্ছুরণ হয়েছিল, এবং এই কাহিনীর একেবারে প্রথম দিকে কতগুলি অনুকূল পরিবর্তনের ফলে ক্লোরোফিল নামে একপ্রকার সবুজ পদার্থের উৎপত্তি হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত আলো থাকত এই পদার্থটি সূর্যকিরণে প্রায়

চিরস্থায়ী যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করত। এইভাবে পাষাণের ইতিহাস একেবারে হঠাৎ-জীবনহীনতা থেকে বিভিন্ন অন্তর্তরঙ্গ জীবন-আকৃতিতে এসে পড়ল।

এই জীবন-আকৃতিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি সাধারণ প্রবণতা সুস্পষ্ট ছিল—নিজেদের সত্তাকে জাহির করা। জীবনের ইতিহাসের মৌলিক বিষয়, সেই জীবন-সংগ্রাম, তারই স্থূল আরম্ভ তাদের মধ্যে দেখা যায়। একেবারে শুরুতেই এই জীবন্ত জিনিসগুলি স্বতন্ত্র টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে এক-এক পরিবেশে গিয়ে পড়ে, এবং এক জায়গায় যদি কোনটি নষ্ট হয়ে যায় তো অপর জায়গায় আর-একটি রক্ষা পেয়ে যায়। এই স্বতন্ত্র বস্তুগুলির মধ্যে তাদের ভোজ্য কিংবা পরস্পরের প্রতি কোনরকম বিরোধের আবেগ আছে বলে মনে হয় না। দেখা হলে একত্রে ভেসে বেড়াবে, এবং এই সাক্ষাতে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার ভেঙে যাবে। লিঙ্গভেদ-লক্ষণ ব্যতিরেকেই এই পুনরুজ্জীবন আসে। সমানে সমানে এই ব্যাপার।

॥ ৩ ॥ পরিবারের উদয়

এক দল দুঃসাহসিক কাজ পরীক্ষা ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে এবং অপর দল চিরন্তন এই প্রজাতিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে—জীবনের ইতিহাসের অত্যন্ত প্রথম দিকেই স্বতন্ত্র বস্তুগুলির মধ্যে এই পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রহের বহু-কোষী জীবের অধিকাংশেরই উর্বর ডিম্বাম্বু হয়েই শুরু ও শেষ। কেউ প্রস্ফুটিত হয়ে ভেঙে যায়, কেউ বা ছড়িয়ে পড়ে অপুংজনি বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থায়; কিন্তু এ ধরনের জনন-প্রক্রিয়ায় প্রজাতি স্থির অগ্রহণীয় ও ভেস্ত থাকে, এবং শীঘ্র কিংবা দেরিতে, বাঁচতেই যদি হয়, প্রত্নজীববিদ্যার নিদর্শনের প্রাথমিক অধ্যায়ে বর্তমান রূপে প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী ও পুরুষ ভূমিকার ব্যতিক্রম ও বলাধানে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে।

জীবনের পরিবর্তনশীল নীতিতে, এমনকি একই প্রজাতির লিঙ্গ-প্রকারভেদে অত্যন্ত বেশি অনিশ্চয়তা দেখা যায়। উন্মুক্ত বনে জঙ্গলে বাঘ কিংবা বাঘিনীকে দেখলে সেটি স্ত্রী না পুরুষ বিবেচনা করে দেখার জন্য আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই দাঁড়িয়ে থাকবেন, এবং চলমান কোন বেড়াল খরগোস সজারু দলবদ্ধ শিকারানুসন্ধানী কোন নেকড়ে মাছি কিংবা টিকটিকির লিঙ্গ কোনরকমেই স্পষ্ট নয়।

এমনকি একশো বছর আগের চেয়ে আজ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যেও লিঙ্গভেদের লক্ষণের সুস্পষ্টতা কমে এসেছে। সজোরে কোমরে লেস বেঁধে কোমরকে অত্যন্ত সরু দেখানোর প্রথা আজ আর নেই। মেয়েদের উপর চাপানো

এরকম অনেক অদ্ভুত বিধিনিষেধও বন্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য বাইসাইকেল বেশি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। যখন পিতামহী হয়ত শয্যায় আরাম করছেন এবং তা-ই তাঁর কাছে সবচেয়ে আনন্দকর মনে হচ্ছে, তখন তরুণী নাতনি স্থিরসঙ্কল্প হয়ে এই নতুন খেলনায় একটু চড়তে গেল। কোন এক বিপদে আমাদের প্রপিতামহী মূর্ছা যেতেন, কিন্তু আজকালকার মেয়েরা মূর্ছা যায়, এ কথা কে শুনেছে? আজকাল মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই মূর্ছা যায় বেশি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে, কোন এক বয়স্ক লোকের জীবনকালের মধ্যেই, বৃটিশ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, বিবাহে বয়সের ভেদ এবং এইসব পরিবর্তনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থা, সব কিছুরই অত্যন্ত বেশি পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে বয়স্ক পুরুষ যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করত; এখন অল্প-বয়সের দম্পতিতে পৃথিবী পূর্ণ এবং এখন যৌবনোচ্ছল মে-র সঙ্গে শীত-শুষ্ক জানুয়ারির বিবাহ এক অসাধারণ ঘটনা। আমরা ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলার জন্য অপেক্ষা করছি না। সতর্ক-পরিকল্পিত আইন, খাদ্যাভাব ও এ-ধরনের অর্থনৈতিক কারণ, মাতৃত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মনোভাব, দেশাত্মবোধ বা তার অভাব, স্থায়ী সাধারণ স্বার্থবদ্ধ কোন সম্পর্ক গঠনের অভিলাষে প্রেমে পড়ার স্বাভাবিক প্রবণতা,দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যবান সন্তান-সন্ততির গর্ব নতুন মানবিকতা রচনায় এমন অমূল্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, যা আমাদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান অনুজ্ঞাগুলিকে সহজে আত্মস্থ করে পৃথিবীতে জীবনের কাহিনীর শেষ দেখে যেতে পারে।

সাধারণত ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশেষ করে রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা এই দাবি করে যে তারাই পারিবারিক বিধি রক্ষা করে। এ-ধরনের কিছুই তারা করে না। জন্তুরা যেদিন সঙ্গী গ্রহণ করেছে এবং সন্তানের জন্ম দিতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই পরিবার চলে আসছে এবং তারাই তাদের শাবকদের লালন-পালন ও রক্ষা করে আসছে। কিন্তু পাপের মধ্যে তারা গর্ভে এসেছে বলে অজাত শিশুদের অভিশাপ দিয়ে, অবৈধ জন্মকে রহস্যজনক ও লজ্জাকর করে, এবং পারিবারিক জীবনের আদি তথ্য ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্ঞানের সব উপকারিতা যতক্ষণে ফুরিয়ে না যায় ততক্ষণ এ সমস্ত ছোটদের কাছে গোপন রেখে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ এই সহজ ও সুস্পষ্ট সম্পর্ককে নিচে নামিয়ে এনেছে।

॥ ৪ ॥ আসুরিকতায় জাতির আত্মহত্যা

চারপাশের প্রাণীদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বলা যায়, মানুষ খুব বেশি দিন বাঁচে। রেডিয়াম ঘড়ির হিসাবে জীবনের কাল সবচেয়ে বেশি হলে দশ, এবং হয়ত পাঁচ হাজার কোটিরও অনেক কম পার্থিব বছর। এই

সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশ জুড়ে জীবন-আকৃতির অবিরত ধারা বয়ে এসেছে। প্রত্যেকটিই প্রভুত্ব করেছে, এবং প্রত্যেকটিকে আবার একপাশে সরিয়ে দিয়ে এক নতুন আকৃতি এসে প্রভুত্ব করেছে। প্রত্যেকটিই বস্তুর প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অলঙ্ঘনীয় নিয়মগুলি মেনে চলেছে।

এই নিয়মগুলির প্রথম ছিল সুস্পষ্ট আক্রমণ। আদেশ ছিল বাঁচা, যতদূর সম্ভব অজস্রতায় বেঁচে থাকা। তোমার ভাইদের চেয়ে বেশি বাঁচো, বড় হও, বেশি খাও। প্রথম যুগে সাধারণ প্রতিযোগিকে কোনরকম সাহায্য করার বাসনা এই আদেশ-মতে নিষিদ্ধ ছিল। বড় বড় জন্তুরা, ছোটদের ঠিক না খেয়ে ফেললেও তাদের খাবার খেয়ে ফেলে দিন দিন বড় হতে লাগল। পাষাণের ইতিহাসে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সর্বদা আসুরিক জীবেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রহ ঘোরে, জলবায়ুর পরিবর্তন হয়; এইভাবে সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় এই অতি বৃদ্ধ তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আর মানিয়ে চলতে পারে না। তাকে যেতেই হবে। সব সময়ে না হলেও, সাধারণত তার পরিবর্তে আসে একেবারে এক নতুন ধরনের জীবন-আকৃতি। কিংবা হাঙরদের মত তার সংখ্যা হয়ত কমতে শুরু করে যতদিন না তার খাদ্যের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, এবং ইতিমধ্যে প্রকৃতি যদি অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তবে হয়ত সে তার পূর্ব প্রাচুর্যে ফিরে আসে। হাঙর ও ওইরকম প্রাণী বাঁচে ও মরে অত্যন্ত হিংস্রতার মধ্যে এবং শিলীভূত হওয়ার মত তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সম্প্রতি আমরা অত্যন্ত বিরাটকায় হাঙর বা ওই জাতীয় কিছু দেখেছি। যখন তারা খাওয়ার মত প্রচুর মাছ পেয়েছে, তখন থেকেই তারা বাড়তে শুরু করেছে—এটা সাম্প্রতিকও হতে পারে, এমনকি যুগ যুগ ধরেও হতে পারে। এ-বিষয়ে সঠিক প্রমাণ কিছু নেই।

॥ ৫ ॥ অকাল-পক্বতা : জীবন-ধারনের প্রক্রিয়া

জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে অবোধ খেলায় প্রকৃতি জীবন-চক্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর উর্বরতা বা পক্বতা ত্বরান্বিত করে তার দলিলে এক নূতনত্ব এনে দিয়েছে। এইসব ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কয়েকটি নির্দিষ্ট-বয়স্ক জীবন-আকৃতির নয়, আমরা একটি সম্পূর্ণ জীবন-চক্রের উত্তরাধিকারসূত্রে আসি। এবং বার বার প্রকৃতি এক-একটি পূর্ণবয়স্ক জীবন-আকৃতিকে ছিন্ন করে, তার নিদর্শন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে কৃমিময় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাকে যৌন-সম্পর্কীয় পূর্ণতা দান করেছে।

এরই এক আদি যুগে উজ্জ্বল-দেহময় একিনোডার্ম, স্টারফিশ ইত্যাদি সৃষ্টির শীর্ষ-

স্থানীয় ছিল। পূর্ণবয়স্ক কালে তাদের কোন নড়বার শক্তি ছিল না এবং ক্রাইনয়েডের মত অনেকেই পাথরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। উজ্জল-দেহবিশিষ্টদের মধ্যে অন্যতম, টিউনিকাটা, সেলুলোজ উৎপাদন করতে শুরু করেছিল এবং জীবন-ধারার দিক দিয়ে তারা উৎপাদনক্ষম ছিল। জলের মধ্যে তারা উর্বর ডিম পাড়ত এবং ভাসমান শূকগুলিকে (লার্ভা) শক্ত করা এবং তার জন্য স্বাধীনভাবে নড়াচড়ার শক্তি-সহায়ক কতগুলি কাঠামোর বিকাশের জন্য এই উর্বর ডিমগুলি খুব সহজে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারত। এই ভ্রাম্যমান ডিমগুলির মেরুদণ্ডকে নোটোকর্ড বলা হত এবং এই নূতন ও তারপরের সমস্ত জীবন-আকৃতিগুলিকে বলা হত কোরডাটা; যাদের নোটোকর্ড ছিল না তারা হল স্টারফিশ, সী আর্চিন, সী কুকুম্বার ইত্যাদি—এতদিন এরাই ছিল সৃষ্টিকর্তা। মেরুদণ্ডশীল সমস্ত জীব, এমনকি মানুষেরও জগৎ, প্রকৃতির এই বিচিত্র খেয়ালেই জন্মলাভ করেছে। এর পিছনে কোন যুক্তি ছিল না। এমনিতেই এটি হয়েছিল।

মেরুদণ্ডী জন্তুর বৃদ্ধির জন্য নোটোকর্ডের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার অনেক উচ্চস্তরের জীবদের জন্য এল তরুণাস্থি বা অস্থিময় পদার্থ। হ্যাগ-ফিশ ও বাইন মাছের সমস্ত জীবন ধরে তা পাওয়া যায়, এবং বাইন মাছের মধ্য দিয়েই এগুলি আমাদের তালিকায় স্থান পায়।

॥ ৬ ॥ বার্ধক্য ও যৌবনের বিরোধ

নিজের ও যৌবনের মধ্যে যে সংঘর্ষ আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, বর্তমান লেখকের পক্ষে সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলার এই উপযুক্ত সময়। প্রকৃতির এই ব্যাপার লেখক অত্যন্ত স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং অন্য কোনরকম ভাবেই তা গ্রহণ করা শোভা পায় না। কিন্তু কোন যুবক, ধরা যাক খুব বেশি করে পঁয়ত্রিশ বছরের কমবয়স্ক, যে ঠিক এইভাবে তা গ্রহণ করবে লেখক কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। এই বয়স না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুবকই বিশ্বের সঙ্গে বিরোধে আসে এবং তার নিজের মনের মতই সব কিছু দাবি করে। যে সহজেই খুশি হয় এবং যা পায় তার বেশি চায় না, তার জীবনী-শক্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কম।

কিন্তু বর্তমান লেখকের বয়স এখন উনআশি; তিনি প্রচুর আনন্দে ও অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। ল্যাণ্ডরের মত তিনিও জীবনের আগুনে দু-হাতই গরম করেছেন; আজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে অকর্মণ্যতার দিকে অগ্রসর হওয়ায় তিনি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। মনুষ্যজাতিকে লক্ষ্য করতে করতে, এই মানসিক বিশৃঙ্খলার যুগে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকের সাহায্যকর কোন ব্যবস্থার অনুসন্ধানে আজও ব্যাপৃত থেকে তিনি তাঁর শেষদিনের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু

স্বাভাবিক যে-কোন তরুণ তরুণীর মানসিক পরিবেশের মত তিনি জীবনের সঙ্গে মীমাংসা করতে কোন সম্মুখ-সংগ্রাম আর চান না।

সৃষ্টিক্ষম-অতিক্রান্ত বয়স্ক যে-কোন ব্যক্তিরই অবস্থা লেখকের মত। তখন তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন। সেদিন থেকে তিনি এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা শুধু তাঁদের বিশ্বাসে গড়া চিন্তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে প্রাখর্যের কিছুটা ভাঁটার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। জীববিদ্যার প্রতি তাঁর চির-অদম্য কৌতূহলের ফলে রাজনীতিবিদ ফাটকাবাজ ধর্মযাজক বা ব্যস্ত ব্যবসায়ীর চেয়ে জীবন্ত প্রকৃতির সঙ্গে হয়ত তিনি বেশি পরিচিত—একথা তিনি মনে করতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ ও তরুণের বিরোধের মীমাংসা তাতে হয় না। আশায় বা বিদ্বেষে, ঈর্ষায় বা উদারতায়, আমরা বৃদ্ধরা শুধু তাকিয়ে দেখি এবং এই তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না। বস্তুত, আমরা বেঁচে ছিলাম চল্লিশ বছর আগে। যুবকরাই জীবন বলতে যা বোঝায় তাই এবং তারা ছাড়া আর কোন আশা নেই।

॥ ৭ ॥ পাষাণের ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত

আগেই বলা হয়েছে যে (পৃঃ ৩) পৃথিবীর অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরা কিংবা তার কক্ষের বার্ষিক গতি দিনে দিনে কমে আসছে। প্রথম কয়েকটি অধ্যায় রচনার পর যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার ফলে রেডিয়াম ঘড়ির সময়ানুপাতে পাষাণের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগগুলির বয়স কেইনোজোইক যুগের অনুপাতে অনেক, অনেক কমে যাবে। আকারগুলি একই রকমের, কিন্তু অনুপাত ভিন্ন। সেই যুগব্যাপী কমে-যাওয়া অবিচ্ছিন্ন হতেও পারে, নাও হতে পারে। লেখকের কাছে অবশ্য মনে হয় যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সে গতি কমে আসছিল। সঠিক কী, তা আমরা জানি না। সেই অনিশ্চিত যুগে স্বতন্ত্র জীবের পরিস্থিতি ও সবিশেষ জীবনধারণ ব্যবস্থাও মনে হয় অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হত।

একটি ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায়। সুপ্রচুর তথ্য সংগ্রহীত হওয়া সত্ত্বেও, আঙ্গিক অভিব্যক্তি তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার মত এমন কোন তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ধর্মানুরক্ত ব্যক্তিদের ভীষণ মিথ্যা ও চিৎকার সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অভিব্যক্তিক ব্যাপারের অপরাজেয় প্রকৃতি অস্বীকার করতে পারেন না। এ. এম. ডেভিস প্রণীত 'এভোলিউশন অ্যাণ্ড ইটস মডার্ন ক্রিটিকস' নামে একটি অতি সুন্দর ছোট বইয়ে এই ব্যাপার অত্যন্ত চমৎকারভাবে লেখা আছে। মিথ্যা-জানা পাঠকদের এই বইটি পড়ে দেখা উচিত।

পৃথিবীর জীবনী-শক্তি কমে আসাটাই এখন চোখে পড়ে। বৎসর, দিন, ক্রমে-

ক্রমে বড় হতে শুরু করে; মানুষের মন এখনও সক্রিয়, কিন্তু তা অবসান ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর।

বর্তমান লেখক—তাঁর বয়সটা লক্ষ্য রাখা দরকার—এই পৃথিবীকে পুনঃশক্তি-লাভ-বঞ্চিত নিস্তেজ এক পৃথিবী বলে মনে করেন। এই বইয়ের আগের বিভাগ-গুলিতে মানুষ সমস্ত দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন সৃষ্টিশীল জীবনের সূত্রপাত করবে বলে বিশেষ আশা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত দুই বছর বিশ্বব্যাপী অপ্রাচুর্যের মধ্যে এই আশাবাদ এক উদাসীন মানব-বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধেরা অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত নীচ ও ধিক্কারজনক ব্যবহার করেছে এবং তরুণরা হয়ে পড়েছে আবেগ-প্রবণ, মূঢ় ও সহজেই বিপথ-চালিত। মানুষের হয় উত্থান নয় পতন, এবং সমস্ত দিক দিয়ে তার পতন ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাকে যদি উপরে উঠতে হয়, তার যোগ্যতা-গুণ এত বেশি হতে হবে যে তখন সে আর মানুষ থাকবে না। সাধারণ মানুষের আজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা—এই অধ্যায়ের শিরোনামা লক্ষনীয়। অত্যন্ত অল্পসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিই কেবল বেঁচে যেতে পারে। অন্য সকলে তাদের মনের মত কোন ঘুমের ওষুধ বা অন্য কোন সান্ত্বনায় ডুব দিয়ে এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। বর্তমান মানুষের পরিবর্তনকে বিশেষ লক্ষ্য করে জীবনের এই বিচিত্র ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তের উপসংহারে তবে আসা যাক।

প্রাইমেটরা (মানুষ বানর প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবদের আদি) পতঙ্গাশী (Insectivora) দলের অন্যতম বন্য জীব হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তারা গাছের উপর বসবাস করতে শুরু করে। গাছের শাখাপ্রশাখার মধ্যে তারা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও মাংসপেশীর ব্যবহারক্ষমতা লাভ করে। তারা সমাজবদ্ধ ছিল এবং তাদের প্রচুর বংশবৃদ্ধি হয়। তারপর তাদের চেহারা ওজন ও শক্তি যথারীতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে তাদের মাটিতে নেমে আসতে হয় ও বন্য জগতের বড়-বড় মাংসাশী জন্তুদের সম্মুখীন হয়ে লড়াই করতে হয় এবং বুদ্ধি দিয়ে পরাস্ত করার দিক দিয়ে তখন তারা সবিশেষ বড় হয়ে ওঠে। তাদের প্রায়-সোজা হয়ে দাঁড়ানোয় উচ্চতালাভের ফলে তারা শত্রুকে পাথর ছুঁড়ে মারতে পারত—দাঁত ও নখ ছাড়া এই অস্ত্র তখন অজ্ঞেয় ছিল। কিন্তু খাদ্য-সম্ভারের বিস্তৃত অঞ্চলের প্রয়োজনে তাদের সমাজবদ্ধতা কমে এল। তৎকালীন জীবনের সুপ্রাচীন নিয়মানুবর্তিতায় বড়দের কাছে ছোটরা হেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিরাট বিরাট বানরেরা ব্যক্তিগত পারি-বারিক প্রতিষ্ঠানকে সু-উচ্চ মানে তুলে ধরল। এই সীমারেখার পর তারা বর্তমানের গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাং-ওটাঙে পরিবর্তিত হয়।

॥ ৮ ॥ অগ্নি ও অস্ত্র

কিন্তু বনে পশ্চাদপসরণের এক যুগে বনজঙ্গলের বাইরে এই বিরাট বানরদের অন্যরকম দুর্দশায় পড়তে হয়। তৃণময় প্রান্তর ও রুক্ষ বনহীন ভূমি ধু-ধু করতে লাগল। শাকসব্জী ফলাদির যোগান খুব কমে গেল। ছোটখাট শিকার ও মাংস দিন-দিন ভোজ্যের এক প্রধান অংশ গ্রহণ করতে শুরু করল। চিরাচরিত সেই একই বিকল্প ছিল: 'হয় যোগ্যতা, নয় ধ্বংস।' প্রতিরোধকারী বানরদের বিশ্বব্যাপী হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ভাগ্যবলে এক নতুন ধরনের বানর পালাতে সক্ষম হল। বন্য বানরের তুলনায় তারা আরো বেশি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত; তারা দৌড়িয়ে শিকার করত এবং শিকারে সহযোগিতা করার মত বুদ্ধি তাদের ছিল।

এই দ্রুতগামী স্থল-বানররা ছিল হোমিনিডি—ক্ষুধার্ত ও হিংস্র এক জন্তুবিশেষ। তারা মুক্তবায়ু প্রাণী, এবং জলে না ডুবে-যাওয়ার মত বুদ্ধি থাকায় তাদের শিলীভূত অবস্থা একেবারে প্রায় পাওয়াই যায় না। তবু তাদের অস্তিত্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তারা তাদের কোন অস্থি না রেখে গেলেও, পৃথিবী জুড়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে গেছে। এই সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে তারা তাদের হাত ও চোখকে আরও বেশি কাজে লাগাতে পেরেছিল। এই পশুরা কুৎসিত শব্দ করে ভাবের আদান-প্রদান করত। প্রয়োজন-মত তারা লাঠি ও পাথর ব্যবহার করত। পাথরে ঘা মেরে মেরে সূচলো করত এবং শুকনো পাতায় সেই আগুনের ফুলকি পড়ে যে আগুন ছড়িয়ে পড়ত, তারা তাতে কোনরকম ভীত না হয়ে তার মাঝে বসত। ভীত জন্তুদের দুর্যোগের মধ্যে পলায়নের সময় ছাড়া জীবন্ত আর কোন প্রাণী এর আগে আগুন দেখে নি। এই আগুন ভয়ঙ্করভাবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ত। এই আগুন আর ধোঁয়ায় ভয় পেয়ে ভালুকরা পর্যন্ত প্রাণের দায়ে পালাত। হোমিনিডীয়রা কিন্তু এই আগুনকে তাদের কাজে লাগাত। ঠাণ্ডা কিংবা মাংসাশী জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা গুহায় কিংবা এমনি কোন আশ্রয়ে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে রাখত।

ধারাবাহিক হিমবাহ যুগের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এই অর্ধমানব কদাকার জন্তুগুলি রক্ষা পেল। কুৎসিত চিৎকার ও অঙ্গভঙ্গী করে তারা শিকার করত ও হত্যা করত। পূর্ণাকারে তারা মানুষের চেয়ে অনেক বড় ও অনেক ভারী ছিল। যে কুৎসিত হাত দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তারা চেলিয়ান অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, তা মানুষের হাতের চেয়ে অনেক বড় ছিল। পরবর্তী প্যালিওলিথিক যুগের মানুষদের তৈরি সূক্ষ্ম অস্ত্রশস্ত্রগুলির মত জিনিস সুনিপুণ প্রস্তর-খোদক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে, কিন্তু সেই চেলিয়ান অস্ত্রশস্ত্রের অনুরূপ কিছু করা অত্যন্ত

কঠিন। চেলিয়ান অস্ত্রশস্ত্র হল একটি বিরাট পাথরের মজ্জা : কিন্তু পরবর্তী যুগের অস্ত্র হল সেই মজ্জার এক টুকরো।

মানব-গোষ্ঠী প্রাণীর ইতিহাসে এক প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রাহী আকৃতি বা রূপের দিকে জীবন-চক্রের আর একবার আবর্তনের ফলে আদিম হোমিনিডির থেকেই মানব-গোষ্ঠী নামে প্রাণীর সুস্পষ্ট উদ্ভব হয়। সে পূর্ণবয়স্ক বিকৃত হাইডেলবার্গ অথবা নিয়াণ্ডারথাল শ্রেণীর মানুষের সমশ্রেণী নয়। একেবারে শুরুতে সে পরীক্ষারত, আমুদে, শিক্ষাশীল, অকালপক্ব শিশু ; পূর্ণযৌবন-বয়স্ককালে অত্যন্ত সমাজবদ্ধ। এই পূর্ণবয়স্কদের জড় হাবভাব চিরপরিবর্তনশীল জীবন-পরিস্থিতির সঙ্গে সমান তালে চলতে না পেরে জীবন-চক্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রক্ষিত নিদর্শনগুলিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই আদিম কুৎসিত বয়স্ক মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে পরিবর্তে তার চেয়ে অনেক শিশু-সংস্করণের মানুষ এল ; কিন্তু এই পরিবর্তনের ধারা ও ধাপ সম্বন্ধে আজও কারো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সমস্ত প্রকারের এই মানুষের জন্ম স্বজাতি-সঙ্গমে, এবং এই জাতির আদি যুগ হতে নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতি-সঙ্গম চলত। স্বাতন্ত্র্যের সাময়িক বিরতির ফলে জন্ম হয় নিয়ানডারথালয়েডের—নিগ্রোয়েড, ফর্সা,কালো,লম্বা, বেঁটে,বিভিন্ন রকমের লোকের, যারা তখনও স্বজাতি-সঙ্গম করতে পারত—ঠিক যেভাবে কুকুরদের অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হয়েছে ; এবং একবার সীমাবন্ধন ভেঙে গেলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। পরিবার ও জাতি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং বিজয়ীরা বন্দী রমণীগণের সঙ্গে সঙ্গম করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য খুইয়ে ফেলেছে। তুলনামূলক নরদেহ-বিজ্ঞান (Anthropology) ধীরে ধীরে এই বিবর্তনের জট খুলেছে, যে বিবর্তনে বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় আদিম বয়স্ক বন-মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে রেখে গেছে শিশু-সুলভ মানব-গোষ্ঠীকে যে, খুব ভাল হলে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৌতূহলী, শিক্ষাশীল ও পরীক্ষা-নিরত।

'খুব ভাল হলে' কথাগুলি এই বিভাগের সার কথা ; বর্তমান মানুষের মানসিক কর্মক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের হওয়া খুবই সম্ভব। বর্তমান মানুষের পক্ষে পূর্বের তরুণ ও শিশু-সুলভ মনের মত নতুন আদর্শ ও ধারণা সহজে নিতে না পারাও খুবই সম্ভব এবং এটাও খুব সম্ভব যে মানুষের সমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলির বৃদ্ধি ও জটিলতার সঙ্গে সমতালে চলবার মত কল্পনা-শক্তি প্রসারিত হয় নি। মানুষের সমস্ত আশার সবচেয়ে প্রতিবন্ধক এটিই।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, আমার যেমন মানসিক প্রকৃতি তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে, পৃথিবীতে জীবনের শেষ দেখবার মত অত্যন্ত অল্পসংখ্যক মানুষও শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে কি না।

কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে স্পেন ইটালি ও বল্কান উপদ্বীপে আর্যরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ও উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নসস ততদিনে ধ্বংস হয়ে গেছিল এবং তৃতীয় থথমিস, তৃতীয় আমেনোফিস ও দ্বিতীয় রামেসিসের গৌরবোজ্জল যুগের মিশর তারও তিন-চার শতাব্দী আগেকার কথা। একবিংশ বংশের দুর্বল রাজারা নীল নদের উপত্যকায় তখন রাজত্ব করছিলেন। ইস্রায়েল তার আদি রাজাদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে : সল কিংবা ডেভিড, কিংবা সলোমন হয়ত তখন রাজত্ব করছেন। আজকের পৃথিবীর কাছে কনস্ট্যান্টাইন দি গ্রেট যেরকম অপরিচিত, সে-যুগের পৃথিবীর কাছে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি অপরিচিত ছিলেন আক্কাদীয়-সুমেরীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সারগন (২৭৫০ খৃঃ পূঃ)। হাজার বছর আগে হামুরাবি মারা গেছিলেন। হীনবল ব্যাবিলোনিয়ানদের উপর অ্যাসিরিয়ানরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ১১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রথম টিগলাথ পিলেসার ব্যাবিলন অধিকার করেন; কিন্তু চিরস্থায়ী বিজয় সম্ভব হয় নি; অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া তখনও পৃথক সাম্রাজ্য ছিল। চীনে তখন নতুন চৌ বংশের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের প্রস্তর-যুগ তখন কয়েকশো বছর ধরে চলেছে।

এর পরের দুই শতাব্দীতে দেখা গেল দ্বাবিংশ বংশের অধীনে মিশরের পুনরুজ্জীবন, সলোমনের অল্পস্থায়ী ছোট হিব্রু রাজ্যের ভাঙন, বল্কান দক্ষিণ ইটালি ও এশিয়া মাইনরে গ্রীকদের বিস্তার এবং মধ্য-ইটালিতে এট্রুস্কানদের প্রাধান্যের যুগ। আমাদের নির্ণেয় তারিখের তালিকা আমরা তবে এইভাবে শুরু করি :

খৃঃ পূঃ

৮০০ কার্থেজ গঠন।

৭৯০ ইথিওপীয়দের মিশর বিজয় (পঞ্চবিংশ বংশের প্রতিষ্ঠা)।

৭৭৬ প্রথম অলিম্পিয়াড।

৭৫৩ রোম নির্মাণ।

৭৪৫ তৃতীয় টিগলাথ পিলেসারের ব্যাবিলোনিয়া বিজয় ও নতুন অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

খৃঃ পূঃ

৭২২ দ্বিতীয় সারগন অ্যাসিরিয়ান-দের লৌহ-অস্ত্রে সজ্জিত করেন।

৭২১ তিনি ইস্রায়েল-বাসীদের দেশান্তরে পাঠান।

৬৮০ ইথিওপীয় পঞ্চবিংশ বংশকে পরাস্ত করে এসারহাড্ডনের মিশরস্থিত থীবস অধিকার।

খৃঃ পূঃ

৬৬৪ প্রথম সামেটিকাসের মিশরের স্বাধীনতা পুনরর্জন ও ষড়বিংশ বংশের প্রতিষ্ঠা (৬১০ পর্যন্ত)।

৬০৮ মেগিডোর যুদ্ধে জুডার রাজা জোসিয়াকে মিশরের নেকো পরাজিত করেন।

৬০৬ চালদীয় ও মীডগণ কর্তৃক নিনেভে অধিকার। চালদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

৬০৪ ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত নেকোর পশ্চাদপসরণ ও দ্বিতীয় নেবু-কাডনেজার কর্তৃক পরাজয়। (নেবুকাডনেজার ইহুদীদের ব্যাবিলনে নিয়ে যান)।

৫৫০ মীড জারেক্সেসের পর পারসীক সাইরাস উত্তরাধিকারী হন। সাইরাস ক্রসাস জয় করেন।

৫৫০ বুদ্ধ, কনফুসিয়াস ও লাওৎসে এই সময়ে জীবিত ছিলেন।

৫৩৯ সাইরাসের ব্যাবিলন অধিকার ও পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৫২১ হিস্টাস্পেসের পুত্র প্রথম দারিয়ুসের হেলেসপণ্ট থেকে সিন্ধু পর্যন্ত রাজত্ব।
শকদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

৪৯০ ম্যারাথনের যুদ্ধ।

৪৮০ থার্মোপাইলি ও সালামিসের যুদ্ধ।

৪৭৯ প্লাটিয়া ও মাইকেলের যুদ্ধে পারস্য-বিতাড়ন সম্পূর্ণ।

৪৭৪ সিসিলিয়ান গ্রীকদের দ্বারা এট্রুস্কান নৌবহর ধ্বংস।

৪৩১ পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ শুরু (৪০৪ পর্যন্ত)।

৪০১ দশ সহস্রের পশ্চাদপসরণ।

৩৫৯ ফিলিপ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা হলেন।

৩৩৮ কিরোনিয়ার যুদ্ধ।

৩৩৬ ম্যাসিডোনীয় সৈন্যের এশিয়া প্রবেশ। ফিলিপ নিহত।

৩৩৪ গ্র্যানিকাসের যুদ্ধ।

৩৩৩ ইসাসের যুদ্ধ।

৩৩১ আরবেলার যুদ্ধ।

৩৩০ তৃতীয় দারিয়ুস নিহত হন।

৩২৩ অ্যালেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

৩২১ পাঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান। কডিন ফর্কসএর যুদ্ধ সামনাইট কর্তৃক রোম্যানদের সম্পূর্ণ পরাজয়।

২৮১ পিরাসের ইটালি অভিযান।

২৮০ হেরাক্লিয়ার যুদ্ধ।

২৭৯ আউসকুলামের যুদ্ধ।

২৭৮ গলদের এশিয়া মাইনর আক্রমণ ও গ্যালেসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন।

২৭৫ পিরাসের ইটালি ত্যাগ।

২৬৪ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ। (বিহারে অশোকের রাজত্বের সূচনা— রাজত্বকাল ২২৭ পর্যন্ত)।

২৬০ মাইলির যুদ্ধ।

২৫৬ এক্নোমাসের যুদ্ধ।

২৪৬ শি হোয়াং-তি ৎস ইন-এর রাজা হলেন।

২২০ শি হোয়াং-তি চীনের সম্রাট হলেন।

২১৪ চীনের প্রাচীর নির্মাণ শুরু।

২১০ শি হোয়াং-তির মৃত্যু।

২০২ জামার যুদ্ধ।

১৪৬ কার্থেজ বিধ্বস্ত।

১৩৩ অ্যাটালাস রোমকে পেরগামাম দান করেন।

খৃঃ পূঃ

১০২ মারিয়ুস কর্তৃক জার্মান বিতাড়ন।

১০০ মারিয়ুসের বিজয়-গৌরব। (চীনের তারিম উপত্যকা বিজয়।)

৮৯ সমস্ত ইটালিয়ানের রোমের নাগরিকত্ব লাভ।

৭৩ স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ।

৭১ স্পার্টাকাসের পরাজয় ও মৃত্যু।

৬৬ পম্পি রোম্যান সেনাবাহিনী কাস্পিয়ান সাগর ও ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত নিয়ে যান। আলানিদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ।

৪৮ ফার্সালাসের যুদ্ধে জুলিয়াস সীজার পম্পিকে পরাজিত করেন।

৪৪ জুলিয়াস সীজারকে হত্যা।

২৭ অগস্টাস সীজারের রাজত্ব (১৪ খৃঃ অঃ পর্যন্ত)।

৪ নাজারেথের যিশুর প্রকৃত জন্ম-বৎসর।

খৃঃ অঃ খৃষ্ট-বৎসর গণনার শুরু।

১৪ অগস্টাসের মৃত্যু। টাইবেরিয়াস সম্রাট হন।

৩০ ন্যাজারেথের যিশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়।

৪১ কালিগুলাকে হত্যা করে প্রিটোরিয়ান রক্ষীরা ক্লডিয়াসকে (সৈন্যবাহিনীদের প্রথম সম্রাট) সম্রাট করে।

৬৮ নিরোর আত্মহত্যা। (গলবা, অটো, ভাইটেলিয়াস পর পর সম্রাট হন।)

৬৯ ভেস্‌পাসিয়ান।

১০২ পান চাও-র কাস্পিয়ান সাগর তীরে আগমন।

খৃঃ অঃ

১১৭ ট্রাজানের পর হাড্রিয়ান সম্রাট হন। রোম্যান সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার।

১৩৮ (এই সময়ে ভারতীয় শকেরা যাবনিক শাসনের শেষ চিহ্ন ধ্বংস করে যাচ্ছিল।)

১৬১ মার্কাস অরেলিয়াস অ্যাণ্টোনিনাস পায়াসের পদাভিষিক্ত হন।

১৬৪ বিরাট প্লেগ মহামারীর শুরু, এবং এম. অরেলিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত (১৮০) স্থায়ী হয়। এই মহামারী এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে।

(রোম্যান সাম্রাজ্যে প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়।)

২২০ হান বংশের সমাপ্তি। চীনে চারশো বছর-ব্যাপী ভাগাভাগি শুরু।

২২৭ প্রথম আর্দাশির দ্বারা (প্রথম স্যাসানিড শাহ্) পারস্যে আর্সাসিড বংশের পতন।

২৪২ মানি তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

২৪৭ বিরাট অভিযানে গথরা দানিয়ুব অতিক্রম করে।

২৫১ গথদের বিরাট জয়লাভ। সম্রাট দাসিয়ুস নিহত।

২৬০ প্রথম সাপোর (দ্বিতীয় স্যাসানিড শাহ্) অ্যাণ্টিয়ক অধিকার করে সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে বন্দী করেন, এবং এশিয়া মাইনর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে পামিরার ওডেনাথাস তাঁর পথরোধ করেন।

খৃঃ পূঃ	
৬৬৪	প্রথম সামেটিকাসের মিশরের স্বাধীনতা পুনরর্জন ও ষড়বিংশ বংশের প্রতিষ্ঠা (৬১০ পর্যন্ত)।
৬০৮	মেগিডোর যুদ্ধে জুডার রাজা জোসিয়াকে মিশরের নেকো পরাজিত করেন।
৬০৬	চালদীয় ও মীডগণ কর্তৃক নিনেভে অধিকার। চালদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
৬০৪	ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত নেকোর পশ্চাদপসরণ ও দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার কর্তৃক পরাজয়। (নেবুকাডনেজার ইহুদীদের ব্যাবিলনে নিয়ে যান)।
৫৫০	মীড জারেক্সেসেরপর পারসীক সাইরাস উত্তরাধিকারী হন। সাইরাস ক্রসাস জয় করেন।
৫৫০	বুদ্ধ, কনফুসিয়াস ও লাওৎসে এই সময়ে জীবিত ছিলেন।
৫৩৯	সাইরাসের ব্যাবিলন অধিকার ও পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
৫২১	হিস্টাস্পেসের পুত্র প্রথম দারিয়ুসের হেলেসপণ্ট থেকে সিন্ধু পর্যন্ত রাজত্ব। শকদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।
৪৯০	ম্যারাথনের যুদ্ধ।
৪৮০	থার্মোপাইলি ও সালামিসের যুদ্ধ।
৪৭৯	প্লাটিয়া ও মাইকেলের যুদ্ধে পারস্য-বিতাড়ন সম্পূর্ণ।
৪৭৪	সিসিলিয়ান গ্রীকদের দ্বারা এট্রুস্কান নৌবহর ধ্বংস।
৪৩১	পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ শুরু (৪০৪ পর্যন্ত)।
৪০১	দশ সহস্রের পশ্চাদপসরণ।

খৃঃ পূঃ	
৩৫৯	ফিলিপ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা হলেন।
৩৩৮	কিরোনিয়ার যুদ্ধ।
৩৩৬	ম্যাসিডোনীয় সৈন্যের এশিয়া প্রবেশ। ফিলিপ নিহত।
৩৩৪	গ্র্যানিকাসের যুদ্ধ।
৩৩৩	ইসাসের যুদ্ধ।
৩৩১	আরবেলার যুদ্ধ।
৩৩০	তৃতীয় দারিয়ুস নিহত হন।
৩২৩	অ্যালেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
৩২১	পাঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান। কডিন ফর্কসএর যুদ্ধ সামনাইট কর্তৃক রোম্যানদের সম্পূর্ণ পরাজয়।
২৮১	পিরাসের ইটালি অভিযান।
২৮০	হেরাক্লিয়ার যুদ্ধ।
২৭৯	আউসকুলামের যুদ্ধ।
২৭৮	গলদের এশিয়া মাইনর আক্রমণ ও গ্যালেসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন।
২৭৫	পিরাসের ইটালি ত্যাগ।
২৬৪	প্রথম পিউনিক যুদ্ধ। (বিহারে অশোকের রাজত্বের সূচনা—রাজত্বকাল ২২৭ পর্যন্ত)।
২৬০	মাইলির যুদ্ধ।
২৫৬	এক্নোমাসের যুদ্ধ।
২৪৬	শি হোয়াং-তি ৎস ইন-এর রাজা হলেন।
২২০	শি হোয়াং-তি চীনের সম্রাট হলেন।
২১৪	চীনের প্রাচীর নির্মাণ শুরু।
২১০	শি হোয়াং-তির মৃত্যু।
২০২	জামার যুদ্ধ।
১৪৬	কার্থেজ বিধ্বস্ত।
১৩৩	অ্যাটালাস রোমকে পেরগামাম দান করেন।

খৃঃ পূঃ

১০২ মারিয়ুস কর্তৃক জার্মান বিতাড়ন।

১০০ মারিয়ুসের বিজয়-গৌরব। (চীনের তারিম উপত্যকা বিজয়।)

৮৯ সমস্ত ইটালিয়ানের রোমের নাগরিকত্ব লাভ।

৭৩ স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ।

৭১ স্পার্টাকাসের পরাজয় ও মৃত্যু।

৬৬ পম্পি রোম্যান সেনাবাহিনী কাস্পিয়ান সাগর ও ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত নিয়ে যান। আলানিদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ।

৪৮ ফার্সালাসের যুদ্ধে জুলিয়াস সীজার পম্পিকে পরাজিত করেন।

৪৪ জুলিয়াস সীজারকে হত্যা।

২৭ অগস্টাস সীজারের রাজত্ব (১৪ খৃঃ অঃ পর্যন্ত)।

৪ নাজারেথের যিশুর প্রকৃত জন্ম-বৎসর।

খৃঃ অঃ খৃষ্ট-বৎসর গণনার শুরু।

১৪ অগস্টাসের মৃত্যু। টাই-বেরিয়াস সম্রাট হন।

৩০ ন্যাজারেথের যিশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়।

৪১ কালিগুলাকে হত্যা করে প্রিটোরিয়ান রক্ষীরা ক্লডি-য়াসকে (সৈন্যবাহিনীদের প্রথম সম্রাট) সম্রাট করে।

৬৮ নিরোর আত্মহত্যা। (গলবা, অটো, ভাইটেলিয়াস পর পর সম্রাট হন।)

৬৯ ভেস্পাসিয়ান।

১০২ পান চাও-র কাস্পিয়ান সাগর তীরে আগমন।

খৃঃ অঃ

১১৭ ট্রাজানের পর হাড্রিয়ান সম্রাট হন। রোম্যান সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার।

১৩৮ (এই সময়ে ভারতীয় শকেরা যাবনিক শাসনের শেষ চিহ্ন ধ্বংস করে যাচ্ছিল।)

১৬১ মার্কাস অরেলিয়াস অ্যান্টো-নিনাস পায়াসের পদাভিষিক্ত হন।

১৬৪ বিরাট প্লেগ মহামারীর শুরু, এবং এম. অরেলিয়াসের মৃত্যু পর্যন্ত (১৮০) স্থায়ী হয়। এই মহামারী এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে।
(রোম্যান সাম্রাজ্যে প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়।)

২২০ হান বংশের সমাপ্তি। চীনে চারশো বছর-ব্যাপী ভাগা-ভাগি শুরু।

২২৭ প্রথম আর্দাশির দ্বারা (প্রথম স্যাসানিড শাহ) পারস্যে আর্সাসিড বংশের পতন।

২৪২ মানি তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন।

২৪৭ বিরাট অভিযানে গথরা দানিয়ুব অতিক্রম করে।

২৫১ গথদের বিরাট জয়লাভ। সম্রাট দাসিয়ুস নিহত।

২৬০ প্রথম সাপোর (দ্বিতীয় স্যাসানিড শাহ) অ্যান্টিঅক অধিকার করে সম্রাট ভ্যালে-রিয়ানকে বন্দী করেন, এবং এশিয়া মাইনর থেকে প্রত্যা-বর্তনের পথে পামিরার ওডেনাথাস তাঁর পথরোধ করেন।

খৃঃ অঃ

২৭৭ মানি পারস্যে ক্রুসবিদ্ধ।

২৮৪ ডায়োক্লেশিয়ান সম্রাট হন।

৩০৩ ডায়োক্লেশিয়ান কর্তৃক খৃষ্টান-দের নিগ্রহ।

৩১১ গ্যালেরিয়াস খৃষ্টান-নিগ্রহ বন্ধ করেন।

৩১২ কনস্ট্যাণ্টাইন দি গ্রেট সম্রাট হন।

৩২৩ নিকিয়া সম্মেলনে কনস্ট্যাণ্টাইন সভাপতিত্ব করেন।

৩৩: মৃত্যুশয্যায় কনস্ট্যাণ্টাইনের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা।

৩৬১-৩ জুলিয়ান দি অ্যাপোস্টেট খৃষ্টান-ধর্মের পরিবর্তে মিথরা-ইজম প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন।

৩৯২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস।

৩৯৫ থিয়োডোসিয়াস দি গ্রেটের মৃত্যু। অনরিয়াস ও আর্কে-ডিয়াস সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রভু ও রক্ষাকর্তা হিসাবে যথাক্রমে স্টিলিলো ও আলারিককে মেনে নেন।

৪১০ আলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথ-রা রোম অধিকার করে।

৪২৫ ভ্যাণ্ডালদের দক্ষিণ স্পেনে বসতি স্থাপন, পান্নোনিয়ায় হুন, ডালমাসিয়ায় গথ, পর্তুগাল ও উত্তর স্পেনে ভিসিগথ ও সুয়েভি। বৃটেনে ইংরেজ অভিযান।

৪৩৯ ভ্যাণ্ডালদের কার্থেজ দখল।

৪৫১ অ্যাটিলার গল আক্রমণ এবং ট্রয়েসের যুদ্ধে ফ্র্যাঙ্ক,আলেমান্নি ও রোম্যানদের কাছে পরাজয়।

৪৫৩ অ্যাটিলার মৃত্যু।

খৃঃ অঃ

৪৫৫ ভ্যাণ্ডাল কর্তৃক রোম বিধ্বস্ত।

৪৭৬ টিউটনীয় রাজা ওডোয়াকার কনস্ট্যান্টিনোপলকে জানান যে পশ্চিম ইউরোপে আর কোন সম্রাট নেই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের অবসান।

৪৯৩ অস্ট্রোগথ থিওডোরিক ইটালি জয় করে রাজা হন, কিন্তু নামমাত্র কনস্ট্যান্টিনোপলের আনুগত্য স্বীকার করেন। (ইটালিতে গথ-বংশীয় রাজা-দের শুরু। গথরা বিশেষভাবে-অধিকৃত ভূমিতে সৈন্যবাহিনী হিসাবে বসবাস করে।)

৫২৭ জাস্টিনিয়ান সম্রাট হন।

৫২৯ জাস্টিনিয়ান এথেন্সের সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। এই বিদ্যালয়গুলি প্রায় হাজার বছর ধরে দেশে শিক্ষা-বিস্তার করছিল। বেলিসেরিয়াস (জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি) নেপলস্ অধিকার করেন।

৫৩১ প্রথম কোসরোসের রাজত্ব শুরু।

৫৪৩ কনস্ট্যান্টিনোপলে ভীষণ প্লেগ।

৫৫৩ জাস্টিনিয়ান গথদের ইটালি থেকে বিতাড়িত করেন।

৫৬৫ জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু। লম্বার্ডদের উত্তর ইটালির অধিকাংশ জয় (র‍্যাভেনা ও রোমই শুধু বাইজাণ্টাইন-দের অধীনে থাকে)।

৫৭০ মহম্মদের জন্ম।

৫৭৯ প্রথম কোসরোসের মৃত্যু। (ইটালিতে লম্বার্ডদের প্রাধান্য।)

৫৯০ রোমে প্লেগের মড়ক। দ্বিতীয় কোসরোসের রাজত্ব শুরু।

খৃঃ অঃ

৬১০ হেরাক্লিয়াসের রাজত্ব শুরু।

৬১৯ দ্বিতীয় কোসরোস মিশর জেরুজালেম ও দামাস্কাস অধিকার করেন ও হেলেস্পণ্টে সৈন্য আনেন। চীনে তাঙ বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

৬২২ হিজিরা।

৬২৭ হেরাক্লিয়াসের কাছে পারসীকদের ভীষণ পরাজয়। তাই-ৎসুঙ্ চীনের সম্রাট হন।

৬২৮ দ্বিতীয় কাবাধ পিতা দ্বিতীয় কোসরোসকে হত্যা করে সম্রাট হন। মহম্মদ পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের পত্র দেন।

৬২৯ মহম্মদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন।

৬৩২ মহম্মদের মৃত্যু। আবু বকর খালিফ হন।

৬৩৪ য়ারমুকের যুদ্ধ। মুসলমানগণ কর্তৃক সিরিয়া দখল। ওমর দ্বিতীয় খালিফ হন।

৬৩৫ তাই-ৎসুঙ্ নেস্টোরিয়ার ধর্মযাজকদের গ্রহণ করেন।

৬৩৭ কাদেসিয়ার যুদ্ধ।

৬৩৮ খালিফ ওমরের কাছে জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ।

৬৪২ হেরাক্লিয়াসের মৃত্যু।

৬৪৩ অথমান তৃতীয় খালিফ হন।

৬৫৫ মুসলমানদের কাছে বাইজাণ্টাইন নৌবহরের পরাজয়।

৬৬৮ খালিফ মোয়াইজার সাগরপথে কনস্ট্যাণ্টিনোপল আক্রমণ।

৬৮৭ মেয়র হার্স্টাল পেপিন অস্ট্রেশিয়া ও নিউস্ট্রিয়াকে একত্রিত করেন।

৭১১ আফ্রিকা থেকে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর স্পেন আক্রমণ।

খৃঃ অঃ

৭১৫ খালিফ প্রথম ওয়ালিদের সাম্রাজ্য পাইরিনিজ থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

৭১৭-১৮ সুলেমান (ওয়ালিদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী) কনস্ট্যাণ্টিনোপল অধিকার করতে অসমর্থ।

৭৩২ চার্লস মার্টেল পয়টিয়াসের কাছে মুসলমানদের পরাজিত করেন।

৭৫১ পেপিন ফরাসীদের রাজা বলে অভিষিক্ত হন।

৭৬৮ পেপিনের মৃত্যু।

৭৭১ একচ্ছত্রাধিপতি শার্লমেঁ।

৭৭৪ শার্লমেঁর লম্বার্ডি বিজয়।

৭৮৬ হারুন অল রসিদ বাগদাদের খালিফ হন (৮০৯ পর্যন্ত)।

৭৯৫ তৃতীয় লিও পোপ হন (৮১৬ পর্যন্ত)।

৮০০ লিও শার্লমেঁকে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সম্রাট বলে অভিষিক্ত করেন।

৮০২ শার্লমেঁর রাজ-দরবারের এক বাস্তুহারা ইংরেজ, এগবার্ট, ওয়েসেক্সের রাজা হয়ে বসেন।

৮১০ বুলগারিয়ার ক্রুম সম্রাট নিসেফোরাসকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

৮১৪ শার্লমেঁর মৃত্যু।

৮২৮ এগবার্ট ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজা হন।

৮৪৩ লুই দি পায়াসের মৃত্যু ও কার্লোভিঙ্গিয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংস। মাঝে-মাঝে একসময় এক-একজন সম্রাট দেখা গেলেও, ৯৬২ সাল পর্যন্ত রোম্যান সম্রাজ্যের কোন ধারাবাহিক উত্তরাধিকারী ছিল না।

খৃঃ অঃ

৮৫০ প্রায় এই সময়ে রুরিক (একজন নর্থম্যান) নোভোগরোড ও কিয়েভের রাজা হন।

৮৫২ বুলগারিয়ার প্রথম খৃষ্টান রাজা বোরিস (৮৮৪ পর্যন্ত)।

৮৬৫ রুশদের (নর্থমেনদের) নৌবহর কনস্ট্যান্টিনোপলের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৯০৪ রুশদের (নর্থমেনদের) কনস্ট্যান্টিনোপলে আগমন।

৯১২ রোলফ দি গেঞ্জার নর্ম্যাণ্ডিতে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন।

৯১৯ হেনরি দি ফাউলার জার্মানির রাজা নির্বাচিত হন।

৯৩৬ হেনরি দি ফাউলারের পরে তাঁর পুত্র প্রথম অটো জার্মানির রাজা হন।

৯৪১ রুশ নৌবহর আবার কনস্ট্যান্টিনোপলের ভীতির কারণ হয়।

৯৬২ দ্বাদশ জন জার্মানির রাজা প্রথম অটোকে সম্রাট (প্রথম স্যাক্সন সম্রাট) বলে অভিষিক্ত করেন।

৯৮৭ হিউ কাপেট ফ্রান্সের রাজা হন। ফ্রান্সের কার্লোভিঙ্গিয়ান রাজবংশের অবসান।

১০১৬ ক্যানিউট ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা হন।

১০৪৩ রুশ নৌবহর কনস্ট্যান্টি-নোপলকে শঙ্কান্বিত করে।

১০৬৬ নর্মাণ্ডির ডিউক, উইলিয়ম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।

১০৭১ সেলজুক তুর্কীদের অধীনে ইসলামের পুনরুজ্জীবন। মেলাসগার্ডের যুদ্ধ।

খৃঃ অঃ

১০৭৩ হিল্ডেব্র্যাণ্ড পোপ হন (সপ্তম গ্রেগরি) ১০৮৫ পর্যন্ত।

১০৮৪ নর্ম্যান বংশীয় রবার্ট গুইসকার্ড রোম বিধ্বস্ত করেন।

১০৮৭-৯৯ দ্বিতীয় আর্বান পোপ হন।

১০৯৫ ক্লেরমণ্ট থেকে দ্বিতীয় আর্বানের প্রথম ক্রুসেড আহ্বান।

১০৯৬ ক্রুসেডের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড।

১০৯৯ বুইলোঁর গডফ্রে জেরুজালেম অধিকার করেন।

১১৪৭ দ্বিতীয় ক্রুসেড।

১১৬৯ সালাদিন মিশরের সুলতান।

১১৭৬ ভেনিসে ফ্রেডেরিক বার্বা-রোসার পোপের (তৃতীয় অ্যালেকজাণ্ডার) প্রাধান্য-স্বীকার।

১১৮৭ সালাদিনের জেরুজালেম দখল।

১১৮৯ তৃতীয় ক্রুসেড।

১১৯৮ তৃতীয় ইনোসেণ্ট পোপ হন (১২১৬ পর্যন্ত)। (চার বছর বয়সের) দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক সিসিলির রাজা হন ও নাবালকাবস্থায় পোপের অধীনে থাকেন।

১২০২ চতুর্থ ক্রুসেড পূর্ব সাম্রাজ্য আক্রমণ করে।

১২০৪ ল্যাটিনগণ কর্তৃক কনস্ট্যান্টি-নোপল অধিকার।

১২১৪ জেঙ্গিস খাঁর পিকিং অধিকার।

১২২৬ অ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যু। (ফ্রান্সিস্কান মতবাদ)।

১২২৭ কাস্পিয়ান থেকে প্রশান্ত মহা-সাগরের সম্রাট জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু ও ওগদাই খাঁর উত্তরাধিকার লাভ।

খৃঃ অঃ

১২২৮ দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের ষষ্ঠ ক্রুসেড অভিযান ও জেরুজালেম অধিকার।

১২৪০ মঙ্গোলরা কিয়েভ ধ্বংস করে। রাশিয়া মঙ্গোলদের করদ রাজ্য হয়।

১২৪১ সাইলেসিয়াস্থ লিয়েগনিৎসে মঙ্গোলদের বিজয়।

১২৫০ শেষ হোহেনস্টাউফেন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যু। ১২৭৩ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে অরাজকতা।

১২৫১ মঙ্গু খাঁ মহান খাঁ হন। কুবলাই খাঁ চীনের শাসনকর্তা হন।

১২৫৮ হুলাগু খাঁ বাগদাদ অধিকার ও ধ্বংস করেন।

১২৬০ কুবলাই খাঁ মহান খাঁ হন।

১২৬১ ল্যাটিনদের কাছ থেকে গ্রীকদের কনস্ট্যান্টিনোপল পুনরধিকার।

১২৭৩ হাবস্‌বুর্গের রুডল্‌ফ সম্রাট হন। সুইস্‌রা তাদের চিরস্থায়ী সঙ্ঘ গঠন করে।

১২৮০ কুবলাই খাঁ কর্তৃক উয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা।

১২৯২ কুবলাই খাঁর মৃত্যু।

১২৯৩ ফলিত বিজ্ঞানের প্রফেট, রজার বেকনের মৃত্যু।

১৩৪৮ গ্রেট প্লেগ ও ব্ল্যাক ডেথ।

১৩৬০ চীনে মঙ্গোল (য়ুয়ান) বংশের পতন ও সিঙ্‌ বংশের রাজত্ব (১৬৪৪ পর্যন্ত)।

১৩৭৭ পোপ একাদশ গ্রেগরির রোমে প্রত্যাবর্তন।

১৩৭৮ বিরাট ধর্মবিরোধ। রোমে ষষ্ঠ আর্বান। আভিগ্ননে সপ্তম ক্লেমেণ্ট।

১৩৯৮ প্রাগে হাস উইক্লিফের মতবাদ প্রচার করেন।

১৪১৪-১৮ কনস্ট্যান্স-সম্মেলন। হাসকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় (১৪১৫)

১৪১৭ বিরাট ধর্মবিরোধের অবসান।

১৪৫৩ দ্বিতীয় মহম্মদের অধীনে অটোমান তুর্কীদের কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার।

১৪৮০ মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক তৃতীয় ইভান কর্তৃক মঙ্গোল-প্রভুত্ব অস্বীকার।

১৪৮১ ইটালি-বিজয়ের পরিকল্পনারত সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের মৃত্যু।

১৪৮৬ ডায়াজ জাহাজ-যোগে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন।

১৪৯২ কলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকায় পৌছান।

১৪৯৩ প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান সম্রাট হন।

১৪৯৮ ভাস্কো দা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।

১৪৯৯ সুইজারল্যাণ্ডে স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়।

১৫০০ পঞ্চম চার্লসের জন্ম।

১৫০৯ অষ্টম হেনরি ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৫১৩ দশম লিও পোপ হন।

১৫১৫ প্রথম ফ্র্যান্সিস ফ্রান্সের রাজা।

১৫২০ সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেণ্ট সুলতান হন (১৫৬৬ পর্যন্ত)। তাঁর রাজত্ব বাগদাদ থেকে হাঙ্গারি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চম চার্লস সম্রাট হন।

১৫২৫ বাবরের পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ, দিল্লী অধিকার ও মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

খৃঃ অঃ

১৫২৭ বুর্বনের কনস্টেবলের অধীনে জার্মান সৈন্যবাহিনীর ইটালি অভিযান, রোম জয় ও ধ্বংস।

১৫২৯ সুলেমানের ভিয়েনা অবরোধ।

১৫৩০ পোপ কর্তৃক পঞ্চম চার্লসের অভিষেক। পোপ-তন্ত্রের সঙ্গে অষ্টম হেনরির বিবাদ শুরু।

১৫৩৯ সোসাইটি অব জীসাস-এর প্রতিষ্ঠা।

১৫৪৬ মার্টিন লুথারের মৃত্যু।

১৫৪৭ চতুর্থ ইভান (দি টেরিবল) রাশিয়ার জার হন।

১৫৫৬ পঞ্চম চার্লসের সিংহাসন ত্যাগ সম্রাট আকবরের রাজত্ব(১৬০৫ পর্যন্ত)। লায়েলার ইগ্নেশিয়াসের মৃত্যু।

১৫৫৮ পঞ্চম চার্লসের মৃত্যু।

১৫৬৬ সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেণ্টের মৃত্যু।

১৬০৩ প্রথম জেমস্ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজা হন।

১৬২০ 'মেফ্লাওয়ার' অভিযানে নিউ প্লাইমাউথের পত্তন। প্রথম কাফ্রী দাস-দলের জেম্‌সটাউনে অবতরণ।

১৬২৫ প্রথম চার্লস ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬২৬ স্যর ফ্র্যান্সিস বেকনের (লর্ড ভেরুলাম) মৃত্যু।

১৬৪৩ ষোড়শ লুইএর বাহাত্তর বছরব্যাপী রাজত্বের শুরু।

১৬৪৪ মাঞ্চুগণ কর্তৃক মিঙ রাজবংশের অবসান।

১৬৪৮ ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধি। ফলে হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্য বলে স্বীকৃত এবং প্রাশিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি। এই সন্ধিতে সম্রাট কিংবা ছোটখাট রাজারা কেউই সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারেন নি। ফ্রণ্ডের যুদ্ধ; ফরাসী রাজার সম্পূর্ণ বিজয়ে এই যুদ্ধের শেষ।

১৬৪৯ ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ।

১৬৫৮ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব। ক্রমওয়েলের মৃত্যু।

১৬৬০ দ্বিতীয় চার্লস রাজা হন।

১৬৭৪ নিউ (Nieuw) আমস্টার্ডাম সন্ধি-বলে শেষ পর্যন্ত বৃটিশাধীন হয় ও তার নতুন নামকরণ হয় নিউ নিয়র্ক।

১৬৮৩ ভিয়েনার উপর শেষ তুর্কী আক্রমণ পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় জন প্রতিহত করেন।

১৬৮৯ পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার জার হন (১৭২৫ পর্যন্ত)।

১৭০১ প্রথম ফ্রেডেরিক প্রাশিয়ার প্রথম রাজা হন।

১৭০৭ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন।

১৭১৩ প্রাশিয়ার ফ্রেডেরিক দি গ্রেট-এর জন্ম।

১৭১৫ ফ্রান্সের পঞ্চম লুই।

১৭৫৫-৬৩ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্ঘর্ষ। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহায়তায় ফ্রান্সের বৃটেন ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩); সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ(The Seven Years' War)

১৭৫৯ বৃটিশ সেনাপতি উল্ফ কর্তৃক কুইবেক অধিকার।

১৭৬০ তৃতীয় জর্জ বৃটেনের রাজা হন।

খৃঃ অঃ

১৭৬৩ প্যারিসের সন্ধি ; বৃটেনকে ক্যানাডা অর্পণ। ভারতবর্ষে বৃটিশের প্রাধান্য।

১৭৬৯ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম।

১৭৭৪ ষোড়শ লুইএর রাজত্ব আরম্ভ।

১৭৭৬ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৭৮৩ বৃটেন ও নতুন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিচুক্তি।

১৭৮৭ ফিলাডেলফিয়ায় শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট গঠন। ফ্রান্স দেউলিয়া।

১৭৮৮ নিউ ইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সর্বরাজ্য কংগ্রেস।

১৭৮৯ ফরাসী জনসাধারণের সভা। ব্যাস্টিল ধ্বংস।

১৭৯১ ভারেনেসে পলায়ন।

১৭৯২ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা ; ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাসিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা। ভালমি-র যুদ্ধ। ফ্রান্সের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

১৭৯৩ ষোড়শ লুইএর শিরশ্ছেদ।

১৭৯৪ রোবেস্পিয়ের নিহত ও জ্যাকোবিন গণতন্ত্রের অবসান।

১৭৯৫ ডাইরেক্টরি। বোনাপার্টের এক বিদ্রোহ দমন ও প্রধান সেনাপতি হয়ে ইটালি গমন।

১৭৯৮ বোনাপার্টের মিশর গমন। নীল নদের যুদ্ধ।

১৭৯৯ বোনাপার্ট ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন ও প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন 'ফার্স্ট কন্সাল' হন।

১৮০৪ বোনাপার্ট সম্রাট হন। ১৮০৫ খৃঃ দ্বিতীয় ফ্র্যান্সিসের 'অস্ট্রিয়ার সম্রাট' উপাধি গ্রহণ এবং ১৮০৬ খৃঃ 'পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যে' পদবী ত্যাগ। এইভাবে 'পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যে'র অবসান হয়।

১৮০৬ জেনায় (Jena) প্রাশিয়ার পরাজয়।

১৮০৮ নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফকে স্পেনের রাজা করেন।

১৮১০ স্পেনীয় আমেরিকায় গণতন্ত্র।

১৮১২ নেপোলিয়নের মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণ।

১৮১৪ নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ। অষ্টাদশ লুই।

১৮২৪ ফ্রান্সের সম্রাট দশম চার্লস।

১৮২৫ রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস। স্টকটন থেকে ডার্লিংটনে প্রথম রেলপথ।

১৮২৭ নাভারিনোর যুদ্ধ।

১৮২৯ গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ।

১৮৩০ এক বৎসরব্যাপী বিশৃঙ্খলা। লুই ফিলিপ কর্তৃক দশম চার্লসকে বিতাড়ন। হল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়ামের পৃথক হওয়া। স্যাক্স-কোবার্গ-গোথার লিওপোল্ড এই নতুন দেশ বেলজিয়ামের রাজা হন। রুশীয় পোল্যাণ্ডের ব্যর্থ বিদ্রোহ।

১৮৩৫ 'সমাজতন্ত্রবাদ' কথাটির প্রথম প্রচলন।

১৮৩৭ রানী ভিক্টোরিয়া।

১৮৪০ স্যাক্স-কোবার্গ-গোথা বংশের প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ।

১৮৫২ তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী সম্রাট হন।

১৮৫৪-৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।

১৮৫৬ রাশিয়ার জার দ্বিতীয় অ্যালেকজাণ্ডার।

খৃঃ অঃ	
১৮৬১	ইটালির প্রথম রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল। আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের শুরু।
১৮৬৫	অ্যাপোম্যাটক্স কোর্ট হাউসের আত্মসমর্পণ। বিশ্বের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগের সূত্রপাত।
১৮৭০	তৃতীয় নেপলিয়নের প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১৮৭১	প্যারিসের আত্মসমর্পণ (জানুয়ারি) প্রাশিয়ার রাজা 'জার্মান সম্রাট' হলেন। ফ্র্যাঙ্কফোর্টের শান্তিচুক্তি।
১৮৭৮	বার্লিনের সন্ধি। পশ্চিম ইউরোপে ছত্রিশ বছর জুড়ে সশস্ত্র শান্তি।
১৮৮৮	দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক (মার্চ); দ্বিতীয় উইলিয়ম (জুন)—জার্মান সম্রাট।
১৯১২	সাধারণতন্ত্রী চীনের উন্মেষ।
১৯১৪	ইউরোপে মহাযুদ্ধের শুরু।
১৯১৭	রাশিয়ার দুটি বিপ্লব। বলশেভিক আমল স্থাপন।
১৯১৮	যুদ্ধ-বিরতি।
১৯২০	জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন। এতে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুর্কীকে বাদ দেওয়া হয় এবং আমেরিকা যোগদান করে নি।
১৯২১	জাতি-সঙ্ঘের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করে গ্রীসের তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১৯২২	এশিয়া মাইনরে তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের বিরাট পরাজয়। ফ্যাসিস্টদের রোম অধিকার।

খৃঃ অঃ	
১৯২৪	লেনিনের মৃত্যু।
১৯২৭	স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে সংগ্রাম ও ট্রটস্কির নির্বাসন।
১৯২৮	রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু।
১৯৩০	জার্মান রাইখস্ট্যাগে হিটলারের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।
১৯৩১	গ্রেট বৃটেনে অর্থনৈতিক সঙ্কট। স্বর্ণমান পরিত্যাগ। অস্ট্রো-জার্মান কাস্টম্‌স্‌ ইউনিয়ন সংগঠনে জাতি-সঙ্ঘের অ-স্বীকৃতি। স্পেনে সাধারণতন্ত্র।
১৯৩২	জাপান কর্তৃক মাঞ্চুকো সৃষ্টি। ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন।
১৯৩৩	জার্মান রাইখস্ট্যাগে অগ্নি-সংযোগ এবং নাৎসিদের শাসনাধিকার গ্রহণ। হিটলার জার্মানির ডিক্টেটর হন। লণ্ডনে ব্যর্থ বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলন। জাপান (এপ্রিল) ও জার্মানির (অক্টোবর) জাতি-সঙ্ঘ ত্যাগ।
১৯৩৪	রাশিয়ার জাতিসঙ্ঘে যোগদান। কিরভকে হত্যা।
১৯৩৫	জার্মানিকে সার প্রত্যর্পণ। ইটালির বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার জাতি-সঙ্ঘে ব্যর্থ আবেদন। ইহুদীদের জার্মান নাগরিকত্বের অধিকার হরণ ও আর্যজাতির সঙ্গে বিবাহ নিষেধ।
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু। ইটালির আবিসিনিয়া অধিকার। স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর বিদ্রোহ। রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ।

খৃঃ অঃ	
১৯৩৭	ম্যাড্রিড অবরোধ ও স্পেনের সরকারী বাহিনীর শক্তির ক্রমাবনতি।
১৯৩৮	বিনা বাধায় জার্মানির অস্ট্রিয়া আক্রমণ ও অধিকার।
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু।
১৯৪০	জার্মানির নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম অধিকার। ফ্রান্সের পতন। হাঙ্গারি, রুমানিয়া ও স্লোভাকিয়ার অক্ষশক্তিতে যোগদান। ইটালির ব্যর্থ গ্রীস আক্রমণ। চার্চিল বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হন। রুজভেল্ট তৃতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। বৃটেন আটলান্টিক সমর-ঘাঁটি আমেরিকাকে ইজারা দেয়। মেক্সিকোয় ট্রটস্কিকে হত্যা।
১৯৪১	উঃ আফ্রিকায় যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা। ১৯৪১ সালে বৃটিশের লিবিয়ায় প্রবেশ, বসন্তে আবার পশ্চাদপসরণ, নভেম্বরে আবার অগ্রগমন এবং ১৯৪২ সালের বসন্তে আবার পশ্চাদপসরণ। বুলগারিয়ার অক্ষশক্তিতে যোগদান। জার্মানি কর্তৃক গ্রীস যুগোস্লাভিয়া ও ক্রীট অধিকার। আবিসিনিয়া উদ্ধার। বৃটিশ ও ফ্রান্সের সিরিয়া অধিকার। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ (২২শে জুন)। আটল্যাণ্টিক চার্টার। বৃটিশ ও রুশ কর্তৃক ইরান অধিকার। জার্মানদের হাতে কিয়েভের পতন। জার্মানদের মস্কো অভিযান ব্যর্থ হয়। জাপান কর্তৃক আমেরিকা আক্রমণ। জার্মানির বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা।
১৯৪২	সিঙ্গাপুরের পতন। প্রশান্ত মহাসাগর ও ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বিজয়। মিডওয়ে দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ। রমেলের লিবিয়া অভিযানের ফলে জার্মানদের মিশরে আগমন। মিশর ও এল এলামিনের যুদ্ধ। বৃটিশ ও আমেরিকানদের উত্তর আফ্রিকায় আগমন। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত টিউনিস জার্মান অধীনে ছিল, ঐ সময় উত্তর আফ্রিকা থেকে জার্মানদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়। অ্যালজিয়ার্সে দার্লানকে হত্যা। জার্মানদের হাতে সেবাস্তোপোলের পতন। জার্মানরা ককেসাসে প্রবেশ করে কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের কাছে অগ্রগমনে বাধা পায়।
১৯৪৩	ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন। 'বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে' জোর দেওয়া। টিউনিসে অ্যাংলো-আমেরিকান অধিকার। সিসিলি আক্রমণ। ইটালি আক্রমণ, প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার অগ্রগতি। রুশ কর্তৃক খার্কভ, স্মলেংস্ক ও কিয়েভ পুনরধিকার। কুইবেক সম্মেলন। তেহেরান সম্মেলন।
১৯৪৪	ফ্রান্সে মিত্রশক্তির আগমন। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মুক্তি-সাধন। জার্মান-সীমান্তে মিত্রশক্তির সংগ্রাম। গ্রীসের মুক্তি। রুমানিয়া ও বুল-

খৃঃ অঃ		খৃঃ অঃ	
	গারিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার হাঙ্গারি, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবেশ। রুজভেল্ট চতুর্থবার প্রেসিডেণ্ট		নির্বাচিত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার পদার্পণ।
		১৯৪৫	জার্মানির বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ। রুজভেল্টের মৃত্যু।